শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

সপ্তম সম্ভার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গৃহদাহ

গৃহদাহ

১

মহিমের পরম বন্ধু ছিল সুরেশ। একসঙ্গে এফ. এ. পাশ করার পর সুরেশ গিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইল; কিন্তু মহিম তাহার পুরাতন সিটি কলেজেই টিকিয়া রহিল।

সুরেশ অভিমানক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে কহিল, মহিম, আমি বার বার বলচি, বি.এ., এম.এ. পাশ করে কোন লাভ হবে না। এখনও সময় আছে, তোমারও মেডিকেল কলেজেই ভর্ত্তি হওয়া উচিত।

মহিম সহাস্যে কহিল, হওয়া ত উচিত, কিন্তু খরচের কথাটাও ত ভাবা উচিত।

খরচ এমনই কি বেশী যে, তুমি দিতে পার না? তা-ছাড়া তোমার স্কলারশিপও আছে।

মহিম হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশ অধীর হইয়া কহিল, না না—হাসি নয় মহিম, আর দেরি করলে চলবে না, তোমাকে এরই মধ্যে এ্যাডমিশন নিতে হবে, তা-বলে দিচ্ছি। খরচপত্রের কথা পরে বিবেচনা করা যাবে।

মহিম কহিল, আচ্ছা।

সুরেশ বলিল, দেখ মহিম, কোন্‌টা যে তোমার সত্যকারের আচ্ছা, আর কোন্‌টা নয়—তা আজ পর্য্যন্ত আমি বুঝে উঠতে পারলুম না। কিন্তু পথের মধ্যে তোমাকে সত্য করিয়ে নিতে পারলুম না, কারণ, আমার কলেজের দেরি হচ্ছে। কিন্তু কাল-পরশুর মধ্যে এর যা-হোক একটা কিনারা না করে আমি ছাড়ব না। কাল সকালে বাসায় থেক, আমি যাব। বলিয়া সুরেশ তাহার কলেজের পথে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

* * *

দিন-পনের কাটিয়া গিয়াছে। কোথায় বা মহিম, আর কোথায় তাহার মেডিকেল কলেজে এ্যাডমিশন লওয়া! একদিন রবিবারের দুপুরবেলা সুরেশ বিস্তর খোঁজা-খুজির পর একটা দীনহীন ছাত্রাবাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। সোজা উপরে উঠিয়া গিয়া দেখিল, সুমুখের একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরের মেঝের উপর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কুশাসন পাতিয়া ছয়-সাতজন আহারে বসিয়াছে। মহিম মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ বন্ধুকে দেখিয়া কহিল, হঠাৎ বাসা বদলাতে হ'ল বলে তোমাকে সংবাদ দিতে পারিনি; সন্ধান করলে কি ক'রে?

সুরেশ তাহার কোন উত্তর না দিয়া থপ্‌ করিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল

এবং একদৃষ্টে ছেলেদের আহার্য্যের প্রতি চাহিয়া রহিল। অত্যন্ত মোটা চালের অন্ন। জলের মত কি একটা দাল, শাক, ডাঁটা এবং কচু দিয়া একটা তরকারি এবং তাহারই পাশে দু'টুকরা পোড়া কুমড়া ভাজা। দধি নাই, দুগ্ধ নাই, কোনপ্রকার মিষ্ট নাই; এক টুকরা মাছ পর্য্যন্ত কাহারও পাতে পড়িল না।

সকলের সঙ্গে মহিম অম্লান মুখে নিরতিশয় পরিতৃপ্তির সহিত এইগুলি ভোজন করিতে লাগিল; কিন্তু চাহিয়া চাহিয়া সুরেশের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে কোনমতে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সামান্য কারণেই সুরেশের চোখে জল আসিয়া পড়িত।

আহারান্তে মহিম তাহার ক্ষুদ্র শয্যার উপর আনিয়া বন্ধুকে যখন বসাইল, তখন সুরেশ রুদ্ধস্বরে কহিল, বার বার তোমার অত্যাচার সহ্য করতে পারি না মহিম।

মহিম নিরীহভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে?

সুরেশ কহিল, তার মানে—এমন কদর্য্য বাড়ি যে সহরের মধ্যে থাকতে পারে, এমন ভয়ানক বিশ্রী খাওয়াও যে কোন মানুষ মুখে দিতে পারে, চোখে না দেখলে আমি কোনমতে বিশ্বাস করতে পারতুম না। তা যাই হোক, এ জায়গার তুমি সন্ধান পেলেই বা কিরূপে, আর তোমার সাবেক বাসা—তা সে যত মন্দই হোক, এর সঙ্গে তুলনাই হয় না—তাই বা পরিত্যাগ করলে কেন?

বন্ধু-স্নেহ বন্ধুর বুকে আঘাত করিল। মহিম আর তাহার নির্ব্বিকার গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে পারিল না, আর্দ্রস্বরে কহিল, সুরেশ, তুমি আমার গ্রামের বাড়ি দেখ নি; তা হলে বুঝতে এ-বাসায় আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হ'তে পারে না। আর খাওয়া—আর পাঁচজন ভদ্রসন্তান যা স্বচ্ছন্দে খেতে পারে, আমি পারব না কেন?

সুরেশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, এ কেনর কথা নয়। ভালমন্দ জিনিস সংসারে অবশ্যই আছে। ভাল ভালই লাগে, মন্দ যে মন্দ লাগে, তাতে আর সংশয় নেই। আমি শুধু জানতে চাই, তোমার এত দুঃখ করবার প্রয়োজন কি হয়েচে?

মহিম চুপ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল—কথা কহিল না।

সুরেশ কহিল, তোমার প্রয়োজন তোমার থাক, আমি জানতে চাই না। কিন্তু আমার প্রয়োজন তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া। আমি গাড়ি ডেকে তোমার জিনিস-পত্র এখনই আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব। এখানে তোমাকে ফেলে রেখে যদি যাই, চোখে আমার ঘুম আসবে না, মুখে অন্ন রুচবে না। তোমাদের বাসার চাকরকে ডাক, একটা গাড়ি নিয়ে আসুক। এই বলিয়া সুরেশ মহিমকে টানিয়া তুলিয়া স্বহস্তে তাহার বিছানা গুটাইতে প্রবৃত্ত হইল।

মহিম বাধা দিয়া টানা-হেঁচড়া বাধাইয়া দিল না। কিন্তু শান্ত গম্ভীরস্বরে বলিল, পাগলামি ক'রো না সুরেশ।

সুরেশ চোখ তুলিয়া কহিল, পাগলামি কিসের? তুমি যাবে না?

না।

কেন যাবে না? আমি কি তোমার কেউ নই? আমার বাড়ি যাওয়ায় কি তোমার অপমান হবে?

না।

তবে?

মহিম কহিল, সুরেশ, তুমি আমার বন্ধু। এমন বন্ধু আমার আর নেই; সংসারে এমন আর কয়জনের আছে, তাও জানি না। এতকাল পরে এ বস্তু আমি একটু-খানি দেহের আরামের জন্য খুইয়ে ব'সব, আমাকে কি তুমি এত বড়ই নির্ব্বোধ পেয়েচ?

সুরেশ কহিল, বন্ধুত্ব জিনিসটি তোমার ত একার নয় মহিম। আমারও ত তাতে একটা ভাগ আছে। খোয়া যদি যায়, সে ক্ষতি যে কত বড়, সে বোঝবার সাধ্য আমার নেই--আমি কি এতই বোকা? আর এত সতর্ক-সাবধান, এত হিসাবপত্র করে না চললেই এ বন্ধুত্ব যদি নষ্ট হয়ে যায় ত যাক না মহিম! এমনই কি তার মূল্য যে, সেজন্য শরীরের আরামটাকে উপেক্ষা করতে হবে?

মহিম হাসিয়া বলিল, না, এবার হেরেচি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে নিশ্চয় জানাচ্ছি সুরেশ। তুমি মনে করেচ—সখ করে দুঃখ সইতে আমি এসেচি, তা সত্য নয়।

সুরেশ কহিল, বেশ ত সত্য নাই হ'ল। আমি কারণ জানতেও চাই না—কিন্তু যদি টাকা বাঁচানই তোমার উদ্দেশ্য হয়, আমাদের বাড়িতে এসে থাক না, তাতে ত তোমার উদ্দেশ্য মাটি হয়ে যাবে না?

মহিম ঘাড় নাড়িয়া সংক্ষেপে কহিল, এখন থাক সুরেশ। কষ্ট যদি সত্যি হয়, তোমাকে জানাব।

সুরেশ জানিত, মহিমকে তাহার সঙ্কল্প হইতে টলান অসাধ্য। সে আর জিদ না করিয়া একরকম রাগ করিয়াই চলিয়া গেল; কিন্তু বন্ধুর এই থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থাটা চোখে দেখিয়া তাহার মনের মধ্যে সূচ বিঁধিতে লাগিল।

সুরেশ ধনীর সন্তান, এবং মহিমকে সে অকপটে ভালবাসিত। তাহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা, কোনমতে সে বন্ধুর একটা কাজে লাগে। কিন্তু মহিমকে সে কোনদিন সাহায্য লইতে স্বীকার করাইতে পারে নাই--আজিও পারিল না।

বছর-পাঁচেক পরে দুই বন্ধুতে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

তোমার উপর আমার যে কত বড় শ্রদ্ধা ছিল মহিম, তা বলতে পারি না।

বলবার জন্য তোমাকে পীড়াপীড়ি করচি না সুরেশ।

সে শ্রদ্ধা বুঝি আর থাকে না।

না থাকলে তোমাকে দণ্ড দেবো, এমন ভয় ত কখনও দেখাইনি।

তোমাকে কপটতা দোষ দিতে তোমার অতি-বড় শত্রুও কখনও পারত না।

শত্রু পারত না ব'লে কাজটা যে মিত্রও পারবে না, দর্শন-শাস্ত্রের এমন অনুশাসন ত নেই।

ছি ছি, শেষকালে কি না একটা ব্রাহ্ম-মেয়ের কাছে ধরা দিলে? কি আছে ওদের? ঐ শুকনো কাঠপানা চেহারা, বই মুখস্থ ক'রে গায়ে কোথাও এক ফোঁটা রক্ত পর্য্যন্ত যেন নেই। ঠেলা দিলে আধখানা দেহ খসে পড়বে ব'লে ভয় হয়—গলার স্বরটা পর্য্যন্ত এমনি চি চি করে যে শুনলে ঘৃণা হয়।

তা হয় সত্য।

দেখ মহিম, ঠাট্টা কর গে তোমাদের পাড়াগাঁয়ের লোককে, যে ব্রাহ্ম-মেয়ে কখনো চোখে দেখেনি; মেয়েমানুষ ইংরাজীতে ঠিকানা লিখতে পারে শুনলে যারা আশ্চর্য্য অবাক হয়ে যায়—তিনি চ'লে গেলে যারা সসম্ভ্রমে দূরে সরে দাঁড়ায়। বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে দাও গে তোমার গ্রামের লোককে, যারা এঁকে দেব-দেবী মনে করে মাথা লুটিয়ে দেবে; কিন্তু আমাদের বাড়ি ত পাড়াগাঁয়ে নয়—আমাদের ত অত সহজে ভুলানো যায় না।

আমি তোমাকে শপথ করে বলচি সুরেশ, তোমাদের সহরের লোককে ভুলোবার আমার কোন দুরভিসন্ধি নেই। আমি তাঁকে আমাদের পাড়াগাঁয়ে নিয়েই রাখব। তাতে ত তোমার আপত্তি নেই?

সুরেশ রাগিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, আপত্তি নেই? শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি আপত্তি আছে। তুমি সমস্ত জগতের বরেণ্য পূজনীয় হিন্দুর সন্তান হয়ে কি না একটা রমণীর মোহে জাত দেবে? মোহ! একবার তার জুতো মোজা সৌখীন পোষাক ছাড়িয়ে নিয়ে আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের রাঙা শাড়ীখানা পরিয়ে দেখ দেখি, মোহ কাটে কি না! তখন ঐ নির্জ্জীব কাঠের পুতুলটার রূপ দেখে তোমার ভুল ভাঙে কি না! কি আছে তার? কি পারে সে? বেশ ত, তোমার যদি সেলাই আর পশমের কাজই এত দরকার কলকাতা সহরে দর্জ্জির ত অভাব নেই। একখানা চিঠির

ঠিকানা লেখবার জন্য ত তোমাকে ব্রাহ্ম-মেয়ের দ্বারস্থ হ'তে হবে না। তোমার অসময়ে সে কি বাটনা বেটে, কুটনো কুটে তোমাকে এক-মুঠো ভাত রেঁধে দেবে? রোগে তোমার কি সেবা করবে? সে শিক্ষা কি তাদের আছে? ভগবান না করুন, কিন্তু সে দুঃসময়ে সে যদি না তোমাকে ছেড়ে চলে আসে ত আমার সুরেশ নামের বদলে যা ইচ্ছে ব'লে ডেক, আমি দুঃখ করব না।

মহিম চুপ করিয়া রহিল। সুরেশ পুনরায় কহিতে লাগিল, মহিম, তুমি ত জান, আমি তোমার মঙ্গল ভিন্ন কখনো ভুলেও অমঙ্গল কামনা করতে পারিনে। আমি অনেক ব্রাহ্ম মহিলা দেখেচি। দু-একটি ভালও যে দেখিনি, তা নয়, কিন্তু আমাদের হিন্দুঘরের মেয়ের সঙ্গে তাঁদের তুলনাই হয় না। তোমার বিবাহেই যদি প্রবৃত্তি হয়েছিল, আমাকে বললে না কেন? আচ্ছা, যা হবার হয়েচে, আর তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নাই। আমি কথা দিচ্ছি, এক মাসের মধ্যে তোমাকে এমন কন্যা বেছে দেব যে, জীবনে কখনো দুঃখ পেতে হবে না; যদি না পারি, তখন না হয় তোমার যা ইচ্ছা ক'রো—এর শ্রীচরণেই মাথা মুড়িও, আমি বাধা দেব না; কিন্তু এই একটা মাস তোমাকে ধৈর্য্য ধ'রে আমাদের আশৈশব বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখতেই হবে। বল রাখবে?

মহিম পূর্ব্ববৎ মৌন হইয়া রহিল—হাঁ, না, কোন কথাই কহিল না; কিন্তু বন্ধু যে বন্ধুর শুভকামনায় কিরূপ মর্মান্তিক বিচলিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অনুভব করিল।

সুরেশ কহিল, মনে করে দেখ দেখি মহিম, ব্রাহ্ম না হয়েও তুমি যখন প্রথম ব্রাহ্ম মন্দিরে যাতায়াত শুরু করলে, তখন কি তোমাকে বারংবার নিষেধ করি নি? তোমার জন্যে এত বড় এই কলকাতা সহরের মধ্যে কি একটাও হিন্দু-মন্দির ছিল না যে, এই কপটতার কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল? এমনিভাবে একটা-না-একটা বিড়ম্বনার ভেতরে যে অবশেষে জড়িয়ে পড়বে, আমি তখনই সন্দেহ করেছিলাম।

মহিম এবার একটুখানি হাসিয়া কহিল, তা যেন করেছিলে, কিন্তু আমি ত তা করি নাই যে, আমার যাওয়ার মধ্যে কপটতা ছিল; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সুরেশ, তুমি নিজে ত ভগবান পর্য্যন্ত মান না, যে হিন্দুর ঠাকুর-দেবতা মানিবে! আমি ব্রাহ্মর মন্দিরেই যাই, আর হিন্দুর মন্দিরেই যাই তাতে তোমার কি আসে যায়?

সুরেশ দৃপ্তস্বরে কহিল, যা নেই তা আমি মানিনে। ভগবান নেই, ঠাকুর-দেবতা মিছে কথা; কিন্তু যা আছে তাদের ত অস্বীকার করিনে। সমাজকে আমি শ্রদ্ধা করি, মানুষকে পূজা করি। আমি জানি মানুষের সেবা করাই মনুষ্যজন্মের চরম সার্থকতা। যখন হিন্দুর বংশে জন্মেচি, তখন হিন্দুসমাজ রক্ষা করাই আমার কাজ।

আমি প্রাণান্তে তোমাকে ব্রাহ্ম ঘরে বিবাহ করে ব্রাহ্মের দল-পুষ্টি করতে দেব না। কেদার মুখুয্যের মেয়েকে বিবাহ করবে বলে কি কথা দিয়েচ ?

না, কথা যাকে বলে, তা এখনও দিইনি।

দাওনি ত! বেশ! তবে চুপ ক'রে বসে থাক গে; আমি এই মাসের মধ্যেই তোমার বিবাহ দিয়ে দেব।

আমি বিবাহের জন্য পাগল হয়ে উঠেচি তোমায় কে বললে? তুমিও চুপ করে বসে থাক গে, আর কোথাও বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কেন অসম্ভব? কি করেছ? এই স্ত্রীলোকটাকে ভালবেসেচ?

আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু এই ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বল সুরেশ।

সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলতে আমি জানি, আমাকে শেখাতে হবে না। আমি সেই সম্ভ্রান্ত মহিলাটির বয়স কত জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

জানি না।

জান না? কুড়ি, পঁচিশ, ত্রিশ, চল্লিশ কিংবা আরও বেশী—কিছুই জান না?

না।

তোমার চেয়ে ছোট না বড়—তাও বোধ করি জান না?

না।

যখন তোমাকে ফাঁদে ফেলেচেন, তখন নিতান্ত কচি হবেন না—অনুমান করা বোধ করি অসঙ্গত নয়। কি বল?

না। তোমার পক্ষে কিছুই অসঙ্গত নয়; কিন্তু আমার এখন একটু কাজ আছে সুরেশ, একবার বাইরে যেতে চাই।

সুরেশ কহিল, বেশ ত মহিম, আমারও এখন কিছু কাজ নেই, চল, তোমার সঙ্গে ঘুরে আসি।

দুই বন্ধুই পথে বাহির হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চলার পর সুরেশ ধীরে ধীরে কহিল, তোমাকে আজ যে ইচ্ছে করেই ব্যথা দিলাম, এ কথা বোধ করি বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই?

মহিম কহিল, না।

সুরেশ তেমনি মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কেন দিলাম মহিম?

মহিম হাসিল। কহিল; পূর্ব্বেরটা যদি না বুঝালেও বুঝে থাকি, আশা করি, এটাও তোমাকে বুঝাতে হবে না।

তাহার একটা হাত সুরেশের হাতের মধ্যে ধরা ছিল। সুরেশ আর্দ্রচিত্তে তাহাতে ঈষৎ একটু চাপ দিয়া বলিল, না মহিম, তোমাকে বুঝাতে চাই না। সংসারে সবাই ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। তবুও আজ আমি তোমার

মুখের ওপরেই বলচি, তোমাকে আমি যত ভালবেসেচি, তুমি তার অর্দ্ধেকও পারনি। তুমি গ্রাহ্য কর না বটে, কিন্তু তোমার এতটুকু ক্লেশও আমি কোনদিন সইতে পারি না। ছেলেবেলায় এই নিয়ে কত ঝগড়া হয়ে গেছে, একবার মনে ক'রে দেখ। এখন এতকাল পরে যাঁর জন্য আমাকেও পরিত্যাগ করচ মহিম, তাঁকে নিয়েই জীবনে সুখী হবে যদি নিশ্চয়ই জানতাম, আমার সমস্ত দুঃখ আমি হাসিমুখে সহ্য করতে পারতাম, কখনও একটা কথা কইতাম না।

মহিম কহিল, তাঁকে নিয়ে সুখী হতে পারি, কিন্তু তোমাকে ত্যাগ করব কেমন করে জানলে?

তুমি কর বা না কর, আমি তোমাকে ত্যাগ করব।

কেন? আমি ত তোমার ব্রাহ্ম-বন্ধু হতেও পারতাম!

না, কোনমতেই না। ব্রাহ্মদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না—আমার ব্রাহ্ম-বন্ধু একটিও নেই।

তাদের দেখতে পার না কেন?

অনেক কারণ আছে। একটা এই যে, যারা আমাদের সমাজকে মন্দ ব'লে ফেলে গেছে, তাদের ভাল ব'লে আমি কোনমতেই কাছে টানতে পারি না। তুমি ত জান, আমাদের সমাজের প্রতি আমার কত মমতা। সে সমাজকে যারা দেশের কাছে, বিদেশের কাছে, সকলের কাছে হেয় বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের ভাল তাদের থাক, আমার তারা শত্রু।

মহিম মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল; কহিল, এখন কি করতে বল তুমি?

সুরেশ কহিল, তাই ত এতক্ষণ ধরে ক্রমাগত বলচি।

আচ্ছা আরও একবার বল।

এই যুবতীটির মোহ তোমাকে যেমন করে হোক কাটাতে হবে। অন্ততঃ একটা মাস দেখা করতে পারবে না।

কিন্তু তাতেও যদি না কাটে। যদি মোহের বড় আরও কিছু থাকে?

সুরেশ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, ও-সব আমি বুঝি না, মহিম। আমি বুঝি, তোমাকে ভালবাসি; এবং আরও কত বেশি ভালবাসি আমার আপনার সমাজকে। তবে একটিবার ভেবে দেখ, তোমার ছেলেবেলার সেই বসন্তের কথাটা, আর মুঙ্গেরের গঙ্গায় নৌকা ডুবে যখন দুজনেই মরতে বসেছিলেম। বিস্মৃত কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিলাম ব'লে আমাকে মাপ ক'রো মহিম। আমার আর কিছু বলবার নেই, আমি চললাম। বলিয়া সুরেশ অকস্মাৎ দ্রুতবেগে পিছন ফিরিয়া চলিয়া গেল।

৩

সুরেশের একদিকে গায়ে জোর ছিল যেমন অসাধারণ, অন্যদিকে অন্তরটা ছিল তেমনি কোমল, তেমনি স্নেহশীল। পরিচিত-অপরিচিত কাহারও কোন দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিলে তাহার কান্না আসিত। সে ছেলেবেলায় কখনো একটা মশামাছি পর্য্যন্ত মারিতে পারিত না। জৈন মাড়ওয়ারীদের দেখাদেখি কতদিন সে পকেট-ভরিয়া সুজি এবং চিনি লইয়া, স্কুল কামাই করিয়া, গাছতলায় গাছতলায় ঘুরিয়া পিপীলিকা ভোজন করাইয়াছে। জীবনে কতবার যে মাছ-মাংস ছাড়িয়াছে এবং ধরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। যাহাকে ভালবাসিত, তাহার জন্য কি করিয়া যে কি করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইত না। স্কুলে মহিম ছিল ক্লাসের মধ্যে সকলের চেয়ে ভাল ছেলে, অথচ তাহার গায়ের জামাকাপড় ছেঁড়া-খোঁড়া, পায়ের জুতা জীর্ণ পুরাতন, দেহটি শীর্ণ, মুখখানি ম্লান—এই সব দেখিয়াই সে তাহার প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই উভয়ের এই আকর্ষণ বন্যার জলের মত এমনি বাড়িয়া ওঠে যে, সমস্ত বিদ্যালয়ের ছেলেদের তাহা একটা আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। মহিম ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া এই চারিটি টাকা মাত্র সম্বল করিয়া কলিকাতায় আসে এবং স্বগ্রামস্থ একজন মুদীর দোকানে থাকিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হয়। এই সময় হইতেই সুরেশ অনেকপ্রকারে বন্ধুকে নিজের বাটীতে আনিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, কিছুতেই তাহাকে রাজি করাইতে পারে নাই; এইখানে থাকিয়াই মহিম কোনদিন আধপেটা খাইয়া, কোনদিন উপবাস করিয়া এণ্ট্রান্স পাস করে। ইহার পরের ঘটনা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

সেই দিন হইতে সপ্তাহমধ্যে সুরেশ মহিমের দেখা না পাইয়া তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ কি একটা পর্ব্ব-উপলক্ষে স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল। বাসায় আসিয়া শুনিল, মহিম সেই যে সকালে বাহির হইয়াছে, এখনো ফিরে নাই। সে যে পটলডাঙ্গার কেদার মুখুয্যের বাটীতেই ছুটির দিনটা কাটাইতে গিয়াছে, সুরেশের তাহাতে সংশয়মাত্র রহিল না।

যে নির্লজ্জ বন্ধু তাহার আশৈশব সখ্যের সমস্ত মর্য্যাদা সামান্য একটা স্ত্রীলোকের মোহে বিসর্জ্জন দিয়া সাতটা দিনও ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না—ছুটিয়া গেল, মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহার বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষের বহ্নি সুরেশের বুকের মধ্যে আকস্মিক অগ্নুৎপাতের মত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল বিচার না করিয়াই, গাড়িতে উঠিয়া সোজা পটলডাঙ্গার দিকে হাঁকাইতে কোচমানকে হুকুম করিয়া দিল এবং মনে মনে কহিতে লাগিল, ওরে বেহায়া! ওরে অকৃতজ্ঞ! তোর যে প্রাণটা আজ এই

স্ত্রীলোকটাকে দিয়ে ধন্য হয়েচিস ; সে প্রাণটা তোর থাকত কোথায় ? নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে দু'দুবার কে তোকে তা ফিরিয়ে দিয়েচে ? তার কি এতটুকু সম্মানও রাখতে নাই রে !

কেদার মুখুয্যের বাড়ির গলিটা সুরেশের জানা ছিল, সামান্য দু-একটা জিজ্ঞাসা-বাদের দ্বারা গাড়ি ঠিক জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অবতরণ করিয়া সুরেশ বেয়ারাকে প্রশ্ন করিয়া সোজা উপরে বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। নীচে ঢালা বিছানার উপর একজন বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন ; তিনি চাহিয়া দেখিলেন। সুরেশ নমস্কার করিয়া নিজের পরিচয় দিল—আমার নাম শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—আমি মহিমের বাল্যবন্ধু।

বৃদ্ধ প্রতি-নমস্কার করিয়া চশমাটি মুড়িয়া বলিলেন, বসুন।

সুরেশ আসন গ্রহণ করিয়া কহিল, মহিমের বাসায় এসে শুনলাম, সে এখানেই আছে ; তাই মনে করলাম, এই সুযোগে মহাশয়ের সঙ্গেও একবার পরিচিত হয়ে যাই।

বৃদ্ধ বলিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য—আপনি এসেচেন। কিন্তু মহিমও এদিকে দশ-বারদিন আসেননি। আমরা আজ সকালে ভাবছিলুম, কি জানি, তিনি কেমন আছেন ?

সুরেশ মনে মনে একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কিন্তু তার বাসার লোক যে বললে—

বৃদ্ধ কহিলেন, আর কোথাও গেছেন বোধ হয়। যা হোক, ভাল আছেন শুনে নিশ্চিন্ত হলেম।

পথে আসিতে আসিতে সুরেশ যে সকল উদ্ধত সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বৃদ্ধের সম্মুখে তাহাদের ঠিক রাখিতে পারিল না। তাঁহার শান্তমুখে ধীর-মৃদু কথাগুলি তাহার ভিতরের উত্তাপ অনেক পরিমাণে শীতল করিয়া দিল। তথাপি সে নিজের কর্ত্তব্যও বিস্মৃত হইল না। সে মনে মনে এই বলিয়া নিজেকে উত্তেজিত করিতে লাগিল যে, ইনি যত ভালই হোন, ব্রাহ্ম ত বটে ! সুতরাং ইহার সমস্ত শিষ্টাচারই কৃত্রিম। ইহারা এমনি করিয়াই নির্ব্বোধ ভুলাইয়া নিজেদের কাজ আদায় করিয়া ল'ন। অতএব এই সমস্ত শিকারী প্রাণীদের সম্মুখে কোনমতেই আত্মবিস্মৃত হইয়া কাজ ভুলিলে চলিবে না—যেমন করিয়াই হোক, ইহাদের গ্রাস হইতে বন্ধুকে মুক্ত করিতে হইবে। সে কাজের কথা পাড়িল, কহিল, মহিম আমার ছেলেবেলার বন্ধু। এমন বন্ধু আমার আর নেই। যদি অনুমতি করেন, তাঁর সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে দু-একটা কথার আলোচনা করি।

বৃদ্ধ একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। আপনার নাম আমি তাঁর মুখে শুনেছি।

সুরেশ কহিল, মহিমের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে?

বৃদ্ধ কহিলেন; হাঁ, সে একরকম স্থির বৈ কি।

সুরেশ কহিল, কিন্তু মহিম ত আপনাদের ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত নয়। তবুও বিবাহ দেবেন?

বৃদ্ধ চুপ করিয়া রহিলেন।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা সে কথা এখন থাক; কিন্তু তার কিরূপ সঙ্গতি, স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করবার যোগ্যতা আছে কি না, পাড়াগাঁয়ে বিরুদ্ধ হিন্দু-সমাজের মধ্যে ভাঙা মেটে-বাড়ির মধ্যে আপনার কন্যা বাস করতে পারবেন কিনা, না পারলে তখন মহিম কি উপায় করবে, এই সকল চিন্তা ক'রে দেখেছেন কি?

বৃদ্ধ কেদার মুখুয্যে একবার সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, কই, এ-সকল ব্যাপার ত আমি শুনিনি। মহিম কোনোদিন ত এসব কথা বলেননি?

সুরেশ কহিল, কিন্তু আমি এ সকল চিন্তা ক'রে দেখেচি, মহিমকে বলেচি এবং আজ এই সকল অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার জন্যেই আপনার নিকট উপস্থিত হয়েচি। আপনার কন্যার বিষয় আপনি চিন্তা করবেন; কিন্তু আমার পরম বন্ধু যে এই দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অসহ্য ভারে চিরদিন জীবন্মৃত হয়ে থাকবেন, সে ত আমি কোনমতেই ঘটতে দিতে পারিনে।

কেদারবাবু পাংশুমুখে কহিলেন, আপনি বলেন কি সুরেশবাবু?

বাবা!—একটি সতেরো-আঠারো বৎসরের মেয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া পিতার কাছে একজন অপরিচিত যুবককে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থামিয়া গেল।

কে; অচলা? এস মা ব'স। লজ্জা কি মা; ইনি আমাদের মহিমের পরম বন্ধু।

মেয়েটি একটুখানি অগ্রসর হইয়া হাত তুলিয়া সুরেশকে নমস্কার করিল। সুরেশ দেখিল, মেয়েটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে পাতলা গঠন। কপোল, চিবুক, ললাট—সমস্ত মুখের ডৌলটিই সুশ্রী এবং সুকুমার। চোখ দুটির দৃষ্টিতে একটি স্থির-বুদ্ধির আভা। নমস্কার করিয়া সে অদূরে উপবেশন করিল। সুরেশ তাহার মুখের পানে চাহিয়া চক্ষের পলকে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার পিতা বলিয়া উঠিলেন, মহিমের ব্যাপারটা শুনেচ মা? আমরা ভেবে মরছিলাম, সে আসে না কেন? ঐ শোন। ইনি পরম বন্ধু ব'লেই ত কষ্ট ক'রে জানাতে এসেছিলেন, নইলে কি হ'ত বল ত? কে জানত, সে এমন বিশ্বাসঘাতক, এমন মিথ্যাবাদী। তার পাড়াগাঁয়ে শুধু একটা মেটে ভাঙা-বাড়ি। তোমাকে খাওয়াবে কি—তার নিজেরই মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান নেই। উঃ—কি ভয়ানক! এমন লোকের মনের মধ্যেও এত বিষ ছিল, অ্যাঁ!

কথা শুনিয়া অচলার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, কিন্তু সুরেশের মুখের উপরেও কে যেন কালি লেপিয়া দিল। সে নির্ব্বাক্ কাঠের পুতুলের মত মেয়েটির পানে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

৪

সুরেশের একবার মনে হইল, তাহার নিষ্ঠুর সত্য অচলার বুকের ভিতর গিয়া যেন গভীর হইয়া বিঁধিল, কিন্তু পিতা সেদিকে দৃক্‌পাতও করিলেন না। বরঞ্চ কন্যাকেই ইঙ্গিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, সুরেশবাবু, আপনি যে প্রকৃত বন্ধুর কর্ত্তব্য করতে এসেচেন, একথা আমরা কেউ যেন ভ্রমেও না অবিশ্বাস করি। হোক না অপ্রিয়, হোক না কঠোর, তবুও এই যথার্থ ভালবাসা। মা যখন তাঁর পীড়িত শিশুকে অন্ন থেকে বঞ্চিত করেন, সে কি তাঁর কঠোর ঠেকে না? কিন্তু তবুও ত সে কাজ তাঁকে করতে হয়। সত্য বলচি সুরেশবাবু, মহিম যে আমাদের প্রতি এত বড় অন্যায় করতে পারেন, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, বছর-দুই পূর্ব্বে সমাজে যখন তাঁর কথায় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে আমি নিজেই তাকে সসম্মানে বাড়িতে ডেকে এনে অচলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, সে কি এমনি করেই তার প্রতিফল দিলে! উঃ—এত বড় প্রবঞ্চনা আমার জীবনে দেখিনি। বলিয়া কেদারবাবু ভিতরের আবেগে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন।

সুরেশ এবং অচলা উভয়েই নীরবে এবং অধোমুখে বসিয়া রহিল। কেদারবাবু হঠাৎ একসময়ে দাঁড়াইয়া পড়িয়া, মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না মা অচলা, এ চলবে না। কোনমতেই না। সুরেশবাবু, আপনি যেমন কর্ত্তব্য সকলের উপরে রেখে বন্ধুর কাজ করতে এসেচেন, আমিও সেই কর্ত্তব্যকেই সুমুখে রেখে পিতার কাজ করব। অচলার সঙ্গে মহিমের সম্বন্ধটা যতদূর অগ্রসর হয়েচে, তাতে যদি বিনা প্রমাণে আমার বাড়ির দরজা তার মুখের উপর বন্ধ ক'রে দিই, ঠিক হবে না। সেইজন্য একটা প্রমাণ চাই। আপনি মনে করবেন না সুরেশবাবু, আপনার কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি, কিন্তু এটাও আমার কর্ত্তব্য। কি, মা অচলা! একটা প্রমাণ নেওয়া আমাদের উচিত কি না?

উভয়েই তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল, উচিত অনুচিত কোন মন্তব্যই কেহ প্রকাশ করিল না।

কেদারবাবু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়াই বলিলেন, কিন্তু এ প্রমাণের ভার আপনারই উপর, সুরেশবাবু। মহিমের সাংসারিক অবস্থা জানা ত দূরের কথা; কোন গ্রামে যে তার বাড়ি তাই আমরা জানিনে।

বেয়ারা আসিয়া জানাইল; নীচে বিকাশবাবু অপেক্ষা করিতেছেন।

সংবাদ শুনিয়া কেদারবাবু শুষ্ক হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আজ ত তাঁর আসবার কথা ছিল না। আচ্ছা, বলগে আমি যাচ্চি। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সুরেশবাবু, আমাকে মিনিট-পাঁচেক মাপ করতে হবে—লোকটাকে বিদায় ক'রে আসি। যখন এসেচে, তখন দেখা না ক'রে ত নড়বে না। মা অচলা; সুরেশবাবুকে আমাদের পরম বন্ধু ব'লে মনে করবে। যা তোমার জানবার প্রয়োজন এঁর কাছে জেনে নাও—আমি এলাম বলে। বলিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন।

তখন মুহূর্ত্তকালের জন্য চোখাচোখি করিয়া উভয়েই মাথা হেঁট করিল। সুরেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল; আমরা উভয়ে আশৈশব বন্ধু। কিন্তু তার ব্যবহারে আপনাদের কাছে আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

অচলা মৃদুকণ্ঠে কহিল, তার জন্যে আপনার কোন লজ্জার কারণ নেই।

সুরেশ কহিল, আপনি বলেন কি! তার এই কপট আচরণে, এই পাষণ্ডের মত ব্যবহারে আমি বন্ধু হয়ে যদি লজ্জা না পাই ত আর কে পাবে বলুন দেখি। কিন্তু তখনই ত আমার বোঝা উচিত ছিল যে, সে যখন আমাকেই আগাগোড়া গোপন করে গেছে, তখন ভিতরে কোথাও একটা বড় রকমের গলদ আছেই।

অচলা কহিল, আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের। কিন্তু আপনি এ-সমাজের কোন লোকের কোন সংস্রবে থাকতে চান না বলেই বোধ করি তিনি আমাদের উল্লেখ আপনার কাছে করেননি।

কথাটা সুরেশের ভাল লাগিল না। অচলা যে তাহারই মুখের উপর মহিমের দোষক্ষালনের চেষ্টা করিবে, ইহা সে ভাবে নাই। শুষ্ক-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, এ খবর আপনি মহিমের কাছে শুনেচেন আশা করি।

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, তিনিই একদিন বলেছিলেন।

সুরেশ বলিল, আমার দোষের কথা সে বলতে ভোলেনি দেখচি।

অচলা ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, এ আর দোষের কথা কি? সকল মানুষের প্রবৃত্তি এক রকমের নয়। যারা আপনাদের সংস্রব ছেড়ে চলে গেছে, তাদের যদি আপনাদের ভাল না লাগে ত আমি দোষের মনে করতে পারিনে।

এই উত্তরটা যদিচ সুরেশের মনের মত এবং আর কোথাও শুনিলে হয়ত সে লাফাইয়া উঠিত, কিন্তু এই সংযতবাদিনী, তরুণী ব্রাহ্ম মহিলার মুখ হইতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাহার একান্ত বিতৃষ্ণার কথা শুনিয়া আজ তাহার কিছুমাত্র আনন্দোদয় হইল না। বস্তুতঃ, এই সব দলাদলির মীমাংসা শুনিতে সে কথাটা বলেও নাই। বরঞ্চ প্রত্যুত্তরে নিজের সম্বন্ধে ইহাও জানিতে চাহিয়াছিল, মহিমের মুখ হইতে তাহার আর কোন সদ্গুণের বিবরণ তাঁহার কানে গিয়াছে কি-না, অচলা বোধ করি

এই প্রচ্ছন্ন অভিলাষ অনুমান করিতে পারিল না। তাই প্রশ্নটার সোজা জবাব দিয়াই চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, আপনাদের প্রতি আমার সামাজিক বিদ্বেষ আছে কিনা, সে আলোচনা মহিম করুক ; কিন্তু তার ওপর আমার যে লেশমাত্র বিদ্বেষ নেই, এ-কথাটা আপনি আমার মুখ থেকেও অবিশ্বাস করবেন না। তবুও হয়ত আমি তার সাংসারিক প্রসঙ্গ এখানে তুলতে আসতাম না—যদি না সে আমার কাছে সেদিন সত্য কথাটা অস্বীকার করত।

অচলা সুরেশের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া অবিচলিত-স্বরে কহিল, কিন্তু তিনি ত কখনই মিথ্যা বলেন না।

এই বার সুরেশ বাস্তবিক বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মেয়েমানুষের মুখ দিয়া যে এমন শান্ত অথচ দৃঢ় প্রতিবাদ বাহির হইতে পারে, ক্ষণকাল ইহা যেন ভাবিয়াই পাইল না। কিন্তু সে ঐ মুহূর্তকালের জন্য। জীবনে সে সংযমশিক্ষা করে নাই, তাই পরক্ষণেই আত্মবিস্মৃত হইয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, আমাকে মাপ করবেন, কিন্তু সে আমার বাল্যবন্ধু। আপনার চেয়ে তাকে আমি কম জানিনে। এখানে নিজেকে আবদ্ধ করে স্পষ্ট অস্বীকার করাটাকে আমি সত্যবাদিতা বলতে পারিনে।

অচলা তেমনি শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, তিনি ত এখানে নিজেকে আবদ্ধ করেননি।

সুরেশ কহিল, আপনার বাবা ত তাই বললেন। তা ছাড়া নিজের হীন অবস্থা আপনাদের কাছে গোপন করাটাকেও ঠিক সত্যপ্রিয়তা বলা চলে না। স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন করবার অক্ষমতা অপরের কাছে না হোক, অতঃপর আপনার কাছেও ত তার অকপটে প্রকাশ করা উচিত ছিল।

অচলা নীরব হইয়া রহিল।

সুরেশ বলিতে লাগিল, আপনি যে এত করে তার দোষ ঢাকচেন, আপনি বলুন দেখি, সমস্ত কথা পূর্ব্বাহ্নে জানতে পারলে কি তাকে এতটা প্রশ্রয় দিতে পারতেন ?

অচলা তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার কাছে কোন প্রকার জবাব না পাইয়া সুরেশ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিতে লাগিল, আমার কাছে সে নিজের মুখে স্বীকার করেচে যে, এই কলকাতা সহরে আপনাকে প্রতিপালন করবার তার সাধ্যও নেই, সঙ্কল্পও নেই। তার সেই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গ্রামে একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ হিন্দু-সমাজের মধ্যে সে যে আপনাকে একখানা অস্বচ্ছল ভাঙা মেটে-বাড়িতে টেনে নিয়ে যেতে চায়, সে কথা কি আপনাকে তার বলা কর্ত্তব্য নয়। এত দুঃখ সহ্য করতে প্রস্তুত কি-না, এও কি জিজ্ঞাসা করা সে আবশ্যক বিবেচনা করে না ? বলিয়া

উত্তরের জন্য চোখ তুলিয়া দেখিল, অচলা চিন্তিত, অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া আছে।

জবাব না পাইলেও সুরেশ বুঝিল, তাহার কথায় কাজ হইয়াছে। কহিল, দেখুন, আপনার কাছে এখন আমি সত্য কথাই বলব। আজ আমি আমার বন্ধুকে বাঁচাবার সঙ্কল্প করেই শুধু এসেছিলুম—সে বিপদে না পড়ে, এই ছিল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন দেখচি, তাকে বাঁচানোর চেয়ে আপনাকে বাঁচানো আমার ঢের বেশি কর্তব্য। কারণ, তার বিপদ ইচ্ছাকৃত, কিন্তু আপনি ঝাঁপ দিচ্ছেন অন্ধকারে। এইমাত্র আপনার বাবা যখন আমাকেই প্রমাণ করবার ভার দিলেন তখন মনে হয়েছিল, বন্ধুর বিরুদ্ধে এ ভার আমি গ্রহণ করব না; কিন্তু এখন দেখচি, এ কাজ আমাকে করতেই হবে—না করলে অন্যায় হবে।

অচলা কহিল, কিন্তু তিনি শুনলে কি দুঃখিত হবেন না?

সুরেশ কহিল, উপায় নেই। যে লোক পাষণ্ডের মত আপনাকে এত বড় প্রবঞ্চনা করেচে, বন্ধু হলেও তার সুখ-দুঃখ চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করিনে। কিন্তু বিপদ হয়েচে এই যে, আমি তাদের গ্রামের নামটাও জানিনে। কোন উপায়ে আজ যদি সেইটে মাত্র জানতে পাই, কাল সকালেই নিজে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হব এবং সমস্ত প্রমাণ টেনে এনে আপনার বাবার সম্মুখে উপস্থিত করে বন্ধুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

অচলা কহিল, আপনি কেন এত কষ্ট করবেন? বাবাকে বলুন না, তিনি তাঁর বিশ্বাসী কোন লোক দিয়ে সমস্ত সংবাদ জেনে নিন। চব্বিশ পরগণার রাজপুর গ্রাম ত বেশি দূর নয়।

সুরেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, রাজপুর! তা হলে গ্রামের নামটা যে আপনি জানেন দেখচি! আর কিছু জানেন?

অচলা সহজভাবে কহিল, আপনি যা বললেন, আমিও ঐটুকু জানি। রাজপুরের উত্তরপাড়ায় একখানি মেটে-বাড়ি আছে। গুটি-তিনেক ঘর, বাইরে চণ্ডীমণ্ডপ—তাতে গ্রামের পাঠশালা বসে।

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, মহিমের সাংসারিক অবস্থা?

অচলা কহিল, সে বিষয়েও আপনি যা বললেন তাই। সামান্য কিছু সম্পত্তি আছে, তাতে কোনমতে দুঃখ-কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন চলে মাত্র।

সুরেশ কহিল, আপনি ত তা হলে সমস্তই জানেন দেখচি।

অচলা কহিল, এইটুকু জানি, কারণ এইটুকুই তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম। আর আপনি ত জানেন, তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না।

সুরেশ সমস্ত মুখ কালিবর্ণ করিয়া কহিল, যখন সমস্তই জানেন, তখন আপনাদের

সতর্ক করতে আসাটা আমার পক্ষে নিতান্তই একটা বাহুল্য কাজ হয়েচে। দেখচি আপনাকে সে ঠকাতে চায়নি।

অচলা কহিল, আমি কিছু কিছু জানি বটে, কিন্তু আপনি ত আমাকে জানাতে আসেন নি; আপনি যাঁকে জানাতে এসেছিলেন, তিনি এখনো জানেন না। তবে যদি বলেন, আমি যতটুকু জানি, বাবাকে জানাতে পারি।

সুরেশ উদাস-কণ্ঠে কহিল, আপনার ইচ্ছে। আমাকে গিয়ে মহিমকে সমস্ত কথা জানিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে! তবে আমি স্থির হতে পারব।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, তার কি কিছু আবশ্যক আছে?

সুরেশ পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আবশ্যক নেই? না জেনে তার ওপর যে-সকল মিথ্যা দোষারোপ আজ করেচি, সে অপরাধ আমার কত বড়, আপনি কি মনে মনে তা বোঝেননি? তাকে জুয়াচোর, মিথ্যাবাদী, কিছু বলতেই বাকি রাখিনি —এ সকল কথা তার কাছে স্বীকার না করে কেমন করে আমি পরিত্রাণ পাব?

অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, বরঞ্চ আমি বলি, এ সবের কিছুই দরকার নেই সুরেশবাবু। মনে মনে ক্ষমা চাওয়ার চেয়ে প্রকাশ্যে চাওয়াই সে সকল সময়ে সবচেয়ে বড় জিনিস এ আমি স্বীকার করিনে। তিনি শুনতে পেলেই যখন ব্যথা পাবেন, তখন কাজ কি তাঁকে শুনিয়ে? আমি বাবাকেও বরঞ্চ নিষেধ করে দেব, যেন আপনার কথা তাঁকে না বলেন।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা। তার পরে অচলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমি একটা জিনিস বরাবর লক্ষ্য করেচি যে, মহিম কোনো কারণেই এতটুকু ব্যথা না পায়, এই আপনার একমাত্র চেষ্টা। বেশ তাই হোক, আমি তাকে কোন কথাই বলব না। আর তার সম্বন্ধে আমার মনে যত কথা উঠেছে, তাও বলতে চাইনে, কিন্তু আপনাকে একটা কথা না বলে কিছুতেই বিদায় হতে পারচিনে।

অচলা স্নিগ্ধ চক্ষু দুটি তুলিয়া কহিল, বেশ বলুন।

সুরেশ কহিল, তার কাছে ক্ষমা চাইতে পেলুম না, কিন্তু আপনার কাছে চাইচি, আমায় মাপ করুন। বলিয়া সে হঠাৎ দুই হাত যুক্ত করিল।

ছি ছি, ও কি করেন! বলিয়া অচলা চক্ষের নিমেষে হাত দুটি ধরিয়া ফেলিয়াই তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিয়া কহিল, এ কি বিষম অন্যায় বলুন ত! বলিতে বলিতেই তাহার সমস্ত মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

সুরেশের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই আশ্চর্য্য স্পর্শ, সলজ্জ মুখের অপরূপ রক্তিম দীপ্তি চক্ষের পলকে তাহাকে একেবারে অবশ করিয়া ফেলিল। সে অচলার অবনত মুখের পানে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কহিল, না, আমি কোনো অন্যায় করিনি। বরঞ্চ আমার সহস্র-কোটি অন্যায়ের মধ্যে

যদি কোন ঠিক কাজ হয়ে থাকে ত সে এই। আপনি ক্ষমা করলেই আমার মনের সমস্ত ক্ষোভ ধুয়ে মুছে যাবে।

অচলা কাতর হইয়া কহিল, আপনি অমন কথা কিছু বলবেন না। যাঁকে দু' দু'বার মৃত্যুর গ্রাস থেকে ফিরিয়ে এনেচেন—

তাও শুনেচেন?

শুনেচি। আপনার মত সুহৃদ্ তাঁর আর কে আছে?

না, বোধ হয় আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। আর সেই সুবাদে আমরা দু'জন—

অচলার মুখের উপর আবার একটুখানি রাঙা আভা দেখা দিল। সে কহিল, হাঁ বন্ধু। আপনি তাঁকে মরণের পথ থেকে ফিরিয়ে এনেচেন। তাই তাঁর সম্বন্ধে আপনার কোন কাজই আমি অন্যায় বলে ভাবতে পারিনে। মনের মধ্যে কোন ক্ষোভ, কোন লজ্জা আপনি রাখবেন না—ক্ষমা কথাটা উচ্চারণ করলে আপনার যদি তৃপ্তি হয়, আমি তাও বলতে রাজি ছিলুম, যদি না আমার মুখে বাধত।

আচ্ছা, কাজ নেই। বলিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনার বাবার সঙ্গে দেখা হল না, তিনি বোধ হয় ব্যস্ত আছেন। মহিমের সঙ্গে হয়ত আবার কোনদিন আসতেও পারি। নমস্কার।

অচলা একটুখানি হাসিয়া কহিল, নমস্কার; কিন্তু তাঁর সঙ্গেই যে আসতে হবে, এর ত কোন মানে নেই।

সত্যি বলচেন?

সত্যি বলচি।

আমার পরম সৌভাগ্য। বলিয়া সুরেশ আর একবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

৫

বাহিরে আসিয়া যেন নেশার মত তাহার সমস্ত দেহ-মন টলিতে লাগিল। আকাশের খর রৌদ্র তখন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল। সে গাড়ি ফিরাইয়া দিয়া একাকী পদব্রজে বাহির হইয়া পড়িল। ইচ্ছা কলিকাতার জনাকীর্ণ কোলাহলময় রাজপথের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ মগ্ন করিয়া দিয়া অবস্থাটা একবার ভাবিয়া লয়।

অচলার মুখ, অবয়ব, ভাষা, ব্যবহার—সমস্তই তাহার শুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ মনে পড়িয়া নিজেকে যেন ছোট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সে-মুখে সৌন্দর্য্যের অলৌকিকত্ব ছিল না, কথায়, ব্যবহারে, জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধির অপরূপত্ব কোথাও এতটুকু প্রকাশ পায় নাই; তথাপি কেমন করিয়া যেন কেবলই

মনে হইতে লাগিল, এমন একটা বিস্ময়কর বস্তু এইমাত্র সে দেখিয়া আসিয়াছে যাহা এতদিন কোথাও তাহার চোখে পড়ে নাই। পথে চলিতে চলিতে আপনাকে আপনি অনুক্ষণ এই প্রশ্নই করিতে লাগিল—এ বিস্ময় কিসের জন্য? কিসে তাহাকে আজ এতখানি অভিভূত করিয়া দিয়াছে?

এই তরুণীর মধ্যে এমন কোন্ জিনিস আজ সে দেখিতে পাইয়াছে, যাহাতে আপনাকে আপনি লীন মনে করিয়াও তাহার সমস্ত অন্তরটা কি এক অপরিজ্ঞাত সার্থকতায় ভরিয়া গিয়াছে! ঐ মেয়েটির সত্যকার কোন পরিচয়ই এখনো তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই বটে, কিন্তু সে যে বড়, অনেক বড়, তাহাকে লাভ করা যে-কোন পুরুষের পক্ষেই যে দুর্ভাগ্য নয়, এ সংশয় একটিবারও তাহার মনে উদয় হয় না কেন? ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ এক সময়ে তাহার চিন্তার ধারা ঠিক জায়গাটিতে আঘাত করিয়া বসিল। তাহার মনে হইল, এই যে মেয়েটি শিক্ষায়, জ্ঞানে, বয়সে, হয়ত সকল বিষয়েই তাহার অপেক্ষা ছোট হইয়াও এই দণ্ড কয়েকের আলাপেই তাহাকে এমন করিয়া পরাজিত করিয়া ফেলিল, সে শুধু তাহার অসাধারণ সংযমের বলে। তাই সে এত শান্ত হইয়াও দৃঢ়, এত জানিয়াও এমন নির্বাক। মহিমের সম্বন্ধে সে নিজে যখন প্রগল্‌ভের মত অবিশ্রাম বকিয়া গিয়াছে, তখন এই মেয়েটি অধোমুখে শুনিয়াছে, সহিয়াছে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও চঞ্চল হইয়া তর্ক করিয়া, কলহ করিয়া, আপনাকে লঘু করে নাই। সর্বক্ষণেই আপনাকে দমন করিয়াছে, গোপন করিয়াছে, অথচ কিছুই তাহার অবিদিত ছিল না। মহিমকে সে যে কতখানি ভালবাসে তাহা জানিতে দিল না সত্য, কিন্তু তাহার অবিচলিত শ্রদ্ধা যে কিছুতেই তিলার্দ্ধ ক্ষুণ্ণ হয় নাই, সে-কথা কতই না সহজে সংক্ষেপে জানাইয়া দিল।

এ বিদ্যা যে মহিমের কাছেই শেখা এবং ভাল করিয়াই শেখা, এ-কথা সে বহুবার আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল; এবং তাহার নিজের মধ্যে শিশুকাল হইতেই সংযম জিনিসটার একান্ত অভাব ছিল বলিয়া, ইহারই এতখানি প্রাচুর্য্য আর একজনের মধ্যে দেখিতে পাইয়া তাহার শিক্ষিত ভদ্র অন্তঃকরণ আপনা-আপনিই এই গৌরবময়ীর পদতলে মাথা নত করিয়া ধন্য বোধ করিল।

অনেক রাস্তা-গলি ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া, সুরেশ সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিল। বসিবার ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, মহিম চোখের উপর হাত চাপা দিয়া একটা কোচের উপর পড়িয়া আছে, উঠিয়া বসিয়া কহিল, এস সুরেশ।

এই যে! বলিয়া সুরেশ ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া একটা চৌকি টানিয়া বসিল।

মহিম কালে-ভদ্রে আসে। সুতরাং সে আসিলেই সুরেশের অভ্যর্থনা কিঞ্চিৎ উগ্র

হইয়া উঠিত। আজ কিন্তু তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথাই বাহির হইল না। মহিম মনে মনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, বাসায় ফিরে এসে শুনি, তুমি গিয়েছিলে। তাই মনে করলুম—

দয়া করে একবার দেখা দিয়ে আসি। না হে! কতদিন পরে এলে মনে করতে পার?

মহিম হাসিয়া কহিল, পারি। কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি যে। বলিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, গ্যাসের আলোকে সুরেশের মুখের চেহারা অত্যন্ত ম্লান এবং কঠিন দেখাইতেছে। তাহাকে প্রসন্ন করিবার অভিলাষে স্নিগ্ধস্বরে পুনরায় কহিল, তোমার রাগ হতে পারে, এ আমি হাজারবার স্বীকার করি সুরেশ। কিন্তু বাস্তবিক সময় পাইনে। আজকাল পড়াশুনার চাপও একটু আছে, তা ছাড়া সকালে-বিকালে গোটা-দুই টিউসনি—

আবার টিউসনি নেওয়া হয়েচে?

মহিম তাহার ঠিক জবাবটা এড়াইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে খুঁজেছিলে, বিশেষ কিছু দরকার ছিল কি?

সুরেশ কহিল, হুঁ। তুমি আজ না এলে আমাকে আবার সকালে যেতে হত।

মহিম কারণ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া রহিল।

সুরেশ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে তাহার পায়ের জুতা-জোড়ার পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি এর মধ্যে বোধ করি কেদারবাবুর বাড়িতে আর যাওনি।

মহিম কহিল, না।

কেন যাওনি, আমার জন্যে ত? আচ্ছা, তোমার সেই প্রতিশ্রুতি থেকে তোমাকে আমি মুক্তি দিলুম। তোমার ইচ্ছামত সেখানে যেতে পার।

মহিম হাসিল; যাব না, এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলেম বলে ত আমার মনে হয় না!

সুরেশ বলিল, না হয় ভালই, তবুও আমার তরফ থেকে যদি কোন বাধা থাকে ত সে আমি তুলে নিলুম।

এটা অনুগ্রহ না নিগ্রহ, সুরেশ?

তোমার কি মনে হয় মহিম?

চিরকাল যা মনে হয়, তাই।

সুরেশ কহিল, তার মানে আমার খামখেয়াল! এই না? তা বেশ, তোমার যা ইচ্ছে মনে করতে পার, আমার আপত্তি নেই। শুধু যে বাধাটা আমি দিয়েছিলুম, সেইটেই আজ সরিয়ে দিলুম।

কিন্তু তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

খেয়ালের কি কারণ থাকে যে তুমি জিজ্ঞাসা করলেই আমাকে বলতে হবে!

মহিম ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, কিন্তু সুরেশ, তোমার খেয়ালের বশেই যে সমস্ত সংসারে বাধা পড়বে, আর উঠে যাবে, এ হলে হয়ত ভালই হয়; কিন্তু বাস্তব ব্যাপারে তা হয় না। তোমার যেখানে বাধা নেই আমার সেখানে বাধা থাকতে পারে।

তার মানে?

তার মানে, তুমি সেদিন ব্রাহ্ম-মহিলাদের সম্বন্ধে যত কথা বলেছিলে, আমি তা ভেবে দেখেচি। ভাল কথা, সেদিন বলেছিলে, এক মাসের মধ্যে আমার জন্য পাত্রী স্থির করে দেবে, তার কি হল?

সুরেশ মুখ তুলিয়া দেখিল, মহিম গাম্ভীর্য্যের আড়ালে তীব্র পরিহাস করিতেছে। সেও গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, আমি ত ভেবে দেখলুম মহিম, ঘটকালি করা আমার ব্যবসা নয়। তার পরে হাসিয়া কহিল, কিন্তু তামাসা থাক। এতদিন আমার মান রেখেচ বলে তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ, কিন্তু আজ যখন আমার হুকুম পেলে, তখন কাল সকালেই একবার সেখানে যাচ্ছ ত?

না, কাল সকালে আমি বাড়ি যাচ্ছি।

কখন্ ফিরবে?

দশ-পনেরো দিনও হতে পারে, আবার মাস-খানেক দেরি হতেও পারে।

মাস-খানেক! না মহিম, সে হবে না। বলিয়া অকস্মাৎ সুরেশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া মহিমের ডানহাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, আর আমার অপরাধ বাড়িয়ো না মহিম, কাল সকালেই একবার যাও। তিনি হয়ত তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন। বলিতেই তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

মহিমের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। সুরেশের আকস্মিক আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর, এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বিশেষ করিয়া ব্রাহ্ম-মহিলা সম্বন্ধে এই সসম্ভ্রম উল্লেখে সে যেন বিহ্বল হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বন্ধুর মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে আমার পথ চেয়ে বসে আছে সুরেশ! কেদারবাবুর মেয়ে?

সুরেশ সহসা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, থাকতেও ত পারেন?

মহিম আবার কিছুক্ষণ সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে যে ইতিমধ্যে ব্রাহ্ম-বাড়িতে গিয়া অনাহূত পরিচয় করিয়াও আসিতে পারে, এ সম্ভাবনা তাহার কোনমতেই মনে উদয় হইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, না সুরেশ, আমি হার মানচি—তোমার আজকের মেজাজ বাস্তবিক আমার বুদ্ধির অগম্য। ব্রাহ্মমেয়ে পথ চেয়ে বসে আছে, এ-কথা তোমার মুখ থেকে বোঝা আমার দ্বারা অসম্ভব।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা, সে-কথা একদিন বুঝিয়ে দেব। তুমি বল, কাল সকালেই একবার দেখা দেবে?

না, কাল অসম্ভব। আমাকে কাল সকালের গাড়িতেই যেতে হবে।

মিনিট-কয়েকের জন্যও কি দেখা দিতে পার না?

না, তাও পারিনে। কিন্তু তোমার কি হয়েছে বল দেখি?

সে কথা আর একদিন বলব—আজ নয়। আচ্ছা, আমি নিজে গিয়ে তোমার কথা বলে আসতে পারি কি?

মহিম অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, পার, কিন্তু তার ত কিছু দরকার নেই।

সুরেশ কহিল, না থাক্ দরকার—দরকারই সব নয়। আমার পরিচয় দিলে তাঁরা চিনতে পারবেন?

একজন নিশ্চয় পারবেন।

সুরেশ বলিল, তা হলেই যথেষ্ট। তোমার বন্ধু বলে চিনবেন ত?

মহিম বলিল, হাঁ।

সুরেশ এইবার একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আর চিনবেন—তোমার একজন ঘোরতর ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী হিন্দু বন্ধু বলে? না?

মহিম বলিল, কিন্তু সেই ত তোমার প্রধান গর্ব্ব সুরেশ!

সুরেশ বলিল, তা বটে। বলিয়া কিছুক্ষণ মাটির দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ আমার বড় ঘুম পাচ্ছে মহিম, আমি শুতে চললুম। বলিয়া অন্যমনস্কের মত ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

৬

সুরেশ মনে মনে অসংশয়ে অনুভব করিতেছিল যে, কথাটা মহিম যেমন করিয়াই উড়াইয়া দিক, সে তাহারই একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই এতদিন অচলার সহিত দেখা করিতে পারে নাই। সে যত ভালই বাসুক, এখন পর্য্যন্ত সে একটা ব্রাহ্ম-মেয়ের কাছে তাহার শৈশবের বন্ধুকে খাটো করিতে পারে না, এমন কথা কাল শুনিলেও সুরেশের বুকখানা গর্ব্বে দশ হাত ফুলিয়া উঠিত। আজ কিন্তু তাহার নির্জ্জন শয্যায় এ চিন্তা তাহাকে লেশমাত্র আনন্দ দিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, একদিন-না-একদিন হাসি-গল্পে উপহাসে-পরিহাসে বিচিত্র হইয়া সমস্ত অচলার কানে উঠিবে। সেদিন সুখের ক্রোড়ে বসিয়া সে তাহার স্বামীর এই অপদার্থ বন্ধুটার নিষ্ফল ঈর্ষার কোন তাৎপর্য্যই খুঁজিয়া পাইবে না, অথচ হাসির ছলেও সে স্বল্পভাষিণী কোনদিন কোন প্রশ্নই তাহাকে করিবে না। হয়ত বা,

শুধু মনে মনে একটুখানি হাসিয়া বলিবে, এই লোকটা বন্ধুত্বের অতি-অভিমানে কত পণ্ডশ্রমই না করিয়াছে! ব্যর্থ আক্রোশে কত অন্তর্দাহেই না জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে।

রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইল না। যতবার ঘুম ভাঙ্গিল, ততবারই এই সকল তিক্ত চিন্তা তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিয়া গেল—পরের জন্য এমন উৎকট মাথাব্যথার রোগ কবে সারিবে সুরেশ?

সকালবেলা উঠিয়া সে দিনের কাজে মন দিতে পারিল না এবং বেলা বাড়িতে-না-বাড়িতেই গাড়ি করিয়া কেদারবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেয়ারা জানাইল, বাবু আলিপুর আদালতে বাহির হইয়া গিয়াছেন—ফিরতে তিন-চার ঘণ্টা দেরি হইতেও পারে।

সুরেশ ফিরিতে উদ্যত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দুজনেই বেরিয়ে গেছেন?

প্রশ্নটা বেয়ারা বুঝিতে পারিল না। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে ত আমি জানিনে বাবু।

সুরেশ মুস্কিলে পড়িল। গৃহস্বামীর অবর্ত্তমানে তাহার যুবতী কন্যার সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন করা বাহ্ম-পরিবারের মধ্যে শিষ্টতা-বিরুদ্ধ কি না, তাহা স্থির করিতে পারিল না, অথচ এই কন্যাটিকেই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। চিন্তা করিয়া কহিল, তোমার বাবুর ফিরতে এত দেরি নাও হতে পারে ত? আমি এক-আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করেই দেখি।

বেয়ারা সুরেশকে বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইয়া কহিল, দিদিঠাকরুণ বাড়ি আছেন, তাঁকে খবর দেব কি? বলিয়া উত্তরের জন্য চাহিয়া রহিল। অচলা এই ভদ্রলোকটির সুমুখে যে বাহির হ'ন তাহা সে কালই দেখিয়াছিল।

সুরেশ অন্তরের আগ্রহাতিশয্য প্রাণপণে নিবারণ করিয়া নিস্পৃহভাবে কহিল, তাঁকে আবার খবর দেবে? আচ্ছা দাও, ততক্ষণ না হয় তাঁর সঙ্গে দুটো কথা কই।

বেয়ারা চলিয়া গেল এবং অনতিকাল পরেই অচলা পার্শ্বের দরজার পর্দা সরাইয়া প্রবেশ করিল।

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মহিম যে বাড়ি চলে গেল। এত করে বললুম আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে—কিন্তু কোনমতে কথা শুনলে না, এমন একটা—

অচলার মুখ মুহূর্ত্তের জন্য সাদা হইয়া গেল। কিন্তু নমস্কার করিয়া একটা চৌকিতে উপবেশন করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, যাওয়া বোধকরি খুব বেশি দরকার, বাড়িতে কারও অসুখ-বিসুখ করেনি ত?

নমস্কার করিতে দেখিয়া সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া প্রতি-নমস্কার করিল; এবং নিজের অনাবশ্যক উত্তেজনার সঙ্গে অচলার শান্ত ধীর কথাগুলি ওজন করিয়া শতগুণ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া বলিল, দরকার যাই হোক—সে এমন কি ভয়ানক হতে পারে যে, অন্ততঃ দুমিনিটের জন্য এসেও একবার আপনাকে সে বলে যেতে পারে না? আর যখন কবে ফিরবে তার কোন ঠিকানা নেই, আপনিই বলুন, বাড়িতেই বা তার আছে কে—যার অসুখের জন্যে তাকে এভাবে যেতে হয়? আমি ত মরে গেলেও এমন করে চলে যেতে পারতুম না।

অচলার মুখের উপর দিয়া একটা সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসি খেলিয়া গেল। কহিল, আপনার এখনও কেউ হয়নি বলেই এ-কথা বললেন; কিন্তু হলে ঠিক ওঁর মতই অবহেলা করে চলে যেতেন—এ আমি নিশ্চয় বলচি।

সুরেশ তাহার বসিবার চৌকির হাতলের উপর সজোরে একটা চপেটাঘাত করিয়া কহিল, কখ্খনো না। আমাকে আপনি চেনেন না, তাই একথা বলতে পারলেন, কিন্তু চিনলে, পারতেন না।

অচলা কহিল, বেশ ত, এখন থেকে ত চিন্তে পারব; আর কেউ হলে জানতেও পারব। কি বলেন?

সুরেশ কহিল, নিশ্চয়। একশবার। তা ছাড়া মহিমের মত আমি বন্ধুর কাছে কোনকথা গোপন করে রাখতেও পারিনে, রাখা ভালও মনে করিনে; বলিয়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি বলচেন, হলে জানতে পারবেন, কিন্তু আমি বলচি যে, আপনাকে না জানিয়ে, আপনার মত না নিয়ে এ-সব কখনো হবেই না, কারণ আপনাকে মহিমের সঙ্গে পৃথক করে দেখার সাধ্য আমার নেই। আপনারা আমার কাছে আজ অভিন্ন।

অচলা সলজ্জ হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু আপনাকে যাচাই করার শুভদিন না আসা পর্য্যন্ত আমি কিন্তু আপনার বন্ধুকে দোষী করতে পারব না সুরেশবাবু।

সুরেশ সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, সে আপনার ইচ্ছা। কিন্তু আমাকে যাচাই করবার শুভদিন এ-জন্মে ঘটবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সে যাক। আজ সকালেই কেন আপনাদের কাছে এসেচি জানেন? কাল রাত্রে আমি ঘুমুতে পারিনি—না এলে আজও পারব না তাও জানতুম। আমি অনেক অপরাধ করেচি—তার সমস্ত একটি একটি করে আজ আপনার কাছে স্বীকার করে আমি যাব। আমি তাই এসেচি।

তাহার প্রবল বিরুদ্ধতা অচলার অবিদিত ছিল না। তাই সে শঙ্কিত-মুখে

চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সুরেশ বলিতে লাগিল, কাল সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি মহিম বসে আছে। ভাল কথা, আপনি নিশ্চয়ই জানেন—আমি ব্রাহ্মদের দু'চক্ষে—অর্থাৎ কি-না, ব্রাহ্ম-সমাজটাকে আমি তেমন ভাল মনে করিনে।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আমি জানি।

সুরেশ বলিতে লাগিল, জানবেন বই কি। কিন্তু এ-কথাটাও ভুলবেন না যে, আমি তখন আপনাকে চিনতুম না। তাই মহিমকে অনুরোধ করি, সে যেন অন্ততঃ একটা মাস এখানে না আসে। কেন জানেন?

অচলা পুনরায় মাথা নাড়িয়া বলিল, না। তবে বোধ হয়, আপনি ভেবেছিলেন, পুরুষমানুষের ভুলতে একটা মাসই যথেষ্ট সময়। তার বেশী বিলম্ব হওয়া সঙ্গত নয়।

আঘাতটা সুরেশ বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া বলিল, আমি চিরদিনই নির্ব্বোধ। হয়ত এমনই কিছু একটা মনে করে থাকব। তা ছাড়া আরও একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র আপনার বিরুদ্ধে আমার ছিল। আমি শপথ করেছিলুম, এই একটা মাসের মধ্যেই আর কোথাও পাত্রী স্থির করে মহিমের বিয়ে দেব। যেমন করেই হোক তাকে আটকাতেই হবে। আমার বন্ধু হয়ে সে যে একটা নারীর মোহে নিজেদের সমাজ ছেড়ে চলে যাবে, এ যেন কিছুতেই না ঘটতে পায়।

অচলা রুদ্ধ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, তার পরে?

তাহার পাংশু মুখের পানে চাহিয়া সুরেশ একটুখানি হাসিল; কহিল, তার পরে আর ভয় নেই। এ পাপ-সঙ্কল্প ত্যাগ করেচি, আজ সেই কথাই আমি স্বীকার করে যাব। আপনাকে দেখা দেবার জন্যে কাল রাত্রে তাকে অনেক অনুরোধ করেচি। একদিন আমার অনুরোধটা সে রেখেছিল, কিন্তু কালকের অনুরোধটা রাখলে না—আপনাকে দেখা না দিয়েই সে কলকাতা ছেড়ে চলে গেল।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, যাবার কোন কারণ দেখিয়েছিলেন?

সুরেশ কহিল, না। দরকার আছে—এই মাত্র।

অচলা আর একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যেন আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল—দরকার! দরকার! চিরকাল তার মুখে এই কথাই শুনে আসচি—চিরদিন প্রয়োজনই তাঁর সর্ব্বস্ব!

সুরেশ কহিল, একটা চিঠি লিখেও ত সে আপনাকে জানাতে পারত।

অচলা ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, না। চিঠি তিনি লেখেন না।

সুরেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল; বলিল, কি প্রয়োজন, তাও কখনো বলে না। তার সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ সমস্তই তার একার। স্বার্থপর! কখনো কাউকে তার ভাগ দিলে না। এই নিয়ে কত দুঃখ সে যে ছেলেবেলা থেকে

আমাকে দিয়ে এসেচে, বোধ করি তার সীমা নেই। নিষ্ঠুর! দিনের পর দিন নিজে উপোস করে, আমার প্রতিদিনের খাওয়া-পরা তিক্ত বিষাক্ত করেচে—কিন্তু কখনো কোনদিন আমার মুখ চেয়েও আমার হাত থেকে কিছু নেয় নি। আমার ভয় হয়, যে-পাষাণকে নিয়ে আমি কখনো সুখ পায়নি, তাকে নিয়ে আপনিই কি সুখী হতে পারবেন? বলিতে বলিতেই অকস্মাৎ তাহার চোখ দুটো অশ্রুজলে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, দেখুন, আমার বাইরেটা ভারি শক্ত দেখতে, কিন্তু ভিতরটা তেমনি দুর্ব্বল। মহিমের ঠিক তার উল্টো—তবু আমাদের মত বন্ধুত্ব সংসারে বোধ করি খুব কমই ছিল।

অচলা নত মুখে মৃদুকণ্ঠে বলিল, সে আমি জানি সুরেশবাবু, এবং আরও জানি যে সে বন্ধুত্ব আজও তেমনি অক্ষয় হয়ে আছে।

শৈশবের সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতি সুরেশের বুকের ভিতর আলোড়িত হইয়া উঠিল, সে অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যখন জানেনই, তখন এই ভিক্ষা আজ আমাকে দিন যে, অজ্ঞানে যে শত্রুতা আপনাদের করেচি, সে অপরাধ আর যেন আমার বুকে না বেঁধে।

তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে পুনরায় রুদ্ধ হইয়া আসিল এবং এই একান্ত ব্যাকুলতায় অচলার নিজের অন্তরটাও যেন দুলিয়া উঠিল। সে উদ্গত অশ্রু গোপন করিতে অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিল, তাহার পিতা দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

কেদারবাবু সুরেশকে দেখিয়া খুশী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এই যে সুরেশবাবু!

সুরেশ দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল।

কেদারবাবু আসন গ্রহণ না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, মহিমের খবর কি? তাকে ত দেখচিনে!

সুরেশ বলিল, মহিম অত্যন্ত প্রয়োজনে সকালের গাড়িতেই বাড়ি চলে গেল—এই খবর জানাবার জন্যেই আমি এলুম।

কেদারবাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, বাড়ি চলে গেল! বলিয়াই সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিতে লাগিলেন, সে বাড়ি যাক্, থাক্, আমাদের তাতে আর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুমি বাবা সুরেশ যখন সময় পাবে বাড়ির ছেলের মত এখানে এসো, যেয়ো—আমার বড় আনন্দ হবে—কিন্তু তোমার সেই মিথ্যাচারী বন্ধুরত্নটি যেন আর কখন এ-বাড়িতে মুখ না দেখায়। দেখা হলে বলে দিও তার আর কোন লজ্জা না-থাকে—অন্ততঃ অপমানের ভয়টা যেন থাকে।

সুরেশ ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, তাহার মনের ভাব অনুমান করিবার চেষ্টা

করিয়া কেদারবাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, না, না, সুরেশ, তোমার লজ্জা বোধ করবার ত এতে কোনই কারণ নেই। বরঞ্চ কর্ত্তব্য করবার গৌরব আছে। তুমি বুঝতে পারচ না যে, কি বিপদ থেকে আমাদের পরিত্রাণ করেচ এবং কতদূর পর্য্যন্ত আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

মেয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, আমি কাল থেকে এই বড় আশ্চর্য্য হচ্ছি অচলা, সে লোকটা সুরেশের মত ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল কি করে, আর কি করেই বা এতদিন ধরে সে বজায় রেখেছিল। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, যে এ পারে, সে যে আমাদের মত দুটি নিরীহ মানুষকে ভুলিয়ে রাখবে, এ বেশি কথা নয় মানি, কিন্তু এও বড় অদ্ভুত যে, এই লোকটা কি, কেমন—একটু অনুসন্ধান করার কথাও আমার মত প্রবীণ বয়সের লোকের মনেও একটা দিন ওঠেনি। আশ্চর্য্য!

সুরেশ কথা কহিল না, কেদারবাবুর মুখের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিতে পর্য্যন্ত পারিল না।

কেদারবাবু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া নিজের পোষাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আমার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে বাবা; একটু ব'সো, আমি এইগুলো ছেড়ে আসি; বলিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই সুরেশ কহিল, আমার বেলা হয়ে গেছে। আজ যাই, আর একদিন আসব, বলিয়া ব্যস্ত হইয়াই উঠিয়া পড়িল এবং কোনমতে একটা নমস্কার সারিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সকালেই আবার তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল এবং পরদিনও ঠিক এই সময়েই তাহার গাড়ির শব্দ নীচে আসিয়া থামিল।

কিন্তু ইহার পরদিনও আবার যখন তাহার গাড়ির শব্দ শুনা গেল, তখন বেলা হইয়াছে। পিতাকে স্নানাহারের তাগিদ দিয়া অচলা উঠিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু তাঁহার আর উঠা হইল না, তিনি সুরেশকে সানন্দে আহ্বান করিয়া লইয়া গল্প শুরু করিয়া দিলেন।

সুরেশ ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল বলিয়াই দুই-চারিটা সাধারণ কথাবার্ত্তার পর যখন উঠিতে গেল, তখন তাহার শুষ্ক রুক্ষ মাথার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আজ অকস্মাৎ এক নিমিষেই কেদারবাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, এখনো ত তোমার স্নানাহার হয়নি সুরেশবাবু?

সুরেশ সহাস্যে কহিল, আমার আহার একটু বেলাতেই হয়।

কেদারবাবু তাহা কানেই লইলেন না, বলিতে লাগিলেন, এবং এক নিমিষেই একেবারে ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন—অ্যাঁ, এখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি? না, আর এক মিনিট দেরি নয় সুরেশ। এইখানেই স্নান করে যা পারো খেয়ে নাও। মা

অচলা, একটু তাড়া দাও—বেলা বারোটা বেজে গেছে। বেয়ারা, ইত্যাদি উচ্চকণ্ঠে ডাকাডাকি করিতে করিতে তিনি নিজেই বাহির হইয়া গেলেন।

অচলা এতক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখনও কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। পিতা চলিয়া যাইবার পরে আস্তে আস্তে বলিল, আপনি আমাদের এখানে কি কিছু খেতে পারবেন?

সুরেশ মুখ তুলিয়া অচলার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আপনি কি বলেন?

আপনি কখনই ত ব্রাহ্ম-বাড়িতে খান না।

না, খাইনে। কিন্তু আপনি এনে দিলে খাবো। একটুখানি থামিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় ভাবচেন, আমি তামাসা করচি; তা নয়। আপনি হাতে করে দিলে আমি সত্যি খাবো; বলিয়া চাহিয়া রহিল।

এইবার অচলা একটুখানি মুখ নীচু করিয়া হাসি গোপন করিল; কহিল, যথার্থ ই আমি ভেবেছিলুম আপনি ঠাট্টা করচেন। কাল পর্য্যন্তও যাদের বাড়িতে যেতে আপনার ঘৃণার অবধি ছিল না, আজ তাদেরই একজনের ছোঁয়া খেতে কি করে আপনার প্রবৃত্তি হবে, আমি ত ভেবে পাচ্ছিনে সুরেশবাবু।

সুরেশ ম্লান-মুখে ব্যথিতস্বরে কহিল, তবে এতক্ষণ পরে কি এই ভেবে পেলেন যে, আপনার হাতে খেতে আমার ঘৃণা হবে?

অচলা বলিল, কিন্তু এই ভাবনাই ত স্বাভাবিক সুরেশবাবু। আপনার মত একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের চিরদিনের বদ্ধমূল সামাজিক সংস্কার হঠাৎ একদিনে অকারণে ভেসে যাবে, এইটেই কি ভাবতে পারা সহজ?

সুরেশ কহিল, না, সহজ নয়। কিন্তু অকারণে ভেসে যাচ্ছে—তাই বা ভাবচেন কেন? কারণ থাকতেও ত পারে, বলিয়া এমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল যে, জবাব দিতে গিয়া অচলা একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার কথাটায় সে যে আঘাত পাইয়াছে, তাহা সে মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিল, এবং একপ্রকার হিংস্র আনন্দও উপভোগ করিতেছিল। কিন্তু সে বেদনা যে অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত মুখখানাকে একেবারে ছাইয়ের মত শুষ্ক করিয়া দিতে পারে—তা সে ভাবেও নাই, ইচ্ছাও করে নাই। তাই নিজেও ব্যথা পাইয়া কথাটাকে সহজ রহস্যালাপে পরিণত করিতে, জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, ভেবেই দেখুন আপনার মত কঠোর প্রতিজ্ঞ লোকও—

সুরেশ বলিল, হাঁ, ভেসে যায়। তাহার গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল। কহিল, আপনি একটা দিনের কথা বলছিলেন—কিন্তু জানেন আপনি, একদিনের ভূমিকম্পে অর্দ্ধেক দুনিয়াটা পাতালের মধ্যে ডুবে যেতে পারে? একটা দিন কম সময় নয়।

বলিয়া আবার নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল। অচলা ভীত হইয়া উঠিল। সুরেশের মুখের উপর কি একপ্রকার শুষ্ক পাণ্ডুরতা—কপালের শির দুটো রক্তে স্ফীত, চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে—যেন কি একটা সে ছোঁ মারিয়া ধরিতে চায়।

একে এই গরম, তাহাতে এত বেলা পর্য্যন্ত স্নানাহার নাই—গত রাত্রে এতটুকু ঘুমাইতে পারে নাই—তাহার পায়ের নীচের মাটিটা পর্য্যন্ত যেন অকস্মাৎ দুলিয়া উঠিল। আরক্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, ব্রাহ্মদের ঘৃণা করি কি না, সে জবাব ব্রাহ্মদের দেব, কিন্তু আপনি আমার কাছে তাদের অনেক অনেক উপরে—

তাহার উন্মাদ ভঙ্গীতে অচলা ভয়ে কাঠ হইয়া উঠিল। কোনমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য সভয়ে কহিতে গেল, বেয়ারাটা—

কিন্তু সে অস্ফুট মৃদুস্বর সুরেশের উত্তপ্ত উচ্চ কণ্ঠে ঢাকা পড়িয়া গেল। সে অমনি তীব্রস্বরে কহিতে লাগিল, দুটো দিনের পরিচয়!' তা বটে! কিন্তু জানো অচলা, দিন, ঘণ্টা, মিনিট দিয়ে মহিমকে মাপা যায়—কিন্তু সুরেশকে যায় না। সে স্থানকালের অতীত। তুমি ভূমিকম্প দেখেচ? যা পৃথিবী গ্রাস করে—

অচলা ব্যাধভীত হরিণীর মত চক্ষের পলকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনার স্নানের যোগাড়—, বলিয়া পা বাড়াইতেই সুরেশ সহসা সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অচলার ডান হাত ধরিয়া টান দিল। সেই উন্মত্ত ও আকস্মিক আকর্ষণ সহ্য করা স্ত্রীলোকের সাধ্য নয়। সে উপুড় হইয়া সুরেশের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। ভয় ও বিস্ময় অতিক্রম করিয়া তাহার আর্ত্তকণ্ঠের অস্ফুট 'মা গো!' আহ্বান তাহার কম্পিত ওষ্ঠপুট ত্যাগ করিতে না করিতে সুরেশ তাহার দুই হাত নিজের বুকের উপর সজোরে টানিয়া লইয়া ডাকিল, অচলা!

অচলা চোখ তুলিয়া মূর্চ্ছিত মায়ামুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল এবং সুরেশও ক্ষণকালের জন্য কথা কহিতে পারিল না—শুধু তাহার অপরিমেয়, পিপাসাদগ্ধ ওষ্ঠাধর হইতে কেমন যেন একটা স্তব্ধ তীব্র জ্বালা ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত এইভাবে থাকিয়া সুরেশ আর একবার অচলার দুই হাত বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিল, অচলা, একটিবার ভূমিকম্পের এই প্রচণ্ড হৃৎস্পন্দন নিজের দুটি হাতে অনুভব করে দেখ—কি ভীষণ তাণ্ডব এই বুকের ভেতরটায় তোলপাড় করে বেড়াচ্চে। এ কি পৃথিবীর কোন ভূমিকম্পের চেয়ে ছোট? বলতে পার অচলা, পৃথিবীতে কোন্ জাতি, কোন্ ধর্ম্ম, কোন্ মতামত আছে, যা এই বিপ্লবের মধ্যে পড়েও ডুবে রসাতলে তলিয়ে যাবে না!

ছেড়ে দিন—বাবা আসচেন, বলিয়া জোর করিয়া নিজকে মুক্ত করিয়া লইয়া অচলা তাহার চৌকিতে ফিরিয়া গিয়া শান্ত হইয়া বসিল এবং পরক্ষণেই কেদারবাবু

ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, তাই ত, একটু দেরি হয়ে গেল—আর এই বেয়ারা ব্যাটা যে থেকে থেকে কোথায় যায় তার ঠিকানা নেই। মা অচল—ও কি রে, তোর কি কোন অসুখ করেচে? মুখ শুকিয়ে যেন একেবারে—

অচলা কোনমতে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, না বাবা, অসুখ করবে কেন?

তবু মাথা-ধরা-টরা? যে গরম পড়েচে, তা—

না, আমি বেশ আছি বাবা, আমার কিছুই হয়নি।

কেদারবাবু নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, তবু ভাল। মুখ দেখে আমার ভয় লেগে গিয়েছিল। তবে, তুমি একটু দেখ দেখি মা, যদি—

অচলা বলিল, বেশ ত বাবা, আমি এক মিনিটে সমস্ত যোগাড় করে দিচ্চি। কিন্তু এইমাত্র আমি জিজ্ঞাসা করছিলুম সুরেশবাবুকে—আমাদের এখানে নাওয়া-খাওয়া করতে তাঁর ত আপত্তি নেই?

কেদারবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, আপত্তি কেন থাকবে? না—না সুরেশ, আমি ত তোমাকে বলেইচি যে, একদিনেই তোমাকে আমি ঘরের ছেলে মনে করেচি। এ বাড়ি তোমার নিজের বাড়ি। মেয়ের দিকে চাহিয়া সগর্ব্বে কহিলেন, আর তাই যদি না হবে অচলা, আমাদের উদ্ধার করবার জন্য ভগবান ওঁকে পাঠাবেন কেন? কিন্তু আর দেরি হবে না বাবা, এসো আমার সঙ্গে—স্নানের ঘরটা তোমাকে দেখিয়ে দিই গে।

কিন্তু সেই যে সুরেশ, কেদারবাবু প্রবেশ করা পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করিয়াছিল, কিছুতেই আর সে মাথা সোজা করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারিল না।

অচলা বলিল, কাজ কি বাবা পীড়াপীড়ি করে। আমাদের ব্রাহ্ম-বাড়িতে খেতে হয়ত ওঁর বিশেষ বাধা আছে। তা ছাড়া অপ্রবৃত্তির ওপর খেলে অসুখ করতেও পারে।

কেদারবাবু একেবারে মুসড়িয়া পড়িলেন। সুরেশ বড়লোকের ছেলে—স্বাধীন। ঘরের গাড়ি করিয়া যাতায়াত করে। তাহাকে খাওয়াইয়া মাখাইয়া যেমন করিয়া হোক আত্মীয় করা যে তাঁহার চাই-ই; হঠাৎ তাহার আনত মুখের একাংশে নজর পড়ায় কেদারবাবু বিস্ময়ে একেবারে চমকিয়া উঠিলেন—অ্যাঁ! একি হয়েচে সুরেশ? শুকিয়ে সমস্ত মুখখানা যে একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে। ওঠো, ওঠো—মাথায় মুখে জল দিতে আর এক মিনিট বিলম্ব ক'রো না। বলিয়া হাত ধরিয়া একপ্রকার জোর করিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন।

৭

আহারাদির পর কোনমতেই কেদারবাবু এই রৌদ্রের মধ্যে সুরেশকে ছাড়িয়া দিলেন না। বিশ্রামের নামে সমস্ত দুপুরটা একটা ঘরে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। সে চোখ বুজিয়া কৌচের উপর পড়িয়া রহিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। ঘরের বাহিরে মধ্যাহ্নসূর্য্য আকাশে জ্বলিতে লাগিল, ভিতরে আত্মসংযমের আত্মগ্লানি ততোধিক ভীষণ তেজে সুরেশের বুকের ভিতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এমনি করিয়া সমস্ত বেলাটা অন্তরে-বাহিরে পুড়িয়া আধমরা হইয়া যখন সে উঠিয়া বসিয়া সুমুখের জানালাটা খুলিয়া দিল, তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। কেদারবাবু প্রসন্নমুখে ঘরে ঢুকিয়া জোর করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ—গরমটা একবার দেখেচ সুরেশ! আমার এতটা বয়সে কলকাতায় কস্মিনকালেও এমন দেখিনি। বলি, ঘুমটুম একটু হয়েছিল কি?

সুরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, দিনের-বেলায় আমি ঘুমোতে পারিনে।

কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, আর পারা উচিতও নয়। ভয়ানক স্বাস্থ্যহানি হয়। তবুও আমি তিন-চারবার উঠে উঠে দেখি, তোমার পাখাওয়ালা টানচে, না ঘুমোচ্চে। এরা এত বড় শয়তান যে, যে মুহূর্ত্তে তুমি একটু চোখ বুজবে, সেই মুহূর্ত্তে সেও চোখ বুজবে। যা হোক, একটু সুস্থ হতে পেরেচ ত? আমি নিশ্চয় জানতুম—এ রোদে বাইরে বেরুলে আর তুমি বাঁচতে না।

সুরেশ চুপ করিয়া রহিল। কেদারবাবু ঘরের অন্যান্য জানালাগুলো একে একে খুলিয়া দিয়া, বসিবার চৌকিখানা কাছে টানিয়া কহিলেন, আমি ভাবচি সুরেশ, আর গড়ি-মসির প্রয়োজন নেই। সমস্ত স্পষ্ট করে মহিমকে একখানা চিঠি লিখে দিই। কি বল?

প্রশ্নটা সুরেশের পিঠের উপর যেন মর্ম্মান্তিক চাবুকের বাড়ি মারিল। সে এমনি চমকিয়া উঠিল যে, কেদারবাবু দেখিতে পাইয়া বলিলেন, নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য যে কি করে করতে হয়, সে শিক্ষা ত তুমিই আমাকে এতকাল পরে দিলে সুরেশ; এখন তোমার ত পেছুলে চলবে না বাবা।

এ ত ঠিক কথা। সুরেশ কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, কিন্তু আপনার কন্যারও এ সম্বন্ধে মতামত নেওয়া চাই।

কেদারবাবু অল্প হাসিয়া কহিলেন, চাই বই কি।

তিনি কি স্পষ্ট করে চিঠি লিখে দিতেই বলেন?

কেদারবাবু ইহার সোজা জবাব না দিয়া কহিলেন, তা একরকম তাই বই কি।

এসব বিষয়ে মুখোমুখি সওয়াল-জবাব করাটা সকলের পক্ষেই কষ্টকর। কিন্তু সে ত বড় হয়েচে, রীতিমত শিক্ষাও পেয়েচে; এ-সব ব্যাপার দিন থাকতে পরিষ্কার করে না নিলে এর পাগলামিটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, এ ত সে বোঝে। তাই ভাবচি, আজ রাত্রেই কাজটা সেরে ফেলব।

সুরেশ ম্লান হইয়া কহিল, এত তাড়াতাড়ি কেন? দু'দিন চিন্তা করাও ত উচিত।

কেদারবাবু বলিলেন, এর ভেতরে চিন্তা করব আর কোন্‌খানে। ওর হাতে মেয়ে দিতে পারব না, সে নিশ্চয়—তখন এই বিশ্রী ব্যাপারটা যত শীঘ্র শেষ হয় ততই মঙ্গল।

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, আমার উল্লেখ করাও কি প্রয়োজন?

কেদারবাবু হাসিয়া বলিলেন, বুড়ো হয়েচি, এইটুকু বিবেচনাও কি আমার নেই মনে কর? তোমার নাম কোনদিনও কেউ ভুলবে না।

সুরেশের মুখ দিয়া একটা আরামের নিশ্বাস পড়িল; কিন্তু সে আর কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এই নিশ্বাসটুকু কেদারবাবুর দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি সুরেশের আরও দু-একটা আচরণ ইতিমধ্যে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে একটা অনুমান খাড়া করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার সত্যমিথ্যা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে অন্ধকারে একটা ঢিল ফেলিলেন; কহিলেন, মস্ত উপকার আমাদের যেমন তুমি করলে বাবা, কিন্তু এর চেয়েও বড় উপকার তোমার কাছে আমরা দু'জনে প্রত্যাশা করচি। আমরা ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু সেরকম ব্রাহ্ম নয়। আর আমার মেয়ে ত তার মায়ের মত মনে মনে হিন্দুই রয়ে গেছে। সে আমাদের ব্রাহ্মগিরি-টিরি একেবারেই পছন্দ করে না।

সুরেশ বিস্ময়াপন্ন হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তার এই নীরব ঔৎসুক্য কেদারবাবু বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, তাই, মেয়েকে আমি কিছুতেই চিরকাল আইবুড়ো রাখতে পারি না। এ-বিষয়ে আমি তোমাদের মতই সম্পূর্ণ হিন্দুমতাবলম্বী। একটি সম্বন্ধ যেমন তোমা হতে ভেঙ্গে গেল সুরেশ, তেমনই আর একটি তোমাকেই গড় তুলতে হবে বাবা।

সুরেশ কহিল, যে আজ্ঞে, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব।

তাহার মুখের ভাব পড়িতে পড়িতে কেদারবাবু সন্দিগ্ধস্বরে কহিলেন, সমাজে এই নিয়ে যথেষ্ট গোলযোগ হবে দেখতে পাচ্চি। কিন্তু যত শীঘ্র পারা যায়, অচলার বিয়ে দিয়ে এই সব আলোচনা থামিয়ে ফেলতে হবে। তবে একটা শক্ত কথা আছে সুরেশ। বলিয়া একবার দরজার বাহিরে চাহিয়া, আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া, গলা খাটো করিয়া বলিলেন, শক্ত হচ্চে এই যে, পাত্র রূপে গুণে ভাল

হলেই যে হিন্দুসমাজের মত তাকে ধরে এনে বিয়ে দিতে পারব, তা নয়। ও চিরকাল যে শিক্ষা-সংস্কারের মধ্যে বড় হয়ে উঠেচে, তাতে ওর অমতে কিছুই করা যাবে না। কিন্তু মত সে কোন মতেই দেবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দু'জনের মধ্যে এমন একটা কিছু—বুঝলে না সুরেশ ?

কথাবার্ত্তার মধ্যেই সুরেশ কতকটা যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল, এই প্রণয়-ইঙ্গিতটা যেন আর একবার নূতন করিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে অচেতন করিয়া দিল। দুপুরবেলায় তাহার নিজের সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়-নিবেদনের বীভৎস উৎকট আচরণ স্মরণ হওয়ায় নিদারুণ লজ্জায় সমস্ত মুখখানা রাঙা না হইয়া একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল, এবং সকালের যে খবরের কাগজখানা এতক্ষণ পায়ের কাছে মেজেতে পড়িয়াছিল, সেইখানা তুলিয়া লইয়া তাহার বিজ্ঞাপনের পাতাটার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

কেদারবাবু ইহা দেখিতে পাইলেন, এবং এই আকস্মিক ভাবপরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া মনে মনে অত্যন্ত পুলকিত হইলেন; এবং সুযোগ বুঝিয়া একটা বড় রকম চাল চালিয়া দিলেন; কহিলেন, আমি বরাবর এই বড় একটা আশ্চর্য্য জিনিস দেখে আসচি সুরেশ, যে, কেন জানিনে, একটা লোককে আজন্ম কাছে পেয়েও এক তিল বিশ্বাস হয় না, আর একটা মানুষকে হয়ত দু'ঘণ্টা মাত্র কাছে পেয়েই মনে হয়, এর হাতে নিজের প্রাণটা পর্য্যন্ত সঁপে দিতে পারি। মনে হয়, যেন জন্মজন্মান্তরের আলাপ,—শুধু দু'ঘণ্টার নয়। এই যেমন তুমি। কতক্ষণেরই বা পরিচয় বল দেখি ?

ঠিক এমনি সময় অচলা ঘরে প্রবেশ করিল। সুরেশ মুহূর্ত্তের জন্য চোখ তুলিয়াই আবার সংবাদপত্রের প্রতি মনসংযোগ করিল।

বাবা, তুমি এ-বেলা চা, না কোকো খাবে ?

আমি কোকোই খাব মা।

সুরেশবাবু, আপনি চা খাবেন ত ?

সুরেশ কাগজের দিকে চোখ রাখিয়াই অস্ফুটস্বরে বলিল, আমাকে চা-ই দেবেন।

আপনার পেয়ালায় চিনি কম দিতে হবে না ত ?

না, আর পাঁচজন যেমন খায় আমিও তেমনি খাই।

অচলা চলিয়া গেল। কেদারবাবু তাঁহার ছিন্ন প্রসঙ্গের সূত্রযোজনা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এই দেখ না সুরেশ, আমার এই মা-টির জন্যেই এই বুড়োবয়সে আমি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েচি, এ-কথা তোমার কাছে ত গোপন রাখতে পারলুম না। নইলে নিজের দুর্দ্দশা-দুরবস্থার কাহিনী সহজে কি কেউ অপরের কানে তুলতে পারে! কখনও যা পারিনি, এত বন্ধু-বান্ধব থাকতে সে-কথা শুধু

তোমার কাছেই বলতে কেন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে না? এর কি কোন গূঢ় কারণ নেই মনে কর?

সুরেশ বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল। কেদারবাবু বলিতে লাগিলেন, এ ভগবানের নির্দ্দেশ—সাধ্য কি গোপন করি? আমাকে বলতেই হবে যে! বলিয়া চৌকির হাতলের উপর তিনি একটা চাপড় মারিলেন।

কিন্তু তাঁহার এই বিস্তৃত ভূমিকা সত্বেও তাঁহার দুর্দ্দশা দুরবস্থাটা যে মেয়ের জন্য কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা সুরেশ আন্দাজ করিতে পারিল না। কেদারবাবু তখন সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া তাঁহার অমন অর্ডার সাপ্লায়ের ব্যবসাটা নিছক প্রবঞ্চনা ও কৃতঘ্নতার আগুনে পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেলেও তিনি অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং ঋণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া গেলেও একমাত্র কন্যার শিক্ষা-সম্বন্ধে কিছুমাত্র ব্যয়সঙ্কোচ করেন নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন, গুটি পাঁচ-ছয় ডিক্রীজারির ভয়ে তাঁহার আহার-বিহার বিষময় এবং খুচরা ঋণের তাগাদায় জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিলেও তিনি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন না। অথচ এই কলিকাতা সহরেই এমন অনেক বন্ধু আছেন যাঁহারা টাকাটা অনায়াসেই ফেলিয়া দিতে পারেন।

একটুখানি থামিয়া কি যেন চিন্তা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু তোমাকে যে জানালুম—এতটুকু দ্বিধা-সঙ্কোচ হ'ল না—একি শ্রীভগবানের সুস্পষ্ট আদেশ নয়? বলিয়া পরম ভক্তিভরে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিলেন।

সুরেশের ভগবানে বিশ্বাস ছিল না—সে বৃদ্ধের উচ্ছ্বাসে যোগ দিল না, বরঞ্চ তাহার মনটা কেমন যেন ছোট হইয়া গেল। ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ঋণ কত?

কেদারবাবু বলিলেন, ঋণ? আমার ব্যবসাটা বজায় থাকলে কি এ আবার একটা ঋণ! বড় জোর হাজার তিন-চার। তিনি আরও কি একটা বলিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু এমনি সময়ে অচলা বেয়ারার হাতে চায়ের সরঞ্জাম এবং নিজের হাতে জল-খাবারের থালা লইয়া প্রবেশ করিল।

কেদারবাবু গরম কোকো এক চুমুকে খানিকটা খাইয়া, হর্ষসূচক একটা অব্যক্ত নিনাদ করিয়া পেয়ালাটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, দেখ সুরেশ, আমার ওপর ভগবানের এই একটা আশ্চর্য্য কৃপা আমি বরাবর দেখে আসচি যে, তিনি কখনো আমাকে অপ্রস্তুত করেন না। মহিমকে কথাটা বলি বলি করেও যে কেন বলতে পারতুম না—তিনি বরাবর আমার যেন মুখ চেপে ধরতেন—এতদিনে সেটা বোঝা গেল। বলিয়া আর একবার কপালে হাত ঠেকাইয়া তাঁহার অসীম দয়ার জন্য নমস্কার করিলেন।

সুরেশ তাহার পেয়ালাটার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, টাকাটা কবে আপনার প্রয়োজন?

কেদারবাবু মুখ হইতে কোকোর পেয়ালাটা পুনরায় নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, প্রয়োজন ত আমার নয় সুরেশ, প্রয়োজন তোমাদের। বলিয়া একটুখানি উচ্চ অঙ্গের হাস্য করিলেন।

হেঁয়ালিটা বুঝিতে না পারিয়া সুরেশ মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল, অচলা জিজ্ঞাসুমুখে পিতার মুখের পানে চাহিয়া আছে। তিনি একবার কন্যার মুখে, একবার সুরেশর মুখ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, এর মানে বোঝা ত শক্ত নয়। বাড়িটা আমি ত সঙ্গে করে নিয়ে যাব না। যায় তোমাদেরই যাবে, আর থাকে তোমাদেরই দু'জনের থাকবে। বলিয়া মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

দু'জনের চোখাচোখি হইল, এবং চক্ষের পলকে উভয়েই আরক্তমুখে মাথা হেঁট করিয়া ফেলিল।

পেয়ালা-দুই কোকো নিঃশেষ করিয়া কেদারবাবুর একখানা জরুরী চিঠি লেখার কথা স্মরণ হইল। অবিলম্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আজ তোমার খাওয়ার ভরি কষ্ট হ'ল সুরেশ, কাল দুপুরবেলা এখানে খাবে, বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পশ্চিম দিকের দরজা খুলিয়া তাঁহার নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

খোলা দরজা দিয়া অস্তোন্মুখ সূর্য্যের এক ঝলক রাঙা আলো সুরেশের মুখের উপর আসিয়া পড়িল। সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, অচলা তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—সেও দৃষ্টি অবনত করিল। মিনিট-দুই বড় ঘড়িটার খট্ খট্ শব্দ ছাড়া সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

৮

ঘরে নীরবতা ভঙ্গ করিল সুরেশ, কহিল, হঠাৎ আচ্ছা একটা কাণ্ড করে বসলুম। অচলা কথা কহিল না।

সুরেশ পুনরায় কহিল, আপনার নিশ্চয়ই আমাকে একটা রাক্ষস বলে মনে হচ্চে। একলা বসে থাকতে বোধ করি আপনার সাহস হচ্চে না, না? বলিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। অচলা এখনও মুখ তুলিল না; কিন্তু তুলিলে দেখিতে পাইত, সুরেশের ওই একান্ত চেষ্টার নিষ্ফল হাসিটা শুধু তাহার নিজের মুখখানাকেই বারংবার অপমানিত করিয়া লজ্জায় বিকৃত হইয়া উঠিতেছে।

আবার সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, এবং সেই দেওয়ালের গায়ের ঘড়িটাই

শুধু খট্ খট্ করিয়া স্তব্ধতার পরিমাণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণে এই কঠিন নীরবতা যখন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সুরেশ তাহার সমস্ত দেহটাকে ঋজু এবং শক্ত করিয়া কহিল দেখুন, যা হয়ে গেচে, তার পরে আমাদের মধ্যে চক্ষুলজ্জার স্থান নেই। বেলা গেল—আমি এবার যাব। কিন্তু তার আগে গোটা-দুই কথার জবাব শুনে যেতে চাই, দেবেন?

অচলা মুখ তুলিল। তাহার চোখ দুটি ব্যথায় ভরা। কহিল, বলুন।

সুরেশ ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আপনার বাবার দেনাটা পরিশোধ করে দিতে কাল-পরশু একবার আসব; কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হবার প্রয়োজন নাই। আমি জানতে চাই, আমাদের দু'জনের সম্বন্ধে তাঁর অভিপ্রায় কি আপনি জানেন?

অচলা কহিল, আমাকে তিনি স্পষ্ট করে কিছুই বলেন না।

সুরেশ বলিল, আমাকেও না। তবুও বিশ্বাস, তিনি আমাকেই—কিন্তু আপনি বোধ করি রাজি হবেন না?

অচলা কহিল, না।

কোনদিন না?

অচলা দৃষ্টি অবনত করিয়া কহিল, না।

কিন্তু, মহিমের আশা যদি না থাকে?

অচলা অবিচলিত-স্বরে কহিল, সে আশা ত নেই-ই।

সুরেশ প্রশ্ন করিল, বোধ করি, তবুও না?

অচলা মুখ তুলিল না, কিন্তু তেমনি শান্ত দৃঢ়-স্বরে কহিল, তবুও না।

সুরেশ কোচের পিঠে ঢলিয়া পড়িয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক, এ দিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাঁচা গেল। বলিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, কিন্তু আমি এই একটা মুস্কিলের কথা ভাবচি যে, আপনার বাবার দেনাটা তা হলে শোধ হবে কি করে?

অচলা ভয়ে ভয়ে একটুখানি মুখ তুলিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কহিল, আর ত আপনি দিতে পারবেন না?

পারব না? কেন? প্রশ্ন করিয়া সুরেশ তীক্ষ্ণ ব্যগ্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে চাহনির সম্মুখে অচলা পুনরায় মাথা হেঁট করিয়া ফেলিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া সুরেশ হাসিল। কিন্তু এবার তাহার হাসিতে আনন্দ না থাক্, কৃত্রিমতাও কিছু ছিল না। কহিল, দেখুন, আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়া পর্য্যন্ত আমার কোন আচরণকেই যে ভদ্র বলা যেতে পারে না, সে আমি নিজেও জানি; কিন্তু আমি অত ছোটও নই। আপনার বাবাকে আমি এই টাকাটা ঘুষ দিতে চাইনি, তাঁর বিপদে সাহায্য করতেই চেয়েছিলাম। সুতরাং আপনার

মতামতের ওপর আমার দেওয়াটা নির্ভর করচে না। নির্ভর করচে তাঁর নেওয়াটা। এখন কি করে যে তিনি নেবেন, আমি তাই ভাবচি। বরং আসুন, এ সম্বন্ধে আমরা একটা পরামর্শ করি।

অচলা মুখ তুলিয়া কহিল, বলুন।

সুরেশ বলিতে লাগিল, দৈবাৎ অনেক টাকার মালিক আমি। অথচ টাকা-কড়ির উপর কোনদিন কোন মায়াই আমার নেই। হাজার-চারেক টাকা আমি স্বচ্ছন্দে হাতছাড়া করতে পারি। আর আপনার সুখের জন্য ত আরও ঢের বেশি পারি। তা যাক। এখন কথা এই যে, আপনার বাবার ধারণা, এ টাকাটা শোধ দেবার আব আবশ্যক হবে না, অথচ সে একরকম শোধ দেওয়াই হবে। বুঝলেন না?

অচলা মাথা নাড়িয়া অস্ফুটে কহিল, হাঁ।

সুরেশ বলিতে লাগিল, কথাটা স্পষ্ট বলচি বলে মনে কিছু করবেন না। বুঝতে পারচি, টাকাটা তাঁর চাই-ই, অথচ অত টাকা ধার নিয়ে শোধ করবার অবস্থা তাঁর নেই। যদিচ, আমার নিজের তরফ থেকে তার আবশ্যক কিছুমাত্র নেই—আচ্ছা, এ ত সহজেই হতে পারে। পরশু পর্যন্ত আপনার মনের ভাব তাঁকে না জানালেই ত আর কোন গোল থাকে না। কেমন, পারবেন ত?

অচলা তেমনি অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। সুরেশ কহিল, টাকার লোভে আপনি যে মত দিলেন না, এতে আমার ঢের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। বরঞ্চ মত দিলেই হয়ত আমি শেষে ভয়ে পেছিয়ে দাঁড়াতুম। আমার দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়। আচ্ছা, চললুম। বলিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিয়া বলিল, আমার বলবার আর মুখ নেই—তবু যাবার সময় একটা ভিক্ষা চেয়ে যাচ্চি যে, আমার দোষ-অপরাধগুলো মনে করে রাখবেন না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, নমস্কার। খারাপ কাজের জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে বিদায় হলুম—কিন্তু বাস্তবিক, পিশাচও আমি নই। যাক—বিশ্বাস করবার যখন এতটুকু পথ রাখিনি, তখন বলা বৃথা। বলিয়াই দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া সুরেশ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ধীরে ধীরে তাহার পদশব্দ সিঁড়িতে মিলাইয়া গেল, অচলা শুনিতে পাইল; এবং তাহার পরেই নিতান্ত অকারণে তাহার দুই চোখ দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কেদারবাবু ঘরে ঢুকিতে বলিলেন, সুরেশ?

অচলা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, এইমাত্র চলে গেলেন।

কেদারবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, সে কি, আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেল? কাল এখানে খাবার কথাটা স্মরণ করে দিয়েছিলে ত?

অচলা অপ্রতিভ হইয়া কহিল, আমার মনে ছিল না বাবা।

মনে ছিল না! বেশ! বলিয়া কেদারবাবু নিকটস্থ চৌকিটার উপর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া পড়িলেন। মেয়ের চাপা কণ্ঠস্বরে তাঁর মনের মধ্যে একবার একটা খটকা বাজিল বটে, কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারে মুখের চেহারাটা দেখিতে না পাইয়া সেটা স্থায়ী হইতে পারিল না। বলিলেন, এ বুড়ো বয়সে যা নিজে না করব, যেদিকে না চাইব, তাতেই একটা-না-একটা গলদ থেকে যাবে—তাই হবে না। যাই বেয়ারাটাকে দিয়ে এখ্‌খুনি একটা চিঠি পাঠিয়ে দিই গে। সুরেশের বাড়ির ঠিকানাটা কি? বলিয়া উঠিতে উদ্যত হইলেন।

আমি ত জানিনে বাবা!

তাও জান না? বল কি? বলিয়া বৃদ্ধ চেয়ারের উপর পুনরায় হেলান দিয়া পড়িলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠিয়া বসিয়া রুক্ষভাবে বলিতে লাগিলেন, তোমার নিজের হাত-পা যদি নিজেই কেটে ফেলতে চাও, ত কাটো গে মা, আমার ঠেকাবার দরকার নেই। ভাল, এটা ত একবার ভাবতে হয়, যে এক কথায় এতগুলো টাকা দিতে চায়, সে লোকটা কি দরের? তার বাড়ির ঠিকানাটাও কি জিজ্ঞাসা করে রাখতে নেই? তুমি যত বড় হ'চ্চ, ততই যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছ অচলা। বলিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

ঋণজাল-বিজড়িত বিপন্ন পিতা তাহার যে সকল অসত্য ও হীনতার মধ্য দিয়া সম্প্রতি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেন, সে সমস্তই অচলা দেখিতে পাইত। এ-সকল তাহার মর্ম্মভেদ করিত, কিন্তু নীরবে সহ্য করিত। এখনও সে কথা কহিয়া তাহার অকারণ বিরক্তির প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু সে যে মনে মনে অতিশয় লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হইয়াছে, কেদারবাবু ইহাই নিশ্চিত অনুমান করিয়া প্রীত হইলেন।

বেয়ারা আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। তিনি সস্নেহে তিরস্কারের স্বরে বলিতে লাগিলেন, মহিমের সম্বন্ধে কোন খোঁজ কোনদিনই তুমি নিলে না। আচ্ছা, সে না হয় ভালই হয়েচে। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। কিন্তু সুরেশের সম্বন্ধে ত এ-সব খাটতে পারে না। দেখলে না—ঈশ্বর স্বয়ং যেন হাত ধরে এঁকে দিয়ে গেলেন।

অচলা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সুরেশবাবুর কাছ থেকে কি তুমি টাকা ধার নেবে বাবা?

কেদারবাবুর ভগবদ্ভক্তি হঠাৎ বাধা পাইয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হাঁ—না, ঠিক ধার নয়; কি জান মা, সুরেশ না-কি বড় ভাল ছেলে—একালে অমন একটি সৎ ছেলে লক্ষ্যর মধ্যে একটি মেলে। তার মনের ইচ্ছে যে, বাড়িটা ধারের জন্য না নষ্ট হয়। থাকলে তোমাদেরই থাকবে—আমি আর কতদিন—বুঝলে না মা?

অচলা চুপ করিয়া রহিল। কেদারবাবু উৎসাহভরে বলিতে লাগিলেন, জান ত, আমি চিরকাল স্পষ্ট কথা ভালবাসি। মুখে এক, ভিতরে আর, আমার দ্বারা হবার নয়। কাজেই খুলে বলে দিলাম যে, এখন সমস্ত জেনে শুনে মহিমের হাতে মেয়ে দেবার চেয়ে তাকে জলে ফেলে দেওয়া ভাল। সুরেশেরও যখন তাই মত, তখন বলতেই হ'ল যে, তার বন্ধুর সঙ্গে বিয়ের কথাটা অনেক দূর জানাজানি হয়ে গেছে, তখন সম্বন্ধ ভাঙলেই চলবে না—একটা গড়ে তুলতেও হবে; না হলে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। কিন্তু যাই বলো, ছেলে বটে এই সুরেশ! আমি মঙ্গলময়কে তাই বার বার প্রণাম জানাচ্ছি।

পিতার প্রণাম জানানো আর একবার নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইবার পর অচলা ধীরে ধীরে কহিল, এঁর কাছ থেকে এত টাকা না নিলেই কি নয় বাবা?

কেদারবাবু শঙ্কায় চকিত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, না নিলেই যে নয় মা!

বেশ! কিন্তু আমরা ত শোধ দিতে পারব না।

শোধ দেবার কথা কি সুরেশ—কথাটা উদ্বিগ্ন-সংশয়ে বৃদ্ধ শেষ করিতেই পারিলেন না। তাঁহার সমস্ত মুখ শাদা হইয়া গেল। অচলা সে চেহারা দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাইল। তাড়াতাড়ি বলিল, তিনি বলছিলেন, পরশু এসে টাকা দিয়ে যাবেন।

শোধ দেবার কথা—

না, তিনি বলেননি।

লেখাপড়া-টড়া—

না, সে ইচ্ছে বোধ হয় তাঁর একেবারেই নেই।

ঠিক তাই! বলিয়া পরিতৃপ্তির রুদ্ধশ্বাস বৃদ্ধ ফোঁস করিয়া ত্যাগ করিলেন এবং চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া পা দুটা সুমুখের টেবিলের উপর তুলিয়া দিলেন। আনন্দে এবং আরামে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ক্ষণকালের জন্য শিথিল হইয়া গেল। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া পা নামাইয়া উদ্দীপ্ত-স্বরে কহিলেন, একবার ভেবে দেখ দিকি মা, কোত্থেকে কি হ'ল! এই সর্ব্বশক্তিমানের হাত কি এতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ না?

অচলা নীরবে পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। তিনি উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি চোখের উপর দেখতে পাচ্চি, এ শুধু তাঁর দয়া। তোমাকে বলব কি মা, এই দুটো বৎসর একটা রাত্রিও আমি ভাল করে ঘুমোতে পারিনি—শুধু তাঁকে ডেকেচি। আর সুরেশকে দেখবামাত্রই মনে হয়েচে, সে যেন পূর্ব্বজন্মে আমার সন্তান ছিল।

অচলা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পিতার সাংসারিক দুরবস্থার কথা সে বেশ

জানিত, কিন্তু তাহা এতটা দূর পর্য্যন্ত ভিতরে ভিতরে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাই জানিত না। আজ দুই বৎসরের একাগ্র আরাধনায় তাহার দুঃখের সমস্যা যদি বা মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে অকস্মাৎ লঘু হইয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার নিজের সমস্যা একেবারে ভীষণ জটিল হইয়া দেখা দিল। সুরেশের কাছে টাকা লওয়া সম্বন্ধে সে এইমাত্র মনে মনে যে-সকল সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা আবার তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। লেশমাত্র বাধা দিবার কথা সে আর মনে করতে পারিল না। যাই হোক, টাকাটা তাদের গ্রহণ করিতেই হইবে।

সান্ধ্য-উপাসনার জন্য কেদারবাবু উঠিয়া গেলেন। অচলা সমস্ত ব্যাপারটা গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত মনের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য সেখানেই স্তব্ধ হইয়া রহিল।

যে দুই বন্ধু আজ অকস্মাৎ তাহার জীবনের এই সন্ধিস্থলে এমন পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের একজনকে যে আজ 'যাও' বলিয়া বিদায় দিতেই হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই ; কিন্তু কাহাকে ? কে সে ? যে মহিম তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসে, কে জানে কোন্ কর্ত্তব্যের আকর্ষণে, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে বসিয়া আছে, তাহার শান্ত স্থির মুখখানা মনে করিতেই একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে অচলার দুই চক্ষু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কোনদিন যে কোন অপরাধ করে নাই, অথচ, 'যাও' বলিতেই সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবে। এ-জীবনে, কোন সূত্র, কোন ছলেই আর তাহাদের পথে আসিবে না। অচলা স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, সেই অভাবনীয় চির-বিদায়ের ক্ষণেও তাহার অটল গাম্ভীর্য্য এক তিল বিচলিত হইবে না, কাহাকেও দোষ দিবে না, হয়ত কারণ পর্য্যন্তও জানিতে চাহিবে না—নিগূঢ় বিস্ময় ও তীব্র বেদনার একটা অস্পষ্ট রেখা হয়ত বা মুখের উপর দেখা দিবে, কিন্তু সে ছাড়া আর কাহারো তাহা চোখেও পড়িবে না।

তাহার পরে একদিন সুরেশের সঙ্গে বিবাহের কথা তার কানে উঠিবে। সেই মুহূর্ত্তের অসতর্ক অবসরে হয়ত বা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িবে, না হয়, একটু মুচকিয়া হাসিয়াই নিজের কাজে মন দিবে। ব্যাপারটা কল্পনা করিয়া এই নির্জ্জন ঘরের মধ্যেও তাহার চোখ-মুখ লজ্জায়, ঘৃণায় রাঙা হইয়া উঠিল।

৯

দিন দশ-বার কাটিয়া গিয়াছে। কেদারবাবুর ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়, এত স্ফূর্ত্তি বুঝি তাহার যুবা বয়সেও ছিল না, আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বায়স্কোপ দেখিয়া

ফিরিবার পথে গোলদীঘির কাছাকাছি আসিয়া তিনি হঠাৎ গাড়ি হইতে নামিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, সুরেশ, আমি এইটুকু হেঁটে সমাজে যাব, বাবা, তোমরা বাড়ি যাও ; বলিয়া হাতে ছড়িটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বেগে চলিয়া গেলেন।

সুরেশ কহিল, তোমার বাবার শরীরটা আজকাল বেশ ভাল বলে মনে হয়।

অচলা সেই দিকেই চাহিয়াছিল, বলিল, হাঁ, সে আপনারই দয়ায়।

গাড়ি মোড় ফিরিতে আর তাঁহাকে দেখা গেল না। সুরেশ অচলার ডান-হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, তুমি জানো এ-কথায় আমি কত ব্যথা পাই। সেই জন্যেই কি তুমি বার বার বলো অচলা ?

অচলা একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, এত বড় দয়া পাছে ভুলে যাই বলেই যখন তখন স্মরণ করি। আপনাকে ব্যথা দেবার জন্য বলিনে।

সুরেশ তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া বলিল, সেই জন্যেই ব্যথা আমার বেশি বাজে।

কেন ?

আমি বেশ বুঝতে পারি, শুধু এই দয়াটা স্মরণ করেই তুমি মনের মধ্যে জোর পাও। এ-ছাড়া তোমার আর এতটুকু সম্বল নেই, সত্যি কি না বল দিকি ?

যদি না বলি ?

ইচ্ছে না হয়, ব'ল না। কিন্তু আমাকে 'তুমি' বলতেও কি কোনদিন পারবে না ?

অচলার মুখ মলিন হইয়া গেল। আনত-মুখে ধীরে ধীরে বলিল, একদিন বলতেই হবে, সে ত আপনি জানেন।

তাহার ম্লান মুখ লক্ষ্য করিয়া সুরেশ নিশ্বাস ফেলিল। কহিল, তাই যদি হয়, দু'দিন আগে বলতেই বা দোষ কি ?

অচলা জবাব দিল না। অন্যমনস্কের মত পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিনিট-খানেক নিঃশব্দে থাকিয়া সুরেশ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আমার মনে হয়, মহিম সমস্ত জানতে পেরেচে।

অচলা চমকাইয়া মুখ ফিরাইল। তাহার একটা হাত এতক্ষণ পর্য্যন্ত সুরেশের হাতের মধ্যেই ধরা ছিল, সেটা টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি করে জানলেন ?

তাহার ব্যগ্র কণ্ঠ সুরেশের কানে খট্ করিয়া বাজিল। কহিল, নইলে এতদিনে সে আসত। পোনর-ষোল দিন কেটে গেল ত!

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, আজ নিয়ে উনিশ দিন। আচ্ছা, বাবা কি তাঁকে কোন চিঠি-পত্র লিখেচেন, আপনি জানেন ?

সুরেশ সংক্ষেপে কহিল, না, জানিনে।

তিনি বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন কি না, জানেন ?

না। তাও জানিনে।

অচলা গাড়ির বাহিরে পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, তা হলে খোঁজ নিয়ে একখানা চিঠিতে তাঁকে সমস্ত কথা জানানো বাবার উচিত। হঠাৎ কোনদিন আবার না এসে উপস্থিত হন।

আবার কিছুক্ষণের জন্য উভয়ে নীরব হইয়া রহিল। সুরেশ আর একবার তাহার শিথিল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, আমার সবচেয়ে কষ্ট হয় অচলা, যখন মনে হয়, আমাকে কোনদিন শ্রদ্ধা পর্য্যন্ত করতে পারবে না। তোমার চিরকাল মনে হবে শুধু টাকার জোরেই তোমাকে ছিঁড়ে এনেচি। আমার দোষ।

অচলা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বাধা দিয়া বলিল, এমন কথা আপনি বলবেন না—আপনার কোন দোষ দিতে পারিনে। একটু থামিয়া বলিল, টাকার জোর সংসারে সর্ব্বত্রই আছে, এ ত জানা কথা ; কিন্তু সে জোরে আপনি ত জোর খাটাননি। বাবা না জানতে পারেন, কিন্তু আমি সমস্ত জেনে-শুনে যদি আপনাকে অশ্রদ্ধা করি, ত আমার নরকেও স্থান হবে না।

চিরদিন সামান্য একটু করুণ কথাতেই সুরেশ বিগলিত হইয়া যায়। অচলার এইটুকু প্রিয়-বাক্যেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে-জল সে অচলার হাত দুখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহাতেই মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, মনে করো না, এ অপরাধ, এ অন্যায়ের পরিণাম আমি বুঝতে পারিনে। কিন্তু আমি বড় দুর্ব্বল। বড় দুর্ব্বল। এ আঘাত মহিম সইতে পারবে—কিন্তু আমার বুক ফেটে যাবে। বলিয়া একটা কঠিন ধাক্কা যেন সামলাইয়া ফেলিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, তুমি যে আমার নও, আর একজনের, এ কথা আমি ভাবতেও পারিনে। তোমাকে পাব না মনে হলেই আমার পায়ের নীচে মাটি পর্য্যন্ত যেন টলতে থাকে।

সেইমাত্র পথের ধারে গ্যাস জ্বালা হইতেছিল। গাড়ি তাহাদের গলিতে ঢুকিতেই একটা উজ্জ্বল আলো সুরেশের মুখের উপর পড়িয়া তাহার দুই চক্ষের টল্‌টলে জল অচলার চোখে পড়িয়া গেল। মুহূর্তের করুণায় সে কোনদিন যাহা করে নাই, আজ তাহাই করিয়া বসিল! সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিয়া ফেলিল, আমি কোনদিনই বাবার অবাধ্য নই। তিনি আমাকে ত তোমার হাতেই দিয়েচেন।

সুরেশ অচলার সেই হাতটি নিজের মুখের উপর টানিয়া লইয়া বারংবার চুম্বন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, এই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার অচলা, এর বেশি

আর চাইনে। কিন্তু, এটুকু থেকে যেন আমাকে বঞ্চিত ক'রো না।

গাড়ি বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল! সহিস দ্বার খুলিয়া সরিয়া গেল, সুরেশ নিজে নামিয়া সযত্নে সাবধানে অচলার হাত ধরিয়া তাহাকে নীচে নামাইয়া উভয়েই এক সঙ্গে চাহিয়া দেখিল, ঠিক সম্মুখে মহিম দাঁড়াইয়া এবং সেই নিমিষের দৃষ্টিপাতেই এই দুটি নর-নারী একেবারে যেন পাথরে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

পরক্ষণেই অচলা অব্যক্ত আর্তস্বরে কি একটা শব্দ করিয়া সজোরে হাত টানিয়া লইয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল।

মহিম বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, সুরেশ, তুমি যে এখানে?

সুরেশের গলা দিয়া প্রথমে কথা ফুটিল না। তার পরে সে একটা ঢোক গিলিয়া পাংশুমুখে শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, বাঃ—মহিম যে! আর দেখা নেই! ব্যাপার কি হে? কবে এলে? চল, চল, ওপরে চল। বলিয়া কাছে আসিয়া তাহার হাতটা নাড়িয়া দিয়া হাসির ভঙ্গিতে কহিল, আচ্ছা কাজ করলে কিন্তু আপনার বাবা। তিনি গেলেন সমাজে, আর পৌঁছে দেবার ভার পড়ল এই গরীবের ওপরে। তা একরকম ভালই হয়েচে—নইলে মহিমের সঙ্গে হয়ত দেখাই হ'ত না। বাড়িতে এতদিন ধরে করছিলে কি বল ত শুনি?

মহিম কহিল, কাজ ছিল। বিস্ময়ের প্রভাবে তাহার অচলাকে একটা নমস্কার করিবার কথাও মনে হইল না।

সুরেশ তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, আচ্ছা লোক যা হোক্! আমরা ভেবে মরি, একটা চিঠি পর্য্যন্ত দিতে নেই? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ওপরে চল। বলিয়া তাহাকে একরকম জোর করিয়া উপরে ঠেলিয়া লইয়া গেল। কিন্তু বসিবার ঘরে আসিয়া যখন সকলে উপবেশন করিল, তখন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাহার অস্বাভাবিক প্রগল্ভতা একেবারে থামিয়া গেল। গ্যাসের তীব্র আলোকে মুখখানা তাহার কালিবর্ণ হইয়া উঠিল। মিনিট দুই-তিন কেহই কথা কহিল না।

মহিম একবার বন্ধুর প্রতি একবার অচলার প্রতি শূন্য দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিল, খবর সব ভাল?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিল না।

মহিম কহিল, আমি ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গেছি—কিন্তু সুরেশের সঙ্গে তোমাদের আলাপ হল কি করে?

অচলা মুখ তুলিয়া ঠিক যেন মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিল, উনি বাবার চার হাজার টাকা দেনা শোধ করে দিয়েচেন।

তাহার মুখ দেখিয়া মহিমের নিজের মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—তার পরে?

তার পরে তুমি বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'রো, বলিয়া অচলা ত্বরিতপদে উঠিয়া বাহির

হইয়া গেল। মহিম স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অবশেষে বন্ধুর প্রতি চাহিয়া কহিল, ব্যাপার কি সুরেশ ?

সুরেশ উদ্ধতভাবে জবাব দিল, তোমার মত আমার টাকাটাই প্রাণ নয় ! ভদ্রলোক বিপদে পড়ে সাহায্য চাইলে আমি দিই—ব্যস্ এই পর্য্যন্ত। তিনি যদি শোধ দিতে না পারেন ত আশা করি, সে দোষ আমার নয়। তবু যদি আমাকেই দোষী মনে কর ত একশবার করতে পার, আমার কোন আপত্তি নেই।

বন্ধুর এই অসংলগ্ন কৈফিয়ৎ এবং তাহা প্রকাশ করিবার অপরূপ ভঙ্গি দেখিয়া মহিম যথার্থ-ই মূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, হঠাৎ তোমাকেই বা দোষী ভাবতে যাব কেন, তার কোন তাৎপর্য্যই ত ভেবে পেলুম না সুরেশ ; দয়া করে আর একটু খুলে না বললে ত বুঝতে পারব না।

সুরেশ তেমনি রুক্ষস্বরে কহিল, খুলে আবার বলব কি ! বলবার আছে বা কি !

মহিম কহিল, তা আছে। আমি সেদিন যখন বাড়ি যাই, তখন এদের তুমি চিনতে না। এর মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'লই বা কি করে, আর একটা ব্রাহ্ম-পরিবারের বিপদে চার হাজার টাকা দেবার মত তোমার মনের এতখানি উদারতা এল কোথা থেকে, আপাততঃ এইটুকু বুঝিয়ে দিলে আমি কৃতার্থ হ'ব সুরেশ।

সুরেশ বলিল, তা হতে পারে। কিন্তু আমার গল্প করবার এখন সময় নেই—এখুনি উঠতে হবে। তা ছাড়া, কেদারবাবুকেই জিজ্ঞাসা করো না, তিনি সমস্ত বলবার জন্যেই ত অপেক্ষা করে আছেন।

তাই ভাল, বলিয়া মহিম উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, শোনবার ভারি কৌতূহল ছিল, কিন্তু তবু এখন তাঁর অপেক্ষায় বসে থাকবার সময় নেই। আমি চললুম—

সুরেশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল—কোন কথা কহিল না।

মহিম বাহিরে আসিতে দেখিতে পাইল, সুমুখের রেলিঙ ধরিয়া এই দিকে চাহিয়াই অন্ধকারে অচলা দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু সে কাছে আসিবার বা কথা কহিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিল না দেখিয়া সেও নীরবে সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

১০

কয়েকটা অত্যন্ত জরুরি ঔষধ কিনিতে মহিম কলিকাতায় আসিয়াছিল, সুতরাং রাত্রের গাড়িতেই বাড়ি ফিরিয়া গেল। সুরেশ সন্ধান লইয়া জানিল, মহিম তাহার বাসায় আসে নাই, দিন-চারেক পরে বিকালবেলায় কেদারবাবুর বসিবার ঘরে বসিয়া

এই আলোচনাই বোধ করি চলিতেছিল। কেদারবাবু বায়স্কোপে নূতন মাতিয়াছিলেন; কথা ছিল, চা-খাওয়ার পরই তাঁহারা আজ বাহির হইয়া পড়িবেন। সুরেশের গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল—এমনি সময়ে দুর্গ্রহের মত ধীরে ধীরে মহিম আসিয়া অকস্মাৎ দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল এবং সকলের মুখের ভাবেই একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল।

কেদারবাবু বিরস-মুখে, জোর করিয়া একটু হাসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, এস মহিম। সব খবর ভাল?

মহিম নমস্কার করিয়া ভিতরে আসিয়া বসিল। বাড়িতে এতদিন বিলম্ব হইবার কারণ জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে শুধু জানাইল যে, বিশেষ কাজ ছিল।

সুরেশ টেবিলের উপর হইতে সেদিনের খবরের কাগজটা হাতে লইয়া পড়িতে লাগিল এবং অচলা পাশের চৌকি হইতে তাহার সেলাইটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিল। সুতরাং কথাবার্ত্তা একা কেদারবাবুর-সঙ্গেই চলিতে লাগিল।

হঠাৎ এক সময়ে অচলা বাহিরে উঠিয়া গিয়া মিনিট-খানেক পরেই ফিরিয়া আসিয়া বসিল এবং ক্ষণেক পরেই মাথার উপরে টানা-পাখাটা নড়িয়া দুলিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। হঠাৎ বাতাস পাইয়া কেদারবাবু খুশী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তবু ভাল। পাখাওয়ালা ব্যাটার এতক্ষণে দয়া হ'ল।

সুরেশ তীক্ষ্ণ, বক্র দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল, মহিমের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়াছে। কেন অচলা উঠিয়া গিয়াছিল, কেন পাখাওয়ালার অকারণে দয়া প্রকাশ পাইল, সমস্ত ইতিহাসটা তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে খেলিয়া গিয়া, যে বাতাসে কেদারবাবু খুশী হইলেন, সেই বাতাসেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতে লাগিল। সে হঠাৎ ঘাড় তুলিয়া তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, পাঁচটা বেজে গেছে—আর দেরি করলে চলবে না কেদারবাবু।

কেদারবাবু আলাপ বন্ধ করিয়া চায়ের জন্য হাঁকা-হাঁকি করিতেই বেয়ারা সমস্ত সরঞ্জাম আনিয়া হাজির করিয়া দিল। সেলাই রাখিয়া দিয়া অচলা পেয়ালা-দুই চা তৈরি করিয়া সুরেশ ও পিতার সম্মুখে আগাইয়া দিতেই, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি খাবে না মা?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না বাবা, বড় গরম।

হঠাৎ তাঁহার মহিমের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ও কি, মহিমকে দিলে না যে! তুমি কি চা খাবে না মহিম?

সে জবাব দিবার পূর্ব্বেই অচলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, এত গরমে তোমার খেয়ে কাজ নেই। তা ছাড়া এবেলা ত তোমার চা সহ্য হয় না।

মহিমের বুকের উপর হইতে কে যেন অসহ্য গুরুভার পাষাণের বোঝা মায়ামন্ত্রে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। সে কথা কহিতে পারিল না, শুধু অব্যক্ত বিস্ময়ে নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল।

অচলা কহিল, একটুখানি সবুর কর, আমি লাইম-জুস দিয়ে সরবৎ তৈরি করে আনচি। বলিয়া সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সুরেশ আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া কলের পুতুলের মত ধীরে ধীরে চা খাইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার প্রতি বিন্দু তখন তাহার মুখে বিস্বাদ ও তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

চা-পান শেষ করিয়া কেদারবাবু তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া তৈরি হইয়া আসিয়া দেখিলেন, অচলা নিজের জায়গায় বসিয়া একমনে সেলাই করিতেছে। ব্যস্ত এবং আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, এখনো বসে কাপড় সেলাই করচ, তৈরি হয়ে নাওনি যে?

অচলা মুখ তুলিয়া শান্ত-কণ্ঠে কহিল, আমি যাব না বাবা।

যাবে না! সে কি কথা?

না বাবা, আজ তোমরা যাও—আমার ভাল লাগছে না। বলিয়া একটুখানি হাসিল।

সুরেশ অভিমান ও গূঢ় ক্রোধ দমন করিয়া কহিল, চলুন কেদারবাবু, আজ আমরা যাই। ওঁর হয়ত শরীর ভাল নেই, কাজ কি পীড়াপীড়ি করে?

কেদারবাবু তাহার প্রতি চাহিয়াই তাহার ভিতরের ক্রোধ টের পাইলেন। মেয়েকে কহিলেন, তোমার কি কোনোরকম অসুখ করেচে?

অচলা কহিল, না বাবা, অসুখ করবে কেন, আমি ভাল আছি।

সুরেশ মহিমের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিল না; বলিল, আমরা যাই চলুন কেদারবাবু। ওঁর বাড়িতে কোনোরকম আবশ্যক থাকতে পারে—জোর করে নিয়ে যাবার দরকার কি?

কেদারবাবু কঠোর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়িতে তোমার কাজ আছে?

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

কেদারবাবু অকস্মাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন, বলচি চল। অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়ে।

অচলার হাতের সেলাই স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। সে স্তম্ভিত-মুখে দুই চক্ষু ডাগর করিয়া প্রথমে সুরেশের, পরে তাহার পিতার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া, অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া দ্রুতবেগে উঠিয়া গেল।

সুরেশ মুখ কালি করিয়া কহিল, আপনার সব-তাতেই জবরদস্তি। কিন্তু আমি আর দেরি করতে পারিনে—অনুমতি করেন ত যাই।

কেদারবাবু নিজের অভদ্র-আচরণে মনে মনে লজ্জিত হইতেছিলেন—সুরেশের কথায় রাগিয়া উঠিলেন। কিন্তু রাগটা পড়িল মহিমের উপর। সে নিরতিশয় ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠি উঠি করিতেছিল। কেদারবাবু বলিলেন, তোমার কি কোন আবশ্যক আছে মহিম?

মহিম আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না।

কেদারবাবু চলিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, তা হলে আজ আমরা একটু ব্যস্ত আছি, আর একদিন এলে—

মহিম কহিল, যে আজ্ঞে, আসব। কিন্তু আসার কি বিশেষ প্রয়োজন আছে?

কেদারবাবু সুরেশকে শুনাইয়া কহিলেন, আমার নিজের কোন প্রয়োজন নাই। তবে যদি দরকার মনে কর, এসো—দু-একটা বিষয় আলোচনা করা যাবে।

তিনজনেই বাহির হইয়া পড়িলেন! নীচে আসিয়া মহিমকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া সুরেশ কেদারবাবুকে লইয়া তাহার গাড়িতে উঠিয়া বসিল। কোচম্যান গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

মহিম খানিকটা পথ আসিয়াই পিছনে তাহার নাম শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, কেদারবাবুর বেয়ারা। সে বেচারা হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাছে আসিয়া একটুকরা কাগজ হাতে দিল। তাহাতে পেন্সিল দিয়া শুধু লেখা ছিল, অচলা। বেয়ারা কহিল, একবার ফিরে যেতে বললেন।

ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়িতে পা দিয়াই দেখিতে পাইল—অচলা সুমুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার আরক্ত চক্ষুর পাতা আর্দ্র রহিয়াছে। কাছে আসিতেই বলিল, তুমি কি তোমার কসাই বন্ধুর হাতে আমাকে জবাই করবার জন্যে রেখে গেলে? যে তোমার ওপর এত বড় কৃতঘ্নতা করতে পারলে, তার হাতে আমাকে ফেলে যাচ্ছো কি বলে? বলিয়াই ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মহিম স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিনিট-দুই পরে আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, আমার লজ্জা করবার আর সময় নেই। দেখি তোমার ডান হাতটি। বলিয়া নিজেই মহিমের দক্ষিণ হস্ত টানিয়া লইয়া নিজের আঙ্গুল হইতে সোনার আংটিটি খুলিয়া তাহার আঙ্গুলে পরাইয়া দিতে দিতে কহিল, আমি আর ভাবতে পারিনে। এইবার যা করবার তুমি ক'রো। বলিয়া গড় হইয়া পায়ের কাছে একটা নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল।

মহিম ভাল-মন্দ কোন কথা কহিল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রেলিঙটার উপর ভর দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, পুনরায় ধীরে ধীরে নামিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর নত-মস্তকে ধীরে ধীরে মহিম যখন তাহার বাসার দিকে পথ চলিতেছিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া কাহারও বলিবার সাধ্য ছিল না যে, ঠিক সেই সময়ে তাহার সমস্ত প্রাণটা যন্ত্রণায় বাহিরে আসিবার জন্য তাহারই হৃদয়ের দেওয়ালে প্রাণপণে গহ্বর খনন করিতেছিল। কি করিয়া সুরেশ এখানে আসিল, কেমন করিয়া এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিল—এই সব ছোটখাটো ইতিহাস এখনো সে জানিতে পারে নাই বটে, কিন্তু আসল জিনিসটা আর তাহার অবিদিত ছিল না। কেদারবাবুকে সে চিনিত। যেখানে টাকার গন্ধ একবার তিনি পাইয়াছেন, সেখান হইতে সহজে কোনমতেই যে তিনি মুখ ফিরাইয়া লইবেন না, ইহাতে তাহার কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। সুরেশকে সে ছেলেবেলা হইতে নানারূপেই দেখিয়া আসিয়াছে। দৈবাৎ যাহাকে সে ভালবাসে, তাহাকে পাইবার জন্য সে কি যে দিতে না পারে, তাহাও কল্পনা করা কঠিন। টাকা ত কিছুই নয়—এ ত চিরদিনই তাহার কাছে অতি তুচ্ছ বস্তু। একদিন তাহারই জন্য যে মুঙ্গেরের গঙ্গায় নিজের প্রাণটার দিকেও চাহে নাই, আজ যদি সে আর একজনের ভালবাসার প্রবলতর মোহে সেই মহিমের প্রতি দৃকপাত না করে ত তাহাকে দোষ দিবে সে কি করিয়া? সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা একটা মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করা ব্যতীত কাহারও উপর সে বিশেষ কোন দোষারোপ করিল না। কিন্তু এই এতগুলা বিরুদ্ধ ও প্রচণ্ড শক্তি সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, এতগুলিকে প্রতিহত করিয়া অচলা যে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিবে, এ বিশ্বাস তাহার ছিল না। তাই তাহার শেষ কথা, তাহার শেষ আচরণ ক্ষণকালের নিমিত্ত চঞ্চল করা ভিন্ন মহিমকে সত্যকার ভরসা কিছুই দেয় নাই। আঙটিটার পানে বারংবার চাহিয়াও সে কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিল না। অথচ, শেষ নিষ্পত্তি হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। এমন করিয়া নিজেকে ভুলাইয়া আর একটা মুহূর্ত্ত কাটানো চলে না। যা হবার তা হোক, চরম একটা মীমাংসা করিয়া সে লইবেই। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়াই আজ সে তাহার দীন-দরিদ্র ছাত্রাবাসে গিয়া রাত্রি আটটার পর হাজির হইল।

পরদিন অপরাহ্নকালে কেদারবাবুর বাটীতে গিয়া খবর পাইল, তাঁহারা এইমাত্র বাহির হইয়া গিয়াছেন—কোথায় নিমন্ত্রণ আছে। তাহার পরদিন গিয়াও দেখা হইল না। বেয়ারা জানাইল, সকলে বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছেন, ফিরিতে রাত্রি হইবে। সকলে যে কে তাহা প্রশ্ন না করিয়াও মহিম অনুমান করিতে পারিল। অপমান এবং অভিমান যত বড়ই হোক, উপর্য্যুপরি দুই দিন ফিরিয়া আসাই তাহার মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারিত; কিন্তু হাতের আংটিটা তাহাকে তাহার

বাসায় টিকিতে দিল না, পরদিন পুনরায় তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিল। আজ শুনিতে পাইল, বাবু বাড়ি আছেন—উপরের ঘরে বসিয়া চা-পান করিতেছেন।

মহিমকে দ্বারের কাছে দেখিয়া কেদারবাবু মুখ তুলিয়া গম্ভীর-স্বরে শুধু বলিলেন, এসো মহিম। মহিম হাত তুলিয়া নিঃশব্দে নমস্কার করিল।

দূরে খোলা জানালার ধারে একটা সোফার উপর পাশা-পাশি বসিয়া অচলা এবং সুরেশ। অচলার কোলের উপর একটা ভারি ছবির বই। দু'জনে মিলিয়া ছবি দেখিতেছিল। সুরেশ পলকের জন্য চোখ তুলিয়াই, পুনরায় ছবি দেখায় মনঃসংযোগ করিল; কিন্তু অচলা চাহিয়াও দেখিল না। তাহার অবনত মুখখানি দেখা গেল না বটে, কিন্তু সে যেরূপ একান্ত আগ্রহভরে তাহার বইয়ের পাতার দিকে ঝুঁকিয়া রহিল, তাহাতে এমন মনে করা একেবারে অসঙ্গত হইত না যে, পিতার কণ্ঠস্বর, আগন্তুকের পদশব্দ—কিছুই তাহার কানে যায় নাই।

মহিম ঘরে ঢুকিয়া চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল।

কেদারবাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন কথা কহিলেন না—একটু একটু করিয়া চা পান করিতে লাগিলেন। বাটিটা যখন নিঃশেষ হইয়া গেল এবং আর চুপ করিয়া থাকা নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন সেটা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, তা হলে এখন কি করচ? তোমাদের আইনের খবর বার হতে এখনো ত মাস-খনেক দেরি আছে বলে মনে হচ্চে।

মহিম শুধু কহিল, আজ্ঞে হাঁ।

কেদারবাবু বলিলেন, না হয় পাসই হলে—তা পাস তুমি হবে, আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কিছুদিন প্র্যাক্‌টিস করে হাতে কিছু টাকা না জমিয়ে ত আর কোনদিকে মন দিতে পারবে না? কি বল সুরেশ, মহিমের সাংসারিক অবস্থা ত শুনতে পাই তেমন ভাল নয়।

সুরেশ কথা কহিল না। মহিম একটু হাসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, প্র্যাকটিস করলেই যে হাতে টাকা জমবে, তারও ত কোন নিশ্চয়তা নাই।

কেদারবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না, তা নেই—ঈশ্বরের হাত, কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেচেন, 'পুরুষসিংহ'; তোমার সেই পুরুষসিংহ হতে হবে। আর কোনদিকে নজর থাকবে না—শুধু উন্নতি আর উন্নতি। তার পরে সংসারধর্ম্ম করা—যা ইচ্ছা কর, কোনো দোষ নেই—তা নইলে যে মহাপাপ! বলিয়া সুরেশের পানে একবার চাহিয়া কহিলেন, কি বল সুরেশ—তাদের খাওয়াতে পরাতে পারব না, সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে পারব না—এমন করেই ত হিন্দুরা উচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের লোকেরাও যদি সৎদৃষ্টান্ত না দেখাই, তা হলে সভ্যজগতের কোনমতে কারো কাছে মুখ দেখাতে পর্য্যন্ত পারব না, ঠিক কি না? কি বল সুরেশ?

সুরেশ পূর্ব্ববৎ মৌন হইয়া রহিল। মহিম ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, আপনার উপদেশ আমি মনে রাখব। কিন্তু আপনি কি এই আলোচনা করবার জন্যই আমাকে আসতে বলেছিলেন?

কেদারবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিলেন, বলিলেন, না, শুধু এই নয়, আরও কথা আছে, কিন্তু—, বলিয়া সোফার দিকে চাহিলেন।

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা তা হলে ও-ঘরে গিয়ে একটু বসি, বলিয়া হেঁট হইয়া অচলার ক্রোড়ের উপর হইতে ছবির বইখানা তুলিয়া লইল। তাহার এই ইঙ্গিতটুকু কিন্তু অচলার কাছে একেবারে নিষ্ফল হইয়া গেল। সে যেমন বসিয়াছিল, তেমনি রহিল, উঠিবার লেশমাত্র উদ্যোগ করিল না। কেদারবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা দুজনে একটুখানি ও-ঘরে গিয়ে ব'সো গে মা, মহিমের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

অচলা মুখ তুলিয়া পিতার মুখের পানে চাহিয়া শুধু কহিল, আমি থাকি বাবা।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা বেশ, আমি না হয় যাচ্ছি, বলিয়া একরকম রাগ করিয়াই হাতের বইটা অচলার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া সশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কন্যার অবাধ্যতায় কেদারবাবু যে খুশী হইলেন না, তা তিনি মুখের ভাবে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু জিদও করিলেন না। খানিকক্ষণ রুষ্টমুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, মহিম, তুমি মনে ক'রো না, আমি তোমার উপর বিরক্ত; বরঞ্চ তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধাই আছে। তাই বন্ধুর মত উপদেশ দিচ্ছি যে, এখন কোনপ্রকার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে নিজেকে অকর্ম্মণ্য করে তুলো না। নিজের উন্নতি কর, কৃতি হও, তার পরে দায়িত্ব নেবার যথেষ্ট সময় পাবে।

মহিম মুখ ফিরাইয়া একবার অচলার পানে চাহিল। সে চক্ষের পলকে চোখ নামাইয়া ফেলিল। তখন তাহার পিতার পানে চাহিয়া কহিল, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য; কিন্তু আপনার কন্যারও কি তাই ইচ্ছা।

কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়! নিশ্চয়! মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, অন্ততঃ এটা নিশ্চয় যে, সমস্ত জেনে-শুনে তোমার হাতে আমি মেয়েকে বিসর্জ্জন দিতে পারব না।

মহিম শান্তস্বরে কহিল, ইংরেজদের একটা প্রথা আছে, এ-রকম অবস্থায় তারা পরস্পরের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। আপনার সেই অভিপ্রায়ই কি বুঝব?

কেদারবাবু হঠাৎ আগুন হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, দেখ মহিম, আমি তোমার কাছে হলপ নেবার জন্য তোমাকে ডাকিনি। তুমি যে-রকম ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করেচ, তাতে আর কোন বাপ হলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হয়ে যেত। কিন্তু আমি নিতান্ত

শান্তিপ্রিয় লোক, কোনরকমের গোলমাল হাঙ্গামা ভালবাসিনে বলেই যতটা সম্ভব মিষ্টি কথায় আমাদের মনের ভাব তোমাকে জানিয়ে দিলুম। তাতে তুমি অপেক্ষা করে থাকবে, কি থাকবে না, সাহেবরা কি করে, এত কৈফিয়তে ত আমাদের প্রয়োজন দেখিনে। তা ছাড়া, আমরা ইংরাজ নই, বাঙালী। মেয়ে আমাদের বড় হয়ে উঠলেই বাপ-মায়ের চোখে ঘুম আসে না, মুখে অন্ন-জল রোচে না, এ-কথা তুমি নিজেই কোন্ না জান?

মহিমের চোখ-মুখ পলকের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে বলিল, আমি কি ব্যবহার করেচি, যার জন্যে অন্যত্র এত বড় কাণ্ড হ'তে পারত—এ প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাইনে। শুধু আপনার কন্যার নিজের মুখে একবার শুনতে চাই, তাঁরও এই অভিপ্রায় কি না। বলিয়া নিজেই উঠিয়া গিয়া অচলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, কেমন, এই ত?

অচলা মুখ তুলিল না, কথা কহিল না।

একটা উচ্ছ্বসিত বাষ্প মহিম সবলে নিরোধ করিয়া পুনরায় কহিল, তোমার মনের কথা নিভৃতে জানবার, জিজ্ঞেস করে জানবার অবকাশ আমি পেলুম না—সেজন্যে আমি মাপ চাচ্চি। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ঝোঁকের উপর যে কাজ করে ফেলেছিলে, তার জন্যেও তোমাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। শুধু একবার বল, সেই আংটি ফিরে চাও কি না।

সুরেশ ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া কহিল, আমাকে মাপ করতে হবে কেদারবাবু, আমার আর এক মিনিট অপেক্ষা করবার জো নেই।

উপস্থিত সকলেই মৌন-বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া চাহিল। কেদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

সুরেশ অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাত দুটো বাড়াইয়া দিয়া বলিল, না না—এ ভুলের মার্জ্জনা নেই। আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ আজ প্লেগে মৃতকল্প, আর আমি কি-না ভুলে গিয়ে এখানে বসে বৃথা সময় নষ্ট করচি।

কেদারবাবু শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, বল কি সুরেশ, প্লেগ? যাবে নাকি সেখানে?

সুরেশ একটু হাসিয়া বলিল, নিশ্চয়! অনেক পূর্ব্বেই আমার সেখানে যাওয়া উচিত ছিল।

কেদারবাবু অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, কিন্তু প্লেগ যে! তিনি কি তোমার এমন বিশেষ কোন আত্মীয়—

সুরেশ কহিল, আত্মীয়! আত্মীয়ের অনেক বড় কেদারবাবু! মহিমের প্রতি কটাক্ষ করিয়া এই প্রথম কথা কহিল, বলিল, মহিম, আমাদের নিশীথের কাল রাত্রি

থেকে প্লেগ হয়েচে, বাঁচে যে, এ আশা নেই। আমার তোমাকেও একবার বলা উচিত—যাবে দেখতে ?

মহিম নিশীথ লোকটিকে চিনিত পারিল না। কহিল, কোন্ নিশীথ ?

কোন্ নিশীথ! বল কি মহিম ? এরই মধ্যে আমাদের নিশীথকে ভুলে গেলে ? যার সঙ্গে সমস্ত সেকেণ্ড-ইয়ারটা পড়লে, তাকে তার এত বড় বিপদের দিনে আর মনে পড়চে না ? বলিয়া ঘাড় ফিরাইয়া, একবার অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া লইয়া শ্লেষের স্বরে বলিল, তা মনে পড়বে না বটে! প্লেগ কি না!

এই খোঁচাটুকু মহিম নীরবে সহ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি ভবানীপুর থেকে আসতেন ?

সুরেশ ব্যঙ্গ করিয়া জবাব দিল, হাঁ, তাই। কিন্তু নিশীথ ত আমাদের দু-চার জন ছিল না মহিম, যে, এতক্ষণ তোমার মনে পড়েনি! বলি যাবে কি ?

মহিম চিনিতে পারিয়া কহিল, নিশীথ কোথায় থাকে এখন ?

সুরেশ কহিল, আর কোথায় ? নিজের বাড়িতে, ভবানীপুরে। এ সময় তাকে একবার দেখা দেওয়া কি কর্ত্তব্য বলে মনে হয় না ? আমি ডাক্তার, আমাকে ত যেতেই হবে; আর অত বড় বন্ধুত্ব ভুলে গিয়ে না থাক ত তুমিও আমার সঙ্গে যেতে পার। কেদারবাবু, আপনাদের কথা বোধ করি শেষ হয়ে গেছে ? আশা করি, অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যেও ওকে একবার ছুটি দিতে পারবেন ?

এ বিদ্রূপটা যে আবার কাহার উপর হইল, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া কেদারবাবু উদ্বিগ্নমুখে একবার মহিমের, একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার এই বড়লোক ভাবী জামাতাটির মান-অভিমান যে কিসে এবং কতটুকুতে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, আজও বৃদ্ধ তাহার কূলকিনারা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, মহিমও হতবুদ্ধির মত নীরবে চাহিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে অচলার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া হাতের বইখানা সুমুখের টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া এতক্ষণ পরে কথা কহিল; বলিল, তুমি ডাক্তার, তোমার ত যাওয়াই উচিত; কিন্তু ওঁর ওকালতির কেতাবের মধ্যে ত প্লেগের চিকিৎসা লেখা নেই ? উনি যাবেন কি জন্যে শুনি ?

এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত জবাবে সুরেশ অবাক হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, আমি সেখানে ডাক্তারি করতে যাচ্ছিনে, তার ডাক্তারের অভাব নেই। আমি যাচ্ছি বন্ধুর সেবা করতে। বন্ধুত্বটা আমার প্রাণটার চেয়েও বড় বলে মনে করি।

একটা নিষ্ঠুর হাসির আভাস অচলার ওষ্ঠাধরে খেলিয়া গেল; কহিল, সকলেই

যে তোমার মত মহৎ হবে, এমন ত কোন কথা নেই। অত বড় বন্ধুত্বজ্ঞান যদি ওঁর না থাকে ত আমি লজ্জার মনে করিনে। সে যাই হোক, ও-জায়গায় ওঁর কিছুতেই যাওয়া হবে না।

সুরেশের মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল।

কেদারবাবু সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। সভয়ে বলিতে লাগিলেন, ও-সব তুই কি বলচিস্ অচলা? সুরেশের মত—সত্যই ত—নিশীথবাবুর মত—

অচলা বাধা দিয়া কহিল, নিশীথবাবুকে ত প্রথমে চিনতেই পারলেন না। তা ছাড়া উনি ডাক্তার—উনি যেতে পারেন। কিন্তু আর একজনকে বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া কেন?

আহত হইলে সুরেশের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে টেবিলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া, যা মুখে আসিল উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি ভীরু নই—প্রাণের ভয় করিনে। মহিমকে দেখাইয়া বলিল, ঐ নেমকহারামটাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমি ওকে মরতে মরতে বাঁচিয়েছিলুম কি না।

অচলা দৃপ্তস্বরে কহিল, নেমকহারাম উনি! তাই বটে! কিন্তু যাকে এক সময়ে বাঁচানো যায়, আর এক সময়ে ইচ্ছে করলে বুঝি তাকে খুন করা যায়?

কেদারবাবু হতবুদ্ধির মত বলিতে লাগিলেন, থাম্ না অচলা; থাম না সুরেশ। এ-সব কি কাণ্ড বল দেখি!

সুরেশ রক্ত-চক্ষে কেদারবাবুর প্রতি চাহিয়া বলিল, আমি প্লেগের মধ্যে যেতে পারি—তাতে দোষ নেই! মহিমের প্রাণটাই প্রাণ, আর আমারটা কিছু নয়! দেখলেন ত আপনি!

লজ্জায় ক্ষোভে অচলা কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, ওঁর প্রাণ উনি দিতে পারেন, আমি নিষেধ করতে পারিনে; কিন্তু যেখানে বাধা দেবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার, সেখানে আমি বাধা দেবই। আমি কোনমতেই অমন জায়গায় ওঁকে যেতে দিতে পারব না। বলিয়া সে প্রস্থানের উপক্রম করিতেই কেদারবাবু চেঁচাইয়া উঠিলেন, কোথায় যাস্ অচলা!

অচলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না বাবা, দিন-রাত্রি এত পীড়ন আর সহ্য করতে পারিনে। যা একেবারে অসম্ভব, যা প্রাণ থাকতে স্বীকার করবার আমার একেবারে জো নেই, তাই নিয়ে তোমরা আমাকে অহর্নিশ বিঁধছ। বলিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন চাপিতে চাপিতে দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধ কেদারবাবু বুদ্ধিভ্রষ্টের মত খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, শেষে বার বার বলিতে লাগিলেন, যত সব ছেলেমানুষ—কি সব কাণ্ড বল ত!

১২

মাস-খানেক গত হইয়াছে। কেদারবাবু রাজি হইয়াছেন—মহিমের সহিত অচলার বিবাহ আগামী রবিবারে স্থির হইয়া গিয়াছে। সেদিন যে কাণ্ড করিয়া সুরেশ গিয়াছিল, তাহা সত্যই কেদারবাবুর বুকে বিঁধিয়াছিল। কিন্তু সেই অপমানের গুরুত্ব ওজন করিয়াই যে তিনি মহিমের প্রতি অবশেষে প্রসন্ন হইয়া সম্মতি দিয়াছেন, তাহা নয়। সুরেশ নিজেই যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে—এতদিনের মধ্যে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শুনা যায়, সেই রাত্রেই সে নাকি পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে—কবে ফিরিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

সেদিন কান্না চাপিতে অচলা ঘর ছাড়িয়া যখন চলিয়া গেল, তখন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনজনেই মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু কথা কহিল প্রথমে সুরেশ নিজে। কেদারবাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, যদি আপত্তি না থাকে, আমি আপনার সাক্ষাতেই আপনার কন্যাকে গোটা-কয়েক কথা বলতে চাই।

কেদারবাবু ব্যস্ত হয়েই কহিলেন, বিলক্ষণ! তুমি কথা বলবে, তার আবার আপত্তি কি সুরেশ? যত সব ছেলেমানুষের—

তাহলে একবার ডেকে পাঠান—আমার সময় বেশি নেই।

তাহার মুখের ও কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া কেদারবাবু মনে মনে শঙ্কা অনুভব করিলেন। কিন্তু জোর করিয়া একটু হাস্য করিয়া, আবার সেই ধুয়া তুলিয়াই বলিতে লাগিলেন, যত সব ছেলেমানুষের কাণ্ড! কিন্তু একটুখানি সামলাতে না দিলে—বুঝলে না সুরেশ, ও-সব প্লেগ-ফ্লেগের জায়গার নাম করলেই—মেয়েমানুষের মন কি-না। একবার শুনলেই ভয়ে অজ্ঞান—বুঝলে না বাবা—

কোনপ্রকার কৈফিয়তের প্রতি মনোযোগ দিবার মত সুরেশের মনের অবস্থা নয়—সে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, বাস্তবিক কেদারবাবু, আমার অপেক্ষা করবার সময় নেই।

তা ত বটেই। তা ত বটেই। কে আছিস রে ওখানে? বলিয়া ডাক দিয়া কেদারবাবু মহিমের প্রতি একটা বক্র কটাক্ষ করিলেন। মহিম উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা নমস্কার করিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু নিজে গিয়া অচলাকে যখন ডাকিয়া আনিলেন, তখন অপরাহ্ণ-সূর্য্যের রক্তিম-রশ্মি পশ্চিমের জানালা-দরজা দিয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই আলোকে উদ্ভাসিত এই তরুণীর ঈষদ্দীর্ঘ কৃশ দেহের পানে চাহিয়া, পলকের জন্য সুরেশের বিক্ষুব্ধ মনের উপর একটা মোহ ও পুলকের স্পর্শ খেলিয়া গেল, কিন্তু

স্থায়ী হইতে পারিল না। তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রেই সে ভাব তাহার চক্ষের নিমিষে নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু, তবুও সে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিল না, নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অচলার মুখের উপর আকাশের আলো পড়ে নাই বটে, কিন্তু সুমুখের দেওয়াল হইতে প্রতিফলিত আরক্ত আভায় সমস্ত মুখখানা সুরেশের চোখে কঠিন ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্ত্তির মত বোধ হইল। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কি যেন একটা নিবিড় বিতৃষ্ণায় এই নারীর সমস্ত মাধুর্য্য, সমস্ত কোমলতা, নিঃশেষে শুষিয়া ফেলিয়া মুখের প্রত্যেক রেখাটিকে পর্য্যন্ত অবিচলিত দৃঢ়তায় একেবারে ধাতুর মত শক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সহসা কেদারবাবুর প্রবল নিশ্বাসের চোটে সুরেশের চমক ভাঙ্গিতেই সোজা হইয়া বসিল।

কেদারবাবু আর একবার তাঁহার পুরাতন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, যত সব পাগলামি কাণ্ড—কাকে যে কি বলি, আমি ভেবে পাইনে—

সুরেশ অচলাকে উদ্দেশ করিয়া নিরতিশয় গম্ভীর-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনি যা বলে গেলেন, তাই ঠিক ?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

এর আর কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব নয় ?

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

রক্তের উচ্ছ্বাস এক ঝলক আগুনের মত সুরেশের চোখ-মুখ প্রদীপ্ত করিয়া দিল ; কিন্তু সে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়াই কহিল, আমার প্রাণটার পর্য্যন্ত যখন কোন দাম নেই, তখনি আমি জানতুম। তাহার বুকের ভিতরটা তখন পুড়িয়া যাইতেছিল। একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, আমিই কি আপনাদের প্রথম শিকার, না, এমন আরও অনেকে এই ফাঁদে পড়ে নিজেদের মাথা মুড়িয়ে গেছে ?

অসহ্য বিস্ময়ে অচলা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল।

সুরেশ কেদারবাবুর প্রতি চাহিয়া কহিল, বাপ-মেয়েতে ষড়যন্ত্র করে শিকার ধরার ব্যবসা বিলাতে নতুন নয় শুনতে পাই ; কিন্তু এ-ও বলচি আপনাকে, কেদারবাবু, একদিন আপনাদের জেলে যেতে হবে।

কেদারবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এ সব তুমি কি বলচ সুরেশ !

সুরেশ অবিচলিত-স্বরে জবাব দিল; চুপ করুন কেদারবাবু ; থিয়েটারের অভিনয় অনেকদিন ধরে চলচে। পুরানো হয়ে গেছে—আর এতে আমি ভুলব না। টাকা আমার যা গেছে, তা যাক—তার বদলে শিক্ষাও কম পেলুম না। কিন্তু এই যেন শেষ হয়।

অচলা কাঁদিয়া উঠিল—তুমি কেন এর টাকা নিলে বাবা ?

কেদারবাবু পাগলের মত একখণ্ড সাদা কাগজের সন্ধানে এদিকে-ওদিকে হাত বাড়াইয়া,

শেষে একখানা পুরাতন খবরের কাগজ সবেগে টানিয়া লইয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, আমি এখ্‌খুনি হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি—

সুরেশ বলিল, থাক্ থাক্, লেখালিখিতে আর কাজ নেই। আপনি ফিরিয়ে যা দেবেন, সে আমি জানি। কিন্তু আমিও ঐ কটা টাকার জন্য নালিশ করে আপনার সঙ্গে আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।

জবাব দিবার জন্য কেদারবাবু দুই ঠোঁট ঘন ঘন নাড়িতে লাগিলেন, কিন্তু গলা দিয়া একটাও কথা ফুটিল না।

সুরেশ অচলার প্রতি ফিরিয়া চাহিল। তাহার একান্ত পাংশু-মুখ ও সজল চক্ষের পানে চাহিয়া তাহার একবিন্দু দয়া হইল না, বরঞ্চ ভিতরের জ্বালা শতগুণে বাড়িয়া গেল। সে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সহিত বলিয়া উঠিল, কি তোমার গর্ব্ব করবার আছে অচলা, ঐ ত মুখের শ্রী, ঐ ত কাঠের মত দেহ, ঐ ত গায়ের রঙ। তবু যে আমি ভুলেছিলাম—সে কি তোমার রূপে? মনেও ক'রো না।

পিতার সমক্ষে এই নির্লজ্জ অপমানে অচলা দুঃখ ও ঘৃণায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কোচের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ব্রাহ্মদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে। যাদের ছায়া মাড়াতেও আমার ঘৃণা বোধ হ'ত, তাদের বাড়িতে ঢোকামাত্রই যখন আমার আজন্মের সংস্কার—চিরদিনের বিদ্বেষ এক মুহূর্ত্তে ধুয়ে মুছে গেল, তখনি আমার সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল—এ যাদুবিদ্যা! আমার যা হয়েছে, তা হোক, কিন্তু যাবার সময় আপনাদের আমি সহস্রকোটি ধন্যবাদ না দিয়ে যেতে পারছিনে। ধন্যবাদ অচলা!

অচলা মুখ না তুলিয়া অবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বাবা, ওঁকে তুমি চুপ করতে বল। আমরা গাছতলায় থাকি, সে-ও ঢের ভালো, কিন্তু ওঁর যা নিয়েচ, তুমি ফিরিয়ে দাও—

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, গাছতলায়! একদিন তাও তোমাদের জুটবে না তা বলে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সেদিন আমাকে স্মরণ ক'রো, বলিয়া প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, উঃ, কি ভয়ানক লোক! এমন জানলে আমি কি ওকে বাড়ি ঢুকতে দিতুম!

পিতার কথা অচলার কানে গেল, কিন্তু সে কিছুই বলিল না, উপুড় হইয়া পড়িয়া যেমন করিয়া কাঁদিতেছিল, তেমনি একভাবে পড়িয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে লাগিল। অদূরে চৌকির উপর বসিয়া কেদারবাবু সমস্ত দেখিতে

লাগিলেন ; কিন্তু সান্ত্বনার একটা কথা উচ্চারণ করিতেও আর তাঁহার সাহস হইল না। সন্ধ্যা হইয়া গেল। বেয়ারা আসিয়া গ্যাস জ্বালাইবার উপক্রম করিতেই অচলা নিঃশব্দে উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কিন্তু মহিম ইহার কিছুই জানিল না। শুধু যেদিন কেদারবাবু অত্যন্ত অবলীলা-ক্রমে কন্যার সহিত তাহার বিবাহের সম্মতি দিলেন, সেই দিনটায় সে কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বলের মত স্তব্ধ হইয়া রহিল। অনেক প্রকারের অনেক কথা, অনেক সংশয় তাহার মনে উদয় হইল বটে, কিন্তু তাহার এই সৌভাগ্যের সুরেশ নিজেই যে মূল কারণ, ইহা তাহার সুদূর কল্পনায়ও উদয় হইল না। অচলার প্রতি স্নেহে, প্রেমে, কৃতজ্ঞতায় তাহার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ; কিন্তু চিরদিনই সে নিঃশব্দ প্রকৃতির লোক ; আবেগ উচ্ছ্বাস কোনদিন প্রকাশ করিতে পারিত না, পারিলেও হয়ত তাহার মুখে নিতান্তই তাহা একটা অপ্রত্যাশিত, অসংলগ্ন আচরণ বলিয়া লোকের চোখে ঠেকিত। বরঞ্চ, আজ সন্ধ্যার সময় যখন সে একাকী কেদারবাবুর সহিত দুই-চারিটা কথাবার্ত্তার পর বাসায় ফিরিয়া গেল ; তখন অন্যান্য দিনের মত অচলার সহিত দেখা করিয়া তাহাকে একটা ছোট্ট নমস্কার পর্য্যন্ত করিয়া যাইতে পারিল না। কথাটা কেদারবাবু নিজেই পাড়িয়াছিলেন। প্রসঙ্গ উত্থাপন হইতে সুরু করিয়া সম্মতি দেওয়া—মায় দিন-স্থির পর্য্যন্ত, একাই সব করিলেন। কিন্তু সমস্তটাই যেন অনন্যোপায় হইয়াই করিলেন ; মুখে তাঁহার স্ফূর্ত্তি বা উৎসাহের লেশমাত্র চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। তথাপি দিন কাটিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ বিবাহের দিন আসিল।

পরশু বিবাহ। কিন্তু মেয়ের বিবাহে তিনি কোনরূপ ধুমধাম হৈ-চৈ করিবেন না —স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া, আগামী শুভকর্ম্মের আয়োজনটা যতটা নিঃশব্দে হইতে পারে তার ত্রুটি করেন নাই।

আজও বিকেলবেলা তিনি যথাসময়ে চা খাইতে বসিয়াছিলেন। একটা সেলাই লইয়া অচলা অনতিদূরে কোচের উপর বসিয়াছিল। অনেকদিন অনেক দুঃখের মধ্যে দিন-যাপন করিয়া আজ কয়েকদিন হইতে তাহার মনের উপর যে শান্তিটুকু স্থিতিলাভ করিয়াছিল, তাহারই ঈষৎ আভাসে তাহার পাণ্ডুর মুখখানি ম্লান জ্যোৎস্নার মতই স্নিগ্ধ বোধ হইতেছিল। চা খাইতে খাইতে মাঝে মাঝে কেদারবাবু ইহাই লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। কলহ করিয়া সুরেশ চলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত, এতদিন তিনি মন-মরাভাবেই দিন-যাপন করিতেছিলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া কি করিবে, না করিবে—এই এক দুশ্চিন্তা ; তা ছাড়া তাঁহার নিজের কর্ত্তব্যই বা এসম্বন্ধে কি—হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দেওয়া বা টাকাটা পরিশোধ করিতে আর কোথাও চেষ্টা করা, কিংবা মহিমের উপর দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়া—কি যে করা যায়, তাহা ভাবিয়া

ভাবিয়া কোন কূল-কিনারাই দেখিতেছিলেন না। অথচ একটা কিছু করা নিতান্তই আবশ্যক—সুরেশের নিরুদ্দেশ অবস্থার উপর বরাত দিয়া যে চিরদিন চলিবে না, অথবা মেয়ের মত নিজের খেয়ালে মগ্ন হইয়া, চোখ বুজিয়া থাকিলেই যে বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারা যাইবে না, তাহাও হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছিলেন। হতাশ-প্রেমিক একদিন যে চাঙ্গা হইয়া উঠিবে এবং সেদিন ফিরিয়া আসিয়া কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র করিয়া মস্ত হাঙ্গামা বাধাইয়া দিবে এবং যে টাকাটা চেকের দ্বারা তাঁহাকে দিয়াছে—তাহা আর কোন লেখাপড়া না থাকা সত্ত্বেও যে আদালতে উড়াইতে পারা যাইবে না, ভাবিয়া ভাবিয়া এ-বিষয়ে একপ্রকার তিনি নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু, মেয়ের সহিত এ-বিষয়ে একটা পরামর্শ করিবার পর্য্যন্ত জো ছিল না। সুরেশের নামোল্লেখ করিতেও তাঁহার ভয় করিত। এখন অচলার ওই শান্ত স্থির মুখচ্ছবির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার ভারি একটা চিত্তজ্বালার সহিত কেবল মনে হইতে লাগিল, এই মেয়েটাই তাঁহার সকল দুঃখের মূল। অথচ, কি সুবিধাই না হইয়াছিল, এবং অদূর-ভবিষ্যতে আরও কি হইতে পারিত!

যে নিষ্ঠুর কন্যা পিতার বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার সুখ-দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করিল না, সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল, সেই স্বার্থপর সন্তানের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রচ্ছন্ন ক্রোধ অভিশাপের মত যখন তখন প্রায় এই কামনাই করিত—সে যেন ইহার ফল ভোগ করে, একদিন যেন তাহাকে কাঁদিয়া বলিতে হয়, "বাবা, তোমার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি আমি পাইতেছি।" পাত্র হিসাবে সুরেশ যে মহিমের অপেক্ষা অসংখ্য গুণে অধিক বাঞ্ছনীয়, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার সম্পর্ক হইতে বিচ্যুত হওয়াটাকে তিনি গভীর ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতেছিলেন। মনে মনে তাহার উপর তাঁহার ক্রোধ ছিল না। এত কাণ্ডের পরও যদি আজ আবার তাহাকে ফিরিয়া পাইবার পথ থাকিত, উপস্থিত বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে বোধ করি লেশমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। কিন্তু কোন উপায় নাই—কোন উপায় নাই! অচলার কাছে তাহার আভাসমাত্র উত্থাপন করাও অসাধ্য।

সেলাই করিতে করিতে অচলা সহসা মুখ তুলিয়া বলিল, বাবা, সুরেশবাবুর ব্যাপারটা পড়লে?

অচলার মুখে সুরেশের নাম! কেদারবাবু চমকিয়া চাহিলেন। নিজের কানকে তাঁহার বিশ্বাস হইল না। সকালের খবরের কাগজটা টেবিলের উপর পড়িয়াছিল; অচলা সেটা তুলিয়া লইয়া পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল। কাগজখানার স্থানে স্থানে তিনি সকালবেলায় চোখ বুলাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু অপরের সংবাদ খুঁটিয়া জানিবার মত আগ্রহাতিশয্য তাঁহার মনের মধ্যে এখন আর ছিল না। কহিলেন, কোন্ সুরেশ?

অচলা সংবাদপত্রের সেই স্থানটা খুঁজিতে খুজিতে বলিল, বোধ করি, ইনি আমাদেরই সুরেশবাবু।

কেদারবাবু বিস্ময়ে দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমাদের সুরেশবাবু? কি করেচেন তিনি? কোথায় তিনি?

অচলা উঠিয়া আসিয়া সংবাদপত্রের সেই স্থানটি পিতার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, পড়ে দেখ না বাবা।

কেদারবাবু চশমার জন্য পকেট হাতড়াইয়া বলিলেন, চশমাটা হয়ত আমার ঘরেই ফেলে এসেচি। তুমি পড় না মা, ব্যাপারটা কি শুনি?

অচলা পড়িয়া শুনাইল, ফয়জাবাদ সহরের জনৈক পত্রপেরক লিখিতেছেন, সেদিন সহরের দরিদ্র-পল্লীতে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে! একে প্লেগ, তাহাতে এই দুর্ঘটনায় দুঃখী লোকের দুঃখের আর পরিসীমা নাই। কিছুদিন হইতেই সুরেশ নামে একটি ভদ্র যুবক এখানে আসিয়া অর্থ দিয়া, ঔষধ-পথ্য দিয়া, নিজের দেহ দিয়া রোগীর সেবা করিতেছিলেন। বিপদের সময় তিনি উপস্থিত হইয়া শুনিতে পান, রোগশয্যায় পড়িয়া কোন স্ত্রীলোক একটি প্রজ্বলিত গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে—তাহাকে উদ্ধার করিবার আর কেহ নাই।

সংবাদদাতা অতঃপর লিখিয়াছেন, ইহার প্রাণরক্ষা করিতে কি করিয়া এই অসমসাহসী বাঙালী যুবক নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া জলন্ত অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি—

পড়া শেষ হইয়া গেল। কেদারবাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কিন্তু এ কি আমাদের সুরেশ বলেই তোমার মনে হয়?

অচলা শান্তভাবে বলিল, হাঁ বাবা, ইনি আমাদেরই সুরেশবাবু।

কেদারবাবু আর একবার চমকিয়া উঠিলেন। বোধ করি, নিজের অজ্ঞাতসারেই অচলার মুখ দিয়া এই 'আমাদেরই' কথাটার উপর একবার একটা অতিরিক্ত জোর প্রকাশ পাইয়াছিল। হয়ত সে শুধু একটা নিশ্চিত বিশ্বাস জানাইবার জন্যই, কিন্তু কেদারবাবুর বুকের মধ্যে তাহা আর একভাবে বাজিয়া উঠিল; এবং মজ্জমান ব্যক্তি যেভাবে তৃণ অবলম্বন করিতে দুই বাহু বাড়াইয়া দেয়, ঠিক তেমনি করিয়া বৃদ্ধ পিতা কন্যার মুখের এই একটিমাত্র কথাকেই নিবিড় আগ্রহে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। এই একটি কথাই তাঁহার কানে কানে, চক্ষের নিমিষে কত কি অসম্ভব সম্ভাবনার দ্বারোদ্ঘাটনের সংবাদ শুনাইয়া গেল, তাহার সীমা রহিল না। তাঁহার মুখখানা আজ এতদিন পরে অকস্মাৎ আশার আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, আচ্ছা মা, তোমার কি মনে হয় না—

পিতাকে সহসা থামিতে দেখিয়া অচলা মুখপানে চাহিয়া কহিল, কি মনে হয় না বাবা?

কেদারবাবু সাবধানে অগ্রসর হইবার জন্য মুখের কথাটা চাপিয়া গিয়া বলিলেন, তোমার কি মনে হয় না যে, সুরেশ যে ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করে গেল, তার জন্য সে বিশেষ অনুতপ্ত?

অচলা তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল, আমার তা নিশ্চয় মনে হয় বাবা।

কেদারবাবু প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, নিশ্চয়! নিশ্চয়! একশ' বার। তা না হলে সে এভাবে পালাত না—কোথাকার একটা তুচ্ছ স্ত্রীলোককে বাঁচাতে আগুনের মধ্যে ঢুকত না। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, সে শুধু অনুতাপে দগ্ধ হয়েই নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে গিয়েছিল। সত্য কি না বল দেখি মা!

অচলা পিতার ঠিক জবাবটা এড়াইয়া গিয়া ধীরে ধীরে কহিল, শুনেচি, পরকে বাঁচাতে এইরকম আরও দু' একবার তিনি নিজের প্রাণ বিপদাপন্ন করেছিলেন।

কথাটা কেদারবাবুর তেমন ভাল লাগিল না। বলিলেন, সে আলাদা কথা অচলা। কিন্তু এ যে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া! এ যে নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা! দুটোর মধ্যে প্রভেদ দেখতে পাচ্চ না?

অচলা আর প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, তা বটে। কিন্তু যারা মহৎপ্রাণ, তাঁদের যে কোন অবস্থাতেই, পরের বিপদে নিজের বিপদ মনে থাকে না—

কেদারবাবু উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলেন। দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, ঠিক, ঠিক! তাই ত তোকে বলচি অচলা—সে একটা মহৎপ্রাণ। একেবারে মহৎপ্রাণ! তার সঙ্গে কি আর কারো তুলনা চলে! এত লোক ত আছে, কিন্তু কে কাকে পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা একটা কথায় ফেলে দিতে পারে, বল দেখি! সে যাই কেন না করে থাক্, বড় দুঃখেই করে ফেলেছে—এ আমি তোমাকে শপথ করে বলতে পারি।

কিন্তু শপথের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। এ সত্য অচলা নিজে যত জানিত, তিনি তাহার শতাংশের একাংশও জানিতেন না। কিন্তু জবাব দিতে পারিল না—নিমিষের লজ্জা পাছে তাহার মুখে ধরা পড়ে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘাড় হেঁট করিয়া মৌন হইয়া রহিল। কিন্তু বৃদ্ধের সতৃষ্ণ-দৃষ্টির কাছে তাহা ফাঁকি পড়িল না। তিনি পুলকিত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন, মানুষ ত দেবতা নয়—সে যে মানুষ! তার দেহ দোষে-গুণে জড়ানো; কিন্তু তাই বলে ত তার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের উত্তেজনাকে তার স্বভাব বলে ধরে নেওয়া চলে না! বাইরের লোক যে যা ইচ্ছে বলুক অচলা, কিন্তু আমরাও যদি এইটেকেই দোষ বলে বিচার করি, তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ থাকে কোন্‌খানে বল দেখি? বড়লোক ত ঢের আছে, কিন্তু এমন করে দিতে

জানে কে? কি লিখেচে ওইখানটায় আর একবার পড় দেখি মা! আগুনের ভেতর থেকে তাকে নিরাপদে বার করে নিয়ে এল? উঃ কি মহৎপ্রাণ! দেবতা আর বলে কাকে! বলিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

অচলা তেমনি নিরুত্তর অধোমুখে বসিয়া রহিল।

কেদারবাবু ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, আমাদের একখানা টেলিগ্রাফ করে কি তার খবর নেওয়া উচিত নয়? তার এ বিপদের দিনেও কি আমাদের অভিমান করা সাজে?

এবার অচলা মুখ তুলিয়া কহিল, কিন্তু আমরা ত তাঁর ঠিকানা জানিনে বাবা।

কেদারবাবু বলিলেন, ঠিকানা! ফয়জাবাদ সহরে এমন কেউ কি আছে যে আমাদের সুরেশকে আজ চেনে না? তার ওপর আমার রাগ খুবই হয়েছিল, কিন্তু এখন আর আমার কিছু মনে নেই! একখানা টেলিগ্রাম লিখে এখ্‌খুনি পাঠিয়ে দাও মা; আমি তার সংবাদ-জানবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেচি।

এখুনি দিচ্চি বাবা, বলিয়া সে একখানা টেলিগ্রাফের কাগজ আনিতে ঘরের বাহির হইয়া একেবারে সুরেশের সম্মুখেই পড়িয়া গেল।

অন্তরে গভীর দুঃখ বহন করার ক্লান্তি এত শীঘ্র মানুষের মুখকে যে এমন শুষ্ক, এমন শ্রীহীন করিয়া দিতে পারে, জীবনে আজ অচলা এই প্রথম দেখিতে পাইয়া চমকাইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তার পরে সে-ই কথা কহিল। বলিল, বাবা বসে আছেন; আসুন, ঘরে আসুন। ফয়জাবাদ থেকে কবে এলেন? ভাল আছেন আপনি?

অজ্ঞাতসারে তাহার কণ্ঠস্বরে যে কতখানি স্নেহের বেদনা প্রকাশ পাইল, তাহা সে নিজে টের পাইল না; কিন্তু সুরেশ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল; কিন্তু তবুও আজ সে তাহার বিগত দিনের কঠোর শিক্ষাকে নিষ্ফল হইতে দিল না। সেই দুটি আরক্ত পদতলে তৎক্ষণাৎ জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া, তাহার অগাধ দুষ্কৃতির সমস্তটুকু নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিবার দুর্জ্জয় স্পৃহাকে আজ সে প্রাণপণ বলে নিবারণ করিয়া লইয়া, সসম্ভ্রমে কহিল, আমার ফয়জাবাদে থাকবার কথা আপনি কি করে জানলেন?

অচলা তেমনি স্নেহার্দ্রস্বরে বলিল, খবরের কাগজে এইমাত্র দেখে বাবা আমাকে টেলিগ্রাফ করতে বলছিলেন। আপনার জন্যে তিনি বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন—আসুন, একবার তাঁকে দেখে যাবেন, বলিয়া সে ফিরিবার উপক্রম করিতেই সুরেশ বলিয়া উঠিল, তিনি হয়ত পারেন; কিন্তু তুমি আমাকে কি করে মাপ করলে অচলা?

অচলার ওষ্ঠাধারে একটুখানি হাসির আভা দেখা দিল। কহিল, সে প্রয়োজনই আমার হয়নি। আমি একটি দিনের জন্যেও আপনার ওপর রাগ করিনি—আসুন ঘরে আসুন।

১৩

সুরেশ যখন জানাইল, সে মহিমের পত্রে বিবাহের সংবাদ পাইয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছে, তখন কেদারবাবু লজ্জায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু অচলার মুখের ভাবে কিছুই প্রকাশ পাইল না।

সুরেশ বলিল, মহিমের বিবাহে আমি না এলেই ত নয়, নইলে আরও কিছুদিন হাসপাতালে থেকে গেলেই ভাল হ'ত।

কেদারবাবু উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হাসপাতালে কেন সুরেশ, সেরকম ত কিছু—

সুরেশ বলিল, আজ্ঞে না, সে-রকম কিছু নয়—তবে, দেহটা ভাল ছিল না।

কেদারবাবু সুস্থির হইয়া বলিলেন, ভগবানকে সেজন্য শতকোটি প্রণাম করি। অচলা যখন খবরের কাগজ থেকে তোমার অলৌকিক কাহিনী শোনালে সুরেশ, তোমাকে বলব কি—আনন্দে, গর্ব্বে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। মনে মনে বললুম, ঈশ্বর! আমি ধন্য যে—আমি এমন লোকেরও বন্ধু! বলিয়া দু'হাত জোড় করিয়া কপালে স্পর্শ করিলেন। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, কিন্তু, তাও বলি বাবা, নিজের প্রাণ বারংবার এমন বিপদাপন্ন করাই কি উচিত? একটা সামান্য প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে এত বড় একটা মহৎপ্রাণই যদি চলে যেত, তাতে কি সংসারের ঢের বেশী ক্ষতি হ'ত না?

ক্ষতি আর কি হ'ত! বলিয়া সলজ্জভাবে মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইল, অচলা নির্নিমেষ-চক্ষে এতক্ষণ তাহারই মুখের পানে চাহিয়াছিল—এখন দৃষ্টি আনত করিল।

কেদারবাবু বারংবার বলিতে লাগিলেন, এমন কথা মুখে আনাও উচিত নয়; কারণ আপনার লোকেদের এতে যে কত বড় ব্যথা বুকে বাজে তার সীমা নেই।

সুরেশ হাসিতে লাগিল; কহিল, আপনার লোক আমার ত কেউ নেই কেদারবাবু! থাকবার মধ্যে আছেন শুধু পিসিমা,—আমি গেলে সংসারে তাঁরই যা কিছু কষ্ট হবে।

তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও তাহার কেহ নাই শুনিয়া কেদারবাবুর শুষ্ক চক্ষু সজল হইয়া উঠিল; বলিলেন, শুধু কি পিসিমাই দুঃখ পাবেন সুরেশ! তা নয় বাবা,

এ বুড়োও বড় কম শোক পাবে না। তা সে যাক, অন্ততঃ আমি যে ক'টা দিন বেঁচে আছি, সে ক'টা দিন নিজের শরীরের একটু যত্ন রেখো সুরেশ, এই আমার একান্ত অনুরোধ।

ঘড়িতে রাত্রি দশটা বাজিল। বাড়ি ফিরিবার উদ্যোগ করিয়া সুরেশ হঠাৎ হাত জোড় করিয়া বলিল, আমার একটা প্রার্থনা আছে কেদারবাবু, মহিমের বিয়ে ত আমার ওখান থেকেই হবে স্থির হয়েচে; কিন্তু সে ত পরশু। কাল রাত্রেও এই অধমের বাড়িতেই একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে—নইলে বিশ্বাস হবে না যে, আমি ক্ষমা পেয়েচি। বলুন, এ ভিক্ষে দেবেন? বলিয়া সে অকস্মাৎ নীচু হইয়া কেদারবাবুর পায়ের ধুলা লইতে গেল।

কেদারবাবু শশব্যস্ত হইয়া বোধ করি বা তাহাকে জোর করিয়াই নিরস্ত করিতে গিয়াছিলেন—অকস্মাৎ তাহার অস্ফুট কাতরোক্তিতে লাফাইয়া উঠিলেন। পিঠের খানিকটা দগ্ধ হওয়ায় ব্যাণ্ডেজ করা ছিল, একটা শার্ল গায়ে দিয়া এতক্ষণ সুরেশ ইহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। না, জানিয়া টানাটানি করিতে গিয়া, তিনি ব্যাণ্ডেজটাই সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এখন অনাবৃত ক্ষতের পানে চাহিয়া বৃদ্ধ সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত উঠিয়া আসিয়া অচলা ব্যাণ্ডেজ ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, ভয় কি, আমি ঠিক করে বেঁধে দিচ্চি। বলিয়া তাহাকে ওধারের সোফার উপর বসাইয়া দিয়া সযত্নে সাবধানে ব্যাণ্ডেজটা যথাস্থানে বাঁধিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল।

কেদারবাবু তাঁহার চৌকির উপর ধপ্‌ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া পড়িলেন—বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আর তাঁহার কোনরূপ সাড়া-শব্দ রহিল না। কোচের পিঠের উপর দুই কনুয়ের ভর দিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া অচলা নিঃশব্দে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অনতিকাল পরেই মুক্তার আকারে একটির পর একটি নীরবে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সুরেশ ইহার কিছুই দেখিতে পাইল না; এদিকে তাহার খেয়ালই ছিল না। সে শুধু নিমীলিতচক্ষে স্থির হইয়া বসিয়া, তাহার অসীম প্রেমাস্পদের কোমল হাত দু'খানির করুণস্পর্শ বুকের ভিতর অনুভব করিতে লাগিল।

কোনমতে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া অচলা এক সময়ে চুপি চুপি বলিল, আজ আমার কাছে আপনাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

সুরেশ ধ্যান ভাঙিয়া চকিত হইয়া উঠিল; কিন্তু সেও তেমনি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, কি প্রতিজ্ঞা?

এমন করে নিজের প্রাণ আর নষ্ট করতে পারবেন না।

কিন্তু প্রাণ ত আমি ইচ্ছে করে নষ্ট করতে চাইনে! শুধু পরের বিপদে আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—এ যে আমার ছেলেবেলার স্বভাব, অচলা।

অচলা তাহার প্রতিবাদ করিল না; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল, সুরেশ তাহা টের পাইল। বাঁধা শেষ হইয়া গেলে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল, কাল কিন্তু এ দীনের বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে—তাহার ড়'চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল; কিন্তু কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইল না।

অচলা আধোমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

সুরেশ কেদারবাবুকে নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিল, দেখবেন, আমাকে নিরাশ করবেন না যেন! বলিয়া অচলার মুখের পানে চাহিয়া, আর একবার তাহার আবেদন নিঃশব্দে জানাইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন যথাসময়ে সুরেশের গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। কেদারবাবু প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন, কন্যাকে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাত্রা করিলেন।

সুরেশের বাটীর গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেদারবাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। সে বড়লোক, ইহা ত জানা কথা; কিন্তু তাহা যে কতখানি—শুধু আন্দাজের দ্বারা নিশ্চয় করা এতদিন কঠিন হইতেছিল; আজ একেবারে সে-বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া বাঁচিলেন।

সুরেশ আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া উভয়কে গ্রহণ করিল; হাসিয়া বলিল, মহিমের গোঁ আজও ভাঙতে পারা গেল না কেদারবাবু। কাল দুপুরের আগে এ-বাড়িতে ঢুকতে সে কিছুতেই রাজি হ'লো না।

কেদারবাবু সে-কথার কোন জবাবও দিলেন না। তিনজনে বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেই একজন প্রৌঢ়া রমণী দ্বারের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া অচলার হাত ধরিয়া তাহাকে বাড়ির ভিতরে লইয়া গেলেন। তাঁহার নিজের ঘরের মেজের উপর একখানি কার্পেট বিছান ছিল, তাহারই উপর অচলাকে সযত্নে বসাইয়া আপনার পরিচয় দিলেন। বলিলেন, আমি সম্পর্কে তোমার শাশুড়ী হই বৌমা। আমি মহিমের পিসি।

অচলা প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইয়া সবিস্ময়ে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, আপনি এখানে কবে এলেন?

মহিমের যে পিসি ছিলেন, তাহা সে জানিত না। প্রৌঢ়া তাহার বিস্ময়ের কারণ অনুমান করিয়া হাসিয়া কহিলেন, আমি এইখানেই থাকি মা, আমি সুরেশের পিসি; কিন্তু মহিমও পর নয়, তাই তারও আমি পিসি হই মা।

তাঁহার স্বভাব-কোমল কণ্ঠস্বরে এমনই একটা স্নেহ ও আন্তরিকতা প্রকাশ পাইল

যে, এক মুহূর্ত্তেই অচলার বুকের ভিতরটা আলোড়িত হইয়া উঠিল। তাহার মা নাই, সে অভাব এতটুকু পূর্ণ করে, বাড়িতে এমন কোন আত্মীয় স্ত্রীলোক কোনদিন নাই। তাহার জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত এতদিন সে পিতার স্নেহেই মানুষ হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সে স্নেহ যে তাহার হৃদয়ে কতখানি খালি ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা এক মুহূর্ত্তেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল—আজ পরের বাড়ির পরের পিসিমা যখন 'বৌমা' বলিয়া ডাকিয়া তাহাকে আদর করিয়া কাছে বসাইলেন। প্রথমটা সে অভিনব সম্বোধনে একটুখানি লজ্জিত হইয়া পড়িল; কিন্তু ইহার মাধুর্য্য, ইহার গৌরব তাহার নারী-হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে বহুগুণ পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে দু'জনের কথা জমিয়া উঠিল। অচলা লজ্জিতমুখে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা পিসিমা, আমাকে যে আপনি কাছে বসালেন, কৈ ব্রাহ্ম-মেয়ে বলে ত ঘৃণা করলেন না!

পিসিমা তাড়াতাড়ি আপনার অঙ্গুলির প্রান্ত দ্বারা তাহার চুম্বন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তোমাকে ঘৃণা করব কেন মা? একটু হাসিয়া কহিলেন, আমরা হিন্দুর ঘরের মেয়ে বলে কি এমন নির্ব্বোধ, এত হীন বৌমা, যে শুধু ধর্ম্মমত আলাদা বলে তোমার মত মেয়েকেও কাছে বসাতে সঙ্কোচ বোধ করব? ঘৃণা করা ত অনেক দূরের কথা মা!

অচলা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া বলিল, আমাকে মাপ করুন পিসিমা, আমি জানতুম না। আমাদের সমাজের বাইরে কোন মেয়েমানুষের সঙ্গেই কোনদিন আমি মিশতে পাইনি; শুধু শুনেছিলুম যে, তাঁরা আমাদের বড় ঘৃণা করেন; এমন কি, একসঙ্গে বসলে দাঁড়ালেও তাঁদের স্নান করতে হয়।

পিসিমা বলিলেন, সেটা ঘৃণা নয় মা, সে একটা আচার। আমাদের বাইরের আচরণ দেখে হয়ত তোমাদের অনেক সময় এই কথাই মনে হবে, কিন্তু সত্যি বলচি মা, সত্যিকারের ঘৃণা—আমরা কাউকে করিনে। আমাদের দেশের বাড়িতে আজও আমার বাগ্দী জ্যেঠাইমা বেঁচে আছে—তাকে কত যে ভালবাসি, তা বলতে পারিনে।

একটুখানি থামিয়া বলিলেন, আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মা তোমাকে—এ কি সুরেশের মুখ থেকে শুনে, না, আজ তোমার আমাকে দেখে এ-কথা মনে পড়ল?

সুরেশের উল্লেখে অচলা ধীরে ধীরে বলিল, অনেকদিন আগে একবার তিনিও বলেছিলেন বটে।

পিসিমা বলিলেন, ঐ ওর স্বভাব। একটা কথা মনে হলে আর রক্ষে নেই—ও

তাই চারিদিকে বলে বেড়াবে। কোনদিন ব্রাহ্মদের সঙ্গে না মিশেই ও ভেবে নিলে, তাদের ও ভারি ঘৃণা করে। এই নিয়ে মহিমের সঙ্গেও ওর কতদিন ঝগড়া হবার উপক্রম হয়ে গেছে। কিন্তু আমি ত তাকে একরকম মানুষ করেছি, আমি জানি সে কাউকে ঘৃণা করে না—করবার সাধ্যও ওর নেই। এই দেখ না মা, যেদিন থেকে সে তোমাদের দেখলে, সেদিন থেকে—

কিন্তু কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না, অচলার মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় হঠাৎ মাঝখানেই থামিয়া গেলেন। তিনি তাহাদের সম্বন্ধে কতদূর জানিয়াছেন, তাহা বুঝিতে না পারিলেও অচলার সন্দেহ হইল যে, অন্ততঃ কতকটা পিসিমার অবিদিত নাই। ক্ষণকালের জন্য উভয়েই মৌন হইয়া রহিল; অচলা নিজের লজ্জাটাকে কোনমতে দমন করিয়া অন্য কথা পাড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, পিসিমা, আপনিই কি তবে সুরেশবাবুকে মানুষ করেছিলেন?

পিসিমা আবেগে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন, হাঁ মা, আমিই তাকে মানুষ করেছি। দু'বছর বয়সে ও মা-বাপ হারিয়েছিল। আজও আমার সে কাজ সারা হয়নি--আজও সে বোঝা মাথা থেকে নামেনি, কারুর দুঃখ-কষ্ট কারুর আপদ-বিপদ ও সহ্য করতে পারে না, প্রাণের আশা-ভরসা ত্যাগ করে তার বিপদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কত ভয়ে ভয়ে যে দিন-রাত থাকি বৌমা, সে তোমাকে বলতে পারিনে।

অচলা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, ফয়জাবাদের ঘটনাটা শুনেছেন?

পিসিমা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, শুনেছি বৈকি মা! ভগবানকে তাই সদাই বলি, ঠাকুর, আমি বেঁচে থাকতে যেন আমাকে আর সে দেখা দেখিয়ো না—মাথায় পা দিয়ে একেবারে আমাকে রসাতলে ডুবিয়ে দিয়ো না। এ আমি কোনমতে সহ্য করতে পারব না। বলিতে বলিতেই তাঁহার গলা ধরিয়া গেল। তাঁহার সেই মাতৃস্নেহমণ্ডিত মুখের সকাতর প্রার্থনা শুনিয়া অচলার নিজের চোখ দু'টি সজল হইয়া উঠিল, করুণকণ্ঠে কহিল, আপনি নিষেধ করে দেন না কেন পিসিমা?

পিসিমা চোখের জলের ভিতর দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, নিষেধ! আমার নিষেধে কি হবে মা? যার নিষেধে সত্যি সত্যি কাজ হবে, আমি তাকেই ত আজ কত বছর থেকে খুঁজে বেড়াচ্চি। কিন্তু সে ত যে-সে মেয়ের কাজ নয়। ওকে বাঁচাতে পারে, তেমন মেয়ে ভগবান না দিলে আমি কোথায় পাব মা?

অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মনের মত মেয়ে কি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

পিসিমা কহিলেন, ঐ যে তোমাকে বললুম মা, ভগবান না দিলে কোনদিন কেউ পায় না। যে সুরেশ কথ্‌খনো এ-কথায় কান দেয় না, সে নিজে এসে যেদিন

বললে, পিসিমা, এইবার তোমার একটি দাসী এনে হাজির করে দেব, সেদিন আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল তা মুখে জানানো যায় না। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করে বললুম, তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বাবা। সেদিন আমার কবে হবে যে, বৌ-ব্যাটা বরণ করে ঘরে তুলব। কত বললুম, সুরেশ, আমাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে আয়, কিন্তু কিছুতেই রাজি হ'ল না; হেসে বললে, পিসিমা, আশীর্ব্বাদের দিন একেবারে গিয়ে দিনস্থির করে এসো। তার পর হঠাৎ একদিন শুধু এসে বললে, সুবিধে হ'ল না পিসিমা, আমি রাত্রির গাড়িতে পশ্চিমে চললুম। কত জিজ্ঞাসা করলুম, কিসের অসুবিধে আমাকে খুলে বল, কিন্তু কোন কথাই বললে না, সেই রাত্রেই চলে গেল। মনে মনে ভাবলুম, শুধু আমার ছেলের ইচ্ছেতেই ত আর হতে পারে না—সে মেয়েরও ত জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা থাকা চাই! কি বল মা?

অচলা নীরবে ঘাড় নাড়িল। এতক্ষণে সে টের পাইল—মেয়েটি যে কে, পিসিমা তাহা জানেন না। তাহার একবার মনে হইল বটে—তাহার বুকের উপর হইতে একটা পাথর নামিয়া গেল - কিন্তু পাথরখানা যে সহজে যায় নাই, বুকের অনেকখানি স্থান ছিঁড়িয়া পিষিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা পরক্ষণেই আবার যেন স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিল।

আহারের আয়োজন হইলে পিসিমা অচলাকে আলাদা বসাইয়া খাওয়াইলেন এবং সঙ্গে করিয়া বাড়ির প্রত্যেক কক্ষ, প্রতি জিনিসপত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইয়া আনিয়া সহসা একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মা, ভগবানের আশীর্ব্বাদে অভাব কিছুরই নেই—কিন্তু এ যেন সেই লক্ষ্মীহীন বৈকুণ্ঠ। মাঝে মাঝে চোখে জল রাখতে পারিনে বৌমা!

চাকর আসিয়া খবর দিয়া গেল, বাইরে কেদারবাবু যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। অচলা প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইতেই পিসিমা তাহার একটা হাত ধরিয়া একবার একটু দ্বিধা করিয়া চুপি চুপি বলিলেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি কিছু না মনে কর মা!

অচলা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া শুধু একটুখানি হাসিল।

পিসিমা বলিলেন, সুরেশের কাছে তোমার আর মহিমের সমস্ত কথা আমি শুনতে পেয়েচি মা। তার মুখেই শুনতে পেলুম, সে গরীব বলে নাকি তোমার বাবার ইচ্ছে ছিল না। শুধু তোমার জন্যেই—

অচলা ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, সত্যি পিসিমা।

পিসিমা অকস্মাৎ যেন উচ্ছ্বসিত আবেগে অচলার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, এই ত চাই মা! যাকে ভালবেসেচ তাঁর কাছে টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত কতটুকু? মনে কোন ক্ষোভ রেখো না মা। আমি মহিমকে খুব জানি, সে এমনি

ছেলে,—যত কেন না দুঃখ তার জন্যে পাও—একদিন ভগবানের আশীর্ব্বাদে সমস্ত সার্থক হবে। তিনি এত বড় ভালবাসার কিছুতেই অমর্য্যাদা করতে পারবেন না, এ আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি।

অচলা আর একবার হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

তিনি তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, আহা, এমনি একটি বৌ নিয়ে যদি আমি ঘর করতে পেতুম!

সুরেশ আসিয়া উভয়কে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া ফিরিয়া গেল। যাবার সময় লণ্ঠনের আলোকে পলকের জন্য তাহার মুখখানা অচলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে মুখে যে কি ছিল তাহা জগদীশ্বর জানেন, কিন্তু অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল, জুড়ী-গাড়ি দ্রুতপদে পথে আসিয়া পড়িল। রাস্তার জনস্রোত তখন মন্দীভূত হইয়াছে, সেইদিকে চাহিয়া তাহার হঠাৎ মনে হইল, এতক্ষণ সে যেন একটা মস্ত স্বপ্ন দেখিতেছিল। তাহা সুখের কিংবা দুঃখের তাহা বলা শক্ত। কেদারবাবু এতক্ষণ মৌন হইয়াই ছিলেন—বোধকরি সুরেশের ঐশ্বর্য্যের চেহারাটা তাঁহার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছিল; সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হাঁ, বড়লোক বটে!

মেয়ের তরফ থেকে কিন্তু এতটুকু সাড়া পাওয়া গেল না। উৎসাহের অভাবে বাকী পথটা তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন।

গাড়ি আসিয়া যখন তাঁহার দ্বারে লাগিল এবং সহিস কবাট খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, তখন আর একবার যেন তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের মনে মনেই বলিলেন, সুরেশকে আমরা কেউ চিনতে পারিনি! একটা দেবতা!

১৪

আজ অচলার বিবাহ। বিবাহ-সভার পথে পলকের জন্য সুরেশকে দেখা গিয়াছিল। তাহার পরে সে যে কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল, সারা রাত্রির মধ্যে কেদারবাবুর বাটীতে আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

বিবাহ হইয়া গেল। দুই-একটা দিন অচলার মনের মধ্যে বিপ্লব বহিতেছিল। সেই নিমন্ত্রণের রাত্রে সুরেশের পিসিমার কথা সে কোনমতে ভুলিতে পারিতেছিল না; আজ তাহার নিবৃত্তি হইল।

মহিমের অটল গাম্ভীর্য্য আজও অক্ষুণ্ণ রহিল। আনন্দ-নিরানন্দের লেশমাত্র বাহ্য প্রকাশ তাহার মুখের উপর দেখা দিল না। তবুও শুভদৃষ্টির সময় এই মুখ

দেখিয়াই অচলার সমস্ত বক্ষ আনন্দে মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অন্তরের মধ্যে স্বামীর পদতলে মাথা পাতিয়া মনে মনে বলল,—প্রভু, আর আমি ভয় করিনে। তোমার সঙ্গে যেখানে যে অবস্থায় থাকিনে কেন, সেই আমার স্বর্গ; আজ থেকে চিরদিন তোমার কুটীরই আমার রাজপ্রাসাদ।

শ্বশুরবাটী-যাত্রার দিন কেদারবাবু জামার হাতায় চোখ মুছিয়া কহিলেন, মা, আশীর্ব্বাদ করি স্বামীর সঙ্গে দুঃখদারিদ্রর বরণ করে জীবনের পথে, কর্ত্তব্যের পথে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হও। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন। বলিয়া তেমনি চোখ মুছিতে মুছিতে পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরে, শ্রাবণের এক স্বল্পালোকিত দ্বিপ্রহরে মাথার উপর ক্ষান্ত-বর্ষণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও নীচে সঙ্কীর্ণ কর্দ্দমাচ্ছন্ন পিচ্ছিল গ্রাম্য পথ দিয়া পাল্কী চড়িয়া অচলা একদিন স্বামীগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এই পথটুকুর মধ্যেই যেন তাহার নব-বিবাহের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য তিরোহিত হইয়া গেল।

পল্লীগ্রামের সহিত তাহার ছাপার অক্ষরের ভিতর দিয়াই পরিচয় ছিল। সে পরিচয়ে দুঃখ-দারিদ্র্যের সহস্র ইঙ্গিতের মধ্যেও ছত্রে ছত্রে কবিতা ছিল, কল্পনার সৌরভ ছিল। পাল্কী হইতে নামিয়া সে বাড়ির ভিতর আসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—কোথাও কোন দিক হইতে কবিত্বের এতটুকু ইঙ্গিত তাহার হৃদয়ে আঘাত করিল না। তাহার কল্পনার পল্লীগ্রাম সাক্ষাত-দৃষ্টিতে যে এমন নিরানন্দ, নির্জ্জন—মেটে-বাড়ির ঘরগুলো যে এরূপ স্যাতসেঁতে, অন্ধকার জানালা-দরজা যে এতই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র—উপরে বাঁশের আড়া ও মাচা এত কদাকার—ইহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। এই কদর্য্য গৃহে জীবন-যাপন করিতে হইবে—উপলব্ধি করিয়া তাহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। স্বামীসুখ, বিবাহের আনন্দ সমস্তই এক মুহূর্ত্তে মায়ামরীচিকার মত তাহার হৃদয় হইতে বিলীন হইয়া গেল। বাটীতে শ্বশুর-শাশুড়ী জা-ননদ কেহই ছিল না। দূর-সম্পর্কের এক ঠান্‌দিদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বর-বধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিবার জন্য ওপাড়া হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি বিবাহের আজন্ম-পরিচিত সাজ-সজ্জার একান্ত অভাব লক্ষ্য করিয়া অব্যক্ত-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন;—অবশেষে বধূর হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরে আনিয়া বসাইয়া দিলেন। পাড়ার যাহারা বধূ দেখিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারা অচলার বয়স অনুমান করিয়া মুখ-চাওয়া-চাওয়ি, গা-টেপা-টেপি করিল এবং প্রত্যাগমনকালে তাহাদের অস্ফুট কলরবের মধ্যে 'বেম্ম' 'মেলেচ্ছ' প্রভৃতি দুই-একটা মিষ্ট কথা আসিয়াও অচলার কানে পৌঁছিল।

অনতিবিলম্বেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, কথাটা সত্য যে, মহিম ম্লেচ্ছ-কন্যা বিবাহ করিয়া আনিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে এই প্রকার একটা জনশ্রুতির কিছু কিছু

আন্দোলন ও আলোচনা হইয়া গিয়াছিল ; এখন বৌ দেখিয়া কাহারও বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না যে, যাহা রটিয়াছিল তাহা ষোল আনাই খাঁটি।

প্রতিবেশিনীরা প্রস্থান করিলে ঠান্‌দিদি আসিয়া কহিলেন, নাতবৌ, আজ তা হলে আসি দিদি। অনেকটা দূর যেতে হবে, আর ঘরে না গেলেও নয় কি না—ছোট নাতিটি—ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি অনুরোধ-উপরোধের অবকাশ মাত্র না দিয়াই চলিয়া গেলেন। তিনি যে এতক্ষণ শুধু একটা সম্বন্ধ স্মরণ করিয়াই যাইতে পারেন নাই এবং সেজন্য মনে মনে ছট ফট করিতেছিলেন, অচলা তাহা বুঝিয়াছিল। বস্তুতঃ ঠান্‌ দিদির অপরাধ ছিল না। ব্যাপারটা যে যথার্থ ই এরূপ দাঁড়াইবে তাহা জানিলে হয়ত তিনি এদিক মাড়াইতেন না। কারণ পাড়াগাঁয়ে বাস করিয়া এ-সকল জিনিসকে ভয় করে না, এত বড় বুকের পাটা পল্লী ইতিহাসে সুদুর্লভ।

ঠান্‌দিদি অন্তর্দ্ধান করিলে বাড়ির যদু চাকর উড়ে বামুন এবং কলিকাতা হইতে সদ্য আগত অচলার বাপের বাড়ির দাসী হরির মা ভিন্ন সমস্ত বিবাহের বাড়িটা শূন্য খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টির বিরাম হইয়াছিল, পুনরায় ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়িতে শুরু করিল। হরির মা কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে কহিল, এমন বাড়ি ত দেখিনি দিদি, কেউ যে কোথাও নেই—

অচলা অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, অন্যমনস্কের মত শুধু কহিল, হু—

হরির মা পুনরপি কহিল, জামাইবাবুকে ত দেখচিনে ? সেই যে একটিবার দেখা দিয়ে কোথায় গেলেন—

অচলা এ কথার জবাব দিল না।

কিন্তু এই বনজঙ্গলপরিবৃত শূন্য পুরীর মধ্যে হরির মার নিজের চিত্ত যত উদভ্রান্ত হইয়া উঠুক, অচলাকে ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়াছে। তাহাকে একটুখানি সচেতন করিবার জন্য কহিল, ভয় কি ! সত্যই ত আর জলে এসে পড়িনি ! জামাইবাবু এসে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ততক্ষণ এ-সব ছেড়ে ফেল দিদি, আমি তোরঙ্গ খুলে কাপড়-জামা বার করে দি—

এখন থাক হরির মা, বলিয়া অচলা তেমনি অধোমুখে কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। জীবনের সমস্ত স্বাদ-গন্ধ তাহার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। সেই বর্দ্ধিত-বেগ বারিধারার মধ্যে কখন যে দিনশেষের অত্যল্প আলোক নিবিয়া গেল, কখন শ্রাবণের গাঢ় মেঘাস্তীর্ণ আকাশ ভেদ করিয়া মলিন পল্লীগৃহে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, কিছুই ঠাহর হইল না শুধু আনন্দ-লেশহীন আঁধার ঘরের কোণে কোণে আর্দ্র অন্ধকার নিঃশব্দে গাঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল। যদু চাকর আসিয়া হারিকেন লণ্ঠন ঘরের মাঝখানে রাখিয়া দিল। হরির মা প্রশ্ন করিল, জামাইবাবু কোথায় গো ?

কি জানি, বলিয়া যদু ফিরিতে উদ্যত হইল। তাহার সংক্ষিপ্ত ও বিশ্রী উত্তরে হরির মা শঙ্কিত হইয়া কহিল, কি জানি কি-রকম? বাইরে তিনি নেই না কি?

না, বলিয়া যদু প্রস্থান করিল। সে যে আগন্তুকদিগের প্রতি প্রসন্ন নয়, তাহা বেশ বুঝা গেল। হরির মা অত্যন্ত ভীত হইয়া অচলার কাছে সরিয়া আসিয়া ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, রকম-সকম আমার ত ভাল ঠেকচে না দিদি! দোরে খিল দিয়ে দেবো?

অচলা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, খিল দিবি কেন?

হরির মা ছেলেবেলায় দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়াছে, আর কখন যায় নাই। পল্লীগ্রামে চোর-ডাকাত, ঠ্যাঙাড়ে প্রভৃতি গল্পের স্মৃতি ছাড়া আর সমস্তই তাহার কাছে ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছে। সে বাহিরের অন্ধকারে একটা চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অচলার গা ঘেঁষিয়া চুপি চুপি কহিল, পাড়াগাঁ, বলা যায় না দিদি। বলিতে বলিতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।

ঠিক এমনি সময়ে প্রাঙ্গণের মাঝখান হইতে ডাক আসিল, ঠান্‌দি কোথায় গো? বলিতে বলিতেই একটি কুড়ি-একুশ বৎসরের পাতলা ছিপ্‌ছিপে মেয়ে জলে ভিজিতে ভিজিতে দোরগোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল; কহিল, আগে একটা নমস্কার করে নিই ঠান্‌দি, তার পরে কাপড় ছাড়ব এখন, বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া অচলার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল, এবং লণ্ঠনটা অচলার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া চীৎকার করিয়া ডাক দিল, সেজদা, ও সেজদা—

মহিম বাটী পৌঁছিয়াই এই মেয়েটিকে নিজে আনিতে গিয়াছিল। ও-ঘর হইতে সাড়া দিল, কি রে মৃণাল?

এদিকে এসো না বলচি—

মহিম দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, কি রে?

মৃণাল লণ্ঠনের আলোকে আর একবার ভাল করিয়া অচলার মুখখানি দেখিয়া লইয়া বলিল, নাঃ—তুমিই জিতেচ সেজদা। আমাকে বিয়ে করলে ঠকে মরতে ভাই।

মহিম বাহির হইতে তাড়া দিয়া কহিল, কিছুতেই আমার কথা শুনবিনে মৃণাল? আবার এই সব ঠাট্টা? তুই কি আমার কথা শুনবিনে?

বাঃ, ঠাট্টা বৈ কি, অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, ঠান্‌দি, মাইরি বলচি ভাই, তামাসা নয়। আচ্ছা তোমার বরকেই জিজ্ঞাসা কর—আমাকে এক সময় উনি পছন্দ করেছিলেন কি না!

মহিম কহিল, তবে তুই বকে মর, আমি বাইরে চললুম।

মৃণাল কহিল, তা যাও না, তোমাকে কি ধরে রেখেচি? অচলার চিবুকটা

একবার পরম স্নেহে নাড়িয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা ভাই ঠান্‌দি, হিংসে হয় না কি? এ সংসারে আমারই ত গিন্নী হবার কথা! কিন্তু আমার মা পোড়ামুখী কি যে মন্তর সেজদার কানে ঢুকিয়ে দিলে—আমি সেজদার দু'চক্ষের বিষ হয়ে গেলুম। নইলে—ওরে যদু, ঘোষালমশাই গেলেন কোথায়।

যদু কহিল, পুকুরে হাত ধুতে গেছেন।

অ্যাঁ, এই অন্ধকারে পুকুরে? মৃণালের হাসিমুখ এক মুহূর্ত্তে দুশ্চিন্তায় ম্লান হইয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া কহিল, যা বাবা, আলো নিয়ে একবার পুকুরে। বুড়োমানুষ, এক্ষুনি কোথায় অন্ধকারে পিছলে পড়ে হাত-পা ভাঙবে।

পরক্ষণেই অচলার মুখের পানে চাহিয়া লজ্জিতভাবে হাসিয়া কহিল, কি কপাল করেছিলুম ভাই ঠান্‌দি, কোথাকার এক বাহাত্তুরে বুড়ো ধরে আমাকে দিলে—তার সেবা করতে করতে আর তাকে সামলাতে সামলাতেই প্রাণটা গেল। আচ্ছা ভাই, আগে ও-ঘর থেকে ভিজে কাপড়টা ছেড়ে আসি, তার পরে কথা হবে। কিন্তু সতীন বলে রাগ করতে পাবে না, তা বলে দিচ্চি—আর বল ত, না হয়, আমার বুড়োটাকেও তোমাকে ভাগ দেব। বলিয়া হাসির ছটায় সমস্ত ঘরটা যেন আলো করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

এই শ্রেণীর ঠাট্টা-তামাসার সহিত অচলার কোনদিন পরিচয় ঘটে নাই। সমস্ত পরিহাসই তাহার কাছে এমনি কুরুচিপূর্ণ ও বিশ্রী ঠেকিতেছিল যে, লজ্জায় সে একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। এত বড় নির্লজ্জ প্রগল্‌ভতা যে কোন স্ত্রীলোকের মধ্যে থাকিতে পারে, তাহা সে ভাবিতে পারিত না। সুতরাং সমস্ত রসিকতাই তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কারের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিতেছিল। কিন্তু তবুও তাহার মনে হইতে লাগিল, ইহার আগমনে তাহার নির্ব্বাসনের অর্দ্ধেক বেদনা যেন তিরোহিত হইয়া গেল; এবং এ কে, কোথা হইতে আসিল, তাহার সহিত কি সম্বন্ধ—সমস্ত জানিবার জন্য অচলা উৎসুক হইয়া উঠিল!

হরির মা কহিল, এ মেয়েটি কে দিদি? খুব আমুদে মানুষ।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল, হঁা।

ভিজে কাপড় ছাড়িয়া মৃণাল এ-ঘরে আসিয়া কহিল, কেবল ঠাট্টাতামাসা করেই গেলুম ঠান্‌দি, আমার আসল পরিচয়টা এখনো দেওয়া হয়নি। আর পরিচয় এমন কি-ই বা আছে? তোমার বর যিনি, তিনি হচ্ছেন আমার মায়ের বাপ। আমি তাই ছেলেবেলা থেকে সেজদামশাই বলে ডাকি। একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিল, আমার বাবা আর তোমার শ্বশুর—দুজনে ভারি বন্ধু ছিলেন। হঠাৎ একদিন গাড়ি চাপা পড়ে, ডান হাতটা ভেঙে গিয়ে বাবার যখন চাকুরী গেল, তখন তোমার শ্বশুর এই বাড়িতে তাঁদের আশ্রয় দিলেন। তার অনেক পরে আমার জন্ম

হয়। সেজদা তখন আট বছরের ছেলে! তাঁর মা তাঁর জন্ম দিয়েই মারা যান; বড় দু'ছেলে আগে ডিপথিরিয়া রোগে মারা গিয়েছিল। তাই আমার মা আসা পর্য্যন্তই হলেন এ বাড়ির গিন্নী। তার পরে বাবা গেলেন, আমরা এ-বাড়িতেই রইলুম। তার অনেক পরে তোমার শ্বশুর মারা গেলেন, আমরা কিন্তু রয়েই গেলুম। এই সবে পাঁচ বছর হ'ল পলাশীর ঘোষাল-বাড়িতে আমার বিয়ে দিয়ে সেজদা আমাকে দূর করে দিয়েছেন। মা বেঁচে থাকলেও যা হোক একটু জোর থাকত।

বড়বৌ এই ঘরে নাকি? বলিয়া একটি বৃদ্ধ-গোছের বেঁটে-খাটো গৌরবর্ণ ভদ্রলোক দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মৃণাল কহিল, এসো, এসো। অচলার পানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, ঐটি আমার কর্ত্তা ঠান্‌দি। আচ্ছা, তুমিই বল ত ভাই, ওই বাহাত্তুরে বুড়োর সঙ্গে আমাকে মানায়? এ-জন্মের রূপ-যৌবন কি সব মাটি হয়ে গেল না ভাই?

অচলা জবাব দিবে কি, লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

ভদ্রলোকটির নাম ভবানী ঘোষাল, তিনি হাসিয়া কহিলেন, বিশ্বাস করবেন না ঠান্‌দি—সব মিছে কথা। ওর কেবল চেষ্টা আমাকে খেলো করে দেয়। নইলে বয়স ত আমার এই সবে বাহান্ন কি তি—

মৃণাল কহিল, চুপ করো। এই সেজদাটি যে আমার কি শত্রু তা ভগবানই জানেন। আমাকে সব দিকে মাটি করেচেন। আচ্ছা, এই বুড়োর হাতে দেওয়ার চেয়ে, হাত পা বেঁধে কি আমায় জলে ফেলে দেওয়া ভাল হত না ঠান্‌দি? সত্যি বলো ভাই।

অচলা তেমনি আরক্ত মুখে নীরব হইয়া রহিল।

ঘোষাল ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া অচলার লজ্জানত মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সহসা একটা মস্ত আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাঁচালেন ঠান্‌দি, এ ছুঁড়ীর অহঙ্কার এতদিনে ভাঙল। রূপের দেমাকে এ চোখে-কানে দেখতেই পেত না।

স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, কেমন এইবার হ'ল ত? বনদেশে এতদিন শিয়াল রাজা ছিলে, সহরের রূপ কারে বলে এইবার চেয়ে দেখো!

মৃণাল কহিল, তা বৈকি! আমার যেখানে অহঙ্কার সেখানে ভাঙতে যায়—সাধ্যি কার? বলিয়া স্বামীর প্রতি সে যে গোপন কটাক্ষ করিল, অচলার চোখে সহসা তাহা পড়িয়া গেল।

ঘোষাল হাসিয়া বলিলেন, শুনলেন ত ঠান্‌দি—একটু সাবধানে থাকবেন, দুজনের যে ভাব, যে আসা-যাওয়া, বলা যায় না—আর আমি ত বাহাত্তুরে বুড়ো,

মাঝে থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি! নিজেরটি সামলে চলবেন— হিতৈষী বুড়োর এই অনুরোধ।

মৃণাল, তোরা কি সারারাত্রি এই নিয়েই থাকবি?

কি করব সেজদা?

একবার রান্নাঘরের দিকেও যাবিনে?

মৃণাল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, কি ভুলই হয়ে গেছে সেজদা, উড়ে বামুনটাকে আমার আগে দেখে আসা উচিত ছিল। আচ্ছা, তোমরা বাইরে যাও, আমরা যাচ্ছি।

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কে?

মৃণাল কহিল, আমি আর ঠান্‌দি। অচলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আমি যখন এসেচি, তখন এ সংসারের সমস্ত চার্জ্জ তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তবে যাবো সেজদি।

মহিম এবং ভবানী বাহিরে চলিয়া গেল। মৃণাল অচলাকে পুনরায় কহিল, আমার দু'দিন আগে আসাই উচিত ছিল। কিন্তু শাশুড়ীর হাঁপানীর জ্বালায় কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে বেরুতে পারলুম না। আচ্ছা, তুমি কাপড় ছেড়ে প্রস্তুত হও সেজদি, আমি এখ্‌খুনি ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো। বলিয়া মৃণাল রান্নাঘরের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

তখন বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছিল এবং গাঢ় মেঘ কাটিয়া গিয়া নবমীর জ্যোৎস্নায় আকাশ অনেকটা স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছিল।

রান্নার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া মৃণাল অচলার কাছে আসিয়া বসিল। তাহার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কহিল, ঠান্‌দিদির চেয়ে সেজদি ডাকটা ভালো, কি বল সেজদি?

অচলা মৃদুস্বরে কহিল, হাঁ।

মৃণাল কহিল, সম্পর্কে তুমি বড় হলেও বয়সে আমি বড়। তাই ইচ্ছে হয়, আমাকেও তুমি মৃণালদিদি বলে ডেকো, কেমন?

অচলা কহিল, আচ্ছা।

মৃণাল কহিল, আজ তোমাকে রান্নাঘর দেখিয়ে আনলুম, কিন্তু কাল একেবারে ভাঁড়ারের চাবি আঁচলে বেঁধে দেব, কেমন?

অচলা কহিল, চাবিতে আমার কাজ নেই ভাই।

মৃণাল হাসিয়া কহিল, কাজ নেই? বাপ্‌রে, ও কি কথা! ভাঁড়ারটা কি তুচ্ছ জিনিস সেজদি যে, বলচ—তার চাবিতে কাজ নেই? গিন্নীর রাজত্বের ওই ত হ'ল রাজধানী গো।

অচলা কহিল, হোক রাজধানী, তাতে আমার লোভ নেই। কিন্তু তোমার ওপর আমার ভারি লোভ। শীগ্‌গির ছেড়ে দিচ্চিনে মৃণালদিদি।

মৃণাল দুই বাহু বাড়াইয়া অচলাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, সতীনকে ঝাঁটা মেরে বিদায় না করে, ঘরে ধরে রাখতে চাও—এ তোমার কি রকম বুদ্ধি সেজদি?

অচলা আস্তে আস্তে বলিল, তোমার এই ঠাট্টাগুলো আমার ভাল লাগলো না ভাই। আচ্ছা এ-দেশে সবাই কি এই রকম করে তামাসা করে?

মৃণাল খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, না গো ঠান্‌দি, করে না! এ শুধু আমি করি, সবাই এ জিনিস পাবে কোথায় যে করবে?

অচলা কহিল, পেলেও আমরা মুখে আনতে পারিনে ভাই। আমাদের কলকাতার সমাজে অনেকে হয়ত ভাবতে পর্য্যন্ত পারে না যে, কোন ভদ্রমহিলা এসব মুখে উচ্চারণ করতে পারে।

মৃণাল কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না। বরঞ্চ জোর করিয়া অচলাকে আর একবার জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তোমাদের সহরের ক'জন ভদ্রমহিলা আমার মত এমন করে জড়িয়ে ধরতে পারে, বল ত সেজদি? সবাই বুঝি সব কাজ পারে? এই ত তোমাকে কতক্ষণই বা দেখেচি, এর মধ্যেই মনে হচ্ছে, আমার বোন ছিল না, একটি ছোট বোন পেলুম। আর এ শুধু কথার কথা নয়, সারাজীবন ধরে আমাকে এর প্রমাণ যোগাতে হবে—তা মনে রেখো। এখানে আর ঠাট্টা-তামাসা চলবে না।

অচলা শিক্ষিতা মেয়ে। এই পল্লীগ্রামের বিরুদ্ধসমাজের মধ্যে তাহার ভবিষ্যৎ-জীবন যে কিভাবে কাটিবে, তাহা বাটীতে পা দিয়াই সে বুঝিয়া লইয়াছিল। এ সুযোগ সে সহজে ছাড়িয়া দিল না। পরিহাসকে গাম্ভীর্য্যে পরিণত করিয়া কহিল, মৃণালদিদি, সত্যই কি এর প্রমাণ তুমি সারা জীবন-ভোর যোগাতে পারবে?

মৃণাল বলিল, আমরা ত সহরের মহিলা নই ভাই—যোগাতে হবে বৈ কি! যে সত্যি তোমাকে ছুঁয়ে করে ফেললুম সে ত মরে গেলেও আর উল্টোতে পারব না।

অচলা এ কথার আর অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া অন্য কথা পাড়িল; হাসিয়া কহিল, শীগ্‌গির পালাবে না, তাও অমনি বল!

মৃণাল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, বোকা পেয়ে বুঝি ক্রমাগত ফাঁস জড়াতে চাও সেজদি? কিন্তু সে ত আগেই বলেচি ভাই, ভাল করে চার্জ্জ বুঝিয়ে না দিয়ে পালাব না।

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, চার্জ্জ নেবার আমার এক তিল আগ্রহ নেই।

মৃণাল বলিল, সেইটে আমি করে দিয়ে তবে যাবো, কিন্তু বেশিদিন আমার ত বাড়ি ছেড়ে থাকবার জো নেই ভাই! জান ত, কত বড় সংসারটি আমার মাথার ওপর।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, জানিনে!

মৃণাল আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সেজদা আমার কথা তোমাকে আগে বলেন নি!

অচলা কহিল, না, কোনদিন নয়। তাঁর বাড়ি-ঘর সম্বন্ধে সব কথাই আমাকে জানিয়েছিল; কিন্তু যা সকলের আগে জানানো উচিত ছিল সেই তোমার কথাই কেন যে কখনো বলেননি, আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে মৃণালদিদি।

মৃণাল অন্যমনস্কের মত বলিল, তা বটে।

অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্গে বুঝি ওঁর প্রথম বিয়ের কথা হয়?

মৃণাল তখনও অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল, কহিল, হাঁ।

অচলা কহিল, তবে হ'ল না কেন? হলেই ত বেশ হ'ত।

এতক্ষণে কথাটা মৃণালের কানের ভিতর গিয়া ঘা দিল। সে অচলার মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া বলিল, সে হবার নয় ব'লে হ'ল না।

অচলা তথাপি প্রশ্ন করিল, হবার বাধা কি ছিল? তুমি ত আর সত্যিই তাঁর কোন আত্মীয়া নও? তা ছাড়া, ছেলেবেলায় যে ভালবাসা জন্মায় তাকে উপেক্ষা করাও ত ভালো কাজ নয়?

তাহার প্রশ্নের ধরণে মৃণাল হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্থির-দৃষ্টিতে অচলার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, এ সব কি তুমি খুঁজে বেড়াচ্চ সেজদি? তুমি কি মনে কর, ছেলেবেলার সব ভালবাসারই শেষ ফল এই। না, মানুষে বিয়ে দেবার মালিক? এ শুধু এ-জন্মের নয় সেজদি, জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ! আমি যাঁর চিরকালের দাসী, তাঁর হাতে তিনি সঁপে দিয়েচেন। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কি যায় আসে!

অচলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, সে ঠিক কথা মৃণালদিদি—আমি তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম—

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না, সমস্ত মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। মৃণালের কাছে তাহা অগোচর রহিল না। সে অচলার হাতখানি সস্নেহে মুঠার মধ্যে লইয়া বলিল, সেজদি, তুমি শুধু সেদিন স্বামী পেয়েচ, কিন্তু আমি এই পাঁচ বছর ধরে তাঁর সেবা করচি। আমার এই কথাট শুনো ভাই, স্বামীর এই দিকটা কোনদিন নিজের বুদ্ধির জোরে আবিষ্কার করবার চেষ্টা ক'রো না। তাতে বরং ঠকাও ঢের ভাল, কিন্তু জিতে লাভ নেই।

যদু বাহির হইতে কহিল, দিদি, বাবুদের খাবার জায়গা হয়েচে।

আচ্ছা চল, আমি যাচ্চি, বলিয়া মৃণাল হঠাৎ দুই হাত বাড়াইয়া অচলার মুখখানা কাছে টানিয়া আনিয়া একটু চুমা খাইয়া দ্রুতপদে উঠিয়া গেল।

১৫

ওগো সেজদি!

অচলা পাশের ঘর হইতে ব্যস্ত হইয়া এ-ঘরে আসিয়া পড়িল।

মৃণালের কোমরে আঁচল জড়ানো—সে একটা ছোট দেরাজ একলাই টানা-টানি করিয়া সোজা করিয়া রাখিতেছিল। অচলা ঘরে ঢুকিতেই, সে মহা রাগতভাবে চেঁচাইয়া উঠিল, ওরে মুখপোড়া মেয়ে, তুমি নবাবের মত হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে, আর আমি তোমার শোবার ঘর গুছিয়ে দেব? নাও বলছি ওই ঝাঁটাটা তুলে—ঐ কোণটা পরিষ্কার করে ফেল। বলিয়া হাসি আর চাপিতে না পারিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চেঁচামেচি শুনিয়া হরির মা'ও পিছনে পিছনে আসিয়াছিল, সে কহিল, তোমার এক কথা দিদি! বাড়িতে কত গণ্ডা দাসদাসী—দিদিমণির কি কোনদিন ঝাঁটা হাতে করা অভ্যাস আছে না কি, যে, আজ পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মত ঘর ঝাঁট দিতে যাবে? আমি দিচ্চি, বলিয়া ঝাঁটাটা তুলিতে যাইতেছিল,—মৃণাল কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, তুই থাম মাগী। দিদিমণিকে আমার চেয়ে তুই বেশি চিনিস নাকি যে, সালিসি করতে এসেচিস্? বলিয়া অচলার হাতের মধ্যে ঝাঁটা গুঁজিয়া দিয়া হরির মাকে হাসিয়া বলিল, ওরে, তোর দিদিমণি ইচ্ছে করলে যে কাজ করতে পারে, তা তোর সাতগণ্ডা পাড়াগেঁয়ের মেয়েতে পারে না। অচলাকে কহিল, নাও ত সেজদি, ঐ কোণটা চট্ করে ঝেড়ে ফেল ত।

অচলা ঝাঁট দিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিল, মৃণালদিদি, তুমি যাদুবিদ্যে জানো, না?

মৃণাল কহিল, কেন বল দেখি?

অচলা বলিল, তা নইলে এই বাড়ি পরিষ্কার করবার জন্য ঝাঁটা হাতে নিয়েছি, এ ভোজবিদ্যে নয় ত কি?

মৃণাল কহিল, তুমি নেবে না ত কে নেবে গো? তোমার বাড়ি ঝাঁট পাট দেবার জন্যে কি ওপাড়া থেকে পদির মাসি আসবে না কি? নাও, কথা কয়ে সময় নষ্ট করতে হবে না, সন্ধ্যা হয়।

অচলা কাজ করিতে করিতে হাসিয়া কহিল, নিজেও এক দণ্ড বসে না, আমাকেও খাটিয়ে খাটিয়ে মারলে, সত্যি বলচি মৃণালদিদি, এই পাঁচ-ছ'দিন যে খাটান্ আমাকে খাটিয়েচ, চা-বাগানের কর্তারাও বোধকরি তাদের কুলিদের এত করে খাটায় না।

মৃণাল কাছে আসিয়া তাহার চিবুকের উপর আঙুলের একটা ঘা দিয়া বলিল,

তাই ত, ঘর-দোর দেখে মনে হচ্ছে, বাড়িতে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েচে, খাটুনি বলছিস্ ভাই সেজদি—যেদিন স্বামী-পুত্র ঘর-কন্না নিয়ে নাবার-খাবার সময় পাবে না, শুধু তখুনি এই মেয়েমানুষ-জন্মটা সার্থক হবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, একদিন যেন তোমার সেদিন আসে—এখুনি খাটুনির হয়েচে কি গিন্নি। বলিয়া হাসিতে গেল বটে, কিন্তু তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া গেল।

হরির মা হঠাৎ ভ্যাক্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, সেই আশীর্ব্বাদ কর দিদি, শুধু সেই আশীর্ব্বাদই কর। তাহার অচলার মাকে মনে পড়িয়া গিয়াছিল—সেই সাধ্বী অত্যন্ত অসময়ে যখন স্বর্গারোহণ করেন, তখন একরত্তি মেয়েকে হরির মায়ের হাতেই সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সেই মেয়ে এখন এতবড় হইয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে।

মৃণাল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, আ মর্! ছিচ্ কাঁদুনি মাগী কাঁদিস্ কেন?

হরির মা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কাঁদি কি সাধে দিদি। তোমার কথা শুনে কান্না যে কিছুতে ধরে রাখতে পারিনে। মাইরি বলচি, তুমি না এসে পড়লে এ-বাড়িতে একটা রাতও যে আমাদের কি করে কাটত, তা আমি ভেবে পাইনে।

আজ ছয়দিন হইল মৃণাল এ-বাটীতে আসিয়াছে। আসিয়া পর্য্যন্ত বাড়ি-ঘর-দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষগুলোর পর্য্যন্ত চেহারা বদলাইয়া দিবার কার্য্যেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার সব কাজ-কর্ম্ম, হাসি-ঠাট্টার মধ্যে হইতে একটা যাই যাই ভাব অচলাকে পীড়া দিতেছিল। কারণ মৃণালের কাজে কথায়, আচারে-ব্যবহারে এত বড় একটা সহজ আত্মীয়তা ছিল, যাহার আড়ালে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইয়া অচলা উঁকি মারিয়া তাহার নূতন জীবনের অচেনা ঘর-কন্নাকে চিনিয়া লইবার সময় পাইতেছিল এবং ইহার চেয়েও একটা বড় জিনিসকে তাহার ভাল করিয়া এবং বিশেষ করিয়া চিনিবার কৌতূহল হইয়াছিল, সে স্বয়ং মৃণালকে। তাহার সাংসারিক অবস্থা যে স্বচ্ছল নহে, তাহা তাহার সম্পূর্ণ অলঙ্কার-বর্জ্জিত হাত দুখানির পানে চাহিলেই টের পাওয়া যায়। তাহাতে ভগ্ন-স্বাস্থ্য বৃদ্ধ স্বামী—কোন দিক দিয়াই যাহাকে তাহার উপযুক্ত বলিয়া অচলার মনে হয় না; তাহার উপর বাড়িতে পরিশ্রমের অন্ত নাই—জরাজীর্ণ শাশুড়ী মর মর অবস্থায় অহর্নিশ গলায় ঝুলিতেছে; কারণে অকারণে তাহার বকুনি-ঝকুনির বিরাম নাই—এ কথা সে মৃণালের নিজের মুখেই শুনিয়াছে—অথচ কোন প্রতিকূলতাই যেন দুঃখ দিয়া এই মেয়েটিকে তাহার জীবন-যাত্রার পথে অবসন্ন করিয়া বসাইয়া দিতে পারে না। হৃদয়ের আনন্দ-নিরানন্দ ছাড়া বাহিরের কোন কিছুর যেন অস্তিত্ব নাই—এমনি এই মূর্খ পাড়াগাঁয়ের মেয়েটার ভাব। অনুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সে বেশ বুঝিতেছিল, পদ্ম যেমন পাঁকের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াও মলিনতার অতীত, ঠিক তেমনি যেন এই

লেখাপড়া না জানা দরিদ্র পল্লী-লক্ষ্মীটিও সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক দুঃখ-দারিদ্রের ক্রোড়ে অহোরাত্র বাস করিয়াও সমস্ত বেদনা-যন্ত্রণার উপরে অবলীলাক্রমে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। না আছে তাহার দেহে ক্লান্তি, না আছে তাহার মুখের শ্রান্তি। সুতরাং অচলাকেও সে যে সকল অনভ্যস্ত কাজের মধ্যে অবিশ্রান্ত টানিয়া লইয়া ফিরিতেছিল, যদিচ তাহার কোনটার সহিত তাহার শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কারের সামঞ্জস্য ছিল না, তথাপি না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ানটা যেন অতি বড় লজ্জার কথা, এমনই অচলার মনে হইতেছিল। নিজের ভাগ্যটাকেও যে একবার ধিক্কার দিবার জন্য সে এক মুহূর্ত্ত বসিয়া শোক করিবে, এই ছয়টা দিনের মধ্যে সে ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত তাহার মিলে নাই—সমস্ত সময়টা সে কাজ দিয়া, হাসি-গল্প দিয়া এমনি ভরাট করিয়া গাঁথিয়া আনিতেছিল। তাই তাহার শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়া যাইবার ইঙ্গিত মাত্রেই অচলার মনে হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত মেটে-বাড়িটা তাহার দরজা জানালা-দেয়াল সমেত যেন তাসের ঘরের মত চক্ষের নিমিষে উপুড় হইয়া পড়িয়া যাইবে। মৃণালদিদি চলিয়া গেলে এখানে সে এক দণ্ডও তিষ্ঠিবে কি করিয়া।

সন্ধ্যার পর এক সময়ে অচলা কহিল, কেবল যে পালাই পালাই করচ মৃণালদিদি, বাপের বাড়ি এসে কে এত শীঘ্র ফিরে যায় বল ত? তা হবে না—আমি যতদিন না কলকাতায় ফিরে যাব, ততদিন তোমাকে থাকতেই হবে।

মৃণাল কহিল, কি করব ভাই সেজদি, শাশুড়ীবুড়ী না নিজে মরবে, না আমাকে একদণ্ড ছেড়ে দেবে। আমি বলি, বুড়ী তুই মর্। তোর ছেলের বয়স ষাট হতে চলল, শেষে তাকে খেয়ে তবে যাবি? তা এত যে দিবারাত্র কাসে, দমটা ত একবারও আটকে যায় না!

অচলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তোমাকে বুঝি তিনি দেখতে পারেন না?

মৃণাল মাথা নাড়িয়া কহিল, দুটি চক্ষে না।

অচলা কহিল, আর তুমি?

মৃণাল বলিল, আমিও না। বুড়ীকে গঙ্গা-যাত্রা করিয়ে আমি পাঁচ-সিকের হরির-লুট দেব মানত করে রেখেছি যে।

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, বিশ্বাস হয় না মৃণালদিদি, তুমি সংসারে কাকে যে দেখতে পারো, আর কাকে যে পারো না, তা তোমার মুখের কথা শুনে কিছুতেই বলবার জো নেই! হয়ত এই বুড়ীকেই তুমি সবচেয়ে বেশি ভালবাস।

মৃণাল হাসিমুখে কহিল, সবচেয়ে বেশি ভালবাসি? তা হবে। বলিয়া অচলার গাল টিপিয়া দিয়া কাজে চলিয়া গেল।

যাই যাই করিয়া মৃণালের আবার কিছুদিন গড়াইয়া গেল। একদিন হঠাৎ

অচলার চোখে পড়িল, যাবার দিকে তাহার মুখে যত তাড়া, কাজের দিকে তত নয়! সত্যই চলিয়া যাইতে সে যেন ঠিক তত উৎসুক নয়। একদিন তাহার অন্তরালে দাঁড়াইয়া পৃথিবীকে সে যেভাবে চিনিয়া লইতেছিল, এখন তাহার আবরণের বাহিরে আসিয়া পৃথিবীর সে চেহারা তাহার চোখে যেন আর রহিল না। এ-বাটীতে পা দিয়া পর্য্যন্ত যখনই তাকে স্বামীর সঙ্গে কোন একটা হাসি-তামাসা করিতে দেখিয়াছে, তখনই তাহার বুকের মধ্যে ছ্যাঁক করিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখন মাঝে মাঝে যেন সূঁচ ফুটিতে লাগিল। এ-সব কিছুই নয়, ইহার মধ্যে যথার্থ পরিহাস ভিন্ন আর কিছুই নাই—মন খারাপ করিবার কোন হেতু নাই—তাহার মন বড় অশুচি—এমনি করিয়া আপনাকে সে যতই শাসন করিবার চেষ্টা করে, ততই কোথা হইতে সংশয়ের বিপরীত তর্ক তাহার হৃদয়ের মধ্যে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বারংবার মুখ তুলিয়া তাহাকে ভ্যাংচাইতে থাকে। মহিমের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য এইখানে যেন অতিশয় বাড়াবাড়ি বলিয়া তাহার মনে হয়। সে এই বলিয়া বিতর্ক করিতে থাকে, ভিতরে যদি কিছুই নাই, তবে পরিহাসের জবাব পরিহাস দিয়া করিতেই বা দোষ কি! যে তামাসা করিয়া উত্তর দিতে পারে না, সে ত অন্ততঃ হাসিমুখে সেটা উপভোগ করিতে পারে! অথচ সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়, মৃণালের রহস্যালাপের সূত্রপাতেই মহিম লজ্জিত-মুখে কোনমতে তাড়াতাড়ি অন্যত্র পলাইয়া বাঁচে। তাই কোথায় কি একটা যেন প্রচ্ছন্ন অন্যায় রহিয়াছে, আজকাল এ চিন্তা কোনমতেই সে মন হইতে সম্পূর্ণ তাড়াইতে পারে না। মৃণালের সঙ্গে একত্র কাজ-কর্ম্ম করিতেও তাহার একশ'বার মনে হয়, সে নিজে মেয়েমানুষ হইয়া যখন বুকের মধ্যে একটা গোপন ঈর্ষার বেদনা বহন করিতে থাকিয়াও ইহাকে কোনোমতে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে না, একত্র এতকাল ঘর করিয়াও কি কোন পুরুষমানুষে এ মেয়েকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে?

মৃণাল আসিলেই যে উড়ে বামুন তাহার রান্নাঘরের দায় হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিত, একথা অচলা জানিত না। এবারেও সে ছুটি পাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; কিন্তু অচলা কেবলই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল, মৃণাল নিজের হাতে রাঁধিয়া মহিমকে খাওয়াইতে যেন প্রাণ দিয়া ভালবাসে। আজ সকালে সে হঠাৎ বলিয়া বসিল, মৃণালদিদি, আজ তোমার ছুটি।

মৃণাল বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কিসের ভাই সেজদি।

অচলা কহিল, রান্নার। আজ আমিই রাঁধব।

মৃণাল অবাক হইয়া বলিল, পোড়া কপাল! তুমি আবার রাঁধবে কি!

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, বাঃ আমি বুঝি জানিনে? বাড়িতে আমি ত কতদিন রেঁধেছি। সে হবে না মৃণালদি, আমি রাঁধবই।

তাহার আগ্রহ দেখিয়া মৃণাল হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল ; সে কি হয়, আমি থাকতে তুমি কি দুঃখে রান্নাঘরের ধুঁয়োর মধ্যে কষ্ট পেতে যাবে ভাই ?

তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া অচলা জিদ করিয়া বলিল, তা হলে বামুন থাকতে তুমিই বা কেন কষ্ট কর ? এ-বেলা আমি নিশ্চয় রাঁধব।

কেন যে তাহার এই আগ্রহ মৃণাল তাহার কিছুই বুঝিল না। সে হাসি চাপিয়া কৃত্রিম অভিমানের স্বরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বা রে মেয়ে! একে একে বুঝি তুমি আমার সব কেড়েকুড়ে নিতে চাও ? সবই ত নিয়েচ, দুটো দিন রেঁধে খাইয়ে যাবো তাও বুঝি সইচে না ? এখন থেকে সতীনের হিংসে শুরু হ'ল বুঝি ?

অচলার বুকের ভিতরটায় আবার ছ্যাঁক করিয়া উঠিল। মৃণালের শেষ কথাটা গিয়া তাহার ঈর্ষার ব্যথায় সজোরে ঘা দিল। সে এক মুহূর্ত্তেই গম্ভীর হইয়া শুধু সংক্ষেপে কহিল, না, আজ আমি রাঁধব।

এতক্ষণে মৃণাল দেখিতে পাইল, অচলা রাগ করিয়াছে। তাই আর তর্কাতর্কি না করিয়া বিষণ্ণ-মুখে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বেশ, তা হলে তুমিই রাঁধো গে। আচ্ছা চল, কোথায় কি আছে দেখিয়ে দিয়ে আসি।

মহিম যে এতক্ষণ ঘরেই ছিল, তাহা দুজনের কেহই জানিত না। সহসা তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া উভয়েই অপ্রতিভ হইয়া গেল।

মহিম অচলাকে উদ্দেশ্য করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, মৃণাল যে ক'দিন আছে ওই রাঁধুক না।

কেন যে সে আপত্তি করিতেছিল, মহিম তাহা জানিত। কিন্তু সে কথা ত খুলিয়া বলা চলে না।

অচলা আরও জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু রাগ চাপিয়া শুধু কহিল, না, আমি রাঁধতে যাচ্ছি। বলিয়াই বাদানুবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়া দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

অচলা জোর করিয়া রাঁধিতে গেল। রান্নার কাজে সে কাহারও চেয়েই খাটো ছিল না। কিন্তু এদিকে সে মন দিতেই পারিল না। বিগত দিনের সমস্ত কাহিনী নড়িতে-চড়িতে কেবলই খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, হয়ত মহিম কোনদিনই তাহাকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে নাই। তাহার বিবাহের অনতিকাল পূর্ব্বে সুরেশকে লইয়া যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, সেইসকল কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া মনে করিয়া আজ সহসা সে যেন দেখিতে পাইল, মহিম তাহার প্রতি চিরদিনই উদাসীন, এমন কি পিতার অভিমতে পূর্ব্ব-সম্বন্ধ যখন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল, তখনও মহিম যে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই, ইহাতে তাহার যেন আর লেশমাত্র সংশয় রহিল না।

এখানে আসা অবধি মৃণাল ও অচলা একসঙ্গে আহারে বসিত। দুপুরবেলা হরির মাকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া অচলা মৃণালের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মৃণালদিদির জ্বরের মত হয়েছে, তিনি খাবেন না।

অচলা কোন কথা না কহিয়া মৃণালের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মৃণাল চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়াছিল ; অচলা কহিল, খাবে চল মৃণালদিদি।

মৃণাল চাহিয়া দেখিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুমি খাওগে ভাই সেজদি, আমার শরীর ভাল নেই!

অচলা শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে? জ্বর?

মৃণাল কহিল, তাই মনে হচ্চে। আজ উপোস করলেই সেরে যাবে।

অচলা হেঁট হইয়া হাত দিয়া মৃণালের কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, আমি অত বোকা নই মৃণালদিদি, খাবে চল।

মৃণাল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মাইরি বলচি সেজদি, আমার খাবার জো নেই। কেন তুমি আবার কষ্ট করে ডাকতে এলে ভাই। বরং চল, আমি না হয় গিয়ে তোমার সুমুখে বসচি।

অচলা কঠিন হইয়া কহিল, একজন অভুক্ত বন্ধুকে মুখের সামনে বসিয়ে রেখে খাবার শিক্ষা আমরা পাইনি মৃণালদিদি।

মৃণাল তথাপি হাসিবার প্রয়াস করিয়া বলিল, আর বন্ধুর যদি ভোজনের উপায় না থাকে, তা হলে?

অচলা তেমনিভাবে জবাব দিল, নেই কেন আগে শুনি? তোমার জ্বর হয়নি, হয়েচে রাগ। নিজে না খেয়ে আমাকেও শুকোবে, এই যদি তোমার ইচ্ছে হয়ে থাকে স্পষ্ট করে বল আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না।

মৃণাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিল, স্বামীর দিব্যি করে বলচি সেজদি, আমি এতটুকু রাগ করিনি। কিন্তু আমার খাবার জো নেই। চল দিদি, তোমাকে কোলে করে বসে খাওয়াই গে।

অচলা কহিল, তা হলে জ্বর-টর নয়? ওটা শুধু ছল।

মৃণাল চুপ করিয়া রহিল। অচলা নিজেও কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, এতক্ষণে বুঝলুম। কিন্তু গোড়াতেই যদি মুখ ফুটে বলে দিতে মৃণালদিদি, আমার ছোঁয়া তুমি ঘৃণায় মুখে দিতে পারবে না, তা হলে এই অন্যায় জিদ করে তোমাকে কষ্ট দিতাম না, নিজেও দাসী-চাকরের সামনে লজ্জায় পড়তুম না ; তা সে যাক—আমাকে মাপ ক'রো ভাই, কিন্তু দুধ ত ছোঁয়া যায় না শুনেচি, তাই এক বাটি এনে দি—আর যদু গিয়ে দোকান থেকে কিছু সন্দেশ কিনে আনুক। কি বল?

প্রথমটা মৃণাল হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া রহিল! খানিক পরে সে ভাব কাটিয়া গেলেও সে কথা কহিল না, অধোমুখে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল।

অচলা পুনরায় খোঁচা দিয়া কহিল, কি বল?

মৃণাল আঁচলে চোখ মুছিয়া মৃদুকণ্ঠে শুধু কহিল, এখন থাক্।

অচলা আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

মৃণাল মুখও তুলিল না, কথাও কহিল না। বুড়া শাশুড়ীকে তাহার রাঁধিয়া দিতে হয়, তিনি অতিশয় শুচিবাই-প্রকৃতির লোক; এ-কথা শুনিলে কোনকালে যে তাহার জলস্পর্শ করিবেন না, নিদারুণ অভিমানে এ-কথা সে আভাসেও অচলার কাছে প্রকাশ করিল না।

অচলা রান্নাঘরে গিয়া সেখানকার কাজ-কর্ম্ম সারিয়া হাত ধুইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু আর যে কোন কারণেই হোক, কেবল ঘৃণায় যে তাহার প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন মৃণাল স্পর্শ করে নাই এ কথা মিথ্যা বলিয়াই অচলা মনে মনে জানিত বলিয়া অমন করিয়া আজ আঘাত করিয়াছিল। সত্য বলিয়া বুঝিলে মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতেও অচলা পারিত না। অথচ যে প্রভাত আজ কলহের দ্বারাই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার মধ্যাহ্নে ভগবান কাহারও অদৃষ্টই যে প্রস্তুত অন্ন মাপান নাই, তাহা উভয়েই মনে মনে বুঝিল।

অপরাহ্ণবেলায় গরুর গাড়ি আসিয়া সদরে উপস্থিত হইল। মৃণাল অচলার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল, নমস্কার করতে এসেচি—সেজদি, বাড়ি চললুম। যদি কখনো ইচ্ছে হয়, একটা ডাক দিয়ো, আবার এসে হাজির হব। একটুখানি থামিয়া কহিল, কিন্তু যাবার সময় একটা কথাও কবে না ভাই! বলিয়া ক্ষণকাল উৎসুক-চক্ষে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু অচলা একটা কথাও কহিল না, যেমন বসিয়াছিল, তেমনি মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়াই মৃণাল দেখিতে পাইল, মহিম বাড়ি ঢুকিতেছে। কহিল, একটু দাঁড়াও সেজদা, তোমাকেও একটা নমস্কার করি।

মহিম মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিছু না খেয়েই বাড়ি চললি মৃণাল? না হয়, রাত্রিটা থেকে সকালেই যাস্‌নে?

মৃণাল শুধু একটুখানি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না সেজদা, যদু গাড়ি ডেকে এনেচে, আজ যাই—কিন্তু আর একদিন নিয়ে এসো। বলিয়া গলায় আঁচল দিয়া নমস্কার করিয়া পায়ের ধুলা লইল। বলিল, মাথা খাও সেজদাদামশাই, আর একদিন আনতে যেন ভুলো না ভাই।

আজ মহিম হাসিয়া ফেলিল। কহিল, পোড়ারমুখি, তোর স্বভাব কি কোনদিন যাবে না রে?

মরলে যাবে, তার আগে নয়, বলিয়া আর একবার হাসিয়া মৃণাল গিয়া গাড়িতে উঠিল।

আজই এত অকস্মাৎ মৃণাল চলিয়া যাইতে পারে, অচলা তাহা কল্পনাও করে নাই। মৃণাল নিজে খায় নাই, তাহাকে খাইতে দেয় নাই, এই অপরাধের সব চেয়ে বড় দণ্ড অচলা যে কি করিয়া দিবে, একলা ঘরে বসিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে এই চিন্তাই করিতেছিল। যে ভালবাসে, তাহাকে ঘৃণা করার অপবাদ দেওয়ার মত গুরুতর শাস্তি আর নাই এ-কথা ভালবাসাই বলিয়া দেয়। এই গুরুদণ্ডই মৃণালের প্রতি মনে মনে বিধান করিয়া অচলা বসিয়াছিল। মৃণালদিদি যে তাহাকে ব্রাহ্ম-মেয়ে বলিয়া অন্তরের মধ্যে ঘৃণা করে, উঠিতে বসিতে এই খোঁচা দিয়া সে আজকের শোধ লইবে স্থির করিয়াছিল; কিন্তু সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল।

অথচ অভুক্ত মৃণাল বিদায় লইয়া যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তখন তাহারও চোখের জলে দুই চক্ষু পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মৃণালের মুখে সেই এক ফোঁটা হাসির শব্দ তপ্ত-মরুর মত চক্ষের পলকে তাহার উদ্গত অশ্রু শুষ্ক করিয়া ফেলিল, এবং দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া সে সমস্ত চিত্ত দিয়া উভয়ের বিদায়ের পালা দর্শন করিয়া ঠিক বজ্রাহত তরুর মত নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া জ্বলিতে লাগিল।

অনতিকাল পরে মহিম আসিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন তাহার স্বাভাবিক ধৈর্য্য প্রায় সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহার আজন্ম শিক্ষা-সংস্কার তাহাকে ইতরতার হাত হইতে রক্ষা করিল। সে প্রাণপণ বলে আত্ম-সংবরণ করিয়া কঠোর হাসি হাসিয়া কহিল, বাস্তবিক, সহরের লোক, পাড়াগাঁয়ে এসে বাস করার মত বিড়ম্বনা বোধ করি সংসারে অল্পই আছে, না?

মহিম স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার নিজের কথা বলচ ত? বুঝতে পারি, প্রথমটা তোমার নানা প্রকার কষ্ট হবে; কিন্তু—মৃণালের সঙ্গে যে তোমার বনিবনাও হবে না, এ আমি কিছুতে ভাবিনি। কেন না, তার সঙ্গে কোনদিন কারও ঝগড়া হয়নি।

অচলা কহিল, আমার সঙ্গেই যে পাড়াশুদ্ধ লোকের চিরকাল ঝগড়া হয়, এ খবরই বা তুমি কোথায় শুনলে?

মহিম ধীরে ধীরে বলিল, তোমার সমস্তদিন খাওয়া হয়নি থাক্, এ-সব কথায় এখন কাজ নেই।

অচলা অধিকতর জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, মৃণালদিদিও ত সমস্তদিন না খেয়েই বাড়ি গেলেন; কিন্তু তাঁর সঙ্গে হেসে কথা কইতে ত তোমার আপত্তি হয়নি!

মহিম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, এ-সব তুমি কি বলচ অচলা?

অচলা কহিল, আমি এই বলচি যে, কি এমন গুরুতর অপরাধ করেচি, যাতে এই অপমানটা আমাকে না করলে তোমার চলছিল না?

মহিম হতবুদ্ধি হইয়া পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল। কহিল, কি বলচ? এ সব কথার মানে কি?

অচলা অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, মানে এই যে, কি অপরাধে আমাকে এই অপমান করলে তুমি? তোমার কি করেচি আমি?

মহিম বিহ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, আমি তোমাকে অপমান করেচি?

অচলা বলিল, হাঁ, তুমি।

মহিম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, মিছে কথা।

অচলা মুহূর্ত্তকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তার পরে কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া বলিল, আমি কোনদিন মিছে কথা বলিনে। কিন্তু সে কথা যাক; এখন তোমার নিজের যদি সত্যবাদী বলে অভিমান থাকে, সত্য জবাব দেবে?

মহিম উৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

অচলা প্রশ্ন করিল, মৃণালদিদি যা করে আজ চলে গেলেন, তাকে কি তোমাদের পাড়াগাঁয়ের সমাজে অপমান করা বলে না?

মহিম বলিল, কিন্তু তাতে আমাকে জড়াতে চাও কেন?

অচলা কহিল, বলচি। আগে বল, তাকে কি বলা হয় এখানে?

মহিম কহিল, বেশ, তাই যদি হয়—

অচলা বাধা দিয়া কহিল, হয় নয়, ঠিক জবাব দাও।

মহিম কহিল, হাঁ, পাড়াগাঁয়েও অপমান বলেই লোকে মনে করে।

অচলা কহিল, করে ত? তবে, তুমি সমস্ত জেনে-শুনে এই অপমান করিয়েচ। তুমি নিশ্চয় জানতে তিনি আমার ছোঁয়া রান্না খাবেন না। ঠিক কি না? বলিয়া সে নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া মহিমের বুকের ভিতর পর্য্যন্ত যেন তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টি প্রেরণ করিতে লাগিল। মহিম তেমনি অভিভূতের মত শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

ঠিক এমনি সময়ে বাহির হইতে সুরেশের চীৎকার আসিয়া পৌঁছিল - মহিম! কোথা হে?

১৬

একি সুরেশ যে! এস এস, বাড়ির ভেতরে এস। ভাল ত?

মহিমের স্বাগত-সম্ভাষণ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সুরেশ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল

হাতের গ্লাডস্টোন ব্যাগটা নামাইয়া রাখিয়া কহিল, হাঁ, ভাল। কিন্তু কি রকম, একা দাঁড়িয়ে যে? অচলা বধূঠাকুরাণী এক মুহূর্তে সচলা হয়ে অন্তর্দ্ধান হলেন কিরূপে? তাঁর প্রবল বিশ্রম্ভালাপ মোড়ের ওপর থেকে যে আমাকে এ-বাড়ির পাত্তা দিলে।

বস্তুতঃ, অচলার শেষ কথাটা রাগের মাথায় একটু জোরে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক দ্বারের বাহিরেই তাহা সুরেশের কানে গিয়াছিল।

সুরেশ কহিল, দেখলে মহিম, বিদুষী স্ত্রী-লাভের সুবিধে কত? ক'দিনই বা এসেচেন, কিন্তু এর মধ্যেই পাড়াগাঁয়ের প্রেমালাপের ধরণটা পর্য্যন্ত এমনি আয়ত্ত করে নিয়েচেন যে, খুঁত বের করে দেয়, পাড়াগেঁয়ে মেয়েরও তা সাধ্য নেই।

মহিম লজ্জায় আকর্ণ রাঙা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরেশ ঘরের দিকে চাহিয়া অচলাকে উদ্দেশ করিয়া পুনরায় কহিল, অত্যন্ত অসময়ে এসে রঙ্গভঙ্গ করে দিলুম বৌঠান, মাপ ক'রো। মহিম দাঁড়িয়ে রইলে যে? বসবার কিছু থাকে ত নিয়ে চল, একটু বসি। হাঁটতে হাঁটতে ত পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে—ভ্যালা জায়গায় বাড়ি করেছিলে ভাই—চল, চল, কলকাতায় চল।

চল, বলিয়া মহিম তাহাকে বাহিরের ঘরে আনিয়া বসাইল।

সুরেশ কহিল, বৌঠান কি আমার সামনে বের হবেন না না-কি? পরদানসিন?

মহিম জবাব দিবার পূর্ব্বেই পাশের দরজা ঠেলিয়া অচলা প্রবেশ করিল। তাহার মুখে কলহের চিহ্নমাত্র নাই, নমস্কার করিয়া প্রসন্নমুখে কহিল, এ যে আশাতীত সৌভাগ্য! কিন্তু এমন অকস্মাৎ যে?

তাহার প্রফুল্ল হাসি-মুখে সুখ-সৌভাগ্যের প্রসন্ন বিকাশ কল্পনা করিয়া সুরেশের বুকের ভিতরটা ঈর্ষায় যেন জ্বলিয়া উঠিল। হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিল, এখন দেখচি বটে, এমন অকস্মাৎ এসে পড়া উচিত হয়নি। কিন্তু কাণ্ডটা কি হচ্ছিল? Their first difference. না আসা পর্য্যন্ত এইভাবে মতভেদ চলচে? কোন্‌টা?

অচলা তেমনি হাসিমুখে কহিল, কোন্‌টা শুনলে আপনি বেশ খুশী হন বলুন? শেষেরটা ত? তা হলে আমার তাই বলা উচিত - অতিথিকে মনঃক্ষুণ্ণ করতে নেই।

সুরেশের মুখ গম্ভীর হইল; কহিল, কে বললে নেই? বাড়ির গৃহিণীর সেই ত হ'ল আসল কাজ—সেই ত তার পাকা পরিচয়?

অচলা হাসিতে হাসিতে কহিল, গৃহই নেই, তার আবার গৃহিণী! এই দুঃখীদের কুঁড়ের মধ্যে কি করে আজ আপনার রাত্রি কাটবে, সেই হয়েচে আমার ভাবনা। কিন্তু ধন্য আপনাকে, জেনে-শুনে এ দুঃখ সইতে এসেচেন।

স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আচ্ছা, নয়নবাবুকে ধরে চারুবাবুর বাড়িতে আজ রাতটার মত ওঁর শোবার ব্যবস্থা করা যায় না? তাঁদের পাকা বাড়ি—বসবার ঘরটাও আছে, ওঁর কষ্ট হ'তো না।

সৌজন্যের আবরণে উভয়ের শ্লেষের এই সকল প্রচ্ছন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে মহিম মনে মনে অধীর হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু কি করিয়া থামাইবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, এমনি অবস্থায় সুরেশ নিজেই তাহার প্রতিকার করিল; সহসা হাত জোড় করিয়া বলিল, আমার ঘাট হয়েচে বৌঠান, বরং একটু চা-টা দাও, খেয়ে গায়ে জোর করে নিয়ে তার পরে নয়নবাবুকে বল, শ্রবণবাবুকে বল—চন্দ্রবাবুর পাকা ঘরে শোবার জন্যে সুপারিশ করতে রাজি আছি। কিন্তু যাই বল মহিম, এর ওপর এত টান সত্যি হলে, খুশী হবার কথা বটে।

মহিমের হইয়া অচলাই তাহার উত্তর দিল; সহাস্যে কহিল, খুশী হওয়া না-হওয়া মানুষের নিজের হাতে; কিন্তু এ আমার শ্বশুরের ভিটে, এর ওপর টান না জন্মে বড়লাটের রাজপ্রাসাদের ওপর টান পড়লে সেইটে ত হ'ত মিথ্যে। যাক, আগে গায়ে জোর হোক, তার পর কথা হবে। আমি চায়ের জল চড়াতে বলে এসেচি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে এনে হাজির করে দিচ্চি—ততক্ষণ মুখ বুজে একটু বিশ্রাম করুন; বলিয়া অচলা হাসিয়া প্রস্থান করিল।

সে চলিয়া যাইতেই সুরেশের বুকের জ্বালাটা যেন বাড়িয়া উঠিল। নিজেকে সে চিরদিনই দুর্ব্বল এবং অস্থির-মতি বলিয়াই জানিত, এবং এজন্য তাহার লজ্জা বা ক্ষোভও ছিল না। ছেলেবেলায় বন্ধুবান্ধবেরা যখন মহিমের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহাকে খেয়ালী প্রভৃতি বলিয়া অনুযোগ করিত, তখন সে মনে মনে খুশী হইয়া বলিত, সে ঠিক যে, তাহার সঙ্কল্পের জোর নাই, সে প্রবৃত্তির বাধ্য; কিন্তু হৃদয় তাহার প্রশস্ত—সে কখনও হীন বা ছোট কাজ করে না। সে নিজের আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে জানে না, পাত্রাপাত্র হিসাব করিয়া দান করিতে পারে না—মন কাঁদিয়া উঠিলে গায়ের বস্ত্রখানা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া আসিতে তাহার বাধে না—তা সে যাহাকে এবং যে কারণেই হোক; কিন্তু একথা কাহারও বলিবার জো নেই যে, সুরেশ কাহাকেও দ্বেষ করিয়াছে, কিংবা স্বার্থের জন্য এমন কোন কাজ করিয়াছে যাহা তাহার করা উচিত ছিল না। সুতরাং আজন্মকাল হৃদয়ের ব্যাপারে যাহার একান্ত দুর্ব্বল বলিয়াই অখ্যাতি ছিল এবং নিজেও যাহা সে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিত, সেই সুরেশ যখন অকস্মাৎ অচলার সম্পর্কে শেষ মুহূর্ত্তে আপনার এত বড় কঠোর সংযমের পরিচয় পাইল, তখন নিজের মধ্যে এই অজ্ঞাত শক্তির দেখা পাইয়া কেবল আত্মপ্রসাদই লাভ করিল না, তাহার সমস্ত হৃদয় গর্ব্বে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অচলার বিবাহের পরে দুটো দিন সে

আপনাকে নিরন্তর এই কথাই বলিতে লাগিল—সে শক্তিহীন, অক্ষম নয়—সে প্রবৃত্তির দাস নয়; বরঞ্চ আবশ্যক হইলে সমস্ত প্রবৃত্তিটাকেই সে বুকের ভিতর হইতে সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দিতে পারে। বন্ধুত্ব যে কি, তাহার সুখের জন্য একজন যে কতখানি ত্যাগ করিতে পারে এইবার বন্ধু ও বন্ধু-পত্নী বুঝুন গিয়া।

কিন্তু কোন মিথ্যা দিয়াই দীর্ঘকাল একটা ফাঁক ভরাইয়া রাখা যায় না। আত্মসংযম তাহার সত্য বস্তু নয়, ইহা আত্মপ্রতারণা। সুতরাং একটা সম্পূর্ণ সপ্তাহ না কাটিতেই এই মিথ্যা সংযমের মোহ তাহার বিস্ফারিত হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে নিষ্কাশিত হইয়া তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনিতে লাগিল, মন তাহার বারংবার বলিতে লাগিল, এই স্বার্থত্যাগের দ্বারা সে পাইল কি? ইহা তাহাকে কি দিল? কোন্ অবলম্বন লইয়া সে আপনাকে এখন খাড়া রাখিবে? পিসিমা বলিলেন, বাবা, এইবার তুই এমনি একটি বৌ ঘরে আন্, আমি নিয়ে সংসার করি।

একদিন সমাজের দোর-গোড়ায় কেদারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি স্পষ্টই বলিলেন, কাজটা তাঁহার ভাল হয় নাই। মহিমের সহিত বিবাহ দিতে গোড়াগুড়িই তাঁহার ইচ্ছা ছিল না শুধু সে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল বলিয়াই তিনি অবশেষে মত দিলেন। ঘরে আসিয়া তাহার মনের মধ্যে অভিশাপের মত জাগিতে লাগিল, এই বিবাহ দ্বারা তাদের কেহই যেন সুখী না হয়। নিজের অবস্থাকে অতিক্রম করার অপরাধ বন্ধুও অনুভব করুন, অচলাও যেন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া মরে। কিন্তু তাই বলিয়া মন তাহার ছোট নয়। এই অকল্যাণ কামনার জন্য নিজেকে সে অনেকরকম করিয়া শাসিত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার পীড়িত প্রতারিত হৃদয় কিছুতেই বশ মানিল না—নিতান্ত একগুঁয়ে ছেলের মত নিরন্তর ঐ কথাই আবৃত্তি করিতে লাগিল। এমন করিয়া মাসখানেক সে কোনমতে কাটাইয়া দিয়া একদিন কৌতূহল আর দমন করিতে না পারিয়া অবশেষে ব্যাগ হাতে মহিমের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুরেশ বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, এখন দেখতে পাচ্চো মহিম, আমার কথাটা কতখানি সত্যি?

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ কথাটা?

সুরেশ বিজ্ঞের মত বলিল, আমার পল্লীগ্রামে বাস নয় বটে, কিন্তু এর সমস্তই আমি জানি। আমি তথাপি কি সাবধান করে দিইনি যে, গ্রামের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে ঘোরতর বিরোধ বাধবে?

মহিম সহজভাবে কহিল, কৈ, তেমন বিরোধ ত কিছু হয়নি।

বিরোধ আর বল কাকে? তোমার বাড়িতে কেউ খেলে কি? সেইটেই কি যথেষ্ট অশান্তি অপমান নয়?

আমি খেতে কাউকে বলিনি।

বলনি? আচ্ছা, কৈ, বৌ-ভাতে আমাকে ত নেমন্তন্ন করনি মহিম?

ওটা হয়নি বলেই করিনি।

সুরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল, বৌ-ভাত হয়নি? ওঃ—তোমাদের যে আবার—কিন্তু এমন করে কটা উপদ্রব এড়ানো যাবে মহিম? আপদ-বিপদ আছে, ছেলে-মেয়ের কাজ-কর্ম্ম আছে—সংসার করতে গেলে নেই কি? আমি বলি—

যদুর হাতে চায়ের সরঞ্জাম এবং নিজে থালায় করিয়া মিষ্টান্ন লইয়া অচলা প্রবেশ করিল। সুরেশের শেষ কথাটা তাহার কানে গিয়াছিল; কিন্তু তাহার মুখের ভাবে সুরেশ তাহা ধরিতে পারিল না। দুই বন্ধুর জলযোগ এবং চা-পান শেষ হইলে মহিম কাঁধের উপর চাদরটা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ গ্রামের জমিদার মুসলমান, তাঁহার ছেলেটিকে মহিম ইংরাজি পড়াইত। জমিদারসাহেব নিজে লেখাপড়া না জানিলেও তাঁহার ঔদার্য্য ছিল, মহিমের সহিত সদ্ভাবও যথেষ্ট ছিল। এইজন্য গ্রামের লোক সমাজের দোহাই দিয়া আজও তাহার উপর উপদ্রব করিতে সাহস করে নাই।

অচলা কহিল, আজ পড়াতে না গেলেই কি হ'ত না?

মহিম কহিল, কেন?

অচলার মনের জোর ও অন্তরের নির্ম্মলতা যত বড়ই হোক, সুরেশের সহিত তাহার সম্বন্ধটা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে তাহার আকস্মিক অভ্যাগমে কোন রমণীই সঙ্কোচ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না। সুরেশকে সে ভাল করিয়াই চিনিত, তাহার হৃদয় যত মহৎই হোক, সেই হৃদয়ের ঝোঁকের উপর তাহার কোন আস্থা ছিল না—এমন কি, ভয়ই করিত। এই সন্ধ্যায় তাহারই সহিত তাহাকে একাকী ফেলিয়া যাইবার প্রস্তাবে সে মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; কিন্তু বাহিরে তাহার লেশমাত্র প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া কহিল, বাঃ, সে কি হয়? অতিথিকে একলা ফেলে—

মহিম কহিল, তাতে অতিথি-সৎকারের কোন ত্রুটি হবে না। তা ছাড়া, তুমি ত রইলে—

অচলা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কিন্তু আমিও থাকতে পারব না। সুরেশের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমাদের উড়ে বামুনটি এমনি পাকা রাঁধুনী যে, তার সঙ্গে না থাকলে কিছুই মুখে দেবার জো থাকবে না। আমি বলি তুমি বরঞ্চ—

মহিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, তা হয় না। ঘণ্টা-দুই বৈ ত নয়। বলিয়া ঘরের কোণ হইতে সে লাঠিটা হাতে তুলিয়া লইল। একে ত মহিমের কাজের ধারা সহজে বিপর্য্যস্ত হয় না, তাহাতে এই একটা সামান্য কারন লইয়া বারংবার নির্ব্বন্ধ

প্রকাশ করিতেও অচলার লজ্জা করিতে লাগিল, পাছে ভয়টা তাহার সুরেশের চোখে ধরা পড়িয়া লজ্জাটা শতগুণ হইয়া উঠে।

মহিম ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। তাহাকে শুনাইয়া সুরেশ অচলাকে হাসিয়া কহিল, কেন নিজের মুখ হেঁট করা! চিরকাল জানি ও সে পাত্রই নয় যে, কারও কথা রাখবে। তুমি বরং যা হোক একখানা বই আমাকে দিয়ে নিজের কাজে যাও—আমার দিব্য সময় কেটে যাবে।

কথাটা হঠাৎ অচলাকে বাজিল যে, বাস্তবিকই মহিম কোনদিন কোন অনুরোধই তাহার রক্ষা করে না। হউক না ইহা তাহার সুমহৎ গুণ, কিন্তু তবুও সুরেশের মুখ হইতে স্বামীর এই আজন্ম কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় তাহারই সম্মুখে আজ তাহাকে অপমানকর উপেক্ষার আকারে বিঁধিল। কোন কথা না কহিয়া, সে নিজের ঘরে গিয়া, যদুকে দিয়া একখানা বাঙলা বই পাঠাইয়া দিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া মহিম জিজ্ঞাসা করিল, সুরেশ কতদিন এখানে থাকবে তোমাকে বললে?

এমনি তো নানা কারণে আজ সারাদিনই স্বামীর উপর তাহার মন প্রসন্ন ছিল না; তাহাতে এই প্রশ্নের মধ্যে একটা কুৎসিত বিদ্রূপ নিহিত আছে কল্পনা করিয়া সে চক্ষের নিমেষে জ্বলিয়া উঠিল; কঠোরকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তার মানে?

মহিম অবাক্ হইয়া গেল। সে সোজাভাবেই কথাটা জানিতে চাহিয়াছিল, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কিছুই করে নাই। তাহাদের এতক্ষণের আলাপের মধ্যে এ প্রশ্নটা সে বন্ধুকে সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই এবং সুরেশ নিজে হইতে তাহা বলে নাই। কিন্তু তাহার আশা ছিল, সুরেশ নিশ্চয়ই অচলাকে তাহা বলিয়াছে।

মহিমকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অচলা নিজেই বলিল, এ কথার মানে এত সোজা যে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করবারও দরকার নেই। তোমার বিশ্বাস যে, সুরেশবাবু কোন সঙ্কল্প নিয়েই এখানে এসেছেন, এবং তা সফল হতে কত দেরি হবে সে আমি জানি। এই ত?

মহিম আরও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, আমার ও-রকম কোন বিশ্বাস নেই। কিন্তু মৃণালের ব্যবহারে আজ তোমার মন ভাল নেই, তুমি কিছুই ধীরভাবে বুঝতে পারবে না! আজ শোও, কাল সে কথা হবে। বলিয়া নিজে নিজেই বিছানায় শুইয়া পাশ ফিরিয়া নিদ্রার উদ্যোগ করিল।

অচলাও শুইয়া পড়িল বটে, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। তাহার মনের মধ্যে সারাদিন যে বিরক্তি উত্তরোত্তর জমা হইয়া উঠিতেছিল, সামান্য একটা কলহের আকারে তাহা বাহির হইয়া যাইতে পারিলে হয়ত সে সুস্থ হইতে পারিত; কিন্তু এমন করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় সে নিজের মধ্যেই পুড়িতে লাগিল।

অথচ যে প্রসঙ্গ বন্ধ হইয়া গেল, তাহাকে অশিক্ষিত সাধারণ স্ত্রীলোকের মত গায়ে পড়িয়া আন্দোলন করায় যে লজ্জা এবং ইতরতা আছে, তাহাও তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে শুধু কল্পনায় স্বামীকে প্রতিপক্ষ দাঁড করাইয়া, জ্বালাময়ী প্রশ্নোত্তর-মালায় নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া, শয্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

একটু বেলায় ঘুম ভাঙিয়া অচলা ধড়মড় করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, যদু কেৎলি হাতে করিয়া রান্না-ঘরে চলিয়াছে। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কিছু বলে গেছেন যদু?

যদু কহিল, এক প্রহর বেলার মধ্যেই ফিরে আসবেন বলে গেছেন।

মহিম প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া নিজের ক্ষেতখামার দেখিতে যাইত। ফিরিয়া আসিতে কোনদিন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইত।

অচলা প্রশ্ন করিল, নতুনবাবু উঠেচেন?

যদু কহিল, উঠেচেন বৈ কি? তিনিই ত চা তৈরি করতে বলে দিলেন।

অচলা তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, সুরেশ বহুক্ষণ পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া ঘরের সমস্ত জানালা খুলিয়া দিয়া, খোলা দরজায় সুমুখে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া কালকের সেই বইখানা পড়িতেছে। অচলায় পদশব্দে সুরেশ বই হইতে মুখ তুলিয়া চাহিল। অচলার মুখের উপর রাত্রিজাগরণের সমস্ত চিহ্ন দেদীপ্যমান! চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে, গণ্ড পাংশু, ওষ্ঠ মলিন—সে যত দেখিতে লাগিল তত তাহার দুই চক্ষু ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিল না।

তাহার চাহনির ভঙ্গিতে অচলা বিস্মিত হইল, কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারিল না; কহিল, কখন উঠলেন? আমার উঠতে আজ দেরি হয়ে গেল।

তাই ত দেখচি, বলিয়া সুরেশ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল। সুমুখের দেওয়ালের গায়ে বহুদিনের একটা পুরাতন বড় আরসি টাঙান ছিল; ঠিক সেই সময়েই অচলার দৃষ্টি তাহার উপরে পড়ায়, সুরেশের চাহনির অর্থ এক মুহূর্ত্তেই তাহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং নিজের শ্রীহীনতার লজ্জায় যেন সে একেবারে মরিয়া গেল। এই মুখখানা কেমন করিয়া লুকাইবে, কোথায় লুকাইবে, সুরেশের মিথ্যা ধারণার কি করিয়া প্রতিবাদ করিবে—কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া সে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল—বলিতে বলিতে গেল, যাই আপনার চা নিয়ে আসি গে।

সুরেশ কোন কথা বলিল না, শুধু একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শূন্য দৃষ্টিতে শূন্যের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

মিনিট-দশেক পরে চায়ের সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া অচলা পুনরায় যখন প্রবেশ করিল তখন সুরেশ আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়াছিল। চা খাইতে খাইতে সুরেশ কহিল, কৈ তুমি চা খেলে না?

অচলা হাসিয়া কহিল, আমি খাইনে।

কেন খাও না?

আর ভাল লাগে না। তা ছাড়া, এ জায়গাটা গরম কি না, খেলে ঘুম হয় না। কাল ত প্রায় সারারাত ঘুমোতে পারিনি। হাসিয়া বলিল, একটা রাত ঘুম না হলে চোখ-মুখের কি যে শ্রী হয়—পোড়া মুখ যেন আর লোকের সামনে বার করা যায় না। বলিয়া লজ্জিত-মুখে হাসিতে লাগিল।

সুরেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু এ তোমার ছেলেবেলার অভ্যাস, চা খেতে মহিম অনুরোধ করে না?

অচলা হাসিয়া বলিল, অনুরোধ করলেই বা শুনবে কে? তা এ আর এমন কি জিনিস যে, না খেলেই নয়?

এ-হাসি যে শুষ্ক হাসি সুরেশ তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তুমি ত জানই, ভূমিকা করে কথা বলা আমার অভ্যাসও নয়, পারিওনে। কিন্তু স্পষ্ট করে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে কি তুমি রাগ করবে?

অচলা হাসি-মুখে কহিল, শোন কথা। রাগ করব কেন?

সুরেশ কহিল, বেশ। তা হলে জিজ্ঞাসা করি, তুমি এখানে সুখে আছ কি?

অচলার হাসি-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; বলিল, এ-প্রশ্ন আপনার করাই উচিত নয়।

কেন নয়?

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমি সুখে নেই—এ কথা আপনার মনে হওয়াই অন্যায়।

সুরেশ একটুখানি ম্লান-হাসি হাসিয়া বলিল, মনটা কি ন্যায় অন্যায় ভেবে নিয়ে তবে মনে করে অচলা? কেবল মাস-দুই পূর্ব্বে এ ভাবনা শুধু যে আমার উচিত ছিল, তাই নয়, এ ভাবনায় অধিকার ছিল। আজ দু'মাস পরে সব অধিকার যদি ঘুচে থাকে ত থাক্, সে নালিশ করিনে, এখন শুধু সত্যি কথা জেনে যেতে চাই। এসে পর্য্যন্ত একবার মনে হচ্ছে জিতেচ, একবার মনে হচ্ছে হেরেচ। আমার মনটা ত তোমার অজানা নেই—একবার সত্যি করে বল ত অচলা, কি?

দুর্নিবার অশ্রুর ঢেউ অচলার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল; কিন্তু প্রাণপণে তাদের শক্তি প্রতিহত করিয়া অচলা প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি বেশ আছি!

সুরেশ ধীরে ধীরে কহিল, ভালই।

ইহার পরে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই যেন কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। সুরেশ অকস্মাৎ যেন চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আর একটা কথা। তোমার জন্যে যে আমি কত সয়েছি, সে কি তোমার কখনো—

অচলা দুই কানে অঙ্গুলি দিয়া বলিয়া উঠিল, এ-সমস্ত আলোচনা আপনি মাপ করবেন।

সুরেশ খোলা দরজায় দুই হাত প্রসারিত করিয়া অচলার পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া বলিল, না, মাপ আমি করতেই পারিনে, তোমাকে শুনতেই হবে।

তাহার চোখে সেই দৃষ্টি—যাহা মনে পড়িলে আজও অচলা শিহরিয়া ওঠে। একটুখানি পিছাইয়া গিয়া সভয়ে কহিল, আচ্ছা বলুন—

সুরেশ কহিল, ভয় নেই, তোমার গায়ে আমি হাত দেব না—আমার এখনো সে জ্ঞান আছে। বলিয়া পুনরায় চৌকির উপরে বসিয়া পড়িয়া কহিল, এই কথাটা তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে, আমি তোমার ওপর সমস্ত অধিকার হারালেও, আমার ওপর তোমার সেই অধিকার বর্ত্তমান আছে।

অচলা বাধা দিয়া কহিল, এ মনে রাখায় আমার কোন লাভ নেই—কিন্তু—, বলিতে বলিতে দেখিতে পাইল কথাটা যেন সজোরে আঘাত করিয়া সুরেশকে পলকের জন্য বিবর্ণ করিয়া ফেলিল এবং সেই মুহূর্ত্তে নিজেও স্পষ্ট অনুভব করিল অনুতাপের কথা তাহার নিজের পিঠের উপর সজোরে আসিয়া পড়িল।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া এবারে সে কোমল-কণ্ঠে বলিল, সুরেশবাবু, এ-সব কথা আমারও শোনা পাপ, আপনারও বলা উচিত নয়। কেন আপনি এ-সব কথা তুলে আমাকে দুঃখ দিচ্ছেন?

সুরেশ তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, দুঃখ কি পাও অচলা?

অচলার মুখ দিয়া অকস্মাৎ বাহির হইয়া গেল, আমি কি পাষাণ সুরেশবাবু?

সুরেশ তাহার সেই দৃষ্টি অচলার মুখের উপর হইতে নামাইল না বটে, কিন্তু অচলার দুই চক্ষু নত হইয়া পড়িল। সুরেশ ধীরে ধীরে বলিল, ব্যস, এই আমার চিরজীবনের সম্বল রইল অচলা, এর বেশি আর চাইনে। বলিয়া এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া কহিল, তুমি যখন পাষাণ নও, তখন এই শেষ ভিক্ষে থেকে আর আমাকে কিছুতে বঞ্চিত করতে পারবে না। তোমার সুখের ভার যার ওপর ইচ্ছে থাকুক, কিন্তু তোমার হাত থেকে দুঃখই যখন শুধু পেয়ে এসেচি, তখন তোমারও সমস্ত দুঃখের বোঝা আজ থেকে আমার—এই বর আজ মাগি—আমাকে ভিক্ষা দাও। বলিতে বলিতেই অশ্রুভারে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। অচলার চোখ দিয়াও

তাহার বিগত দিবারাত্রের সমস্ত পুঞ্জীভূত বেদনা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এইবার গলিয়া ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনি সময় ঠিক দ্বারের বাহিরেই জুতার শব্দ শোনা গেল এবং পরক্ষণেই মহিম ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে কহিল, কি হে সুরেশ, চা-টা খেলে?

সুরেশ জবাব দিতে পারিল না। সে কোনমতে মুখ নীচু করিয়া কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া ফেলিল, এবং অচলা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতবেগে মহিমের পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। মহিম চৌকাঠের ভিতর এক পা এবং বাহিরে এক পা দিয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

১৭

আপনাকে সংবরণ করিয়া মহিম ঘরে ঢুকিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল।

মানব-চিত্ত যে অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা অসংকোচে ও অবলীলাক্রমে মিথ্যা উদ্ভাবন করিতে পারে, সুরেশের তখন সেই অবস্থা। সে চট্ করিয়া হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল; সলজ্জ হাস্যে উদারভাবে স্বীকার করিল যে, সে বাস্তবিকই ভারি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু মহিম সেজন্য কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করিল না, এমন কি তাহার হেতু পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিল না।

সুরেশ তখন নিজেই নিজের কৈফিয়ৎ দিতে লাগিল। কহিল, যিনি যাই বলুন মহিম, এ আমি জোর করে বলতে পারি যে, এদের চোখে জল দেখলে কোথা থেকে যেন নিজেদের চোখেও জল এসে পড়ে—কিছুতে সামলানো যায় না। আমি না গিয়ে পড়লে কেদারবাবু ত এ-যাত্রা কিছুতেই বাঁচতেন না, কিন্তু বুড়ো আচ্ছা বদ-মেজাজী লোক হে মহিম, একটিমাত্র মেয়ে, তবুও তাকে খবর দিতে দিলে না। বিয়ের দিন থেকে সেই যে ভদ্রলোক চটে আছে, সে চটা আর জোড়া লাগল না। বললুম, যা হবার, সে ত হয়েই গেছে—

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, চা পেয়েচ ত হে?

সুরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ পেয়েছি। কিন্তু বাপের কাছে এ-রকম ব্যবহার পেলে কার চক্ষে না জল আসে বল? পুরুষমানুষই সব সইতে পারে না, এ ত স্ত্রীলোক।

মহিম বলিল, তা বটে। রাত্রে তোমার শোবার কোন ব্যাঘাত হয়নি সুরেশ, বেশ ঘুমোতে পেয়েছিলে? নতুন জায়গা—

সুরেশ তাড়াতাড়ি কহিল, না, নতুন জায়গায় আমার ঘুমের কোন ত্রুটি হয়নি—একপাশেই রাত কেটে গেছে। আচ্ছা মহিম, কেদারবাবু তাঁর অসুখের খবর তোমাদের একেবারেই দিলেন না, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ভেবে দেখ দেখি!

মহিম একান্ত সহজভাবে কহিল, আশ্চর্য্য বৈ কি! বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া কহিল, হাত-মুখ ধুয়ে একটু বেড়াতে বের হবে না কি? যাও ত একটু চটপট সেরে নাও ভাই, আমাকে আবার ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই বেরুতে হবে। এখনও আমার সকালের কাজ-কর্ম্মই সারা হয়নি।

সুরেশ তাহার পুস্তকের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া কহিল, গল্পটা বেশ লাগচে—এটা শেষ করে ফেলি।

তাই কর। আমি ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যেই ফিরে আসচি, বলিয়া মহিম উঠিয়া চলিয়া গেল।

সে পিছন ফিরিবামাত্রই সুরেশ চোখ তুলিয়া চাহিল। মনে হইল, কোন্ অদৃশ্য হস্ত এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার আগাগোড়া মুখখানার উপরে যেন এক পোঁচ লজ্জার কালি মাখাইয়া দিয়াছে।

যে দ্বার দিয়া মহিম বাহির হইয়া গেল, সেই খোলা দরজার প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া সুরেশ কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিল রহিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার অযাচিত জবাবদিহির সমস্ত নিষ্ফলতা ক্রুদ্ধ অভিমানে তাহার সর্ব্বাঙ্গে হুল ফুটাইয়া দংশন করিতে লাগিল।

দুই বন্ধুর কথোপকথন দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া অচলা কান পাতিয়া শুনিতেছিল। মহিম কাপড় ছাড়িবার জন্য নিজের ঘরে ঢুকিবার অব্যবহিত পরেই সে কবাট ঠেলিয়া প্রবেশ করিল।

মহিম মুখ তুলিয়া চাহিতেই অচলা স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আমার বাবা কি তোমার কাছে এমন কিছু গুরুতর অপরাধ করেছেন?

অকস্মাৎ এরূপ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া মহিম জিজ্ঞাসুমুখে নীরব রহিল।

অচলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমার কথাটা বুঝি বুঝতে পারলে না?

মহিম কহিল, না, কথাগুলো প্রিয় না হলেও স্পষ্ট বটে। কিন্তু তার অর্থ বোঝা কঠিন। অন্ততঃ আমার পক্ষে বটে।

অচলা অন্তরের ক্রোধ যথাশক্তি দমন করিয়া জবাব দিল, এ-দুটার কোনটাই তোমার কাছে কঠিন নয়, কিন্তু কঠিন হচ্ছে স্বীকার করা। সুরেশবাবুকে যে কথা তুমি স্বচ্ছন্দে জানিয়ে এলে, সেই কথাটাই আমাকে জানাবার বোধ করি তোমার

সাহস হচ্ছে না। কিন্তু আজ আমি তোমাকে স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমার বাবা কি তোমার কাছে এত তুচ্ছ হয়ে গেছেন যে তাঁর সাংঘাতিক অসুখের খবরটাতে তুমি কান দেওয়া আবশ্যক মনে কর না।

মহিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুবই করি। কিন্তু যেখানে সে আবশ্যক নেই, সেখানে আমাকে কি করতে বল?

অচলা কহিল, কোন্‌খানে আবশ্যক নেই শুনি?

মহিম ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া সহসা কঠোরকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, যেমন এইমাত্র সুরেশের ছিল না। আর যেমন এ নিয়ে তোমারও এতখানি রাগারাগি করে আমার মুখ থেকে কড়া কথা টেনে বার করার প্রয়োজন ছিল না। যাক, আর না। যার তলায় পাঁক আছে, তার জল ঘুলিয়ে তোলা আমি বুদ্ধির কাজ মনে করিনে। বলিয়া মহিম বাহির হইয়া যাইতেছিল, অচলা দ্রুতপদে সম্মুখে আসিয়া পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল সে দাঁত দিয়া সজোরে অধর চাপিয়া রহিল, ঠিক যেন একটা আকস্মিক দুঃসহ আঘাতের মর্মান্তিক চীৎকার সে প্রাণপণে রুদ্ধ করিতেছে মনে হইল। তারপরে কহিল, তোমার বাইরে কি বিশেষ জরুরী কোন কাজ আছে? দু'মিনিট অপেক্ষা করতে পারবে না?

মহিম বলিল, তা পারব।

অচলা কহিল, তা হলে কথাটা স্পষ্ট হয়েই যাক। জল যখন সরে আসে, তখনই পাঁকের খবর পাওয়া যায়, এই না?

মহিম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

অচলা বলিল, নিরর্থক জল ঘুলিয়ে তোলায় আমিও পক্ষপাতী নই, কিন্তু সেই ভয়ে পঙ্কোদ্ধারটাও বন্ধ রাখা কি ভাল? একদিন যদি ঘোলায় ত ঘোলাক না, যদি বরাবরের জন্যে পাঁকের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। কি বল?

মহিম কঠিনভাবে কহিল, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী দরকারি কাজ আমার পড়ে রয়েচে—এখন সময় হবে না।

অচলা ঠিক তেমনি কঠিন-কণ্ঠে জবাব দিল, তোমার এই ঢের বেশি দরকারি কাজ সারা হয়ে গেলে ফুরসুত হবে ত? ভাল, ততক্ষণ আমি না হয় অপেক্ষা করেই রইলুম। বলিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মহিম ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পরে কপাট বন্ধ করিয়া দিল।

ঘণ্টা-খানেক পরে যখন স্নান করিবার প্রসঙ্গ লইয়া বাহিরে সুরেশের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মুখের শ্রান্ত শোকাচ্ছন্ন চেহারা সুরেশ চোখ তুলিবামাত্র

অনুভব করিল। মহিমের সঙ্গে ইতিমধ্যে নিশ্চয় কিছু একটা ঘটিয়া গিয়াছে, ইহা অনুমান করিয়া সুরেশ মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সাহস করিয়া প্রশ্ন করিতে পারিল না।

অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও কি হচ্চে?

সুরেশ ব্যাগের মধ্যে তাহার কল্যকার ব্যবহৃত জামা-কাপড়গুলি গুছাইয়া তুলিতেছিল, কহিল, একটার মধ্যেই ত ট্রেন, একটু আগেই ঠিক করে নিচ্চি।

অচলা একটুখানি আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, আপনি কি আজই যাবেন না কি?

সুরেশ মুখ না তুলিয়াই কহিল, হাঁ।

অচলা কহিল, কেন বলুন ত?

সুরেশ তেমনি অধোমুখে থাকিয়াই বলিল, আর থেকে কি হবে? তোমাদের একবার দেখতে এসেছিলুম, দেখে গেলুম।

অচলা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, তবে উঠে আসুন। এ-সব কাজ আপনাদের নয়, মেয়েমানুষের; আমি গুছিয়ে সমস্ত ঠিক করে দিচ্ছি। বলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেই সুরেশ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, না না, তোমাকে কিছুই করতে হবে না—এ কিছুই নয়—এ অতি—

কিন্তু তাহার মুখের কথা শেষ না হইতেই অচলা ব্যাগটা তাহার সুমুখ হইতে টানিয়া লইয়া সমস্ত জিনিষ-পত্র উপুড় করিয়া ফেলিয়া ভাঁজ করা কাপড় আর একবার ভাঁজ করিয়া ধীরে ধীরে ব্যাগের মধ্যে তুলিতে লাগিল। সুরেশ অদূরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল, এর কিছুই আবশ্যক ছিল না—সে যদি- আমি নিজেই- ইত্যাদি ইত্যাদি।

অচলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথারই প্রত্যুত্তর করিল না, ধীরে ধীরে কাজ করিতে করিতে কহিল, আপনার ভগিনী কিংবা স্ত্রী থাকলে ত তাঁরাই করতেন, আপনাকে করতে দিতেন না; কিন্তু আপনার ভয়, যদি বন্ধুটি ফিরে এসে দেখতে পান—এই না? কিন্তু তাতেই বা কি, এ ত মেয়েমানুষেরই কাজ।

সুরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এইমাত্র মহিমের সহিত তাহার যাহা হইয়া গিয়াছে, অচলা তাহা নিশ্চয়ই জানে না। তাই কথাটা পাড়িয়া তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিতেও তাহার সাহস হইল না, অথচ ভয় করিতেও লাগিল, পাছে সে আসিয়া পড়িয়া আবার স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া ফেলে।

ব্যাগটি পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিয়া অচলা আস্তে আস্তে বলিল, বাবার অসুখের কথাটা না তুললেই ছিল ভাল। এতে তাঁর অপমানই শুধু সার হ'ল—উনি ত গ্রাহ্যই করলেন না।

সুরেশ চকিত হইয়া কহিল, কে বললে তোমাকে মহিম ?

অচলা তাহার ঠিক জবাব না দিয়া পাশের দরজাটা চোখ দিয়া দেখাইয়া কহিল, ঐখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজেই সমস্ত শুনেচি।

সুরেশ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল, সেজন্য আমি তোমার কাছে মাপ চাচ্ছি অচলা।

অচলা মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, কেন ?

সুরেশ অনুতপ্ত-কণ্ঠে কহিল, কারণ ত তুমি নিজেই বললে। আমার নিজের দোষে তাঁকে তোমাকে দু'জনকে আজ আমি অপমান করেচি। সেই জন্যেই তোমার কাছে বিশেষ করে ক্ষমা প্রার্থনা করচি অচলা।

অচলা মুখ তুলিয়া চাহিল! সহসা তাহার সমস্ত চোখ-মুখ যেন ভিতরের আবেগে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; কহিল, যাই কেন না আপনি করে থাকেন সুরেশবাবু, সে ত আমার জন্যেই করেচেন? আমাকে লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যই ত আজ আপনার এই লজ্জা। তবুও আমার কাছে আপনাকে মাপ চাইতে হবে, এত বড় অমানুষ আমি নই। কিসের জন্যে আপনি লজ্জিত হচ্ছেন? যা করেচেন, বেশ করেচেন।

সুরেশের হতবুদ্ধিপ্রায় মুখের পানে চাহিয়া অচলা বুঝিল, সে তাহার কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। তাই এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, আজই আপনি যাবেন না সুরেশবাবু! এখানে লজ্জা যদি কিছু পেয়ে থাকেন সে ত আমারই লজ্জা ঢাকবার জন্যে; নইলে নিজের জন্যে আপনার ত কোন দরকারই ছিল না। আর বাড়ি আপনার বন্ধুর একার নয়, এর ওপর আমারও ত কিছু অধিকার আছে। সেই জোরে আমি নিমন্ত্রণ করচি, আমার অতিথি হয়ে অন্ততঃ আর কিছুদিন থাকুন।

তাহার সাহস দেখিয়া সুরেশ অভিভূত হইয়া গেল! কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হৃদয়ে কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই দেখিতে পাইল, মহিম তাহার বাহিরের কাজ সারিয়া বাড়ি ঢুকিতেছে।

অচলা তখন পর্য্যন্ত ব্যাগটা সম্মুখে লইয়া মেঝের উপর বসিয়া এই দিকে পিছন ফিরিয়াছিল, পাছে মহিমের আগমন জানিতে না পারিয়া আরও কিছু বলিয়া ফেলে, এই ভয়ে সে একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া বলিয়া উঠিল, এই যে মহিম, কাজ সারা হল তোমার ?

হাঁ হ'ল, বলিয়া মহিম ঘরে পা দিয়াই অচলাকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, ও কি হচ্ছে ?

অচলা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া সুরেশকেই লক্ষ্য

করিয়া পূর্ব্ব-প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া কহিল, আপনি আমারও বন্ধু—শুধু বন্ধুই বা কেন, আমাদের যা করেচেন, তাতে আপনি আমার পরমাত্মীয়। এমন করে চলে গেলে আমার লজ্জার সীমা থাকবে না। আজ আপনাকে ত আমি কোন-মতেই ছেড়ে দিনে পারব না।

সুরেশ শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, শোন কথা মহিম! তোমাদের দেখতে এসেছিলুম, দেখে গেলুম, ব্যাস্। কিন্তু এ জঙ্গলের মধ্যে আমাকে অনর্থক বেশিদিন ধরে রেখে তোমাদেরই বা লাভ কি, আর আমারই বা কষ্ট সহ্য করে ফল কি বল?

মহিম ধীরভাবে জবাব দিল, বোধ করি রাগ করে চলে যাচ্ছিলে, কিন্তু সেটা উনি পছন্দ করেন না।

অচলা তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে কহিল, তুমি পছন্দ কর নাকি?

মহিম জবাব দিল, আমার কথা ত হচ্ছে না।

সুরেশ মনে মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তাই এই অপ্রিয় আলোচনা কোনমতে থামাইয়া দিবার জন্য প্রফুল্লতার ভান করিয়া সহাস্যে কহিল, এ কি মিথ্যে অপবাদ দেওয়া! রাগ করব কেন হে, আচ্ছা লোক ত তোমরা! বেশ, খুশীই যদি হও, আরও দু-একদিন না হয় থেকেই যাবো। বৌঠান, কাপড়গুলো আর তুলে কাজ নেই, বের করেই ফেলো। মহিম, চল হে, তোমাদের পুকুর থেকে আজ স্নান করেই আসা যাক্; তার পরে বাড়ি গিয়ে না হয় একশিশি কুইনিনই গেলা যাবে।

চল, বলিয়া মহিম জামা-কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৮

যাহারা নূতন জুতার সুতীক্ষ্ণ কামড় গোপনে সহ্য করিয়া বাহিরে স্বচ্ছন্দতার ভান করে ঠিক তাদের মতই সুরেশ সমস্ত দিনটা হাসিখুশীতে কাটাইয়া দিল; কিন্তু আর একজন, যাহাকে আরও গোপনে এই দংশনের অংশ গ্রহণ করিত হইল, সে পারিল না।

স্বামীর অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের কাছে এই কদাকার ভাঁড়ামিতে, এত বেহায়াপনায় তাহার ক্ষোভে অপমানে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তাঁহাকে সে আজও হৃদয়ের দিক হইতে চিনিতে না পারিলেও বুদ্ধির দিক হইতে চিনিয়াছিল। সে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, এই তীক্ষ্ণ-ধীমান অল্পভাষী লোকটির কাছে এ অভিনয় একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, অথচ লজ্জার কালিমা প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন

তাহারি মুখের উপর গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। আজ সকালবেলার পরে মহিম আর বাটীর বাহির হয় নাই, সুতরাং দিনের বেলায় ভাত খাওয়া হইতে শুরু করিয়া রাত্রির লুচি খাওয়া পর্যন্ত প্রায় সমস্ত সময়টাই এইভাবে কাটিয়া গেল।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিছানার উপর ছট্‌ফট্‌ করিয়া অচলা ধীরে ধীরে কহিল, সারারাত্রি আলো জ্বেলে পড়লে আর একজন ঘুমোতে পারে না। তোমার কাছে এটুকু দয়াও কি আর আমি প্রত্যাশা করতে পারিনে?

তাহার কণ্ঠস্বরে মহিম চমকিয়া উঠিয়া এবং তাড়াতাড়ি বাতিটা নামাইয়া দিয়া কহিল, অন্যায় হয়ে গেছে, আমায় মাপ করো। বলিয়া বই বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। এই প্রার্থিত অনুগ্রহলাভের জন্য অচলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল না, কিন্তু ইহা তাহার নিদ্রার পক্ষেও লেশমাত্র সাহায্য করিল না। বরঞ্চ যত সময় কাটিতে লাগিল, এই নিঃশব্দ অন্ধকার যেন ব্যথায় ভারী হইয়া প্রতি মুহূর্তেই তাহার কাছে দুঃসহ হইয়া উঠিতে লাগিল। আর সহিতে না পারিয়া এক সময়ে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, সংসারে ভুল করলেই তার শাস্তি পেতে হয়, এ-কথা কি সত্যি?

মহিম অত্যন্ত সহজভাবে জবাব দিল, অভিজ্ঞ লোকেরা তাই ত বলেন।

অচলা পুনরায় কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, তবে যে ভুল আমরা দু'জনেই করেচি, যার কুফল গোড়া থেকেই শুরু হয়েচে, তার শেষ ফলটা কি-রকম দাঁড়াবে তুমি আন্দাজ করতে পারো?

মহিম কহিল, না।

অচলা কহিল, আমিও পারিনে। কিন্তু ভেবে ভেবে আমি এটুকু বুঝেচি যে, আর সমস্ত ছেড়ে দিলেও শুধু পুরুষমানুষ বলেই এই শাস্তির বেশি ভার পুরুষের বহা উচিত।

মহিম বলিল, আরও একটু ভাবলে দেখতে পাবে, মেয়েমানুষের বোঝা তাতে এক তিল কম পড়ে না। কিন্তু পুরুষটি কে? আমি, না সুরেশ?

অচলা যে শিহরিয়া উঠিল, অন্ধকারের মধ্যেও মহিম তাহা অনুভব করিল।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অচলা ধীরে ধীরে কহিল, তুমি যে একদিন আমাকে মুখের ওপরেই অপমান করতে শুরু করবে, এ আমি ভেবেছিলুম। আর এও জানি, এ জিনিস একবার আরম্ভ হলে কোথায় যে শেষ হয়, তা কেউ বলতে পারে না; কিন্তু আমি ঝগড়া করতেও পারব না, কিংবা বিয়ে হয়েচে বলেই ঝগড়া করে তোমার ঘর করতেও পারব না। কাল হোক, পরশু হোক, আমি বাবার ওখানে ফিরে যাবো।

মহিম কহিল, তোমার বাবা কিন্তু আশ্চর্য্য হবেন।

অচলা বলিল, না। তিনি জানতেন বলেই আমাকে বারংবার সাবধান করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, এর ফল কোনদিন ভাল হবে না। কলকাতায় চলে, কিন্তু পল্লীগ্রামে সমাজ, আত্মীয়, বন্ধু সকলকে ত্যাগ করে শুধু স্ত্রী নিয়ে কারও বেশি দিন চলে না। সুতরাং তিনি আর যাই হোন, আশ্চর্য্য হবেন না।

মহিম কহিল, তবে তাঁর নিষেধ শোনোনি কেন?

অচলা প্রাণপণ-বলে একটা উচ্ছ্বসিত শ্বাস দমন করিয়া লইয়া কহিল, আমি ভাবতুম, তুমি কিছু না বুঝে কর না।

সে ধারণা ভেঙে গেছে?

হাঁ।

তাই ভাগের কারবারে সুবিধে হ'লো না টের পেয়ে দোকান তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চাচ্ছো?

হাঁ।

মহিম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তা হলে যেয়ো। কিন্তু একে ব্যবসা বলেই যদি বুঝতে শিখে থাকো, আমার সঙ্গে তোমার মতের মিল হবে না, কিন্তু এ-কথাটাও ভুলো না যে, ব্যবসা জিনিসটাকে বুঝতে সময় লাগে। সে ভুল যদি কখনো ধরা পড়ে আমাকে জানিয়ো, আমি তখনি গিয়ে নিয়ে আসব।

অচলার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল; হাত দিয়া তাহা সে মুছিয়া ফেলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া কণ্ঠস্বরকে সংযত করিয়া বলিল, ভুল মানুষের বার বার হয় না। তোমার সে কষ্ট স্বীকার করবার দরকার হবে মনে করিনে।

মহিম কহিল, মনে করা যায় না বলেই তাকে ভবিষ্যৎ বলা হয়। সেই ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের জন্যে রেখে আজ আমাকে মাপ কর, আমি আর বকতে পারচিনে।

অচলা আঘাত পাইয়া বলিল, আমাকে কি তুমি তামাসা করচ? তা যদি হয়, তোমার ভুল হচ্চে। আমি সত্যই কাল-পরশু চলে যেতে চাই।

মহিম কহিল, আমি সত্যিই তোমাকে যেতে দিতে চাইনে।

অচলা হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে রাখবে? সে তুমি কিছুতেই পারো না, জানো?

মহিম শান্ত সহজভাবে জবাব দিল, বেশ ত, সেও ত আজই রাত্রে নয়। কাল-পরশু যখন যাবে, তখন বিবেচনা করে দেখলেই হবে। ঢের সময় আছে, আজ এই পর্য্যন্ত থাক্‌। বলিয়া সে মাথার বালিশটা উল্টাইয়া লইয়া সমস্ত প্রসঙ্গ জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া, নিশ্চিন্তভাবে শয়ন করিল এবং বোধ করি বা পরক্ষণেই ঘুমাইয়া

পরদিন সকালে চা খাইতে বসিয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, মহিম ত মাঠের চাষবাস দেখতে আজও ভোরে বেরিয়ে গেছে বোধ হয় ?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে গেলেও তার অন্যথা হবার জো নেই।

সুরেশ চায়ের বাটিটা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, এক হিসেবে সে আমাদের চেয়ে ঢের ভাল। তার কাজের একটা গতি আছে, যা কলের চাকার মত যতক্ষণ দম আছে ততক্ষণ চলবেই।

অচলা কহিল, কলের মত হওয়াটাই কি আপনি ভাল বলেন ?

সুরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, তা বলি, কেন না, এ ক্ষমতা আমার নিজের সাধ্যাতীত। দুর্ব্বল হওয়ার যে কত দোষ, সে ত আমি জানি। তাই, যে স্থিরচিত্ত তাকে আমি প্রশংসা না করে পারিনে। কিন্তু আজ আমাকে ছুটি দাও, আমি বাড়ি যাই।

অচলা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, যান। আমি কাল যাচ্ছি।

সুরেশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তুমি কোথায় যাবে কাল ?

কলকাতায়।

হঠাৎ কলকাতায় কেন ? কৈ, কাল এ মতলব ত শুনিনি ?

বাবার অসুখ, তাই তাঁকে একবার দেখতে যাবো।

সুরেশের মুখের উপর উদ্বেগের ছায়া পড়িল, অসুস্থ বাবাকে হঠাৎ দেখবার ইচ্ছে হওয়া কিছু সংসারে আশ্চর্য্য ঘটনা নয়, কিন্তু ভয় হয়, পাছে বা আমার জন্যেই একটা রাগারাগি করে—

অচলা তাহার কোন জবাব দিল না। যদু সুমুখ দিয়া যাইতেছিল, সুরেশ ডাকিয়া কহিল, তোর বাবু মাঠ থেকে ফিরেছেন রে ?

যদু কহিল, তিনি আজ সকালে বার হননি। তাঁর পড়বার ঘরে ঘুমোচ্চেন।

অচলা তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বারের বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, মহিম একটা চেয়ারের উপর হেলান দিয়া বসিয়া দুই পা টেবিলের উপরে তুলিয়া দিয়া ঘুমাইতেছে। একটা লোক রাত্রের অতৃপ্ত নিদ্রা এইভাবে পোষাইয়া লইতেছে, সংসারে ইহা একান্ত অদ্ভুত নহে, কিন্তু অচলার বাস্তবিকই বিস্ময়ের অবধি রহিল না, যখন সে স্বচক্ষে দেখিল, তাহার স্বামী দিনের কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া এই অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। সে পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া চুপ করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া প্রভাতের অপর্য্যাপ্ত আলোক সেই নিদ্রামগ্ন মুখের উপর পড়িয়াছিল। আজ অকস্মাৎ এতদিন পরে তাহার চোখের উপর এমন একটা নতুন জিনিস পড়িল যাহা ইতিপূর্ব্বে কোনদিন সে দেখে নাই। আজ

দেখিল, শান্ত মুখের উপর যেন একখানা অশান্তির সূক্ষ্ম জাল পড়িয়া আছে; কপালের উপর যে কয়েকটা রেখা পড়িয়াছে, এক বৎসর পূর্ব্বেও সেখানে সে-সকল দাগ ছিল না। সমস্ত মুখের চেহারাটাই আজ যেন তাহার মনে হইল, কিসের গোপন ব্যথায় শ্রান্ত, পীড়িত। সে নিঃশব্দে আসিয়াছিল, নিঃশব্দেই চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু পিকদানিটা পায়ে ঠেকিয়া যেটুকু শব্দ হইল তাহাতেই মহিম চোখ মেলিয়া চাহিল। অচলা অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, এখন ঘুমাচ্চো যে? অসুখ করেনি ত?

মহিম চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি জানি, অসুখ না হওয়াই ত আশ্চর্য্য।

অচলা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পরেই সুরেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, মহিম অদূরে একখানা চৌকির উপর বসিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল; অচলা দ্বারের নিকটে আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিয়া উঠিল, কাল আমিও যাচ্ছি। সুবিধে হলে বাবার সঙ্গে দেখা করবেন।

সুরেশ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, তাই নাকি? বলিয়াই মহিমের মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বৌঠানকে তুমি কালই কলকাতা পাঠাচ্ছ নাকি মহিম?

স্ত্রীর এই গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতায় মহিমের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু সে মুখের ভাব প্রসন্ন রাখিয়াই মৃদু হাসিয়া বলিল, আর কোন বাধা ছিল না, কিন্তু আমাদের এই পল্লীগ্রামের গৃহস্থঘরে নাটক তৈরী করার রীতি নেই। কালই বা কেন, আজই ত তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারতুম।

সুরেশের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল; অচলা চক্ষের পলকে তাহা লক্ষ্য করিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, সুরেশবাবু, আমাদের সহরে বাড়ি বলে লজ্জিত হবার কারণ নেই। অসুস্থ বাপ-মাকে দেখতে যাওয়া যদি পাড়াগাঁয়ের রীতি না হয়, আমি ত বলি আমাদের সহরের নাটকই ঢের ভাল। আপনি না হয় আজকের দিনটেও থেকে যান না, কাল না হয় একসঙ্গেই যাবো!

তাহার অপরিসীম ঔদ্ধত্যে সুরেশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে মাথা হেঁট করিয়া বলিতে লাগিল, না, না, আমার আর থাকবার জো নেই বৌঠান। তোমার ইচ্ছে হলে কাল যেয়ো, কিন্তু আমি আজই চললুম। বলিতে বলিতেই সে তীব্র উত্তেজনায় হঠাৎ ব্যাগটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার উত্তেজনার আবেগ অচলাকেও একবার যেন মূল হইতে নাড়িয়া দিল।

সে অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, এখনও ট্রেনের অনেক দেরি সুরেশবাবু, এরি মধ্যে যাবেন না—একটু দাঁড়ান। আমার দুটো কথা দয়া করে শুনে যান। তাহার আর্ত্ত কণ্ঠস্বরের আকুল অনুরোধে উভয় শ্রোতাই যুগপৎ চমকিয়া উঠিল।

অচলা কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, তোমার আমি কোন কাজেই লাগলুম না সুরেশবাবু; কিন্তু তুমি ছাড়া আর আমাদের অসময়ের বন্ধু কেউ নেই। তুমি বাবাকে গিয়ে ব'লো, এরা আমাকে বন্ধ করে রেখেচে, কোথাও যেতে দেবে না—আমি এখানে মরে যাবো। সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসিনে, তার ঘর করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিয়ো না।

মহিম বিহ্বলের ন্যায় নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

সুরেশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষু দৃপ্ত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি জানো মহিম, উনি ব্রাহ্ম-মহিলা। নামে স্ত্রী হলেও ওঁর ওপর পাশবিক বলপ্রয়োগের তোমার অধিকার নেই।

মহিম মুহূর্ত্তকালের জন্যই অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। সে আত্মসংবরণ করিয়া শান্তস্বরে স্ত্রীকে কহিল, তুমি কিসের জন্যে কি করচ, একবার ভেবে দেখ দিকি অচলা! সুরেশকে কহিল, পশু-বল, মানুষ-বল, কোন জোরই কারও উপর কোন দিন খাটাইনে। বেশ ত সুরেশ, তুমি যদি থাকতে পার, আজকের দিনটা থেকে ওঁকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাও না। আমি নিজে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব—তাতে গ্রামের মধ্যে বিশেষ দৃষ্টিকটুও হবে না। একটুখানি থামিয়া বলিল, একটু কাজ আছে, এখন চললুম। সুরেশ, যাওয়া যখন হ'লই না, তখন কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেল। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসচি। বলিয়া ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অচলা মূর্ত্তির মত চৌকাঠ ধরিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। সুরেশ মিনিট-খানেক হেটমুখে থাকিয়া হঠাৎ অট্টহাসি হাসিয়া বলিল, বাঃ রে, বা। বেশ একটি অঙ্ক অভিনয় করা গেল! তুমিও মন্দ করনি, আমি ত চমৎকার! ওর বাড়িতে ওর স্ত্রী নিয়ে ওকেই চোখ রাঙিয়ে দিলুম! আর চাই কি? আর বন্ধু আমার মিষ্টিমুখে একটু হেসে ঠিক যেন বাহবা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি বাজি রেখে বলতে পারি অচলা, ও আড়ালে শুধু গলা ছেড়ে হো হো করে হাসবার জন্যেই কাজের ছুতো করে বেরিয়ে গেল। যাক, আরসিখানা একবার আন ত বৌঠান, দেখি নিজের মুখের চেহারা কি-রকম দেখাচ্চে! বলিয়া চাহিয়া দেখিল, অচলার মুখখানা একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। সে কোন জবাব দিল না, শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

১৯

যে শয্যা স্পর্শ করিতেও আজ অচলার ঘৃণা বোধ হওয়া উচিত ছিল, তাহাই যখন সে যথা-নিয়মে প্রস্তুত করিতে অপরাহ্নবেলায় ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সমস্ত মনটা যে তাহার কোথায় এবং কি অবস্থায় ছিল—মানব-চিত্ত সম্বন্ধে যাঁহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারই অগোচর রহিবে না।

যন্ত্র-চালিতের মত অভ্যস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া ফিরিবার মুখে পাশের ছোট টেবিলটির প্রতি অকস্মাৎ তার চোখ পড়িয়া গেল; এবং ব্লটিং প্যাডখানির উপর প্রসারিত একখানি ছোট্ট চিঠি সে চক্ষের নিমেষে পড়িয়া ফেলিল। মাত্র একটি ছত্র। বার, তারিখ নাই, মৃণাল লিখিয়াছে—সেজদামশাই গো, করচ কি? পরশু থেকে তোমায় পথ চেয়ে চেয়ে তোমার মৃণালের চোখ দুটি ক্ষয়ে গেল যে!

বহুক্ষণ অবধি অচলার চোখের পাতা পড়িল না। ঠিক পাথরে-গড়া মূর্ত্তির পলকবিহীন দৃষ্টি সেই একটি ছত্রের উপর পাতিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ চিঠি কবেকার, কখন, কে আনিয়া দিয়া গেছে—সে কিছুই জানে না। মৃণালের বাটী কোন্ দিকে, কোন্ মুখে তাহার বাড়ি ঢুকিতে হয়, কোন্ পথটার উপর, কিজন্য সে এমন করিয়া তাহার ব্যগ্র উৎসুক দৃষ্টি পাতিয়া রাখিয়াছে, তাহার কিছুই জানিবার জো নাই। সম্মুখের এই কটি কালির দাগ শুধু এই খবরটুকু দিতেছে যে, কোন্ এক পরশু হইতে একজন আর একজনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া চোখ নষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু দেখা মিলে নাই।

এদিকে সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া, তাহার নিজের চোখ-দুটি বেদনায় পীড়িত এবং কালো কালো অক্ষরগুলা প্রথমে ঝাপ্‌সা এবং পরে যেন ছোট ছোট পোকার মত সমস্ত কাগজময় নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তবুও এমনি একভাবে দাঁড়াইয়া হয়ত সে আর কতক্ষণ চাহিয়া থাকিত; কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে এতক্ষণ ধরিয়া তাহার ভিতরে ভিতরে যে নিশ্বাসটা উত্তরোত্তর জমা হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই যখন অবরুদ্ধ স্রোতের বাঁধ ভাঙার ন্যায় অকস্মাৎ গর্জ্জিয়া বাহির হইয়া আসিল, তখন সেই শব্দে সে চমকিয়া সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। দ্বারের বাহিরে মুখ তুলিয়া দেখিল, সন্ধ্যায় আঁধার প্রাঙ্গণতলে নামিয়া আসিয়াছে এবং যদু চাকর হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালাইয়া বাহিরের ঘরে দিতে চলিয়াছে। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু ফিরে এসেচেন, যদু?

যদু কহিল, না মা, কৈ, এখনও ত তিনি ফেরেন নি।

এতক্ষণে অচলার মনে পড়িল, দুপুরবেলায় সেই লজ্জাকর অভিনয়ের একটা অঙ্ক

শেষ হইলে, সেই যে তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন, এখনও ফিরেন নাই। স্বামীর প্রাত্যহিক গতিবিধি সম্বন্ধে আজ তাহার তিলমাত্র সংশয় রহিল না। সুরেশের আসা পর্য্যন্ত এমনই একটা উৎকট ও অবিচ্ছিন্ন কলহের ধারা এ-বাটীতে প্রবাহিত হইয়াছিল যে, তাহারই সহিত মাতামাতি করিয়া অচলা আর সব ভুলিয়াছিল। সে স্বামীকে ভালবাসে না, অথচ ভুল করিয়া বিবাহ করিয়াছে, সারাজীবন সেই ভুলেরই দাসত্ব করার বিরুদ্ধে তাহার অশান্ত চিত্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অহর্নিশি লড়াই করিতেছিল। মৃণালের কথাটা সে একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াই গিয়াছিল, কিন্তু আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই মৃণালের একটিমাত্র ছত্র তাহার সমস্ত পুরাতন দাহ লইয়া যখন উল্টা-স্রোতে ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন এক মুহূর্ত্তে প্রমাণ হইয়া গেল, তাহার সেই ভুল-করা স্বামীরই অন্য-নারীতে আসক্তির সংশয় হৃদয় দগ্ধ করিতে সংসারে কোন চিন্তার চেয়েই খাটো নয়।

লেখাটুকু সে আর একবার পড়িবার জন্য চোখের কাছে তুলিয়া ধরিতে হাত বাড়াইল, কিন্তু নিবিড় ঘৃণায় হাতখানা তাহার আপনি ফিরিয়া আসিল। সে চিঠি সেইখানেই তেমনি খোলা পড়িয়া রহিল, অচলা ঘরের বাহিরে আসিয়া, বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল—সব মিথ্যা। এই ঘর-দ্বার, স্বামী-সংসার, খাওয়া-পরা, শোওয়া-বসা কিছুই সত্য নয়—কোন কিছুর জন্যেই মানুষের তিলার্দ্ধ হাত-পা বাড়াইবার পর্য্যন্ত আবশ্যকতা নাই। শুধু মনের ভুলেই মানুষে ছট ফট করিয়া মরে, না হইলে পল্লীগ্রাম সহরই বা কি, খড়ের ঘর রাজপ্রাসাদই বা কি, স্বামী-স্ত্রী, বাপ-মা, ভাই-বোন সম্বন্ধই বা কোথায়। আর কিসের জন্যেই বা রাগা-রাগি, কান্না-কাটি, ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া মরা। দুপুরবেলায় অত বড় কাণ্ডের পরেও যে-স্বামী স্ত্রীকে একলা ফেলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চিন্ত হইয়া বাহিরে কাটাইতে পারে, তাহার মনের কথা যাচাই করিবার জন্যেই বা এত মাথাব্যথা কেন? সমস্ত মিথ্যা! সমস্ত ফাঁকি! মরীচিকার মতই সমস্ত অসত্য! কিন্তু সংসার তাহার কাছে এতদূর খালি হইয়া যাইতে পারিত না, একবার যদি সে মৃণালের ঐ ভাষাটুকুর উপরে তাহার সমস্ত চিত্ত ঢালিয়া না দিয়া সেই মৃণালকে একবার ভাবিবার চেষ্টা করিত। অন্য নারীর সহিত সেই পল্লীবাসিনী সদানন্দময়ীর আচরণ একবার মনে করিয়া দেখিলে তার নিজের মনটাকে ঐ কটা কথার কালিমাই এমন করিয়া কালো করিয়া দিতে বোধ করি পারিত না।

যদু ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, চায়ের জল গরম হয়েছে কি?

অচলা ঠিক যেন ঘুম ভাঙিয়া উঠিল, কহিল, কোন্ বাবু?

যদু জোর দিয়া বলিল, আমাদের বাবু। এইমাত্র তিনি ফিরে এলেন যে। চায়ের জল ত অনেকক্ষণ গরম হয়ে গেছে মা।

চল যাচ্চি, বলিয়া অচলা রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। খানিক পরে চা এবং জলখাবার চাকরের হাতে দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, মহিম অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করিতেছে এবং সুরেশ ঘরের মধ্যে লণ্ঠনের কাছে মুখ লইয়া একমনে খবরের কাগজ পড়িতেছে। যেন কেহই কাহারো উপস্থিতি আজ জানিতেও পারে নাই। এই যে অত্যন্ত লজ্জাকর সঙ্কোচ দুটি চিরদিনের বন্ধুর মাঝখানে আজ সহজ শিষ্টাচারের পথটা পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহার উপলক্ষটা মনে পড়িতেই অচলার পা দুটা আপনি থামিয়া গেল।

অচলাকে দেখিয়া মহিম থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সুরেশকে চা দিতে এত দেরি হ'ল যে?

অচলার মুখ দিয়া কিছুতেই কথা বাহির হইল না। সে মুহূর্ত্তকাল মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, নীরবে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যদু চায়ের সরঞ্জাম টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলে, সুরেশ কাগজখানা রাখিয়া দিয়া মুখ ফিরাইল, কহিল, মহিম কৈ, সে এখনো ফেরেনি নাকি?

সঙ্গে সঙ্গেই মহিম প্রবেশ করিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল, কিন্তু সে যে মিনিট-দশকে ধরিয়া তাহারই কানের কাছে বারান্দার উপরে হাঁটিয়া বেড়াইতেছিল, এই বাহুল্য কথাটা মুখ দিয়া উচ্চারণ করার প্রয়োজন বোধ করিল না।

তার পরেই সমস্ত চুপ-চাপ। অচলা নিঃশব্দে অধোমুখে দু'বাটি চা প্রস্তুত করিয়া এক বাটি সুরেশকে দিয়া, অন্যটা স্বামীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া নীরবেই উঠিয়া যাইতেছিল, মহিমের আহ্বানে সে চমকিয়া দাঁড়াইল।

মহিম কহিল, একটু অপেক্ষা কর, বলিয়া নিজেই চট করিয়া উঠিয়া কপাটে খিল লাগাইয়া দিল। চক্ষের নিমিষে তাহার ছয় নলা পিস্তলটার কথাই সুরেশের স্মরণ হইল; এবং হাতের পেয়ালা কাঁপিয়া উঠিয়া খানিকটা চা চলকাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। সে মুখখানা মড়ার মত বিবর্ণ করিয়া বলিল, দোর বন্ধ করলে যে?

তাহার কণ্ঠস্বর, মুখের চেহারা ও প্রশ্নের ভঙ্গিতে অচলারও ঠিক সেই কথাই মনে পড়িয়া মাথার চুল পর্য্যন্ত কাঁটা দিয়া উঠিল। বোধ করি বা একবার যেন সে চীৎকার করিবারও প্রয়াস করিল, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হইল না। মহিম ক্ষণকালমাত্র অচলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্ত বুঝিল। তার পর সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, চাকরটা না এসে পড়ে এই জন্যেই—নইলে পিস্তলটা

আমার চিরকাল যেমন বাক্সে বন্ধ থাকে, এখনো তেমনি আছে। তোমরা এত ভয় পাবে জানলে আমি দোর বন্ধ করতাম না।

সুরেশ চায়ের পোয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া হাসিবার মত মুখের ভাব করিয়া বলিল, বাঃ, ভয় পেতে যাবো কেন হে? তুমি আমার উপর গুলি চালাবে বাঃ—প্রাণের ভয়! আমি? কবে আবার তুমি দেখলে? আচ্ছা যা হোক—

তাহার অসংলগ্ন কৈফিয়ৎ শেষ হইবার পূর্ব্বেই মহিম কহিল, সত্যই কখনো ভয় পেতে তোমাকে দেখিনি। প্রাণের মায়া তোমার নেই বলেই আমি জানতাম। সুরেশ, আমার নিজের দুঃখের চেয়ে তোমার এই অধঃপতন আমার বুকে আজ বেশি করে বাজল। যাতে তোমার মত মানুষকেও এত ছোট করে আনতে পারে—না, সুরেশ, কাল তুমি নিশ্চয় বাড়ি যাবে। কোন ছলে আর দেরি করা চলবে না।

সুরেশ তবুও কি একটা জবাব দিতে চাহিল; কিন্তু এবার তাহার গলা দিয়া স্বরও ফুটিল না, ঘাড়টা সোজা করিতেও পারিল না; সেটা যেন তাহার অজ্ঞাতসারেই ঝুঁকিয়া পড়িল।

তুমি ভেতরে যাও অচলা, বলিয়া মহিম খিল খুলিয়া পরক্ষণেই অন্ধকারের মধ্যে বাহির হইয়া গেল।

এইবার সুরেশ মাথা তুলিয়া জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, শোন কথা। অমন কত গণ্ডা বন্দুক-পিস্তল রাত-দিন নাড়াচাড়া করে বুড়ো হয়ে এলুম, এখন ওর একটা ভাঙা ফুটো রিভলভারের ভয়ে মরে গেছি আর কি! হাসালে যা হোক, বলিয়া সুরেশ নিজেই টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। সে হাসিতে যোগ দিবার মত লোক ঘরের মধ্যে অচলা ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে কিন্তু যেমন ঘাড় হেঁট করিয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি ভাবেই আরও কিছুকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে পাশের দরজা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে মহিম নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কেহ নাই। পাশের ঘরে দেখিল, মাটিতে মাদুর পাতিয়া, হাতের উপর মাথা রাখিয়া অচলা শুইয়া আছে। স্বামীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল! পাশে একটা খালি তক্তোপোশ ছিল, মহিম তাহার উপর উপবেশন করিয়া বলিল, কেমন, কাল তোমার বাপের বাড়ি যাওয়া ত ঠিক?

অচলা নীচের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না!

মহিম অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনশ্চ কহিল, যাকে ভালবাস না, তারই ঘর করতে হবে, এত বড় অন্যায় উপদ্রব আমি স্বামী হলেও তোমার ওপর করতে পারব না।

কিন্তু অচলা তেমনি পাষাণ-মূর্ত্তির মত নিঃশব্দ স্থির হইয়া রহিল দেখিয়া মহিম

বলিতে লাগিল, কিন্তু তোমার ওপর আমার অন্য নালিশ আছে। আমার স্বভাব ত জানো। শুধু বিয়ের পর থেকেই ত নয়, অনেক আগেই ত আমাকে জানতে যে, আমি সুখ-দুঃখ যাই হোক, নিজের প্রাপ্য ছাড়া এক বিন্দু উপরি পাওনা কখনো প্রত্যাশা করিনে—পেলেও নিইনে। ভালবাসার ওপর ত জোর খাটে না অচলা। না পারলে হয়ত তা দুঃখের কথা, কিন্তু লজ্জার কথা ত নয়। কেন তবে এতদিন কষ্ট পাচ্ছিলে? কেন আমাকে না জানিয়ে ভেবে নিয়েছিলে, আমি জোর করে তোমাকে আটকে রাখবো? কোনদিন কোন বিষয়েই ত আমি জোর খাটাইনি। তাঁরা তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে, তবে তোমার প্রাণ বাঁচবে—আর আমাকে জানালে কি কোন উপায় হ'তো না? তোমার প্রাণের দামটা কি শুধু তাঁরাই বোঝেন।

অচলা অশ্রু-বিকৃত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর যতদূর সাধ্য সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া চুপি চুপি বলিল, তুমিও ত ভালবাসো না।

মহিম আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এ-কথা কে বললে? আমি ত কখনো বলিনি।

অচলার উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না; কহিল, শুধু কথাই কি সব? শুধু মুখের বলাই সত্য, আর সব মিথ্যে? রাগের মাথায় মনের কষ্টে যা-কিছু মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকেই কেবল সত্যি ধরে নিয়েই তুমি জোর খাটাতে চাও? তোমার মতন নিক্তির ওজনে কথা বলতে না পারলেই কি তার মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে? বলিতে বলিতেই তার গলা ধরিয়া প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মহিম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল, তার মানে?

অচলা উচ্ছ্বসিত রোদন চাপিয়া বলিল, মনে করো না তোমার মত সাবধানী লোকেও মিথ্যেকে চিরকাল চাপা দিয়ে রাখতে পারে! তোমারও কত ভুল হতে পারে—দেখ গে চেয়ে, তোমারই টেবিলের ওপর। শুধু আমাদেরই—

মহিম প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি আমার টেবিলের উপর?

অচলা মুখে আঁচল গুঁজিয়া মাদুরের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। তাহার কাছে আর কোন জবাব না পাইয়া মহিম আস্তে আস্তে উঠিয়া তাহার টেবিল দেখিতে গেল। তাহার পড়ার ঘরের টেবিলের উপর খান কতক বই পড়িয়াছিল; প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া সেইগুলা উলটিয়া-পালটিয়া দেখিয়া, তাহার নীচে আশেপাশে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া স্ত্রীর অভিযোগের কিছুমাত্র তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, বিমূঢ়ের ন্যায় ফিরিয়া আসিবার পথে শোবার ঘরটার প্রতি দৃষ্টি পড়ায়, ভিতরে একটা পা দিয়াই মৃণালের সেই চিঠিখানার উপর তাহার চোখ পড়িল। সেখানা হাতে তুলিয়া লইয়া পড়িবামাত্রই অকস্মাৎ অন্ধকারে বিদ্যুৎহানার মতই আজ এক মুহূর্ত্তে মহিম পথ

দেখিতে পাইল। অচলা যে কি ইঙ্গিত করিয়াছে, আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সেটুকু হাতের মধ্যে লইয়া মহিম বিছানার উপর বসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। যেমন করিয়া সে প্রথম দিনটিতে আসিয়াছিল, যেভাবে সে চলিয়া গিয়াছিল, সতীন বলিয়া সে অচলাকে যত পরিহাস করিয়াছে—একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল। পল্লীগ্রামের এইসকল রহস্যালাপের সহিত যে মেয়ে পরিচিত নয়, প্রতিদিন তাহার যে কিরূপ বিঁধিয়াছে, এবং সে নিজেও যখন কোনদিন এই পরিহাসে খোলা মনে যোগ দিতে পারে নাই, বরঞ্চ স্ত্রীর সম্মুখে লজ্জা পাইয়া বারংবার বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে—তাহার সেই লজ্জা যদি এই উচ্চশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী রমণীর ধারণায় অপরাধীর সত্যকার লজ্জা বলিয়া ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়া থাকে ত আজ তাহার মূলোচ্ছেদ করিবে সে কি দিয়া? বাহিরের অন্ধকারের ভিতর হইতেই আজ অনেক সত্য তাহাকে দেখা দিতে লাগিল; কেমন করিয়া অচলার হৃদয় ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া স্বামীর সঙ্গ দিনের পর দিন বিষাক্ত হইয়াছে, কেমন করিয়া স্বামীর আশ্রয় প্রতিমুহূর্তে কারাগার হইয়া উঠিয়াছে, সমস্তই সে যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। এই প্রাণান্তকর অবরোধের মধ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার সেই যে আকুল প্রার্থনা সুরেশের কাছে তখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল—সে যে তাহার অন্তরের কোন্ অন্তরতম দেশ হইতে উত্থিত হইয়াছিল, তাহাও আজ মহিমের মনশ্চক্ষের সম্মুখে প্রচ্ছন্ন রহিল না। অচলাকে সে যথার্থই সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসিয়াছিল। সেই অচলার এতদিন এত কাছে থাকিয়াও, তাহার এত বড় মনোবেদনার প্রতি চোখ বুজিয়া থাকাটাকে সে গভীর অপরাধ বলিয়া গণ্য করিল। কিন্তু এমন করিয়া আর ত একটা মুহূর্তও চলিবে না। স্ত্রীর হৃদয় ফিরিয়া পাইবার উপায় আছে কি না, তাহা কোথায় কত দূরে সরিয়া গিয়াছে, অনুমান করাও আজ দুঃসাধ্য। কিন্তু অনেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও স্বামী বলিয়া যাহাকে সে একদিন আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারই কাছে অপমান এবং লাঞ্ছনা পাইয়া যে আজ তাহাকে ফিরিতে হইতেছে, এত বড় ভুল ত তাহাকে জানানো চাই।

মহিম ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া অচলার দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিল কবাট রুদ্ধ এবং ঠেলিয়া দেখিল, তাহা ভিতর হইতে বন্ধ। আস্তে আস্তে বার দুই ডাকিয়া যখন কোন সাড়া পাইল না, তখন শুধু যে জোর করিয়া শান্তিভঙ্গ করিবারই তাহার প্রবৃত্তি হইল না তাহা নহে, একটা অতি কঠিন পরীক্ষার দায় হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি পাইয়া নিজেও যেন বাঁচিয়া গেল।

মহিম ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল; কিন্তু যাহার অভাবে পার্শ্বের স্থানটা আজ শূন্য পড়িয়া রহিল, ও-ঘরে সে অনশনে মাটিতে পড়িয়া আছে মনে

করিয়া কিছুতেই তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। উঠিয়া গিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহাকে তুলিয়া আনা উচিত কি না, ভাবিতে ভাবিতে দ্বিধা করিতে করিতে অনেক রাত্রে বোধ করি সে কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সহসা মুদ্রিত-চক্ষে তীব্র আলোক অনুভব করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। শিয়রের খোলা জানালা দিয়া এবং চালের ফাঁক দিয়া অজস্র আলোক ও উৎকট ধূমে ঘর ভরিয়া গিয়াছে এবং অত্যন্ত সন্নিকটে এমন শব্দ উঠিয়াছে যাহা কানে প্রবেশমাত্রই সর্ব্বাঙ্গ অসাড় করিয়া দেয়। কোথায় সে আগুন লাগিয়াছে, তাহা নিশ্চয় বুঝিয়াও ক্ষণকালের জন্য সে হাত-পা নাড়িতে পারিল না। কিন্তু সেই কয়েকটা মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মাথার ভিতর দিয়া যেন ব্রহ্মাণ্ড খেলিয়া গেল! লাফাইয়া উঠিয়া, দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, রান্নাঘর এবং যে ঘরে আজ অচলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহারই বারান্দার একটা কোণ বিদীর্ণ করিয়া প্রধূমিত অগ্নিশিখা উপরের সমস্ত জাম গাছটাকে রাঙা করিয়া ফেলিয়াছে। পল্লীগ্রামে খড়ের ঘরে আগুন ধরিলে তাহা নিবাইবার কল্পনা করাও পাগলামি, সে চেষ্টাও কেহ করে না; পাড়ার লোক, যে যাহার জিনিসপত্র ও গরু-বাছুর সরাইতে ছুটাছুটি করে, এবং ভিন্ন পাড়ার লোক একদিকে মেয়েরা এবং একদিকে পুরুষেরা সমবেত হইয়া অত্যন্ত নিরুদ্বেগে হায় হায় করিয়া এবং কি পরিমাণের দ্রব্য-সম্ভার দগ্ধ হইতেছে এবং কি করিয়া এ সর্ব্বনাশ ঘটিল তাহাই আলোচনা করিয়া সমস্ত বাড়িটা ভস্মসাৎ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। তার পরে ঘরে ফিরিয়া হাত-পা ধুইয়া বাকী রাত্রিটুকু বিছানায় গড়াইয়া লইয়া পুনরায় সকালবেলা একে একে গাড়ু হাতে দেখা দেয়; এবং আলোচনার জেরটুকু সকালের মত শেষ করিয়া বাড়ি গিয়া স্নানাহার করে। কিন্তু একজনের গৃহপ্রাঙ্গণের বিরাট ভস্মস্তূপ আর একজনের নিয়মিত জীবনযাত্রায় লেশমাত্র ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে না।

মহিম পল্লীগ্রামের লোক, সকল কথাই সে জানিত। তাই নিরর্থক চেঁচামেচি করিয়া অসময়ে পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল না। বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও ছিল না, কারণ তাহার আম কাঁঠালের এত বড় বাগানটা অতিক্রম করিয়া এই অগ্ন্যুৎপাত যে আর কাহারও গৃহ স্পর্শ করিবে, সে সম্ভাবনা ছিল না। বাহিরের সারে যে কয়টা ঘরে সুরেশ এবং চাকর-বাকরেরা নিদ্রিত ছিল, অগ্নিস্পৃষ্ট হইবার তাহাদের বিলম্ব ছিল। বিলম্ব ছিল না শুধু অচলার ঘরটার। সে তাহারই দ্বারে সজোরে করাঘাত করিয়া ডাকিল, অচলা।

অচলা ঠিক যেন জাগিয়াছিল, এমনিভাবে উত্তর দিল, কেন?

মহিম কহিল, দোর খুলে বেরিয়ে এস।

অচলা শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, কি হবে? আমি ত বেশ আছি।

মহিম কহিল, দেরি করো না, বেরিয়ে এসো—বাড়িতে আগুন লেগেচে।

প্রত্যুত্তরে অচলা একবার ভয়জড়িত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, তার পরে সমস্ত চুপচাপ। মহিমের পুনশ্চ ব্যগ্র আহ্বানে সে আর সাড়াও দিল না। ঠিক এই ভয়ই মহিমের ছিল; কারণ বাটীতে আগুন লাগা যে কি ব্যাপার, তাহার কোন-প্রকার ধারণাই অচলার ছিল না। মহিম ঠিক বুঝিল, ইতিপূর্ব্বে সে চোখ বুজিয়াই কথা কহিতেছিল, কিন্তু চোখ মেলিয়া যে দৃশ্য তাহাকেও কিছুক্ষণের জন্য অবশ করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই অপর্য্যাপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত সমস্ত ঘরটা চোখে পড়িবামাত্র অচলারও সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই দুর্ঘটনার জন্য মহিম প্রস্তুত হইয়াছিল। সে একটা কপাট টানিয়া উঁচু করিয়া হাঁসকলটা খুলিয়া ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং মূর্চ্ছিতা স্ত্রীকে বুকে তুলিয়া লইয়া অবিলম্বে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।

এইবার এই বাটীর অন্য সকলকে সজাগ করিবার জন্য নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সুরেশ পাংশুমুখে বাহির হইয়া আসিল, যদু প্রভৃতি অপর সকলেও দ্বার খুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পরেই একটা প্রচণ্ড শব্দে অচলা সচেতন হইয়া দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ প্রাণপণ-বলে জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মহিম সকলকে লইয়া যখন বাহিরের খোলা জায়গায় আসিয়া পড়িল, তখন বড় ঘরের চালে আগুন ধরিয়াছে। এইবার তাহার মনে পড়িল, অচলার অলঙ্কার প্রভৃতি দামী জিনিস যাহা কিছু আছে, সমস্তই এই ঘরে এবং আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে কিছুই বাঁচানো যাইবে না।

অচলা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, সে সজোরে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না, সে হবে না। প্রতিশোধ নেবার এই কি সময় পেলে? কিছুতেই ওর মধ্যে তোমাকে আমি যেতে দেব না। যাক, সব পুড়ে যাক।

না গেলে চলবে না অচলা, বলিয়া জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া মহিম সেই জমাট ধূমরাশির মধ্যে দ্রুতবেগে গিয়া প্রবেশ করিল। যদু চেঁচাইতে চেঁচাইতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

সুরেশ এতক্ষণ পর্য্যন্ত অভিভূতের মত চাহিয়া অদূরে দাঁড়াইয়াছিল; অকস্মাৎ সম্বিৎ পাইয়া, সে পিছু লইবার উপক্রম করিতেই অচলা তাহার কোঁচার খুঁট ধরিয়া ফেলিয়া কঠোর-কণ্ঠে কহিল, আপনি যান কোথায়?

সুরেশ টানাটানি করিয়া বলিল, মহিম গেল যে—

অচলা তিক্তস্বরে বলিল, তিনি গেলেন তাঁর জিনিস বাঁচাতে। আপনি কে? আপনাকে যেতে আমি কোনমতেই দেব না।

তাঁহার কণ্ঠস্বরে স্নেহের লেশমাত্র সম্পর্ক ছিল না—এ যেন সে অনধিকারীর উৎপাতকে তিরস্কার করিয়া দমন করিল।

মিনিট দুই-তিন পরেই মহিম দুই হাতে দুটা বাক্স লইয়া এবং যদু প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ মাথায় করিয়া উপস্থিত হইল। মহিম অচলার পায়ের কাছে রাখিয়া কহিল, তোমার গহনার বাক্সটা যেন কিছুতে হাতছাড়া করো না, আমরা বাইরের ঘরে যদি কিছু বাঁচাতে পারি, চেষ্টা করিগে।

অচলার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। তাহার মুঠোর মধ্যে তখনো সুরেশের কোঁচার খুঁট ধরা ছিল, তেমনি ধরা রহিল। মহিম পলকমাত্র সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যদুকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

২০

প্রভাতের প্রথম আলোকে স্বামীর মুখের প্রতি চোখ পড়িবামাত্রই অচলার বুকের ভিতরটা হাহা-রবে কাঁদিয়া উঠিল। চোখের জল আর সে কোনমতে সংবরণ করিতে পারিল না। এ কি হইয়াছে! মাথার চুল ধূলাতে, বালুতে, ভস্মে রুক্ষ বিবর্ণ; শীর্ণ বিরস মুখ অগ্ন্যুত্তাপে ঝলসিয়া একটা রাত্রির মধ্যেই তাঁহার অমন সুন্দর স্বামীকে যেন বুড়া করিয়া দিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোক চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া কলরব করিতেছে! পিতল-কাঁসার বাসন-কোসন সে ত সমস্তই গিয়াছে দেখা যাইতেছে। তা যাক—কিন্তু শাল-দোশালা গহনাপত্র তাই বা আর কত ঐ একটিমাত্র তোরঙ্গে রক্ষা পাইয়াছে—এই লইয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সমালোচনা চলিতেছে। ইহাদেরই একটু দূরে নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিস্তূপের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া মহিম চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সমস্তই শুনিতে পাইতেছিল, কিন্তু কৌতূহল নিবারণ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। ও-পাড়ার ভিখু বাঁড়ুয্যে—অত্যন্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি—বাতের জন্য এ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই; এখন লাঠিতে ভর দিয়া সদলবলে আগমন করিতেছেন দেখিয়া মহিম অগ্রসর হইয়া গেল। বাঁড়ুয্যেমশাই বহুপ্রকার বিলাপ করিয়া শেষে বলিলেন, মহিম, তোমার বাবা অনেকদিন স্বর্গীয় হয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি আর আমি ভিন্ন ছিলাম না। আমরা দু'জনে হরিহর-আত্মা ছিলাম।

মহিম ঘাড় নাড়িয়া সবিনয়ে জানাইল যে, ইহাতে তাহার কোন সংশয় নাই। শুনিয়া তিনি কহিলেন যে, এই কাণ্ডটি যে ঘটিবে, তাহা তিনি পূর্ব্বাহ্ণেই জানিতেন!

মহিম চকিত হইয়া জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া রহিল। পার্শ্বেই বেড়ার আড়ালে অচলা জিনিসপত্র লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, সেও শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। ভূমিকা এই পর্য্যন্ত করিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মার ক্রোধ ত শুধু শুধু হয় না বাবা! আমাদের একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করলে না, এত বড় বামুনের ছেলে হয়ে কি অপকর্ম্মটাই না করলে বল দেখি।

মহিম কথাটা বুঝিতে পারিল না। তিনি নিজের কথাটার তখন বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে অনুচরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা সবাই বলাবলি করি যে, কিছু একটা ঘটবেই। কৈ, আর কারুর প্রতি ব্রহ্মার অকৃপা হ'ল না কেন! বাবা, বেম্মও যা, খ্রীষ্টানও তাই। সাহেব হলেই বলে খ্রীষ্টান, আর বাঙালী হইলেই বলে বেম্ম। এ আমাদের কাছে—যাদের শাস্ত্রজ্ঞান জন্মেচে—তাদের কাছে চাপা থাকে না।

উপস্থিত সকলেই ইহাতে অনুমোদন করিল। তিনি উৎসাহ পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, যাই কর না বাবা, আগে একটা প্রায়শ্চিত্ত করে ওটাকে ত্যাগ করে—

মহিম হাত তুলিয়া বলিল, থামুন। আপনাদের আমি অসম্মান করতে চাইনে, কিন্তু যা নয় তা মুখে আনবেন না। আমি যাঁকে ঘরে এনেচি, তাঁর পুণ্যে ঘর থাকে ভালই; না হয় বার বার পুড়ে যায়, সেও আমার সহ্য হবে। বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

বাড়ুয্যেমশাই সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে যাহা বলিতে বলিতে গেলেন তাহা মুখে না আনাই ভাল।

অচলা সমস্ত শুনিতে পাইয়াছিল; তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

যদু আসিয়া কহিল, মা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করে বাবু পাল্কীবেহারা ডেকে আনতে বললেন। আনব?

অচলা আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, বাবুকে একবার ডেকে দাও ত যদু।

পাল্কী?

এখন থাক্।

মহিম কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইতেই মহিম বিস্মিত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। হয়ত সে স্বামীর হাত দুটা ধরিয়া কাছে টানিয়া বসাইত, হয়ত বা আরও কিছু ছেলেমানুষি করিয়া ফেলিত, কি করিত, তা সে তাহার অন্তর্য্যামীই

জানিতেন; কিন্তু সকাল হইয়া গিয়াছে—চারিদিকে কৌতূহলী লোক; অচলা আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, পাল্কী কেন?

মহিম কহিল, নটার ট্রেন ধরতে পারলেই ত সবদিকে স্থবিধে। একটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে স্নানাহার করতে পারবে। কাল রাত্রেও ত কিছু খাওনি।

আর তুমি?

আমি! মহিম আর একটুখানি চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল, আমারও যা হোক একটা উপায় হবে বৈ কি।

তা হলে আমারও হবে। আমি যাবো না।

কি উপায় হবে বল।

অচলা এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। একবার তাহার মুখে আসিল—বনে গাছতলায়! কিন্তু সে ত সত্যই সম্ভব নয়। আর পাড়ায় কাহারও বাটীতে একটা ঘণ্টার জন্যও আশ্রয় লওয়া যে কত অপমানজনক, সে ইঙ্গিত ত সে এইমাত্র ভাল করিয়াই পাইয়াছে। মৃণালের কথা যে তাহার মনে পড়ে নাই, তাহা নহে; বারংবার স্মরণ হইয়াছে; কিন্তু লজ্জায় তাহা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, তুমিও সঙ্গে চল।

মহিম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আমি সঙ্গে যাবো? তাতে লাভ কি?

অচলা বলিল, লাভ-লোকসান দেখবার ভার আজ থেকে আমি নেব। তোমার শুভানুধ্যায়ী এখানে বেশি নেই, সে আমি জানতে পেরেচি। তা ছাড়া, তোমার মুখের চেহারা এক রাত্রির মধ্যেই যা হয়ে গেছে, সে তুমি দেখতে পাচ্ছো না, আমি পাচ্ছি। আমার গলায় ছুরি দিলেও, এখানে তোমাকে একলা ফেলে রেখে আমি যেতে পারবো না।

মহিমের মনের ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল; কিন্তু সে স্থির হইয়া রহিল।

অচলা বলিতে লাগিল, কেন তুমি অত ভাবচ? আমার গয়নাগুলো ত আছে। তা দিয়ে পশ্চিমে যেখানে হোক্ কোথাও একটা ছোট বাড়ি অনায়াসে কিনতে পারবো। যেখানে থাকি, আমাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলতে তুমি পারবে না। সে চেষ্টা তোমাকে করতেই হবে। আর বলেইচি ত তোমার ভার এখন থেকে আমার ওপর।

যদু অদূরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পাল্কী আনতে যাবো মা?

উত্তরের জন্য অচলা উৎসুক চক্ষে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মহিম ইহার জবাব দিল। যদুকে আনিতে হুকুম করিয়া স্ত্রীকে বলিল, আমি ত এখুনি যেতে পারিনে।

শুনিয়া অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও তৃপ্তিতে অচলার বুক ভরিয়া গেল। সে অন্তরের

আবেগ সংবরণ করিয়া সহজভাবে কহিল, সে সত্যি, এক্ষুনি তোমার যাওয়া হয় না ; কিন্তু সন্ধ্যের গাড়িতে নিশ্চয় যাবে বল ? নইলে আমি খাবার নিয়ে বসে বসে ভাবব, আর—

কিন্তু মন্তব্যটা তাহার মহিমের দীর্ঘশ্বাসে যেন নিবিয়া গেল। সে মলিন হইয়া সভয়ে কহিল, ও-বেলা যেতে পারবে না ? তবে এই অন্ধকার রাত্রে কার বাড়িতে —কিন্তু বলিতে বলিতেই সে থামিয়া গেল। যাহার বাটীতে তাহার স্বামীর রাত্রি যাপনের সম্ভাবনা, সে কথা মনে হইতেই তাহার মুখশ্রী গম্ভীর ও বিবর্ণ হইয়া উঠিল। বোধ করি তাহার মনের কথা মহিম বুঝিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় আমাকে কোথায় যেতে বল ?

অচলা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, কেন, বাবার ওখানে।

মহিম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না।

না কেন ? সেও কি তোমার নিজের বাড়ি না ?

মহিম তেমনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

অচলা কহিল, না হয় সেখানে কেবল দুটো দিন থেকেই আমরা পশ্চিমে চলে যাবো।

না।

অচলা জানিত, তাহাকে টলানো সম্ভব নয়। একটুখানি চিন্তা করিয়া বলিল, তবে চল, এখান থেকেই আমরা পশ্চিমের কোন সহরে গিয়ে উঠি গে। আমি সঙ্গে থাকলে কোথাও আমাদের কষ্ট হবে না আমি বেশ জানি। কিন্তু গহনাগুলো ত বেচতে হবে ; সে কলকাতা ছাড়া হবে কি করে ?

মহিম আর একদিকে চাহিয়া নীরব হইয়া রহিল। অচলা ব্যগ্র-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, পশ্চিমেও ত বড় সহর আছে, সেখানেও ত বিক্রী করা যায় ? আমার বাক্সে প্রায় দুশ' টাকা আছে, এখন তাতেই ত আমাদের যাওয়া হতে পারে ? চুপ করে রইলে যে ? বল না শীগ্‌গীর !

মহিম স্ত্রীর চোখের দিকে চাহিতে পারিল না, কিন্তু জবাব দিল ; বলিল, তোমার গহনা নিতে পারব না অচলা।

অকস্মাৎ একট গুরুতর ধাক্কা খাইয়া যেন অচলা পিছাইয়া গেল। খানিক পরে কহিল, কেন পারবে না, শুনতে পাই ?

মহিম তাহার উত্তর দিল না এবং কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। হঠাৎ অচলা একসঙ্গে একরাশ প্রশ্ন করিয়া বসিল। কহিল, পৃথিবীতে স্বামী কী কেবল তুমি একটি ? দুঃসময়ে তাঁরা নেন কি করে ? স্ত্রীর গহনা থাকে কি জন্যে ? এত কষ্টে এগুলো বাঁচাতে গেলেই বা কেন ? বলিয়া সে ছোট টিনের বাক্সটা হাত

দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিল, আজ বিপদের দিনে যদি কোন কাজেই না লাগে ত মিথ্যে বোঝা বয়ে বেড়িয়ে কি হবে? আগুন এখনও জ্বলচে, আমি টান মেরে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাই—তোমার মনে যা আছে ক'রো। বলিয়া সে আঁচল দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিল।

মিনিট-দুই চুপ করিয়া থাকিয়া মহিম ধীরে ধীরে কহিল, আমি সমস্ত ভেবে দেখলাম অচলা। কিন্তু, তুমি ত জানো, আমি কোন কাজ ঝোঁকের ওপর করিনে; কিংবা আর কেউ করে, সেও চাইনে, তুমি যা দিতে চাচ্ছো তা নিজের বলে নিতে পারলে আজ আমার সুখের সীমা থাকত না; কিন্তু কিছুতেই নিতে পারিনে। দুঃখ দেখে তোমার মত আরও একজন আরও ঢের বেশি আমাকে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সেও যেমন দয়া, এও তেমনি দয়া। কিন্তু এতে না তোমাদের, না আমার, কারও শেষ পর্য্যন্ত ভাল হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

অচলা আর সহিতে পারিল না। কান্না ভুলিয়া বোধ করি প্রতিবাদ করিবার জন্যই দৃপ্ত চক্ষু দুটি উপরে তুলিবামাত্রই স্বামীর দৃষ্টি অনুসরণ করিতে দেখিতে পাইল, কতকটা দূরে তাহাদের যে পুষ্করিণী আছে, তাহারই ঘাটের পাশে বাঁধানো নিমগাছতলায় সুরেশ হাতে মাথা রাখিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। অচলার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল এবং উচ্ছ্রিত মাথা তাহার আপনি হেঁট হইয়া গেল।

কিন্তু মহিম যেন কতকটা অন্যমনস্কের মত আপন মনেই বলিতে লাগিল, শুধু যে কখনো শান্তি পাবো না তাই নয়, তোমাকে বারংবার বঞ্চিত করতে পারি, এ সম্বন্ধই কোনদিন আমাদের মধ্যে হয়নি। একটুখানি থামিয়া কহিল, অচলা, নিজেকে রিক্ত করে দান করবার অনেক দুঃখ। কিন্তু ঝোঁকের ওপর হয়ত তাই এক মুহূর্ত্তে পারা যায়, কিন্তু তার ফল ভোগ হয় সারা জীবন ধরে। আমি জানি, একটা ভুলের জন্যে তোমাদের মনস্তাপের অবধি নেই। আবার একটা ভুল হয়ে গেলে তুমি না পারবে কোনদিন নিজেকে ক্ষমা করতে, না পারবে আমাকে মাপ করতে। এ ক্ষতি সইবার মত সম্বল তোমার নেই; এ-কথা আজ না টের পেতে পারো, দু'দিন পরে পারবে। তাই তোমার কাছ থেকে কিছুই আমি নিতে পারব না।

কথাগুলো অচলার বুকের ভিতর বিঁধিল। স্বামীর চক্ষে সে যে কত পর তাহা আজ যেমন অনুভব করিল, এমন আর কোনদিন নয়; এবং সঙ্গে সঙ্গেই মৃণালের স্মৃতিতে সে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! সেও কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি এতক্ষণ ধরে যা বোঝাচ্ছো সে আমি বুঝেচি। হয়ত তোমার কথাই সত্যি, হয়ত তোমার মুখ দেখে দয়া হওয়াতেও আমার যথাসর্ব্বস্ব দিতে চেয়েছিলুম। হয়ত দুদিন

পরে আমাকে সত্যি এর জন্যে অনুতাপ করতে হ'তো, সব ঠিক, কিন্তু ছাখো, অপরের মনের ইচ্ছে বুঝে নেবার মত যত বুদ্ধিই তোমার থাক্, তোমাকে বুঝিয়ে দেবারও জিনিস আছে। স্ত্রীর জিনিস জোর করে নেওয়া ত দূরের কথা, হাত পেতে নেবার সম্বল তোমারই বা কি আছে? আর তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না। এটুকু বিবেক-বুদ্ধি যে এখনো তোমাতে বাকী আছে, আজ থেকে তাই আমার সান্ত্বনা। কিন্তু যেখানেই থাকি, একদিন-না-একদিন তোমাকে সব কথা বুঝতেই হবে। হবেই হবে। বলিয়া সে হাত দিয়া নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কান্না রোধ করিল।

নটার ট্রেনে সুরেশও বাটী ফিরিতেছিল। গত রাত্রের অগ্নিকাণ্ড তাহাকে কেমন যেন একরকম করিয়া দিয়াছিল। কাহারও সহিত কথা কহিবার যেন শক্তিই তাহাতে ছিল না। গাড়ি আসিতে এখনও কিছু বিলম্ব ছিল; সুরেশ মহিমকে স্টেশনের এক প্রান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, মহিম, আগুন লাগার জন্যে আমাকে ত তুমি সন্দেহ করোনি?

মহিম তার হাত দুটো সজোরে ধরিয়া ফেলিয়া শুধু বলিল, ছিঃ!

সুরেশের দুই চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। বাষ্পরুদ্ধ-স্বরে বলিল, কাল থেকে এই ভয়ে আমার শান্তি নেই মহিম!

মহিম নীরবে শুধু তাহার হাতের মধ্যে চাপ দিল। তাহার পরে কহিল, সুরেশ, একটা সত্যকার অপরাধ অনেক মিথ্যা অপরাধের বোঝা বয়ে আনে। কিন্তু অনেক দুঃখ পেয়ে তুমি যাই কর না কেন, যাকে 'ক্রাইম' বলে, সে তুমি কোনদিন করতে পার না বলে আজ আমি বিশ্বাস করি। একটুখানি থামিয়া কহিল, সুরেশ, তুমি ভগবান মানো না বটে, কিন্তু যে যথার্থ মানে সে অহর্নিশ প্রার্থনা করে, এ বিশ্বাস তিনি যেন তার না ভেঙ্গে দেন।

ট্রেন আসিয়া পড়িল। মেয়েদের গাড়িতে অচলা এবং তাহার দাসীকে তুলিয়া দিয়া মহিম সুরেশের কাছে আসিতেই সে জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, তোমার কালকের ক্ষতিটা পূর্ণ করে দেবার প্রার্থনাটা আমার কিছুতেই মঞ্জুর করলে না, কিন্তু ভগবান তোমার প্রার্থনা যেন মঞ্জুর করেন ভাই। আমাকে যেন আর তিনি ছোট না করেন, বলিয়াই সে হাত ছাড়িয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

ওদিকে জানালায় মুখ রাখিয়া অচলা যদুর সঙ্গে এতক্ষণ চুপি চুপি কি কথা কহিতেছিল, মহিম নিকটে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিল, মৃণালদিদির স্বামী নাকি আজ মারা গেছেন?

মহিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ঘণ্টা-খানেক পূর্ব্বে মারা গেছেন শুনলাম।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, প্রায় দশ-বারোদিন ধরে নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন। ঐ খবরটাও আমাকে দেওয়া কোনদিন তুমি আবশ্যক মনে করোনি ?

মহিম জবাব দিতে চাহিল, কিন্তু কি করিয়া কথাটা গুছাইয়া বলিবে, ভাবিতে ভাবিতেই বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

২১

তখনও কেদারবাবু আগেকার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান নাই। খাওয়া-দাওয়ার পরে বাহিরে বারান্দায় একখানা ইজি চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে হয়ত একটু তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলেন, দরজায় ঠিকা গাড়ির কঠোর শব্দে চোখ মেলিয়া দেখিলেন সুরেশ এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার কন্যা এবং ঝি অবতরণ করিল। ঘুমের ঝোঁক তাহার নিমিষে উড়িয়া গেল; কি একটা অজ্ঞাত শঙ্কায় শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িয়া গলা বাড়াইয়া চীৎকার করিলেন, অচলা যে? সুরেশ, তুমি কোথা থেকে? কি, ব্যাপার কি? এ সব কি কাণ্ডকারখানা, আমি ত কিছু বুঝতে পারিনে!

অচলা উঠিয়া আসিয়া পিতার পদধূলি গ্রহণ করিল। সুরেশ প্রণাম করিয়া কহিল, মহিমের টেলিগ্রাম পাননি ?

কেদারবাবু উদ্বিগ্নমুখে কহিলেন, কৈ, না!

সুরেশ একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিয়া বলিল, তা হলে হয় সে টেলিগ্রাফ করতে ভুলেচে, না হয় এখনো এসে পৌঁছায়নি।

কেদারবাবু কহিলেন, টেলিগ্রাফ যাক, ব্যাপার কি, তাই আগে বল না! তুমি এদের কোথা থেকে নিয়ে এলে ?

সুরেশ বলিল, কাল রাত্রিতে আগুন লেগে মহিমের বাড়ি পুড়ে গেছে।

বাড়ি পুড়ে গেছে? সর্ব্বনাশ! বল কি—বাড়ি পুড়ে গেল? কেমন করে পুড়ল? মহিম কৈ? তুমি এদের পেলে কোথায়? এক নিশ্বাসে এতগুলো প্রশ্ন করিয়া কেদারবাবু ধপ্ করিয়া তাঁহার ইজি-চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

সুরেশ বলিল, এদের সেখান থেকেই নিয়ে আসচি। আমি সেখানেই ছিলাম কি-না।

কেদারবাবুর মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন এবং গম্ভীর হইয়া উঠিল, কহিলেন, তুমি ছিলে সেখানে? কবে গেলে, আমি ত কিছু জানিনে। কিন্তু সে কৈ ?

সুরেশ বলিল, মহিম ত আসতে পারচে না, তাই—

তাঁহার গম্ভীর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না না,

এ-সব ভাল কথা নয়। অতিশয় মন্দ কথা। যৎপরোনাস্তি অন্যায়। এ-সব ত আমি কোনমতেই—, বলিতে বলিতে তিনি চোখ তুলিয়া কন্যার মুখের প্রতি চাহিলেন।

অচলা এতক্ষণ একটা চেয়ারের পিঠে হাত রাখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। পিতার এই সংশয় তাহার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। তাহার এই অকস্মাৎ আগমনের হেতু যে তিনি লেশমাত্র বিশ্বাস করেন নাই, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া লজ্জায় ঘৃণায় তাহার মুখে আর রক্তের চিহ্ন রহিল না।

কেদারবাবু এখানে ভুল করিলেন। মেয়ের মুখের চেহারায় তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়ভূত হইল। আরাম-চেয়ারটায় হেলিয়া পড়িয়া হাতের কাগজখানা মুখের উপরে টানিয়া নিয়া ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যা ভাল বোঝ তোমরা কর। আমি কালই বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও চলে যাবো।

সুরেশ ক্রুদ্ধ-বিস্ময়ের সহিত কহিল, এ সব আপনি কি বলচেন কেদারবাবু? আপনি বা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন কেন, আর হয়েচেই বা কি? বলিয়া সে একবার অচলার প্রতি, একবার তাহার পিতার প্রতি চাহিতে লাগিল; কিন্তু কাহারও মুখ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না।

কেদারবাবুর কাছে কোন জবাব না পাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, যাক, আমার ওপর মহিম যা ভার দিয়েছিল, তা হয়ে গিয়েচে। এখন আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন। আমার নাওয়া-খাওয়া এখনো হয়নি, আমি বাড়ি চললুম। বলিয়া সে কয়েক পদ দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইতেই কেদারবাবু উঠিয়া বসিয়া ক্লান্ত-কণ্ঠে কহিলেন, আহা, যাও কেন ছাই। ব্যাপারটা কি, তবু শুনিই না। আগুন লাগল কি করে?

সুরেশ অভিমান-ভরে বলিল, তা জানিনে।

তুমি গেলে কবে সেখানে?

দিন পাঁচ-ছয় পূর্ব্বে। আমি খাইনি এখনো, আর দেরি করতে পারিনে, বলিয়া পুনরায় চলিবার উপক্রম করিতেই কেদারবাবু বলিয়া উঠিলেন, আহা হা, নাওয়া-খাওয়া ত তোমাদের কারও হয়নি দেখচি, কিন্তু জলে পড়নি, এটাও ত বাড়ি, এখানেও ত চাকর-বাকর আছে। অচলা, ডাকো না একবার বেয়ারাটাকে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস, বোস সুরেশ, ব্যাপারটা কি হ'লো খুলেই সব বল শুনি।

সুরেশ ফিরিয়া আসিয়া বসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, রাত্রে ঘুমুচ্চি, মহিমের চীৎকারে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে দেখি, সমস্ত ধু ধু করে জলছে; খড়ের ঘর, নিবোবার উপায়ও ছিল না, সে বৃথা চেষ্টাও কেউ করলে না—সর্ব্বস্ব পুড়ে গেল আর কি!

কেদারবাবু লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, বল কি হে, সর্ব্বস্ব পুড়ে গেল? কিছুই বাঁচাতে পারা গেল না? অচলার গয়নাপত্রগুলো?

সেগুলো বেঁচেচে।

তবু রক্ষে হোক! বলিয়া বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তবু কি করে আগুন লাগল?

সুরেশ কহিল, বললুম ত আপনাকে, সে খবর এখনো জানা যায়নি। তবে গ্রামের মধ্যে বড় কেউ আর তার শুভাকাঙ্ক্ষী নেই জেনে এসেচি।

নেই বুঝি?

না।

কেদারবাবু আর কোন কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিয়া পরিশেষে আর একটা গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, যাও, স্নান করে এসো গে সুরেশ, আর বেলা ক'রো না। দেখি, রান্না-বান্নার কি যোগাড় হচ্ছে। বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আহারাদির পরেও তিনি সুরেশকে মুক্তি দেন নাই। সে একটা আরাম-চৌকির উপরে অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় পড়িয়া ছিল। অচলাও সেই যে স্নানান্তে তাহার ঘরে গিয়া খিল দিয়াছিল আর তাহার কোন সাড়াশব্দ ছিল না। বিশ্রাম ছিল না শুধু কেদারবাবুর। এখন যে টেলিগ্রাম আসা না-আসার বিশেষ কোন সার্থকতা ছিল না, তাহারই জন্য সমস্ত বেলাটা ছটফট করিয়া, সন্ধ্যার সময় অসময়ে ঘুমানো উচিত নয়, এই অজুহাতে মেয়েকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন, তোমরা যে বললে, সে টেলিগ্রাম করেচে—টেলিগ্রাম করেচে—কৈ তার ত কিছুই দেখিনে। তোমরা ট্রেনেতে এসে পড়লে, আর তারের খবর এতক্ষণেও পৌঁছল না। আচ্ছা, দাঁড়াও ত দেখি, বলিয়া মেয়ের মুখের জবাব না শুনিয়াই চটিজুতা ফটফট করিতে করিতে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন এবং ক্ষণকাল পরেই নীচে হইতে তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল। অচলার দাসীকে ধরিয়া তিনি নানাপ্রকার জেরা করিতেছেন, এবং প্রত্যুত্তরে সে আশ্চর্য্য হইয়া বারংবার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে, সে কি বাবু, আগুন লেগে ঘর-দোর সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল, চক্ষে দেখে এলুম, আর আপনি বলচেন, পোড়েনি। আর আগুন যদি না-ই লাগবে, তবে ঘর-দোর পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল কি করে, একবার বিবেচনা করে দেখুন দেখি।

সুরেশ সমস্তই শুনিতেছিল; সে মাথা তুলিয়া দেখিল, অচলা চৌকাট ধরিয়া

দাঁড়াইয়া পাংশু-মুখে কান পাতিয়া প্রত্যেক কথাটি গিলিতেছে। শুষ্ক উপহাসের ভঙ্গিতে কহিল, তোমার বাবার হ'ল কি, বলতে পারো?

অচলা চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, না।

সুরেশ কহিল, আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি, উনি বিশ্বাস করেননি। ওঁর ধারণা, আগুন লাগার গল্পটা আমাদের আগাগোড়া বানানো। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সত্যি-মিথ্যে একদিন টের পাবেনই, ওঁর সন্দেহটা এমন যে, এখানে আসা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেচে।

অচলা শুষ্ক-মুখে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আর আসবেন না?

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বোধ করি সম্ভব নয়। আমারও ত কিছু আত্ম-সম্মানবোধ আছে। কোন লোককে দিয়ে আমার ব্যাগটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ো।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা! কিন্তু তাহার এখানে আসা না-আসার সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না।

তা হলে কাল সকালেই দিয়ো। অনেক দরকারী জিনিস আমার ওর মধ্যে আছে, বলিয়াসে কেদারবাবুর জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু ফিরিয়া আসিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে যে অপ্রসন্ন হইয়াছেন, তাহা বোধ হইল না।

রাত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শয্যার উপর ছট্‌ফট্ করিয়া অচলা উঠিয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা, বাইরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সম্মুখের রাজপথের উপর লোকচলাচলের প্রতি চাহিয়া কিছুক্ষণের জন্যেও অন্যমনস্ক হয়।

তাহার ঘরের ও-দিকের কবাট খুলিয়া সে বারান্দায় আসিয়া দেখিল, তখনও বসিবার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। প্রথমে মনে করিল, চাকরেরা গ্যাস বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু কয়েকপদ অগ্রসর হইতেই ভিতর হইতেই তাহার পিতার কণ্ঠস্বর কানে আসিতে তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। চিরদিন তিনি দশটা বাজিতে না বাজিতেই শয্যা গ্রহণ করেন; কিন্তু আজ সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই দাসীর গলা শুনা গেল। সে বলিতেছে, এখন সোয়ামী মারা গেছে—আর যে মৃণাল-দিদিমণি শ্বশুর-ঘর করে, এমন ত আমার মনে হয় না বাবু। জামাইবাবুর সঙ্গে কি যে দাদা-নাতনি সুবাদ, তা তেনাই জানে।

প্রত্যুত্তরে কেদারবাবু শুধু হুঁ বলিয়াই চুপ করিয়া রহিলেন।

অচলা বুঝিল, ইতিপূর্ব্বে অনেক কথাই হইয়া গিয়াছে। মৃণালের সম্বন্ধে, মহিমের সম্বন্ধে, তাহার সম্বন্ধে—কিছুই বাদ যায় নাই। কিন্তু পাছে নিজের সম্বন্ধে নিরতিশয়

অপ্রিয় কথা নিজের কানেই শুনিতে হয়, এই ভয়ে সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনই নীরবে ফিরিয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু কিসে যেন তাহারা পা লোহার শিকলে বাঁধিয়া দিয়া গেল।

কেদারবাবু অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, দু'জনের তা হলে বনিবনাও হয়নি বল?

ঝি কহিল, মোটে না বাবু, মোটে না। একটি দিনের তরে না।

এই দাসীটিকে অচলা নির্ব্বোধ বলিয়াই এতদিন জানিত, আজ দেখিল, বুদ্ধি তাহার কাহারো অপেক্ষা কম নয়।

কেদারবাবু আবার মিনিট-খানেক মৌন থাকিয়া বলিলেন, কাল রাতে তা হলে কারও খাওয়া হয়নি বল? সুরেশ যাওয়া পর্য্যন্তই একরকম ঝগড়া ঝাঁটিতেই দিন কাটছিল।

দাসীর উত্তর শুনা গেল না বটে, কিন্তু পিতার মুখের মন্তব্য শুনিয়াই বুঝা গেল, সে গ্রীবা আন্দোলনের দ্বারা কিরূপ অভিমত ব্যক্ত করিল। কারণ, পরক্ষণেই কেদারবাবু একটি গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, এমনটি যে একদিন ঘটবে আমি আগেই জানতুম। আজকালকার ছেলে-মেয়েরা ত বাপ-মায়ের কথা গ্রাহ্য করে না; নইলে আমি ত সমস্তই একরকম ঠিক করে এনেছিলুম। আজ তা হলে ওর ভাবনা কি! বলিয়া আর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাহাও স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল।

ঝি পূর্ণ সহানুভূতির সহিত প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কহিল, তাই বলুন ত বাবু, নইলে আজ ভাবনা কি! কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে কি না একটা খোড়ো মেটে বাড়ি। তাও রইল কৈ? আজ জামাইবাবুও ত—, বলিয়া সেও কথাটাকে শেষ না করিয়াও একটা দীর্ঘশ্বাসের দ্বারা অনেকদূর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দিল।

কপাল! বলিয়া কেদারবাবু মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আচ্ছা, তুই যা; বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া আলো নিবাইবার জন্য বেয়ারাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

অচলা পা টিপিয়া আস্তে আস্তে তাহার ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। পিতার উদারতা, তাঁহার ভব্যতাবোধের ধারণা কোনদিনই তাহার মনের মধ্যে খুব উচ্চ অঙ্গের ছিল না, কিন্তু সে যে বাটীর দাসীর সহিত নিভৃতে আলোচনা করিবার মত এত ক্ষুদ্র, ইহাও সে কখনও ভাবিতে পারিত না। আজ তাহার নিজের মন ছোট হইয়া মাটিতে লুটাইতেছে—কিন্তু তাহার স্বামী, তাহার পিতা, তাহার দাসী —তাহার বন্ধু—সবাই যখন তাহারই মত ভূমিতলে পড়িয়া, তখন কাহাকেও অবলম্বন করিয়া কোনদিন যে সে এই ধূলিশয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, এ ভরসা কল্পনা করিতেও পারিল না।

২২

কেদারবাবু সংসারে সাধারণ দশজনের মত দোষে-গুণে মানুষ। মেয়ের বিবাহে জামাই যাহাতে পাস-করা হয়, অবস্থাপন্ন হয়, এই কামনাই করিয়াছিলেন। মহিম ভাল ছেলে, সে এম. এ. পাস করিয়াছে, দেশে তাহার অন্নবস্ত্রের সংস্থান আছে, অতএব তাহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করিতে তিনি সৌভাগ্য বলিয়াই গণ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার ধনাঢ্য বন্ধু সুরেশ যখন একদিন তাহার গাড়ি করিয়া আসিয়া একটা উল্টা রকমের খবর দিয়া নিজেই জামাইগিরির উমেদার খাড়া হইল, তখন উভয় বন্ধুর মধ্যে আর্থিক সঙ্গতির হিসাব করিয়া মহিমকে বরখাস্ত করিতে কেদারবাবুর মনের মধ্যে কোন আপত্তিই উঠিল না। তিনি ভালবাসার সূক্ষ্ম-তত্ত্বের বড় একটা ধার ধারিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মেয়েমানুষে যাহার কাছে গাড়ি পাল্কী চড়িয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পায়, স্বামী হিসাবে তাহাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করে। সুতরাং মেয়েকে সুখী করাই যদি পিতার কর্ত্তব্য হয় ত এত বড় অযাচিত সুযোগ কোনমতেই যে হাত-ছাড়া করা উচিত নয়, ইহা স্থির করিতে তাঁহাকে অত্যন্ত বেশি চিন্তা করিতে হয় নাই।

এমন কি বড়লোক জামাতার কাছে কর্জ্জ করিয়া বিবাহের পূর্ব্বেই হাজার-পাঁচেক টাকা লওয়াও তিনি দোষের মনে করেন নাই; এবং বাড়িটা যখন তাহার থাকিবে, তখন পরিশোধের দুশ্চিন্তাও তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে নাই।

অথচ হতভাগা মেয়েটা সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল—কিছুতেই বাগ মানিল না। অতএব শেষ পর্য্যন্ত সেই মহিমের হাতেই তাঁহাকে মেয়ে দিতে হইল বটে, কিন্তু এই দুর্ঘটনায় তাঁহার ক্ষোভের অবধি রহিল না! তা ছাড়া, যে কথাটা এখন তাঁহাকে নিজের কাছে নিজে স্বীকার করিতে হইল তাহা এই যে টাকাটা এইবার ফিরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু জিনিসটা লেখাপড়ার মধ্যে না থাকায় এবং পরিশোধের রাস্তাটাও খুব সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হইয়া চোখে না পড়ায়, ইহার চিন্তাটাকেও তিনি হৃদয়ের মধ্যেও তেমনি উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিলেন না। সুতরাং, প্রশ্নটা যদিচ মনের মধ্যে উঠিল বটে, কিন্তু উত্তরটা তেমনি ঝাপ্‌সা হইয়া রহিল।

অচলা শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। ইহার পরে সুরেশের আসা-যাওয়া, ঘনিষ্ঠতা কেদারবাবু পছন্দ করিতেন না। বাটী নাই অজুহাতে অধিকাংশ সময় দেখাও দিতেন না। কিন্তু তাহাকে ভালবাসিতেন বলিয়া মেয়ের দুর্ব্যবহারে বৃদ্ধ অন্তরের মধ্যে লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়া রহিলেন।

এইভাবে দিন কাটিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি অত্যন্ত অসুখে পড়িয়া গেলেন। সুরেশ আসিয়া চিকিৎসা করিয়া এবং নিজ পুত্রাধিক সেবা-যত্ন করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া তুলিল। তিনি স্বয়ং ঋণের উল্লেখ করিলে, সে তাহা বন্ধুকে যৌতুক দিয়াছে বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সেই অবধি এই যুবকটির প্রতি তাঁহার স্নেহ প্রতিদিন গভীর ও অকৃত্রিম হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন কি, সময়ে সময়ে কন্যার বিরুদ্ধে তাঁহার মনের মধ্যে অভিশাপের ন্যায় উদয় হইত যে, দুর্ভাগা মেয়েটা এমন রত্ন চিনিল না, উপেক্ষা করিয়া ত্যাগ করিয়া গেল, সে যেন একদিন ইহার শাস্তি ভোগ করে।

এই ব্যাপারে মহিম তাঁহার দু'চক্ষের বিষ হইয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার কন্যা যে নারীধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া স্বামী ত্যাগের গভীর দুষ্কৃতি সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া তাঁহারই গৃহে আসিয়া উঠিবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই ; এবং এই মহাপাপে যে ব্যক্তি সাহায্য করিয়াছে, সে যত বড় হোক, পিতার মনের ভাব যে তাহার বিরুদ্ধে কিরূপ বাঁকিয়া দাঁড়াইবে, ইহাও অনুমান করা কঠিন নহে।

অন্যপক্ষে, পিতার প্রতি কন্যার মনোভাব পূর্ব্বে যেমনি থাক্‌, সেদিন তিনি শুদ্ধমাত্র টাকার লোভেই মহিমকে বর্জ্জন করিয়া সুরেশের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, এবং পরিশোধের কোন উপায় না থাকা সত্ত্বেও তাহার কাছে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদিন হইতে মানুষ হিসাবে কেদারবাবু অচলার চক্ষে অত্যন্ত নামিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অশ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল কাল রাত্রে, যখন সে স্বকর্ণে শুনিতে পাইল, তিনি নিজের কন্যার চরিত্র সম্বন্ধে গোপনে দাসীর মতামত গ্রহণ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিলেন না।

কিন্তু সেই সঙ্গে অচলা আজ আপনাকেও দেখিতে পাইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া চোখে পড়িল, যে মুহূর্ত্তে সে স্বামীকে নিজের মুখে বলিয়াছে, তাহাকে সে ভালবাসে না, সেই মুহূর্ত্তেই নারীর সর্ব্বোত্তম মর্য্যাদাও জগৎসংসার হইতে তাহার জন্য মুছিয়া গিয়াছে। তাই আজ সে স্বামীর কাছে ছোট, পিতার কাছে ছোট, নিজের পরিচারিকার কাছে ছোট, এমন কি, সেই সুরেশের মত লোকের চক্ষেও আজ সে এত ছোট যে, তাহাকে লালসার সঙ্গিনী কল্পনা করাও তাহার পক্ষে আর দুরাশা নয়। কিন্তু সত্যই কি সে তাই? এমন ছোট? এই ত সেদিন সে যাহার ভালবাসাকেই সর্ব্বজয়ী করিতে সমস্ত বিরোধ, সমস্ত প্রলোভন পায়ে দলিয়া উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজ ইহারই মধ্যে সে কথা কি সবাই ভুলিয়াছে? তাহাকে সুরেশের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াও স্বামী তাহার কোন সংবাদ লইলেন না। এই ঔদাসীন্যের নিগূঢ় অপমান ও লাঞ্ছনা তাহাকে সমস্ত রাত্রি যেন আগুন দিয়া পোড়াইতে লাগিল।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা হইয়াছে। তরুণ সূর্য্যালোক খোলা জানালার ভিতর দিয়া ঘরের মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া শিয়রের জানালাটা খুলিয়া দিয়া বাহিরের পথের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কলিকাতার রাজপথে জনপ্রবাহের বিরাম নাই। কেহ কাজে চলিয়াছে, কেহ ঘরে ফিরিতেছে, কেহ বা প্রভাতের আলোক ও হাওয়ার মধ্যে শুধু শুধু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ এক সময়ে তাহার মনে হইল, এ-সময়ে কেহই ত ঘরে বসিয়া নাই, আর আমিই বা যথার্থ কি এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে মুখ দেখাইতে পারি না—আপনাকে আপনি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি! অপরাধ যদি কিছু করিয়াই থাকি ত সে তাঁর কাছে। সে দণ্ড তিনিই দেবেন; কিন্তু নির্বিচারে যে-কেহ শাস্তি দিতে আসিবে, তাহাই মাথা পাতিয়া লইব কিসের জন্য?

অচলা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সমস্ত গ্লানি যেন জোর করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কেদারবাবু তাঁহার আরাম-কেদারায় বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন, একটিবার মাত্র মুখ তুলিয়াই আবার সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিলেন।

খানিক পরেই বেয়ারা কেৎলিতে গরম চায়ের জল এবং অন্যান্য সরঞ্জাম আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল, কেদারবাবু নিজে উঠিয়া আসিয়া নিজের জন্য এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া লইলেন এবং বাটিটা হাতে করিয়া নিঃশব্দে তাঁহার আরাম-চৌকিতে ফিরিয়া গিয়া খবরের কাগজ লইয়া বসিলেন।

অচলা নতমুখে বসিয়া পিতার আচরণ সমস্ত লক্ষ্য করিল, কিন্তু নিজে যাচিয়া তাঁহার চা তৈরী করিয়া দিতে কিংবা একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসও হইল না, ইচ্ছাও করিল না।

কিন্তু ঘরের মধ্যে এমন করিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকাও অসম্ভব। এমন কি, এইভাবে দীর্ঘকাল এক গৃহের মধ্যেও তাঁহার সহিত বাস করা সম্ভবপর এবং উচিত কি না এবং না হইলেই বা সে কি উপায় করিবে, এই জটিল সমস্যার কোথাও একটু নিরালায় বসিয়া মীমাংসা করিয়া লইতে যখন সে উঠি উঠি করিতেছিল, এমন সময়ে দুঃসহ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল সুরেশ ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

সে হাত তুলিয়া কেদারবাবুকে নমস্কার করিতে তিনি মুখ তুলিয়া মাথাটা একটু নাড়িয়া পুনশ্চ পড়ায় মন দিলেন।

সুরেশ চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। চায়ের জিনিসগুলা সরাইবার জন্য বেয়ারা ঘরে ঢুকিতেই তাহাকে কহিল, আমার ব্যাগটা কোথায় আছে, আমার গাড়িতে

তুলে দাও ত। শেভ করবার জিনিসগুলো পর্য্যন্ত তার মধ্যে আছে। দেরি করো না, আমি এখ্‌খুনি যাবো।

যে আজ্ঞে, বলিয়া সে চলিয়া গেলে আবার সমস্ত কক্ষটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। খানিক পরে সুরেশ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, মহিমের কোন খবর পাওয়া গেল?

কেদারবাবু মুখ না তুলিয়াই শুধু বলিলেন, না।

সুরেশ কহিল, আশ্চর্য্য!

তার পরে আবার সমস্ত চুপ-চাপ। বেয়ারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, ব্যাগ তাঁহার গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে!

আমি তা হলে চললুম। মহিমের চিঠি এলে আমাকে একটু খবর পাঠাবেন, বলিয়া সুরেশ উঠিবার উপক্রম করিতেই সহসা কেদারবাবু হাতের কাগজখানা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি একটু অপেক্ষা কর সুরেশ, আমি আসচি! বলিয়া তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই চটিজুতার পটাপট্‌ শব্দ করিয়া একটু দ্রুতবেগেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এতক্ষণ অবধি অচলা আধোমুখেই ছিল। তিনি বাহির হইয়া যাইতেই বিস্মিত সুরেশ অকস্মাৎ মুখ ফিরাইতেই তাহার দৃষ্টি অচলার ত্রস্ত পীড়িত ও একান্ত মলিন দুই চক্ষুর উপর গিয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?

অচলা মুখ আনত করিয়া শুধু মাথা নাড়িল।

সুরেশ বলিল, আমি যে কত দুঃখিত, কত লজ্জিত হয়েচি তা বলে জানাতে পারিনে।

অচলা অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিল।

সে পুনশ্চ কহিল, তোমার বাবা যে আমাকে এমন হীন, এত বড় পাষণ্ড ভাবতে পারেন, এ আমি স্বপ্নেও মনে করিনি।

এ অভিযোগেও অচলা কোন উত্তর দিল না, তেমনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

সুরেশ বলিল, আমার এমনি ইচ্ছা হচ্ছে যে এখ্‌খুনি মহিমের কাছে গিয়ে তাকে—কথাটা শেষ হইতে পাইল না, কেদারবাবু ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহার হাতে একখানা ছোট কাগজ। সেইখানা সুরেশের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া কহিলেন, গড়িমসি করে তোমার সেই টাকাটার একখানা রসিদ দেওয়া আর ঘটে উঠেনি। পাঁচ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোটই লিখে দিলুম—সুদ বোধ হয় আর দিতে পারব না; তবে এই বাড়িটা ত রইল, এর থেকে আসলটা শোধ হতে পারবেই।

সুরেশ স্তম্ভিতের ন্যায় ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, আমি ত আপনার কাছে হ্যাণ্ডনোট চাইনি কেদারবাবু!

কেদারবাবু বলিলেন, তুমি চাওনি সত্য, কিন্তু আমার ত দেওয়া উচিত। এতদিন যে দিইনি, সেই আমার যথেষ্ট অন্যায় হয়ে গেছে সুরেশ; কাগজখানা তুমি পকেটে তুলে রাখো। বুড়ো হয়েছি, হঠাৎ যদি মরে যাই, টাকাটার গোল হতে পারে।

সুরেশ আবেগের সহিত জবাব দিল, কেদারবাবু, সুরেশ আর যাই করুক, সে টাকা নিয়ে কখনো কারোর সঙ্গে গোল করে না। তা ছাড়া আপনি নিজেও বেশ জানেন, এ টাকা আমি চাইনে—এ আমি আমার বন্ধুকে যৌতুক দিয়েছি।

কেদারবাবু বলিলেন, তা হলে সে তোমার বন্ধুকে দিয়ো, আমাকে নয়। আমি যা নিয়েছি, সে আমারই ঋণ।

সুরেশ কহিল, বেশ আমার বন্ধুকেই দেবো, বলিয়া কাগজখানা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া অচলার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্রই, কেদারবাবু অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন, খবরদার, সুরেশ! কাল থেকে অনেক অপমান আমি নিঃশব্দে সহ্য করেছি, কিন্তু আমার মেয়েকে আমার চোখের সামনে তুমি টাকা দিয়ে যাবে, সে আমার কিছুতেই সইবে না বলে দিচ্ছি। বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার আরাম-কেদারায় ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

প্রথমটা সুরেশ চমকিয়া কেদারবাবুর প্রতি নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তিনি ওইরূপে বসিয়া পড়িলে সে তাহার বিবর্ণ মুখ অচলার প্রতি ফিরাইয়া দেখিল, সে এক মুহূর্তে যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে। প্রবল চেষ্টায় একবার সুরেশ কি একটা বলিতেও গেল; কিন্তু তাহার শুষ্ক কণ্ঠ হইতে একটা অব্যক্ত ধ্বনি ভিন্ন স্পষ্ট কিছুই বাহির হইল না। আবার ফিরিয়া দেখিল, কেদারবাবু দুই করতল মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া তেমনি পড়িয়া আছেন। আর সে কোন কথা বলিবার চেষ্টাও করিল না, শুধু আড়ষ্টের মত আরও মিনিট-খানেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া অবশেষে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু কন্যা ও পিতা ঠিক তেমনি একভাবে বসিয়া রহিলেন; এবং দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া সমস্ত কক্ষ ব্যাপিয়া কেবল একটা নিষ্ঠুর নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

নীচে সুরেশের রবার টায়ারের গাড়িখানা যে ফটক পার হইয়া গেল, তাহা ঘোড়ার খুরের শব্দে বুঝিতে পারা গেল এবং পরক্ষণেই বেয়ারা ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, বাবু!

কেদারবাবু চোখ তুলিয়া দেখিলেন, তাহার হাতে একখণ্ড ছিন্ন কাগজ। আর কিছু বলিতে হইল না, তিনি লাফাইয়া উঠিয়া তাহার প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত

করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, নিয়ে যা বলচি ব্যাটা, নিয়ে যা সুমুখ থেকে। বেরো বলচি—

হতবুদ্ধি বেয়ারাটা মনিবের কাণ্ড দেখিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতেই, তিনি কন্যার প্রতি অগ্নি-দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কণ্ঠস্বর আরও একপর্দ্দা চড়াইয়া দিয়া বলিলেন, হারামজাদা, নচ্ছার যদি আর কোনদিন কোন ছলে আমার বাড়ি ঢোকবার চেষ্টা করে ত তাকে পুলিশে দেব—এই আমি তোমাকে জানিয়ে রাখলুম অচলা!

নিজের নাম শুনিয়া অচলা তাহার একান্ত পাণ্ডুর মুখখানি ধীরে ধীরে উন্নত করিয়া ব্যথিত ম্লান চক্ষুদুটি পিতার মুখের প্রতি নিঃশব্দে মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

পিতা কহিলেন, টাকা ছড়িয়ে বাপের চোখকে বন্ধ করা যায় না, পাষণ্ড যেন একথা মনে রাখে!

কন্যা তথাপি নিরুত্তর হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার মলিন দৃষ্টি যে উত্তরোত্তর প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল, পিতার দৃষ্টিতে তাহা পড়িল না। তিনি তর্জ্জনী কম্পিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হাণ্ডনোট ছিঁড়ে ফেলে বাপকে ঘুষ দেওয়া যায় না, এ-কথা আমি তাকে বুঝিয়ে তবে ছাড়ব। এ-বাড়ি আমি নিজে বিক্রী করে নিজের ঋণ পরিশোধ করে যেখানে ইচ্ছে চলে যাবো—আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না, তা বলে রাখচি।

এতক্ষণ পরে অচলা কথা কহিল। প্রথমটা বাধা পাইল বটে, কিন্তু তার পরে স্থির অবিচলিত-কণ্ঠে কহিল, ঋণ-পরিশোধ না করে বাড়িটা আমার জন্যে রেখে যাবে, এই কি আমি প্রত্যাশা করি বাবা? তুমি না করলে ত এ-কাজ আমাকেই করতে হ'তো।

কেদারবাবু অধিকতর উত্তেজিতভাবে জবাব দিলেন, তোমরা যা করে এসেচ, শুধু তাইতেই ত আমি ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারচিনে, তা তুমি জানো?

অচলা তেমনি শান্ত দৃঢ়স্বরে প্রত্যুত্তর দিল, না, আমি জানিনে। আমি এমন কিছু যদি করতুম বাবা, যার জন্যে তুমি মুখ দেখাতে পারো না, তা হলে সকলের আগে আমার মুখই তোমরা কেউ দেখতে পেতে না। সে-দেশে আর যারই অভাব থাক, ডুবে মরবার জলের অভাব ছিল না। বলিতে বলিতেই কান্নায় তাহার গলা ধরিয়া আসিল; কহিল, কাল থেকে যে অপমান আমাকে তুমি করচ, শুধু মিথ্যে বলেই সইতে পেরেচি, নইলে—

এইখানে তাহার একেবারে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সে মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন কোনমতে সংবরণ করিয়া দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। ক্রোধ করিবার, আঘাত করিবার,

শোক করিবার অর্থাৎ কন্যার নিন্দিত আচরণে সর্ব্বপ্রকার গভীর বিষাদের কারণ একমাত্র তাঁহারই ঘটিয়াছে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস; কিন্তু অপরপক্ষও যে অকস্মাৎ তাঁহারই আচরণকে অধিকতর গর্হিত বলিয়া মুখের উপর তিরস্কার করিয়া তীব্র অভিমানে কাঁদিয়া চলিয়া যাইতে পারে, এ সম্ভাবনা তাঁহার স্বপ্নেও উদয় হয় নাই। তাই অভিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িলেন এবং মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বারংবার বলিতে লাগিলেন, এই নাও—এ আবার কি কাণ্ড!

ইহার পরে আট দশদিন পিতা-পুত্রীর যে কি করিয়া কাটিল, সে শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন। অচলা কোনমতেই নিজের ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল না, বাটীর চাকর-দাসীর কাছেও মুখ-দেখানো তাহার পক্ষে যেন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিগত কয়েকদিনের মত আজও সে পথের দিকে চাহিয়াই দিন কাটাইবার জন্য খোলা জানালায় আসিয়া বসিয়াছিল।

শীতের দিন, মধ্যাহ্নের সঙ্গে সঙ্গেই একটা ম্লান ছায়া যেন আকাশ হইতে মাটির উপরে ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িতেছিল এবং সেই মালিন্যের সহিত তাহার সমস্ত জীবনের কি একটা অজ্ঞাত সম্বন্ধ অন্তরের গভীর তলদেশে অনুভব করিয়া তাহার সমস্ত মন যেন স্বল্পায়ু বেলার মতই নিঃশব্দে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। তাহার চক্ষু যে ঠিক কিছু দেখিতেছিল তাহাও নহে, অথচ অভ্যাসমত উপরে-নীচে, আশে-পাশে কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়াইতেছিল না। এমনি একভাবে বসিয়া বেলা যখন আর বাকী নাই, সহসা দেখিতে পাইল, সুরেশের গাড়ি তাহাদের বাটীতে প্রবেশ করিতেছে। চক্ষের পলকে তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল এবং পুলিশ দেখিয়া চোর যে ভাবে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, ঠিক তেমনি করিয়া সে জানালা হইতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে খাটের উপর শুইয়া পড়িল।

মিনিট-কুড়ি পরে তাহার রুদ্ধ দরজায় ঘা পড়িল, এবং বাহির হইতে তাহার পিতা স্নিগ্ধস্বরে ডাক দিলেন, মা অচলা, জেগে আছো কি?

কিন্তু সাড়া না পাইয়া অধিকতর কোমল-কণ্ঠে কহিলেন, বেলা গেছে মা, ওঠো। সুরেশের পিসিমা তোমাকে নিতে এসেচেন, মহিম নাকি ভারি পীড়িত।

অচলা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া নীরবে দ্বার খুলিয়া দিতেই সুরেশের পিসিমা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

অচলা হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

কেদারবাবু সকলের পশ্চাতে ঘরে ঢুকিয়া শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমাদের চলে আসবার পর থেকেই মহিমের ভারি

জ্বর। খুব সম্ভব রাত্রে হিম লেগে দুশ্চিন্তায় পরিশ্রমে নানা কারণে এই অসুখটি হয়েছে। বলিয়া সুরেশের পিসিকে উদ্দেশ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আমি ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি, এদের পাঠিয়ে পর্য্যন্ত সে একটা সংবাদ দিলে না কেন? সুরেশ আমার দীর্ঘজীবী হোক, সে গিয়ে বুদ্ধি করে তাকে এখানে না এনে ফেললে কি যে হ'তো তা ভগবানই জানেন। বলিয়া সস্নেহ অনুতাপে বৃদ্ধের গলা ধরিয়া আসিল।

অচলা নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিল, কোন প্রশ্ন করিল না, কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না।

সুরেশের পিসিমা অচলার বাহুর উপর তাঁহার ডান হাতখানি রাখিয়া শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, ভয় নেই মা, সে দু'দিনেই ভাল হয়ে যাবে।

অচলা কোন কথা না কহিয়া তাঁহাকে আর একবার নত হইয়া প্রণাম করিয়া আলনা হইতে শুধু গায়ের কাপড়খানি টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

এই শীতের অপরাহ্ণে ঠাণ্ডার মধ্যে তাহাকে কিছুমাত্র গরম জামা-কাপড় না লইয়া, খালি পায়ে অনভ্যস্ত সাজে বাহিরে যাইতে উদ্যত দেখিয়া বৃদ্ধ পিতার বুকে বাজিল; কিন্তু পুরোবর্ত্তী ওই বিধবার সজ্জার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আর তাঁহার বাধা দিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি শুধু কেবল বলিলেন, চল মা, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি; বলিয়া চটিজুতা পায়ে দিয়াই সকলের অগ্রে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া চলিলেন।

২৩

মহিমের প্রতি অচলার সকলের চেয়ে বড় অভিমান এই ছিল যে, স্ত্রী হইয়াও সে একটি দিনের জন্যও স্বামীর দুঃখ-দুশ্চিন্তার অংশ গ্রহণ করিতে পায় নাই। এই লইয়া সুরেশও বন্ধুর সহিত ছেলেবেলা হইতে অনেক বিবাদ করিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কৃপণের ধনের মত মহিম এই বস্তুটিকে সমস্ত সংসার হইতে চিরদিন এমনি একান্ত করিয়া আগলাইয়া ফিরিয়াছে যে, তাহাকে দুঃখে দুঃসময়ে কাহারও সাহায্য করা দূরে থাক, কি যে তাহার অভাব, কোথায় যে তাহার ব্যথা, ইহাই কোনদিন কেহ ঠাহর করিতে পারে নাই।

সুতরাং বাড়ি যখন পুড়িয়া গেল, তখন সেই পিতৃপিতামহের ভস্মীভূত গৃহস্তূপের প্রতি চাহিয়া মহিমের বুকে যে কি শেল বিঁধিল, তাহার মুখ দেখিয়া অচলা অনুমান করিতে পারিল না। মৃণালের বৈধব্যেও স্বামীর দুঃখের পরিমাণ করা তাহার তেমনি

অসাধ্য। যেদিন নিজের মুখে শুনাইয়া দিয়াছিল, তাহাকে সে ভালবাসে না, সেদিন সে আঘাতের গুরুত্ব সম্বন্ধেও সে এমনি অন্ধকারেই ছিল। অথচ এত বড় নির্ব্বোধও সে নহে যে, সর্ব্বপ্রকার দুর্ভাগ্যেই স্বামীর নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যকে যথার্থই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহার মনের মধ্যে কোন সংশয় উঁকি মারিত না। তাই সেদিন স্টেশনের উপরে যে স্বামীর অবিচলিত শান্ত মুখের প্রতি বারংবার চাহিয়া সমস্ত পথটা শুধু এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিল, সহিষ্ণুতার ওই মিথ্যা মুখোসের অন্তরালে তাহার মুখের সত্যকার চেহারাটা না জানি কিরূপ!

আজ তাহার পীড়ার সংবাদটাকে লঘু এবং স্বাভাবিক ঘটনার আকার দিবার জন্য কেদারবাবু যখন সহজ গলায় বলিয়াছিলেন, তিনি কিছুই আশ্চর্য্য হন নাই, বরঞ্চ এতবড় দুর্ঘটনার পরে এমনিই কিছু একটা মনে মনে আশঙ্কা করিতেছিলেন, তখন অচলার নিজের অন্তরে যে ভাব এক মুহূর্ত্তের জন্যও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাকে অবিমিশ্র উৎকণ্ঠা বলাও সাজে না।

সুরেশের রবার-টায়ারের গাড়ি দ্রুতবেগে চলিয়াছিল। পিসিমা এক দিকের দরজা টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, এবং তাহার পার্শ্বে অচলা পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া বসিয়াছিল। শুধু কেদারবাবু কাহারো কাছে কোন উৎসাহ না পাইয়াও পথের দিকে শূন্য দৃষ্টি পাতিয়া অনর্গল বকিতেছিল। সুরেশের মত দয়ালু বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ছেলে ভূ-ভারতে নাই; মহিমের একগুঁয়েমির জ্বালায় তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন; যে-দেশে মানুষ নাই, ডাক্তার-বৈদ্য নাই, শুধু চোর-ডাকাত, শিয়াল-কুকুরের বাস, সেই পাড়াগাঁয়ে গিয়া বাস করার শাস্তি একদিন তাহাকে ভাল করিয়াই ভোগ করিতে হইবে। এমনি সমস্ত সংলগ্ন অসংলগ্ন মন্তব্য তিনি নিরন্তর এই দুটি নির্ব্বাক্ রমণীর কর্ণে নির্ব্বিচারে ঢালিয়া চলিতেছিলেন।

ইহার কারণও ছিল। কেদারবাবু স্বভাবতঃই যে এতটা হাল্কা প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ের গূঢ় আনন্দ কোন সংযমের শাসনই মানিতেছিল না। তাঁহাদের পরম মিত্র সুরেশের সহিত প্রকাণ্ড বিবাদ, একমাত্র কন্যার নিঃশব্দ বিদ্রোহ এবং সর্ব্বোপরি একান্ত কুৎসিত ও কদর্য্য সংশয়ের গোপন গুরুভার বিগত কয়েকদিন হইতে তাঁহার বুকের উপর জাঁতার মত চাপিয়া বসিয়াছিল; আজ পিসিমার অপ্রত্যাশিত আগমনে সেই ভারটা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। মহিমের অসুখের খবরটাকে তিনি মনের মধ্যে আমলই দেন নাই। যদি সে রাত্রির দৈব-দুর্ব্বিপাকে ঠাণ্ডা লাগাইয়া একটু জ্বরভাবই হইয়া থাকে ত সে কিছুই নহে। পিসিমা দুই-তিনদিনের মধ্যে আরোগ্য হইবার আশা দিয়াছেন; হয়ত সে সময়ও লাগিবে না, হয়ত কাল সকালেই সারিয়া যাইবে। পীড়ার সম্বন্ধে ইহাই তিনি ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আসল কথা হইতেছে এই যে, সুরেশ

স্বয়ং গিয়া তাহাকে আপনার বাড়িতে ধরিয়া আনিয়াছে এবং যে কোন ছলে তাহার স্ত্রীকে তাহারই পার্শ্বে আনিয়া দিবার জন্য নিজের পিসিমাকে পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিয়াছে। কন্যা-জামাতার মধ্যে যে কিছুকাল হইতে একটা মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছিল, দাসীর মুখের এ তথ্যটি তিনি একবারও বিস্মৃত হন নাই। অতএব সমস্তই যে সেই দাম্পত্য-কলহের ফল, আজ এই সত্য পরিস্ফুট হওয়ায়, এই অবিশ্রাম বকুনির মধ্যেও তাঁহার নিরতিশয় আত্মগ্লানির সহিত মনে হইতে লাগিল, ওখানে পৌঁছিয়া সেই সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও ভদ্র যুবকের মুখের পানে তিনি চাহিয়া দেখিবেন কি করিয়া? কিন্তু তাঁহার কন্যার সর্ব্বদেহের উপর একটা কঠিন নীরবতা স্থির হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। অসুখটা যে বিশেষ কিছুই নহে, তাহা সেও মনে মনে বুঝিয়াছিল; শুধু বুঝিতে পারিতেছিল না, সুরেশ তাহাকে ধরিয়া আনিল কিরূপে! স্বামীকে সে এটুকু চিনিয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাস্তার গ্যাস জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গাড়ি সুরেশের বাড়ির ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং গাড়ি-বারান্দার অনতিদূরে আসিয়া থামিল। কেদারবাবু গলা বাড়াইয়া দেখিয়া সহসা উদ্বিগ্ন-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, দুখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে কেন?

সঙ্গে সঙ্গেই অচলার চকিত দৃষ্টি গিয়া তাহার উপরে পড়িল এবং লণ্ঠনের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সুরেশ একজন প্রবীণ ইংরাজকে সসম্ভ্রমে গাড়িতে তুলিয়া দিতেছে এবং আর একজন সাহেবী-পোষাকপরা বাঙালী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। ইহারা যে ডাক্তার, তাহা উভয়েই চক্ষের পলকে বুঝিতে পারিল।

তাঁহার চলিয়া গেলে ইহাদের গাড়ি আসিয়া গাড়ি-বারান্দায় লাগিল। সুরেশ দাঁড়াইয়াছিল, কেদারবাবু চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিলেন, মহিম কেমন আছে সুরেশ! অসুখটা কি?

সুরেশ কহিল, ভাল আছে। আসুন।

কেদারবাবু অধিকতর ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, অসুখটা কি তাই বল না শুনি?

সুরেশ কহিল, অসুখের নাম করলে ত আপনি বুঝতে পারবেন না কেদারবাবু! জ্বর, বুকে একটু সর্দ্দি বসেচে! কিন্তু আপনি নেমে আসুন, ওদের নামতে দিন।

কেদারবাবু নামিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া বলিলেন, একটু সর্দ্দি বসেচে, তার চিকিৎসা ত তুমি নিজেই করতে পার! আমি ছেলেমানুষ নই সুরেশ, দু'জন ডাক্তার কেন? সাহেবডাক্তারই বা কিসের জন্যে? বলিতে বলিতে তাঁহার গলা কাঁপিতে লাগিল।

সুরেশ নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে নামাইয়া বলিল, পিসিমা, অচলাকে ভেতরে নিয়ে যাও, আমি যাচ্ছি।

অচলা কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিল না, তাহার মুখের চেহারাও অন্ধকারে দেখা গেল না ; নামিতে গিয়া পা-দানের উপর তাহার পা যে টলিতে লাগিল, ইহাও কাহারও চোখে পড়িল না, সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে নামিয়া পিসিমার পিছনে পিছনে বাটীর ভিতর চলিয়া গেল।

মিনিট-কয়েক পরে দ্বারের ভারি পর্দ্দা সরাইয়া যখন সে রোগীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন মহিম বোধ করি তাহার বাটীর সম্বন্ধে কি-সব বলিতেছিল। সেই জড়িত-কণ্ঠের দুটো কথা কানে প্রবেশ করিবামাত্রই বুঝিতে বাকী রহিল না, ইহা অর্থহীন প্রলাপ এবং রোগ কতদূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে ; মুহূর্ত্তকালের জন্য সে দেয়ালের গায়ে ভর দিয়া আপনাকে দৃঢ় করিয়া রাখিল।

যে মেয়েটি রোগীর শিয়রে বসিয়া বরফ দিতেছিল, সে ফিরিয়া চাহিল এবং ধীর-পদে উঠিয়া আসিয়া অচলাকে হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ইহার বিধবা বেশ। চুলগুলি ঘাড় পর্য্যন্ত ছোট করিয়া ছাঁটা ; ইহার মুখের উপর সর্ব্বকালের সকল বিধবার বৈরাগ্য যেন নিবিড়ভাবে বিরাজ করিতেছিল। ম্লান দীপালোকে প্রথমে ইহাকে মৃণাল বলিয়া অচলা চিনিতে পারে নাই ; এখন মুখোমুখি স্থির হইয়া দাঁড়াইতেই ক্ষণকালের জন্য উভয়েই যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিল ; একবার অচলার সমস্ত দেহ দুলিয়া নড়িয়া উঠিল ; কি একটা বলিবার জন্য ওষ্ঠাধরও কাঁপিতে লাগিল ; কিন্তু কোন কথাই তাহার মুখ ফুটিয়া বাহির হইল না, এবং পরক্ষণেই তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ ছিন্নলতার মত মৃণালের পদমূলে পড়িয়া গেল।

চেতনা পাইয়া অচলা চাহিয়া দেখিল, সে পিতার ক্রোড়ের উপর মাথা রাখিয়া একটা কোচের উপর শুইয়া আছে। একটা দাসী গোলাপজলের পাত্র হইতে তাহার চোখে-মুখে ছিটা দিতেছে এবং পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুরেশ একখানা হাত-পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছে।

ব্যাপারটা কি হইয়াছে, স্মরণ করিতে তাহার কিছুক্ষণ লাগিল। কিন্তু মনে পড়িতে লজ্জায় মরিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেই কেদারবাবু বাধা দিয়া কহিল, একটু বিশ্রাম কর মা, এখন উঠে কাজ নাই।

অচলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, না বাবা, আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি, বলিয়া পুনরায় বসিবার চেষ্টা করিতে পিতা জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়া উদ্বেগের সহিত বলিলেন, এখন উঠবার কোন আবশ্যক নেই অচলা, বরঞ্চ একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা কর।

সুরেশও অস্ফুটে বোধ করি এই কথায়ই অনুমোদন করিল। অচলা নীরবে একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া প্রত্যুত্তরে কেবল পিতার হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ঘুমোবার জন্যে ত এখানে আসিনি বাবা—

আমার কিছুই হয়নি—আমি ও-ঘরে যাচ্ছি। বলিয়া প্রতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এ-বাটীর ঘর-দ্বার সে বিস্মৃত হয় নাই। রোগীর কক্ষ চিনিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। প্রবেশ করিতেই মৃণাল চাহিয়া দেখিল; কহিল, তুমি এসে একটুখানি বোসো সেজদি, আমি আহ্নিক সেরে নিই গে। বরফের টুপীটা না পড়ে যায়, একটু নজর রেখো। বলিয়া সে অচলাকে নিজের জায়গায় বসাইয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

২৪

কঠিন নিমোনিয়া রোগ সারিতে সময় লাগিবে। কিন্তু মহিম ধীরে ধীরে যে আরোগ্যের পথেই চলিয়াছিল, এ-যাত্রায় আর তাহার ভয় নাই, এ-কথা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখের অর্থহীন বাক্য, চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি সমস্তই শান্ত এবং স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছিল।

দিন-দশেক পরে একদিন অপরাহ্ণবেলায় মহিম শান্তভাবে ঘুমাইতেছিল। এ-বৎসর সর্ব্বত্রই শীতটা বেশি পড়িয়াছিল। তাহাতে এইমাত্র বাহিরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রোগীর খাটের সহিত একটা তক্তপোষ জোড়া দিয়া বিছানা করা হইয়াছিল; ইহার উপরেই সকলে বেশ করিয়া কাপড় গায়ে দিয়া বসিয়াছিল। সকলের চোখ-মুখেই একটা নিরুদ্বিগ্ন তৃপ্তির প্রকাশ, শুধু পিসিমা গৃহকর্ম্মে অন্যত্র নিযুক্ত এবং কেদারবাবু তখনও বাড়ি হইতে আসিয়া জুটিতে পারেন নাই।

সুরেশের প্রতি চাহিয়া মৃণাল হঠাৎ হাতজোড় করিয়া কহিল, এইবার আমার ছাড়-পত্র মঞ্জুর করতে হুকুম হোক সুরেশবাবু, আমি দেশে যাই। এই দারুণ শীতে আমার বুড়ী শাশুড়ী হয়ত বা মরেই গেল।

সুরেশ কহিল, এখনও কি তার বেঁচে থাকা দরকার না কি? না, তাঁর জন্য আপনার যাওয়া হবে না?

মৃণাল পলকের তরে ঘাড় ফিরাইয়া বোধ করি বা একটা দীর্ঘ নিশ্বাসই চাপিয়া লইল, তাহার পরে সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, শুধু আপনিই নয় সুরেশবাবু, এ প্রশ্ন পূর্ব্বে আমিও অনেকবার করেচি। মনেও হয়, এখন তাঁর যাওয়াই মঙ্গল। কিন্তু মরণ-বাঁচনের মালিক যিনি, তাঁর ত সে খেয়াল নেই, থাকলে হয়ত সংসারে অনেক দুঃখ-কষ্টের হাত থেকেই মানুষ নিস্তার পেত।

অচলা এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। মৃণালের কথায় বোধ করি তাহার স্বামীর

মৃত্যুর কথাটাই মনে করিয়া কহিল, তার মানে যিনি অন্তর্যামী তিনি জানেন, মানুষ শত দুঃখেও নিজের মৃত্যু চায় না।

মৃণালের মুখের উপর একটা গোপন বেদনার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। মাথা নাড়িয়া কহিল, না সেজদি, তা নয়। এমন সময় সত্যিই আসে যখন মানুষে যথার্থই মরণ-কামনা করে। সেদিন অনেক রাত্রে হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে যেতে শাশুড়ী-ঠাকুরুণকে বিছানায় পেলুম না। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি, ঠাকুর-ঘরের দরজাটা একটু খোলা। চুপি চুপি পাশে এসে দাঁড়ালুম। দেখি, তিনি গলায় কাপড় দিয়ে ঠাকুরের কাছে করজোড়ে মৃত্যু ভিক্ষে চাইচেন। বলচেন, ঠাকুর! যদি একটা দিনও কায়মনে তোমার সেবা করে থাকি ত আজ আমার লজ্জা নিবারণ কর। আমি মুক্তি চাইনে, স্বর্গ চাইনে, শুধু এই চাই ঠাকুর; তুমি আর আমাকে লজ্জা দিও না—আমি এ মুখ আমার বৌমার কাছে বার করতে পারচিনে। বলিতে বলিতেই মৃণাল ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই প্রার্থনার মধ্যে মাতৃ হৃদয়ের কত বড় সুগভীর বেদনা যে নিহিত ছিল, তাহা কাহারও অনুভব করিতে বিলম্ব হইল না। সুরেশের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কাহারও সামান্য দুঃখেই সে কাতর হইয়া পড়িত। আজ এই সন্তানহারা বৃদ্ধা জননীর মর্ম্মান্তিক দুঃখের কাহিনীতে তাহার বুকের মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল। সে খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে মাটির দিকে চাহিয়া মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, যাও দিদি, তোমার বুড়ো শাশুড়ীর সেবা করে কর্ত্তব্য কর গে, আমি আর তোমাকে আটকে রাখব না। এই হতভাগ্য দেশের আজও যদি কিছু গৌরব করবার থাকে ত সে তোমার মত মেয়েমানুষ। এমন জিনিসটি বোধ করি আর কোন দেশ দেখাতে পারে না। বলিয়া সে জিজ্ঞাসু-মুখে একবার অচলার প্রতি চাহিল। কিন্তু সে জানালার বাহিরে একখণ্ড ধূসর মেঘের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়াছিল বলিয়া তাহার কাছ হইতে কোন সাড়া আসিল না।

কিন্তু মৃণাল লজ্জা পাইয়া নিজের দিক হইতে আলোচনাটাকে অন্য পথে সরাইবার জন্য তাড়াতাড়ি জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, না, নেই বৈ কি! আপনি সব দেশের খবর জানেন কি-না! আচ্ছা, সেজদার চেয়ে আপনি বড় না ছোট?

এই অদ্ভুত প্রশ্নে সুরেশ সহাস্যে কহিল, কেন বলুন ত?

মৃণাল বাধা দিয়া বলিল, না, আমাকে আর আপনি নয়। আমি দিদি হলেও যখন বয়সে ছোট, তখন—মেজদা? নদা? বলুন, বলুন, শীগ্গির বলুন, কি?

অচলা আকাশ হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া এবার তাহার দিকে চাহিল। অনেকদিন পূর্ব্বে যেদিন এই মেয়েটি এমনি দ্রুত, এমনি অবলীলাক্রমে তাহার সহিত সেজদি সম্বন্ধ পাতাইয়া লইয়াছিল, সে কথা তাহার মনে পড়িল। কিন্তু মৃণালের

চরিত্রের এই দিকটা সুরেশের জানা ছিল না বলিয়া সে এই আশ্চর্য্য রমণীর মুখের পানে তাকাইয়া সকৌতুক হাস্যে বলিল, নদা! নদা! তোমার সেজদার চেয়ে আমি প্রায় দেড় বছরের ছোট।

মৃণাল কহিল, তা হলে নদা, দয়া করে একটি লোক ঠিক করে দিন, যে আমাকে কাল সকালের গাড়িতে রেখে আসবে।

যাইবার অনুমতি এইমাত্র সুরেশ নিজে দিলেও সে যে কাল সকালেই যাইতে উদ্যত হইবে তাহা সে ভাবে নাই। তাই ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, আর দুটো দিনও কি থাকতে পারবে না দিদি? তোমার ওপর ভার দিয়ে আমরা মহিমের জন্যে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলুম। এমন অহর্নিশি সতর্ক, এমন গুছিয়ে সেবা করতে আমি হাসপাতালেও কখনো কাউকে দেখেচি বলে মনে হয় না। কি বল অচলা?

প্রত্যুত্তরে অচলা শুধু মাথা নাড়িল।

মৃণাল সুরেশের চিন্তিতভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিল, আপনি সেজন্যে একটুকুও ভাববেন না। যার জিনিস, তারই হাতে দিয়ে যাচ্ছি, নইলে আমিও হয়ত যেতে পারতুম না। আপনার ত মনে আছে, আমাকে কি-রকম তাড়াতাড়ি চলে আসতে হয়েছিল। তাই কোনো বন্দোবস্ত করেই আসা হয়নি। কাল আমাকে ছুটি দিন নদা, আবার যখনই হুকুম করবেন তখনই চলে আসব।

সুরেশ আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া সহসা বলিয়া বসিল, আচ্ছা মৃণাল, সেই অজ পাড়াগাঁয়ে শুধু কেবল একা বুড়ো শাশুড়ীর সেবা করে, আর পূজো-আহ্নিক করে তোমার সমস্ত সময়টা কাটবে কি করে, আমি তাই শুধু ভাবি।

মৃণালের মুখের উপর পুনরায় ব্যথার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। কিন্তু সে হাসিয়া কহিল, সময় কাটাবার ভার ত আমার ওপর নেই নদা। যিনি সময় সৃষ্টি করেছেন তিনিই তার ব্যবস্থা করবেন।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা, সে যেন হ'লো। কিন্তু তোমার শাশুড়ী ত বেশিদিন বাঁচবেন না, আর মহিমকেও ডাক্তারের হুকুমমত ভাল হয়ে পশ্চিমের কোন একটা স্বাস্থ্যকর শহরে গিয়ে কিছুকাল বাস করতে হবে। তখন একলাটি সেখানে তুমি থাকবে কি করে?

মৃণাল উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় একটু হাসিল। কহিল, সে উনিই জানেন।

অজ্ঞাতসারে সুরেশের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। মৃণাল কহিল, নদা বুঝি এ-সব মানেন না?

কি সব?

এই যেমন ভগবান—

না।

তবে বুঝি আমাদের জন্যে ওটা আপনার অবজ্ঞার দীর্ঘনিশ্বাস বয়ে গেল দাদা?

সুরেশ এ-প্রশ্নের সহসা কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ বিমনার মত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না মৃণাল, তা নয়। একটা অজানা ভবিষ্যতের ভার তেমনি অজানা একটা ঈশ্বরের ওপর দিয়ে তারা যে বরঞ্চ আমাদের চেয়ে জিতের পথেই চলে, তা আমি অনেক দেখেচি। কিন্তু এসব আলোচনা থাক দিদি, হয়ত আমার প্রতি তোমার একটা ঘৃণা জন্মে যাবে।

মৃণাল তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া সুরেশের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিল, আচ্ছা, থাক্।

সুরেশ বিস্ময়ে অবাক হইয়া কহিল, এটা আবার কি হলো মৃণাল?

কোন্‌টা দাদা?

কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ পায়ের ধুলো নেওয়াটা?

মৃণাল কহিল, বড়ভাইয়ের পায়ের ধুলো নিতে কি আবার দিনক্ষণ দেখতে হয় নাকি? বলিয়া হাসিয়া উঠিয়া গেল।

আচ্ছা মেয়ে ত! বলিয়া সস্নেহ-হাস্যে সুরেশ অচলার মুখের প্রতি চাহিতে গিয়া বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। তাহার সমস্ত মুখ শ্রাবণ-আকাশের মত ঘন মেঘে যেন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, এমনি বোধ হইল। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাইয়া এ-সম্বন্ধে কোনপ্রকার প্রশ্নের আভাসমাত্র দিবার পূর্বেই অচলা হতবুদ্ধি সুরেশকে আকাশ-পাতাল ভাবিবার অজস্র অবকাশ দিয়া ত্বরিতপদে মৃণালের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

সেইখানে স্তব্ধভাবে বসিয়া সুরেশ কেবলি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এ কিসে কি হইল? মৃণালের প্রণাম করার সঙ্গে ইহার কেমন করিয়া যেন একটা নিগূঢ় যোগ আছে, তাহা সে নিজের ভিতর হইতে নিশ্চয় অনুমান করিতে লাগিল; কিন্তু এ যোগ কোথায়? কেন মৃণাল অকস্মাৎ তাহার পদধূলি মাথায় লইয়া চলিয়া গেল, এবং পলক না ফেলিতে কেনই বা অচলা ওরূপ বিবর্ণমুখে ঘর ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। নিজের ব্যবহার ও কথাবার্ত্তাগুলো সে আগাগোড়া বারংবার তন্ন তন্ন করিয়া স্মরণ করিয়াও কিন্তু কোন কূলকিনারা খুঁজিয়া পাইল না। অথচ পাশাপাশি এত বড় দুটো ঘটনাও কিছু শুধু শুধু ঘটে নাই, তাহাও সে বুঝিল। সুতরাং তাহারই কোন অজ্ঞাত নিন্দিত আচরণই যে এই অনর্থের মূল, এ সংশয় তাহার মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল।

কিন্তু মৃণালকেও এ-সম্বন্ধে কোনপ্রকার প্রশ্ন করা অসম্ভব। রাত্রিটা সে এক-

রকম পাশ কাটাইয়া রহিল, এবং প্রভাতে এক সময়ে অচলাকে নিভৃতে পাইয়া কহিল, তোমাকে একটা কথার জবাব দিতে হবে।

অলচার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। প্রশ্নটা যে কি, সে তাহার অগোচর ছিল না। গত রাত্রির সেই তাহার অদ্ভুত আচরণের কৈফিয়ৎ দিতে হইবে বুঝিয়া সে আরক্ত-মুখে মৃদুকণ্ঠে কহিল, কি কথা ?

সুরেশ আস্তে আস্তে বলিল, কাল মৃণাল হঠাৎ আমার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে গেল, তুমিও মুখ ভার করে রাগ করে চলে গেলে, সে কি তার শাশুড়ীর মরণের কথা বলেছিলুম বলে ?

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে অচলা একটা পথ দেখিতে পাইয়া মনে মনে খুশী হইয়া বলিল, এ-রকম প্রসঙ্গ কি তোমার তোলা উচিত ছিল ? সে বেচারার স্বামী নেই। শাশুড়ীর মৃত্যুতে তার নিঃসহায় অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ দিকি !

সুরেশ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, আমার ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি যে আর বেশিদিন বাঁচতে পারেন না, এ ত মৃণাল নিজেও বোঝে। তা ছাড়া সে নিঃসহায় হবেই বা কেন ?

অচলা জবাব দিল, এ-কথা আমরা ত তাকে একবারও বলিনি। বরঞ্চ তুমি তাকে নানারকমে ভয় দেখালে, দেশে সে একলাটি থাকবে কেমন করে !

সুরেশ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে সে যাবার পূর্ব্বে আমার কি তাকে সাহস দেওয়া উচিত নয় ? তার যে কোন ভয় নেই, এ-কথা কি তাকে—

বলিতে বলিতেই অকৃত্রিম করুণায় তাহার কণ্ঠ সজল হইয়া আসিল।

অচলা তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল। এই পরদুঃখকাতর সহৃদয় যুবকের সহস্র দয়ার কাহিনী তাহার চক্ষের নিমিষে মনে পড়িয়া গেল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তোমার সাহস দিতেও হবে না, ভয় দেখিয়েও কাজ নেই। যখন যে সময় আসবে, তখন আমি চুপ করে থাকব না।

সুরেশ আত্মবিস্মৃত আবেগভরে অকস্মাৎ তাহার হাতখানা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া প্রচণ্ড একটা নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, এই ত তোমার যোগ্য কথা। এই ত তোমার কাছে আমি চাই অচলা! বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু অপরিসীম লজ্জায় হাত ছাড়িয়া দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

তাহার যে উচ্ছ্বাস মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে পরার্থতার নির্ম্মল আনন্দের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছিল, এই লজ্জিত পলায়নে তাহা এক নিমিষেই কদর্য্য কলুষিত হইয়া দেখা দিল। অচলার বুকের রক্ত বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হইয়া বিন্দু বিন্দু ঘামে ললাট ভরিয়া উঠিল এবং সর্ব্বাঙ্গ বারংবার শিহরিয়া উঠিয়া নিকটবর্ত্তী একখানা চেয়ারের উপর সে নির্জ্জীবের মত বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণে তাহার সে ভাবটা কাটিয়া গেল

বটে, কিন্তু পীড়িত শয্যায় গিয়া নিজের আসনটি গ্রহণ করিতে আজ সমস্ত সকালটা তাহার কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল।

যাই যাই করিয়াও যাইতে মৃণালের দিন-দুই দেরি হইয়া গেল। মহিমের কাছে বিদায় লইতে গিয়া দেখিল, আজ সে পাশ ফিরিয়া অত্যন্ত অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যে বিদায় লইতে আসিয়াছিল, সে এই মিথ্যা নিদ্রার হেতু নিশ্চিত অনুমান করিয়াও চুপি চুপি কহিল, ওঁকে আর জাগিয়ে কাজ নেই সেজদি। কি বল?

প্রত্যুত্তরে অচলার ঠোঁটের কোণে শুধু একটুখানি বাঁকা হাসি দেখা দিল। মৃণাল মনে মনে বুঝিল, এ ছলনা সে ছাড়াও আরো একটি নারীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে অচলা অন্তরের মধ্যে যে গোপন ঈর্ষার ভাব পোষণ করে, তাহা সে মহিমের কাছে কোনদিন আভাসমাত্র না পাইয়াও জানিত। এই একান্ত অমূলক দ্বেষ তাহাকে কাঁটার মত বিঁধিত। কিন্তু তথাপি অচলা যে নিজের হীনতা দিয়া আজিকার দিনেও ওই পীড়িত লোকটির পবিত্র দুর্ব্বলতাটুকুকে বিকৃত করিয়া দেখিবে, তাহা সে ভাবে নাই। মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত তাহার মনটা জ্বালা করিয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া কানে কানে কহিল, তুমি ত সব জান সেজদি, আমার হয়ে ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ো। ব'লো ভাল হয়ে আবার যখন দেশে ফিরবেন, বেঁচে থাকি ত দেখা হবে।

নীচে কেদারবাবু বসিয়াছিলেন। মৃণাল প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল; এই অল্পকালের মধ্যেই সকলের মত তিনিও এই বিধবা মেয়েটিকে অতিশয় ভালবাসিয়াছিলেন। জামার হাতায় অশ্রু মুছিয়া কহিলেন, মা, তোমার কল্যাণেই মহিমকে আমরা যমের মুখ থেকে ফিরে পেয়েছি। যখনি ইচ্ছে হবে, যখনই একটু বেড়াবার সাধ হবে, তোমার ছেলেটিকে ভুলো না মা। আমার বাড়ি তোমার জন্যে রাত্রি-দিন খোলা থাকবে মৃণাল।

অচলা অদূরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মৃণাল তাহাকে দেখাইয়া হাসিমুখে কহিল, যমের বাপের সাধ্যি কি বাবা, ওঁর কাছ থেকে সেজদাকে নিয়ে যায়! যেদিন সেজদির হাতে পৌঁছে দিয়েচি, সেইদিনই আমার কাজ চুকে গেছে।

কেদারবাবুর মুখের ভাব একটু গম্ভীর হইল, কিন্তু আর তিনি কিছু বলিলেন না।

দুইজন বৃদ্ধগোছের কর্ম্মচারী ও একজন দাসী মৃণালকে দেশে পৌঁছাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; তাহাদের সকলকে লইয়া স্টেশনের অভিমুখে ঘোড়ার গাড়ি ফটকের বাহির হইয়া গেলে কেদারবাবুর অন্তরের ভিতর হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। ধীরে ধীরে শুধু বলিলেন, অদ্ভুত, অপূর্ব্ব মেয়ে!

সুরেশের মনটাও বোধ করি এই ভাবেই পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সে কোনদিকে

লক্ষ্য না করিয়া সায় দিয়া আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল, আমি কখনো এমনটি আর দেখিনি কেদারবাবু! এমন মিষ্টি কথাও কখনো শুনিনি, এমন নিপুণ কাজ-কর্ম্মও কখনো দেখিনি। যে কাজ দাও এমন অপূর্ব্ব দক্ষতার সঙ্গে করে দেবে যে, মনে হবে যেন এই নিয়েই সে চিরকালটা আছে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, কোনদিন গ্রামের বাইরে পর্য্যন্ত যায় নি।

কেদারবাবু ইহা সত্য বলিয়া জানিলেও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, বল কি সুরেশ।

সুরেশ কহিল, যাথার্থ-ই তাই। ওর পানে চেয়ে চেয়ে মাঝে মাঝে মনে হ'তো, এই যে জন্মান্তরের সংস্কার বলে একটা প্রবাদ আছে, কি জানি সত্যি না-কি। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

পরকাল-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গে কেদারবাবু চিন্তাযুক্ত মুখে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, তা সে যাই হোক, এ কয়দিন দেখে দেখে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হয়েচে, এ মেয়ে স্ত্রীলোকের মধ্যে অমূল্য রত্ন। একে সারাজীবন এমন জীবন্মৃত করে রাখা শুধু পাপ নয়, মহাপাপ। ও আমার মেয়ে হলে আমি কোনমতেই নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারতুম না।

সুরেশ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি করতেন?

বৃদ্ধ উদ্দীপ্তস্বরে বলিলেন, আমি আবার বিবাহ দিতুম। একটা বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওর ওই উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে যারা ওকে সন্ন্যাসিনী সাজিয়েচে, তারা ওর মিত্র নয়, ওর শত্রু। শত্রুর কার্য্যকে আমি কোনমতেই ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করে নিতুম না।

একটু মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন, তাছাড়া ওর স্বামীর ব্যবহারটাই একবার মনে করে দেখ দিকি সুরেশ। সে লোকটার দু-দুটো স্ত্রী গত হতে পঞ্চাশ বছর বয়সে যখন এমন মেয়েকে বিবাহ করতে রাজি হ'লো তখন নিজের সুখ-সুবিধে ভিন্ন স্ত্রীর ভবিষ্যতের দিকে পাষণ্ড কতটুকু দৃষ্টিপাত করেছিল, কল্পনা কর দেখি!

সুরেশকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, না সুরেশ, আমি বিধবা-বিবাহের ভালমন্দ তর্ক তুলচিনে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তোমার সমস্ত হিন্দুসমাজ চীৎকার করে মলেও আমি মানবো না, এই ব্যবস্থাই ওই দুখের মেয়েটার পক্ষে চরম শ্রেয়ঃ। ওর এমন এতটুকু কিছু নেই যার মুখ চেয়ে ও একটা দিনও কাটাতে পারে। সমস্ত জীবনটা কি তোমরা খেলার জিনিস পেয়েছ সুরেশ যে, ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মচর্য্য করে চেঁচালেই সারা দুনিয়াটা ও জন্যেই রাতারাতি বদলে ঋষির তপোবন হয়ে উঠবে! মেয়েটার শুধু কাপড়-চোপড়ের পানে চাইলে আমার বুক যেন ফেটে যেতে থাকে।

সুরেশ জবাবও দিল না, মুখ তুলিয়াও চাহিল না; কিন্তু চোখের কোণে দেখিতে পাইল যে; চৌকাঠে ভর দিয়া অচলা এতক্ষণ পর্য্যন্ত মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিল—সেখানে আর সে নাই, কখন নিঃশব্দে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেছে।

মৃণাল চলিয়া গেলে, অচলা যখনই সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখে, তখনই তাহার মনে হয়, সে বিমনা হইয়া আছে এবং কিসের শোক যেন তাহাকে নিরন্তর শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছে।

দিন-দুই পরে একদিন অপরাহ্নে সুরেশ নীচের বারান্দার একধারে রৌদ্রের মধ্যে আরাম-কেদারাটা টানিয়া লইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল, পদশব্দে চাহিয়া দেখিল তাহারই জন্য চা লইয়া অচলা নিজে আসিতেছে। এরূপ ঘটনা পূর্ব্বে কোনদিন ঘটে নাই, তাই সে আশ্চর্য্য হইয়া সোজা উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেয়ারা কৈ? আজ তুমি যে!

অচলা এ-প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই একটা ছোট টিপায় চেয়ারের পাশে টানিয়া চায়ের বাটি নামাইয়া এবং আর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া নিজেও বসিয়া পড়িল।

এই অভিনব আচরণে তাহাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে আর সুরেশের সাহস হইল না। শুধু চায়ের পেয়ালাটা নীরবে হাতে তুলিয়া লইল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া অচলা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সুরেশবাবু, আপনি কি বিধবা-বিবাহ কোন ক্ষেত্রেই ভাল বলে মনে করেন না?

সুরেশ চায়ের বাটি হইতে মুখ না তুলিয়াই জবাব দিল, করি। তার কারণ, কুসংস্কার আজও আমার অতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছায়নি।

অচলা চিন্তা করিবার নিজেকে আর মুহূর্ত্ত অবসর না দিয়া বলিল, তা হলে মৃণালের মত মেয়েকে বিবাহ করতে আপনার ত লেশমাত্র আপত্তি থাকা উচিত নয়।

সুরেশ চায়ের চাটিটা হাতে করিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া বলিল, এ কথার মানে?

অচলার মুখে বা কণ্ঠস্বরে কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না। বেশ সহজভাবে বলিল, আপনার কাছে আমি অসংখ্য ঋণে ঋণী। তা ছাড়া আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষিণী। আপনাকে আমি সুস্থ, সহজ, সংসারী এবং স্বাভাবিক দেখতে চাই। একদিন আপনি বিবাহ করতে প্রস্তুত ছিলেন, আজ আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি স্বীকার করুন।

এক নিশ্বাসে মুখস্থর মত এতগুলো কথা বলিয়া অচলা যেন হাঁপাইতে লাগিল।

সুরেশ পাথরে-গড়া মূর্ত্তির মত অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, এতে তুমি কি সত্যই সুখী হবে?

অচলা কহিল, হাঁ।

সে রাজি হবে?

তাই ত আমার বিশ্বাস।

সুরেশ একটুখানি ম্লান হাসিয়া বলিল, আমার বিশ্বাস তা নয়। বইয়ে পড়েচ ত সহমরণের দিনে কোন কোন সতী হাসতে হাসতে পুড়ে মরত। মৃণাল তাদেরই জাত। এদের মুখের কথায় সম্মত করানো ত ঢের দূরের কথা, একটা একটা করে হাত-পা কাটতে থাকলেও একে আর একবার বিয়ে করতে রাজি করানো যাবে না। এ অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করে মাঝ থেকে আমাকে তার কাছে মাটি করে দিও না অচলা। আমাকে সে দাদা বলে ডেকেচে, তার কাছে আমি সম্মানটুকু বজায় রাখতে চাই।

দেখিতে দেখিতে অচলার সমস্ত মুখ ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। সুরেশের কথা শেষ হইতেই কঠিন মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সংসারে শুধু মৃণালই একমাত্র সতী নয় সুরেশবাবু। এমন সতীও আছে, যারা মনে মনেও একবার কাউকে স্বামিত্বে বরণ করলে, সহস্র কোটি প্রলোভনেও আর তাদের নড়ানো যায় না। এদের কথা আপনি ছাপার বইয়ে পড়তে না পেলেও সত্যি বলে জেনে রাখবেন সুরেশবাবু! বলিয়া স্তম্ভিত অভিভূত সুরেশের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়াই এই গর্ব্বিতা রমণী দৃঢ়-পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গেল।

২৫

একজনের উচ্ছ্বসিত অকপট প্রশংসার মধ্যে যে আর একজনের কত বড় সুকঠোর আঘাত ও অপমান লুকাইয়া থাকিতে পারে, বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের কেহই বোধকরি তাহা মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বেও জানিত না। সুরেশ হাতের বাতি হাতে লইয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল, এবং অচলা তাহার ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া মর্ম্মান্তিক ক্রন্দনের দুর্নিবার বেগ রোধ করিতে লাগিল; পাশেই মহিমের ঘর, পাছে বিন্দুমাত্র শব্দও তাহার কানে গিয়া পৌঁছে। বস্তুতঃ অন্তর্যামী ভিন্ন সে কান্নার ইতিহাস আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জানিল না।

কিন্তু সে নিজে এই গভীর দুঃখের মধ্যে এক নূতন তত্ত্ব লাভ করিল। এই নারী-জীবনের সতীত্ব যে কত বড় সম্পদ, এতদিন পরে তাহার পরিপূর্ণ মহিমা আজই প্রথম যেন তাহার চোখের সম্মুখে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হইয়া দেখা দিল। সেদিন সুরেশের সংস্পর্শে পিতার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিকে সে অন্যায় উপদ্রব মনে করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ অকস্মাৎ সেই ধর্ম্মহীন পরস্ত্রীলুব্ধ সুরেশকেই

যখন সতীত্বের পাদপদ্মে অমন করিয়া মাথা পাতিয়া প্রণাম করিতে দেখিল, তখন নিজের সত্যকার স্থানটাও আর তাহার দৃষ্টির আগোচর রহিল না।

আরও একটা জিনিস। সুস্পষ্ট বাক্যের শক্তি যে কত বৃহৎ; আজ এ সত্যও সে প্রথম উপলব্ধি করিল। সে শিক্ষিতা রমণী। স্বামীর প্রতি কায়মন-নিষ্ঠাই যে সতীত্ব এ-কথা তাহার অবিদিত ছিল না। শুধু দেহ বা শুধু মন কোনটাই যে একাকী সম্পূর্ণ নয়, ইহা সে ভাল করিয়াই জানিত। তথাপি মন যখন তাহার বিচলিত হইয়াছে, স্বামীকে ভালবাসে না, জিহ্বা যখন এ-কথা উচ্চরবে ঘোষণা করিতে সঙ্কোচ মানে নাই, তখনও কিন্তু কোনদিন তাহার আপনাকে ছোট বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু আজ যখন সুরেশের মুখের সুস্পষ্ট বাণী না জানিয়া তাহার নামের সঙ্গে অসতী শব্দটা যোগ করিয়া দিতে চাহিল, তখনই তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন এক বুক-ফাটা বেদনার আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাই বলিয়া মৃণালের প্রতি যে তাহার শ্রদ্ধা বাড়িল, তাহা নহে; কিন্তু এই মেয়েটির প্রসঙ্গে যে চৈতন্য আজ সে লাভ করিল, ইহা সে জীবনে কখনও বিস্মৃত হইবে না, ইহা আপনার কাছে আপনি বার বার প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল।

বাহিরে পিতার লাঠির আওয়াজ এবং পিছনে সুরেশের পদশব্দ সে শুনিতে পাইল। বুঝিল তাঁহারা মহিমকে দেখিতে চলিয়াছেন, এবং অল্পকাল পরেই পিতার কণ্ঠস্বরে তাহার আহ্বান শুনিয়া সে বেশ করিয়া আঁচলে চোখ-মুখ মুছিয়া দ্বার খুলিয়া ও-ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

কেদারবাবু তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, আজ ব্যাপার কি? ছটোর সময় সুরুয়া দেবার কথা, চারটে বাজে যে! ও কি, চোখ-মুখ অমন ভারি কেন? ঘুমুচ্ছিলে না কি?

অচলা উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রোগীকে সুরুয়া দিবার ব্যবস্থা হইবার পরে এই কাজটা মৃণালই করিত। চাকর চড়াইয়া দিত, সে আন্দাজ করিয়া যথাসময়ে নামাইয়া লইত। সে চলিয়া গেলে এ ভারটা অচলার উপরেই পড়িয়াছিল। আজ সে-কথা তাহার মনেই ছিল না। ছুটিয়া গিয়া দেখিল, আগুন বহুক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে এবং সমস্ত শুকাইয়া পুড়িয়া রহিয়াছে।

বহুক্ষণ সেইখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন কেদারবাবু এ-কথা শুনিয়া অচলাকে কিছুই না বলিয়া শুধু সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া কঠিনভাবে বলিলেন, তখনি ত তোমাকে বলেছিলুম সুরেশ, এখন একজন ভাল নার্স না রাখলে মহিমকে বাঁচাতে পারবে না। নিজের মেয়েকে কি আমার চেয়ে তোমরা বেশি বোঝো?

সুরেশ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। কিন্তু মহিম যে এতক্ষণ নিঃশব্দে স্ত্রীর লজ্জিত

ম্লান মুখখানির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিল তাহা কেহই দেখে নাই। সে এখন ধীরে ধীরে কহিল, নার্সের হাতে আমার ওষুধ পর্য্যন্ত খেতে প্রবৃত্তি হবে না সুরেশ। তবে ওঁকে সাহায্য করবার একজন লোক দাও। কাল-পরশু দুটো রাত্রিই ওঁকে সারারাত্রি জাগতে হয়েচে। দিনের-বেলায় একটু বিশ্রামের অবকাশ না পেলে কলের মানুষকে দিয়েও কাজ পাবে না ভাই।

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য না হইলেও মিথ্যা নয়। সুরেশ খুশী হইয়া মুখ তুলিল, কিন্তু কেদারবাবু নিজের রূঢ়বাক্যে লজ্জা পাইয়া কোন-কিছু একটা বলিবার উদ্যোগ করিতেই অচলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে তাহার অনেকবার ইচ্ছা করিতে লাগিল, রুগ্ন স্বামীর কাছে বহু অপরাধের জন্য কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া একবার জিজ্ঞাসা করে, তাহার মত পাপিষ্ঠাকে তিরস্কার হইতে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার কি মাথাব্যথা পড়িয়াছিল! কিন্তু নিদারুণ লজ্জায় কোনমতে এ-প্রশ্ন তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না।

সুরেশের একটা কাজ ছিল, প্রতিদিন অনেক রাত্রে সে একবার করিয়া মহিমের ঘরে ঢুকিয়া প্রয়োজনীয় সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া তবে শুইতে যাইত। মৃণাল থাকিতে প্রায় সারারাত্রিই আনাগোনা করিত, এবং তাহার আবশ্যকও ছিল; কিন্তু কয়দিন হইতে দেখা গেল, সে সহজে আর ঘরে প্রবেশ করে না। প্রয়োজন হইলে দাসী পাঠাইয়া খবর লয়, শুধু সন্ধ্যার প্রাক্কালে ক্ষণকালের জন্য একটিবার মাত্র নিজে আসিয়া সংবাদ গ্রহণ করে। তাহার এই নূতন আচরণ সকলের অগ্রে অচলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু এ-বিষয়ে সামান্য একটু মন্তব্য প্রকাশ করাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে, তাই সে মৌন হইয়াই ছিল; কিন্তু যেদিন মহিম নিজে ইহার উল্লেখ করিল, তখন তাহাকে বলিতেই হইল, আজকাল অধিকাংশ সময় বাটীতেও থাকেন না এবং ইহার হেতু কি, তাহাও সে জানে না। মহিম চুপ করিয়া শুনিল, কোনপ্রকার মতামত প্রকাশ করিল না।

পরদিন সকালে অচলা নীচে নামিতেছিল, এবং সুরেশও কি একটা কাজে এই সিঁড়ি দিয়াই উপরেই উঠিতেছিল; মুখ তুলিয়া অচলাকে দেখিবামাত্রই অন্যদিকে সরিয়া গেল। সে যে সর্ব্বপ্রকারে তাহাকেই পরিহার করিয়া চলিতেছে, এ-বিষয়ে আর তাহার সংশয়মাত্র রহিল না; এবং একদিন যাহা সে সমস্ত মন দিয়া কামনা করিয়াছিল, আজ তাহার সেই মনই সুরেশের আচরণে বেদনায় পীড়িত হইয়া উঠিল।

অচলার সমস্ত কাজ-কর্ম্ম, সমস্ত ওঠা-বসার মধ্যেও নিভৃত হৃদয়তলে যে কথাটা অনুক্ষণ জ্বালা করিতেই লাগিল, তাহা এই যে, সুরেশের মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন কাজ করিতেছে, যাহার সহিত তাহার নিজের কোন সম্বন্ধ নাই। যে উদ্দাম ভালবাসা একদিন তাহারই মধ্যে জন্মলাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, সে আজ জীর্ণ আশ্রয়ের ন্যায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাত্রা করিয়াছে। আপনাকে আপনি সে সহস্র তিরস্কার, সহস্র কটূক্তি করিয়া লাঞ্ছনা করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি এই বিদায়ের বেদনাকে আজ সে কোন মতেই মন হইতে দূরে সরাইতে পারিল না। এমন কি মাঝে মাঝে বিকট ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত করিয়া এ সংশয় উঁকি মারিতে লাগিল, নিজের অজ্ঞাতসারে সেও সুরেশকে গোপনে ভালবাসিয়াছে কি না। প্রতিবারই এ আশঙ্কাকে সে অসঙ্গত অমূলক বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল; আপনাকে আপনি বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, এ অসম্ভব সম্ভব হইবার পূর্ব্বে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিবে; তথাপি ছায়ার মত এ-কথা যেন তাহার মনের পিছনে লাগিয়াই রহিল, ঘুরিতে-ফিরিতেই যেন সে ইহাকে চোখে দেখিতে লাগিল এবং বোধ করি বা, এই বিভীষিকা হইতে আত্মরক্ষা করিতে সে স্নানাহারের সময়টুকু ব্যতীত দিবারাত্রি এতটুকুকাল স্বামীর কাছ-ছাড়া হইতে সাহস করিল না। পাশের যে ঘরটা তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, কয়েক-দিনের মধ্যে সে-ঘরে প্রবেশ করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না; এমন করিয়াও কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

মহিম প্রায় আরোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। শীঘ্রই জব্বলপুরে চেঞ্জে যাইবার কথাবার্ত্তা চলিতেছে। সেদিন সকালবেলা অচলা মেঝের উপর বসিয়া একটি স্টোভে স্বামীর জন্য দুধ গরম করিতেছিল; দুধ মুহুর্মুহু উথলিয়া উঠিতেছে, কোন দিকে চাহিবার তার এতটুকু অবসর নাই, মহিম এতক্ষণ যে একদৃষ্টে তাহারই প্রতি চাহিয়াছিল, সে জানিত না— হঠাৎ স্বামীর দীর্ঘশ্বাস কানে যাইতে সে মুখ তুলিয়া একটিবারমাত্র চাহিয়াই পুনরায় নিজের কাজে মন দিল।

মহিম কোনদিন বেশি কথা কহে না, কিন্তু আজ সহসা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, বাস্তবিক অচলা, বড় দুঃখ ছাড়া কোনদিন কোন বড় জিনিস লাভ করা যায় না। আমার বাড়িও আবার হবে, রোগও একদিন সারবে; কিন্তু এর থেকেও যে অমূল্য বস্তুটি লাভ করলুম, সে তুমি। আজকাল আমার মনে হয়, তুমি ছাড়া আর বোধ হয় আমার একটা দিনও কাটবে না।

অচলা নিঃশব্দে গরম দুধ বাটিতে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিতে লাগিল, কোন উত্তর

করিল না। মহিম একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল, মৃণাল, সুরেশ এরা আমার সেবা কিছু কম করেনি, কিন্তু কি জানি যখনই জ্ঞান হ'তো তখনই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতুম; কেবলি মনে হ'তো হয়ত এদের কত কষ্ট, কত অসুবিধে হচ্ছে— এদের দয়ার ঋণ আমি কেমন করে এ-জীবনে শোধ দেব। কিন্তু ভগবানের হাতে বাঁধা এমনি সম্বন্ধ যে, তোমার বিষয়ে কখনো মনে হয় না, এই সেবার দেনা একদিন আমাকে শুধতেই হবে। আমাকে বাঁচিয়ে তোলা যেন তোমার নিজেরই গরজ। বলিয়া মহিম একটুখানি হাসিল।

অচলা ঘাড় হেঁট করিয়া দুধ নাড়িতে লাগিল, কোন কথা কহিল না।

মহিম বলিল, আর কত ঠাণ্ডা করবে, দাও।

তবুও অচলা জবাব দিল না, তেমনি অধোমুখেই বসিয়া রহিল। প্রথমটা মহিম একটুখানি বিস্মিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিল, স্বামীর কাছে অচলা চোখের জল গোপন করিবার জন্যই অমন করিয়া একভাবে অধোমুখে বসিয়া আছে।

কেন যে সুরেশ বড়-একটা আসে না, তাহার হেতু নিশ্চয় করিয়া মহিম না বুঝিলেও কতকটা অনুমান করে নাই, তাহা নহে। ইহাতে ক্ষোভ-মিশ্রিত একটা আনন্দের ভাবই তাহার মনের মধ্যে ছিল। কারণ, অচলা যে সতর্ক হইয়াছে, নির্জ্জনে অকস্মাৎ দেখা হইতে না পায়, এই ভয়েই সে ঘর ছাড়িয়া সহজে অন্যত্র যাইতে চাহে না, ইহা সে মনে মনে অনুভব করিল। আজ তাই সারাদিন ধরিয়া মন যেন তাহার বসন্ত-বাতাসে উড়িয়া বেড়াইয়া কাটাইল। তাহার শয্যার কিছু দূরে একটা আরাম-চৌকি ছিল। সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারই উপরে বসিয়া অচলা কি একখানা বই পড়িতেছিল, এবং ক্লান্তিবশতঃ সেখানেই অবশিষ্ট রাতটুকু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পরদিন সকালে মহিমের ডাকে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল, এবং জানালা দিয়া দেখিল, বেলা হইয়া গিয়াছে।

মহিম কি একটা কাজ বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল, এবং স্ত্রীর আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নিজের গায়ের কাপড় কি হ'লো?

অচলা ততোধিক বিস্ময়ে নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, এইমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া যেখানা সে তাড়াতাড়ি নিজের গায়ে জড়াইয়া লইয়া উঠিয়া আসিয়াছে, সেখানা সুরেশের। স্বামীর প্রশ্নটা তাহাকে যেন চাবুক মারিল। লজ্জায় ব্যথায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু এ যে কি করিয়া ঘটিল, তাহা কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। তাহার স্মরণ হইল, গত রাত্রে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে সে নিজের শালখানা পাট করিয়া তাঁহার পায়ের উপর চাপা দিয়া অঞ্চলমাত্র গায়ে দিয়া পড়িতে বসিয়াছিল। ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে তাহার অত্যন্ত শীত করিতেছিল মনে পড়ে, তাহার পরে জাগিয়া উঠিয়া ইহাই দেখিতেছে।

কিন্তু স্ত্রীর একান্ত লজ্জিত মুখের পানে চাহিয়া মহিম সস্নেহে সকৌতুকে হাসিল। কহিল, এতে লজ্জা কি অচলা? চাকরটাই হয়ত উল্টো-পাল্টা করে তোমারটা তার ঘরে দিয়ে তারটা এখানে রেখে গিয়েচে। না হয় সুরেশ নিজেই হয়ত কাল বিকেলবেলা ফেলে গিয়েচে, রাত্রে চিনতে না পেয়ে তুমি গায়ে দিয়েচ। বেয়ারাকে ডেকে বদলে আনতে বলে দাও।

দিই বলিয়া সেখানা হাতে করিয়া অচলা বাহির হইয়া আসিল এবং পাশের ঘরে ঢুকিয়া যখন অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল, তখন বুঝিতে কিছুই আর তাহার অবশিষ্ট ছিল না। অনেক রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে সুরেশ যে নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং শীতের মধ্যে তাহাকে ওভাবে নিদ্রিত দেখিয়া আপনার গাত্রবাসখানি দিয়া ঘুমন্ত তাঁহাকে সস্নেহে সযত্নে আচ্ছাদিত করিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছিল, ইহাতে তাহার আর লেশমাত্র সংশয় রহিল না। সে চোখ বুঝিয়া সেই আনত সতৃষ্ণ দৃষ্টি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, শুধু তাহাকে দেখিবার জন্য এবং ভাল করিয়াই দেখিবার জন্য যে অমন করিয়া আসিয়াছে, এবং হয়ত প্রতি রাত্রেই আসিয়া থাকে, কেহ জানিতেও পারে না।

এই কদাচারে তাহার লজ্জার পরিসীমা রহিল না; এবং ইহাকে সে কুৎসিত বলিয়া, গর্হিত বলিয়া, অভদ্র বলিয়া সহস্রপ্রকারে অপমানিত করিতে লাগিল এবং অতিথির প্রতি গৃহস্বামীর এ চৌর্য্যবৃত্তিকে সে কোনদিন ক্ষমা করিবে না বলিয়া নিজের কাছে বারংবার প্রতিজ্ঞা করিল; কিন্তু তথাপি সমস্ত মনটা যে এই অভিযোগে কোনমতেই সায় দিতেছে না, ইহাও তাহার অগোচরে রহিল না এবং কোথায় কিসে যে তাহার এতদিন উঠিতে বসিতে বিঁধিতেছিল তাহাও যেন একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল।

কেদারবাবুর এক বাল্যবন্ধু জব্বলপুর সহরে বাস করেন; তাঁহার নিকট হইতে উত্তর আসিল, জল-বায়ু ও প্রাকৃতিক দৃশ্যে এ-স্থান অতি উৎকৃষ্ট। তাঁহার নিজের বাসাও খুব বড়; অতএব মহিমের যদি আসাই হয় ত সে স্বচ্ছন্দে তাঁহার কাছেই থাকিতে পারে।

একদিন সকালে কেদারবাবু আসিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন; এবং মাঘ-মাস যখন শেষ হইয়াই আসিতেছে এবং পথের অল্প-স্বল্প ক্লেশও যখন সহ্য করিতে সমর্থ, তখন আর কাল-বিলম্ব না করিয়া তাহার যাত্রা করাই কর্ত্তব্য। যুবা-বয়সে তিনি নিজে একবার জব্বলপুরে গিয়াছিলেন, সেই স্মৃতি তাঁহার মনে ছিল, মহা উল্লাসে সেই সকল বর্ণনা করিয়া কহিলেন, জগদীশের স্ত্রী এখনো জীবিত আছেন, তিনি মায়ের মত মহিমকে যত্ন করিবেন, এবং চাই কি, এই উপলক্ষে তাঁহারও আর

একবার দেশটা দেখা হইয়া যাইবে। মহিম চুপ করিয়া এইসকল শুনিল, কিন্তু কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করিল না। এই আগ্রহহীনতা শুধু অচলাই লক্ষ্য করিল। পিতা প্রস্থান করিলে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কেন, জব্বলপুর ত বেশ জায়গা, তোমার যেতে কি ইচ্ছে নেই?

মহিম কহিল, তোমরা সকলে আমাকে যতটা সুস্থ সবল ভাবচ, ততটা এখনো আমি হইনি। কোনদিন হ'ব কিনা, তার আমি আশা করিনে।

অচলা কহিল, সেই জন্যই ত ডাক্তার তোমার চেঞ্জের ব্যবস্থা করেচেন। একবার ঘুরে এলেই সমস্ত সেরে যাবে।

মহিম ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল, কি জানি। কিন্তু এ অবস্থায় আমার নিজের বা পরের উপর নির্ভর করে স্বর্গে যেতেও ভরসা হয় না। অচলা, ভেতরে ভেতরে আমি দুর্ব্বল, বড় অসুস্থ। তুমি কাছে না থাকলে হয়ত আমি বেশিদিন বাঁচবো না। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর যেন সজল হইয়া উঠিল।

যে মুখ ফুটিয়া কখনো কিছু চাহে না, কখনো নিজের দুঃখ অভাব ব্যক্ত করে না, তাহারই মুখের এই আকুল ভিক্ষা ঠিক যেন শূলের মতন আঘাত করিয়া অচলার হৃদয়ে যত স্নেহ, যত করুণা, যত মাধুর্য্য এতদিন রুদ্ধ হইয়াছিল, সমস্ত একসঙ্গে এক মুহূর্ত্তে মুখ খুলিয়া দিল। সে নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া পাছে অসম্ভব কিছু একটা করিয়া বসে এই ভয়ে চক্ষের জল চাপিতে চাপিতে একেবারে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল! মহিম হতবুদ্ধির মত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্ময়ে ব্যথায় সেই উন্মুক্ত দ্বারের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া আবার ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

আবার যখন উভয়ে সাক্ষাৎ হইল তখন স্বামী-স্ত্রীর কেহই এ-সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না। পরদিন অচলা একখানা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আসিয়া হাসিমুখে কহিল, জগদীশবাবু টেলিগ্রামের জবাব দিয়েচেন, তাঁর বাসার কাছে আমাদের জন্য তিনি একটা ছোট বাড়ি ঠিক করেচেন।

মহিম কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিল, তার মানে?

অচলা কহিল, বাবার বন্ধু বলে তোমাকেই না হয় তিনি বাড়িতে জায়গা দিতে পারেন। কিন্তু দু'জনে গিয়ে ত তাঁর কাঁধে ভর করা যায় না। তাই কালই একটা বাসা ঠিক করবার জন্যে টেলিগ্রাম করতে বাবাকে চিঠি লিখে দিই। এই তার জবাব। বলিয়া সে হলদে খামখানা স্বামীর বিছানার উপর ছুঁড়িয়া দিল।

মহিম হাতে লইয়া সেখানা আগাগোড়া পড়িয়া শুধু বলিল, আচ্ছা। অচলা যে স্বেচ্ছায় সঙ্গে যাইতে চাহে, ইহা সে বুঝিল। কিন্তু কন্যার আচরণ, যাহা আজও তাহার কাছে তেমনি দুর্ব্বোধ্য, তেমনিই দুজ্ঞেয়, তাহাই স্মরণ করিয়া কোনরূপ অযথা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

কিন্তু অচলার তরফ হইতে যাত্রার উদ্যোগ পুরা মাত্রায় চলিতে লাগিল। সেদিন দুপুরবেলা সে এ-বাটীতে আসিয়া তাহার জিনিসপত্র গুছাইতেছিল, কেদারবাবু দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তোমার না গেলেই কি নয় মা?

অচলা চমকিয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাবা?

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দিক দিয়া তাহার সঙ্গে থাকাটা যে ঠিক সঙ্গত নয়, পিতা হইয়া কন্যাকে এ-কথা জানাইতে কেদারবাবু লজ্জা বোধ করিলেন। তাই তিনি মহিমের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, বেশিদিন ত নয়। তা ছাড়া, জগদীশের ওখানে তার কোন অসুবিধেই হ'তো না। এই অল্পকালের জন্যে বেশি কতকগুলো খরচপত্র করে।

আসল কথাটা অচলা বুঝিল না। সে পিতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিল, তিনি বলছিলেন বুঝি?

না না, মহিম কিছু বলেননি, শুধু আমি ভাবছি—

তুমি কিছু ভেবো না বাবা, সে সমস্ত ঠিক করে নেবো, বলিয়া অচলা পুনরায় তাহার কাজের মধ্যে মনোনিবেশ করিল এবং পরদিনই লুকাইয়া তাহার দুখানা গহনা বিক্রী করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিল।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি যাত্রার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু সুরেশের পিসিমা পুরোহিত ডাকাইয়া পাঁজি দেখাইয়া মাসের প্রথম সপ্তাহেই দিন স্থির করিয়া দিলেন। সেই মতই সকলকে মানিয়া লইতে হইল।

যাইবার দিন-দুই পূর্ব্ব হইতেই অচলার সারা প্রাণটা যেন হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছুদিনের নিমিত্ত স্বামীগৃহবাস ব্যতীত তাহাকে জীবনে কখনো অন্যত্র যাইতে হয় নাই, আজিও সে পশ্চিমের মুখ দেখে নাই। সেখানে কতো প্রাচীন কীর্ত্তি, কত বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, কত নদ নদী, জলপ্রপাত, এমন কত কি আছে যাহার গল্প লোকের মুখে শুনা ভিন্ন নিজে দেখিবার কল্পনা কোনদিন তাহার মনে স্থান পায় নাই। এইবার সেই সকল আশ্চর্য্য সে স্বচক্ষে দেখিতে চলিয়াছে। তাহা ছাড়া সেখানে তাহার স্বামী ভগ্ন-দেহ ফিরিয়া পাইবে, একাকী সে-ই সেখানে ঘরণী, গৃহিণী, সর্ব্বকার্য্যে স্বামীর সাহায্যকারিণী। সেখানে জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর, সেখানে জীবন-যাত্রার পথ সহজ ও সুগম, তিনি ভাল হইলে হয়ত একদিন তাহারা সেইখানেই তাদের ঘর-সংসার পাতিয়া বসিবে এবং অচির-ভবিষ্যতে যে-সকল অপরিচিত অতিথিরা একে একে আসিয়া তাহাদের গৃহস্থালী পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে, তাদের কচি মুখগুলি নিতান্ত পরিচিতের মতই সে যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। এমনি কত কি

যে সুখের স্বপ্ন দিবানিশি তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তার ইয়ত্তা নাই। আর সকল কথার মধ্যে স্বামী যে তাহাকে ছাড়িয়া আর স্বর্গে যাইতেও ভরসা করেন না, এই কথাটা মিশিয়া যেন তাহার সমস্ত চিন্তাকেই একেবারে মধুময় করিয়া তুলিল। আর তাহার কাহারও বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ, কোন নালিশ রহিল না—অন্তরের সমস্ত গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া গিয়া হৃদয় গঙ্গাজলের মত নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়া উঠিল। আজ তাহার সাধ হইতে লাগিল, যাইবার আগে একবার মৃণালকে দেখে এবং সমস্ত বুক দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া জানা, অজানা সকল অপরাধের ক্ষমা-ভিক্ষা মাগিয়া লয়। আর সুরেশের জন্যও তাহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। সে যে পরম বন্ধু হইয়াও লজ্জায় সঙ্কোচে তাহাদের দেখা দিতে পারে না, তাহার এই দুর্ভাগ্যের গোপন বেদনাটি সে আজ যেমন অনুভব করিল, এমন বোধ করি কোনদিন করে নাই। তাঁহারও কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা চাহিয়া বিদায় লইবার আছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া জানিল, তিনি কাল হইতেই গৃহে নাই!

যাইবার দিন সকাল হইতেই আকাশে মেঘ করিয়া টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। জিনিস-পত্র বাঁধা-ছাদা হইয়াছে, কিছু কিছু স্টেশনেও পাঠানো হইয়াছে, টিকিট পর্য্যন্ত কেনা হইয়া গিয়াছে। অচলার জন্যও সেকেণ্ড ক্লাসে কেনার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু সে ঘোরতর আপত্তি তুলিয়া মহিমকে বলিয়াছিল, টাকা মিথ্যে নষ্ট করবার সাধ থাকে ত কিনতে দাও গে। আমি সুস্থ সবল, তা ছাড়া কত বড়লোকের মেয়েরা ইন্‌টার ক্লাসের মেয়েগাড়িতে যাচ্ছে, আর আমি পারিনে? আমি দেড়াভাড়ার বেশি কোনমতেই যাবো না।

সুতরাং সেইরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ দুটা দিন সুরেশের দেখা নাই। কিন্তু আজ সকালে দুর্য্যোগের জন্যই হোক বা অপর কোন কারণেই হোক, সে তাহার পড়িবার ঘরে ছিল। এই আনন্দ-হীন কক্ষের মধ্যে অচলা ঠিক যেন একটা বসন্তের দমকা বাতাসের মত গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কণ্ঠস্বরে আনন্দের আতিশয্য উপ্‌চাইয়া পড়িতেছিল; বলিল, সুরেশবাবু, এজন্মে আমাদের আর মুখ দেখাবেন না, না কি? এত বড় অপরাধটা কি করেচি, বলুন ত?

সুরেশ চিঠি লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহাদের বাড়ি পুড়িয়া গেলে আশেপাশের গাছপালার যে চেহারা অচলা আসিবার দিন চক্ষে দেখিয়া আসিয়া-ছিল, সুরেশের এই মুখখানা এমনি করিয়াই তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিল যে, সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। বসন্তের হাওয়া ফিরিয়া গেল সে কি বলিতে আসিয়া-ছিল, সব ভুলিয়া কাছে আসিয়া উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি অসুখ করেচে, সুরেশবাবু? কৈ, আমাকে ত এ-কথা কেউ বলেনি।

শুধু পলকের নিমিত্তই সুরেশ মুখ তুলিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ নত করিয়া কহিল, না, আমার কোন অসুখ করেনি, আমি ভালই আছি; বলিয়া সেই বইখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে পুনরায় কহিল, আজই ত তোমরা যাবে—সমস্ত ঠিক হয়েচে? কতকাল হয়ত আর দেখা হবে না।

কিন্তু মিনিট-খানেক পর্য্যন্ত অপর পক্ষ হইতে কোন উত্তর না পাইয়া সুরেশ বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া চাহিল। অচলার দুই চক্ষু জলে ভাসিতেছিল, চোখা-চোখি হইবামাত্রই বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা টপ্‌ টপ্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

সুরেশের ধমনীতে উচ্চ রক্তস্রোত উন্মত্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে তাহার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া, আপনাকে সংযত করিয়া দৃষ্টি অবনত করিল।

অচলা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া গাঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, তোমার কথ্‌খনো শরীর ভাল নেই সুরেশবাবু, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।

সুরেশ মাথা নাড়িয়া শুধু বলিল, না।

না, কেন? তোমার জন্যে—কথাটা শেষ হইতে পাইল না। দ্বারের বাহির হইতে বেয়ারা ডাকিয়া কহিল, বাবু, আপনার চা—বলিতে বলিতে সে পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং পরক্ষণেই অচলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে সে তাহার স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিলে, মহিম জিজ্ঞাসা করিল, সুরেশ ক'দিন থেকে কোথায় গেছে জানো? পিসিমাকেও কিছু বলে যায়নি; সে কি আজ আমার সঙ্গে দেখা করবে না, না কি?

অচলা আস্তে আস্তে কহিল, আজ ত তিনি বাড়িতেই আছেন।

মহিম কহিল, না। এইমাত্র আমাকে ঝি বলে গেল, সে সকালেই কোথায় বেরিয়ে গেছে।

অচলা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল পূর্ব্বেই যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, সে যে অতিশয় অসুস্থ, সে যে ছোটবেলার মত এবারও তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছে—শুধু কেবল এইটুকু কৃতজ্ঞতার জন্যও একবার তাহাকে আমাদের ওখানে আহ্বান করা উচিত—আর তাহাকে ভয় নাই—লজ্জিতাকে সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া আর লজ্জা দিয়ো না—তাহার অন্তরের এই সকলের একটা কথাও জিহ্বা আজ উচ্চারণ করিতে পারিল না। সে স্বামীর মুখের প্রতি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে পর্য্যন্ত পারিল না; নিঃশব্দে নিরুত্তরে হাতের কাছে যে কোন একটা কাজের মধ্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিল।

ক্রমশঃ স্টেশনে যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠিল। নীচে কেদারবাবুর হাঁক-ডাক শোনা গেল এবং পিসিমা পূর্ণ-ঘট প্রভৃতি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চাকরেরা জিনিস-পত্র গাড়ির মাথায় তুলিয়া দিল, শুধু যিনি গৃহস্বামী তাঁহারই

কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। অথচ, এই বলিয়া প্রকাশ্যে কেহ আলোচনা করিতেও সাহস করিল না—ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে এমনিই যেন সকলকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কেদারবাবু কন্যাকে একটু নিরালায় পাইয়া মাথায় হাত দিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, সতীলক্ষ্মী হও মা, মায়ের মত হও। বুড়ো বয়সে না বুঝে অনেক মন্দ কথা বলেচি মা, রাগ করিসনে; বলিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন।

মহিম গাড়িতে উঠিতে গিয়া অচলাকে একান্তে ক্ষুণ্ণস্বরে চুপি চুপি কহিল, সে সত্যিই আমাদের সঙ্গে দেখা করলে না। একটা কথা তাকে বলবার জন্যে আমি দু'দিন পথ চেয়েছিলাম।

পিতার বাক্যে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল সে কেবল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

দ্বারের অন্তরালে পিসিমা দাঁড়াইয়াছিলেন। অচলা প্রগাঢ় ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেই তিনি গদগদ-কণ্ঠে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক মা, স্বামীকে নীরোগ করে শীগ্‌গির ফিরিয়ে এনো, এই প্রার্থনা করি।

এই আমার সবচেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ পিসিমা! বলিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে সে গাড়িতে গিয়া বসিল। কথাটা কেদারবাবুরও কানে গেল। তিনি নিজে অমার্জ্জনীয় সন্দেহের লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন।

২৭

হাওড়া স্টেশন হইতে পশ্চিমের গাড়ি ছাড়িতে মিনিট-দশেক মাত্র বিলম্ব আছে। বাহিরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, টিপি টিপি বৃষ্টির আর বিরাম নাই। লোকের পায়ে পায়ে জলে কাদায় সমস্ত প্লাটফর্ম ভরিয়া উঠিয়াছে,—যাত্রীরা পিছল বাঁচাইয়া ভিড় ঠেলিয়া কোনমতে মোট-ঘাট লইয়া জায়গা খুঁজিয়া ফিরিতেছিল; এমনি সময় অচলা চাহিয়া দেখিল, প্রকাণ্ড একটা ব্যাগ হাতে করিয়া সুরেশ আসিতেছে।

বিস্ময়ে দুশ্চিন্তায় কেদারবাবুর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল, সে কাছে আসিতে না-আসিতে তিনি চিৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি সুরেশ? তুমি কোথায় চলেচ?

জবাবটা সুরেশ অচলাকে দিল। তাহারই মুখের প্রতি চাহিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, নাঃ—তোমার উপদেশ এবং নিমন্ত্রণ কোনটাই অবহেলা করা চলে না

দেখলুম। আজ সকালবেলা তুমি অমন করে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে হয়ত ধরতেই পারতুম না, শরীর আমার কত খারাপ হয়ে গেছে! চল, তোমাদের অতিথি হয়েই দিন-কতক দেখি, সারাতে পারি কি না! বাস্তবিক বলচি—

বেশ ত, বেশ ত সুরেশ! তা ছাড়া, নূতন জায়গায় আমাদেরও ঢের সাহায্য হবে; বলিয়া মহিম পলকের জন্য একবার অচলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সেই মুহূর্তে নিঃশব্দ ব্যথিত দৃষ্টি যেন সকলকেই উচ্চকণ্ঠে শুনাইয়া অচলাকে কহিয়া উঠিল, আমাকে বলিলে না কেন? যাহার স্বাস্থ্য লইয়া মনে মনে এত উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়াছ; আজ সকালবেলা পর্য্যন্ত উভয়ের যে কথা আলোচনা করিয়াছ, আমাকে তাহা ঘুণাক্ষরে জানিতে দাও নাই কেন? এই লুকোচুরির কি প্রয়োজন ছিল, অচলা!

কিন্তু অচলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল এবং সুরেশ ক্ষণকাল বিমূঢ়ের মত থাকিয়া অকস্মাৎ ভিতরের উত্তেজনা বাহিরে ঠেলিয়া আনিয়া অকারণ ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিল, কিন্তু আর ত দেরি নেই। চল চল, গাড়িতে উঠে তার পরে কথাবার্ত্তা। চলুন কেদারবাবু, বলিয়া সে কেবলমাত্র সম্মুখের দিকেই চোখ রাখিয়া সকলকে একপ্রকার যেন ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

কেদারবাবু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা কহিলেন না। মহিমকে তাহার জায়গায় বসাইয়া দিয়া অচলাকে মেয়েদের গাড়িতে তুলিয়া দিলেন। শুধু গাড়ি ছাড়িবার সময় সুরেশ হেঁট হইয়া যখন তাঁহাকে নমস্কার করিয়া মহিমের পার্শ্বে গিয়া বসিল, তখনই তাহাকে বলিলেন, তুমি সঙ্গে আছ, আশা করি পথে বিশেষ কষ্ট হবে না। মেয়েদের গাড়িটা একটু দূরে রহিল, মাঝে মাঝে খবর নিয়ো সুরেশ এবং মহিমকে আর একবার সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন, পৌঁছেই খবর দিতে যেন ভুল হয় না—দেখো। আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকব, বলিয়া চোখের জল চাপিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বিষণ্ণ মলিন মুখ ও স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দুই বন্ধুরই কানের মধ্যে বাজিতে লাগিল।

গাড়ি ছাড়িলে ঠাণ্ডার ভয়ে মহিম কম্বল মুড়ি দিয়া অবিলম্বে শুইয়া পড়িল, কিন্তু সুরেশ সেইখানে একভাবে বসিয়া রহিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবার সেখানে লোক কেহ ছিল না, থাকিলে যে কেহ বলিতে পারিত, ওই দুটো চোখের দৃষ্টি আজ কোনমতেই স্বাভাবিক নয়—ভিতরে অতি বড় অগ্নিকাণ্ড না ঘটিতে থাকিলে মানুষের চোখ দিয়া কিছুতেই অমন কঠিন আলো ফুটিয়া বাহির হয় না।

স্লো প্যাসেঞ্জার ছোট-বড় প্রত্যেক স্টেশনে ধরিতে ধরিতে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বাহিরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি সমভাবেই বর্ষিত হইতে লাগিল। একটা বড় স্টেশনে গাড়ি থামিবার উপক্রম করিলে, মহিম তাহার আবরণের ভিতর হইতে

মুখ বাহির করিয়া কহিল, ভিড় ছিল না, একটু শুয়ে নিলে না কেন সুরেশ? এমন সুবিধে ত বরাবর আশা করা যায় না?

সুরেশ চমকিয়া বলিল, হ্যাঁ, এই যে শুই।

এই চমকটা এমনি অসঙ্গত ও অকারণে কুণ্ঠিত দেখাইল যে, মহিম সবিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল। সে যেন তাহার অগোচরে কি একটা অপরাধ করিতেছিল, ধরা পড়ার ভয়েই এমন ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই ভাবটা মহিম অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মন হইতে দূর করিতে পারিল না।

গাড়ি আসিয়া স্টেশনে থামিল।

সুরেশ আপনার অবস্থাটা অনুভব করিয়া একটুখানি হাসির আভাসে মুখখানা সরস করিয়া কহিল, আমি ভেবেছিলুম তুমি ঘুমোচ্ছ, তাই চমকে উঠেছিলাম।

মহিম শুধু কহিল, হুঁ; কিন্তু এই অনাবশ্যক কৈফিয়ৎটাও তাহার ভাল লাগিল না।

সুরেশ বলিল, তাঁর কিছু চাই কি না একবার খবর নিতে পারলে—

কিন্তু জল পড়চে না?

ও কিছুই নয়, আমি চট্ করে দেখে আসচি, বলিয়া সুরেশ দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। সে মেয়েগাড়ির সুমুখে আসিয়া দেখিল, অচলা ইতিমধ্যে একটি সমবয়সী সঙ্গী পাইয়াছে এবং তাহারই সহিত গল্প করিতেছে। যেই অগ্রে সুরেশকে দেখিতে পাইয়া অচলার গা টিপিয়া দিয়া মুখ ফিরিয়া বসিল, অচলা চাহিয়া দেখিতেই সুরেশ কিছু চাই কি না জিজ্ঞাসা করিল। অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না; তোমায় জলে ভিজতে হবে না যাও। বলিয়াই কিন্তু নিজের জানালার কাছে উঠিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, কিন্তু যাঁর জন্যে ভাবনা তাঁর প্রতি যেন দৃষ্টি থাকে।

সুরেশ কহিল, তা আছে, কিন্তু তোমার কিছু খাবার, কিংবা চা, কিংবা শুধু একটু জল—

অচলা সহাস্যে বলিল, না গো না, আমার কিছু চাইনে। কিন্তু তুমি নিজে কি জলে ভিজে অসুখ করতে চাও না-কি?

সুরেশ পলকমাত্র অচলার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু আনত করিল, কহিল, অনেকদিন থেকেই ত চাইচি, কিন্তু হতভাগ্যের কাছে অসুখ পর্য্যন্ত ঘেঁষতে চায় না যে!

কথা শুনিয়া অচলার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু পাছে সুরেশ মুখ তুলিয়া তাহা দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় সে কোনমতে ইহাকে একটা পরিহাসের আকার দিতে জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, একবার চল না। তখন এমন খাটুনি খাটাব যে—

কিন্তু কথাটাকে সে শেষ করিতে পারিল না, তাহার অদৃশ্য লজ্জা এই ছদ্ম রহস্যের বাহ্য প্রকাশ যেন অর্দ্ধপথেই ধিক্কার দিয়া থামাইয়া দিল।

গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল, সুরেশ কি বলিবার জন্য মুখ তুলিয়াও অবশেষে কিছু না বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, সহসা বাধা পাইয়া ফিরিয়া দেখিল, তাহার র‍্যাপারের একটা খুঁট অচলার হাতের মুঠোর মধ্যে। সে ফিস্ ফিস্ করিয়া অকস্মাৎ তর্জ্জন করিয়া উঠিল, তোমাকে আমি সঙ্গে যেতে ডেকেচি, এ-কথা সকলের কাছে প্রকাশ করে দিলে কেন? কেন আমাকে অমন অপ্রতিভ করলে?

ঠিক এই কথাটাই সুরেশ তখন হইতে সহস্রবার তোলাপাড়া করিয়া অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছিল, তাই প্রত্যুত্তরে কেবল করুণ-কণ্ঠে কহিল, আমি না বুঝে অপরাধ করে ফেলেচি অচলা।

অচলা লেশমাত্র শান্ত না হইয়া তেমনি উত্তপ্তস্বরে জবাব দিল, না বুঝে বৈ কি? সকলের কাছে আমার শুধু মাথা হেঁট করবার জন্যেই তুমি ইচ্ছে করে বলেচ।

ট্রেন চলিতে শুরু করিয়াছিল; সুরেশ আর কথা কহিবার অবকাশ পাইল না; অচলা তাহার গায়ের কাপড় ছাড়িয়া দিতেই সে দুরু দুরু বক্ষে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল; সে কোনদিকে না চাহিয়া ছুটিয়া চলিল বটে, কিন্তু তাহাকে দৃষ্টি-দ্বারা অনুসরণ করিতে গিয়া আর একজনের হৃৎস্পন্দন একেবারে থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল। অচলার চোখ পড়িয়া গেল, আর একটা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া মহিম ঠিক তাহাদের দিকেই চাহিয়া আছে। সে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া যখন উপবেশন করিল, মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, উনিই বুঝি আপনার বাবু?

অন্যমনস্ক অচলা শুধু একটা হুঁ বলিয়া সায় দিয়াই আর একটা জানালার বাহিরে গাছ-পালা, মাঠ-ময়দানের প্রতি শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; যে গল্প অসমাপ্ত রাখিয়া সে সুরেশের কাছে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ করিবার আর তাহার প্রবৃত্তিমাত্র রহিল না।

আবার গ্রামের পর গ্রাম, সহরের পর সহর পার হইয়া যাইতে লাগিল, আবার মনের ক্ষোভ কাটিয়া গিয়া মুখ নির্ম্মল ও প্রশান্ত হইয়া উঠিল, আবার সে তাহার সঙ্গিনীর সহিত স্বচ্ছন্দচিত্তে কথা-বার্ত্তায় যোগ দিতে পারিল; যে লজ্জা ঘণ্টা-খানেক মাত্র পূর্ব্বে তাহাকে এরূপ পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, সে আর তাহার মনেও রহিল না।

একটা বড় স্টেশনে সুরেশ খানসামার হাতে চা ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী উপস্থিত করিল। অচলা সেগুলি গ্রহণ করিয়া সস্নেহ অনুযোগের স্বরে কহিল, তোমাকে এত হাঙ্গামা করতে কে বলে দিচ্ছে বল ত? তোমার বন্ধুত্বটি বুঝি?

এ বিষয়ে সুরেশ কাহারো যে বলার অপেক্ষা রাখে না, অচলা তাহা ভাল করিয়াই

জানিত, তথাপি এই অযাচিত যত্নটুকুর পরিবর্তে সেই স্নিগ্ধ খোঁচাটুকু না দিয়া যেন থাকিতে পারিল না।

সুরেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল, অচলা ফিরিয়া ডাকিল। সে চাপা হাসির আভাসটুকু তখনও তাহার ওষ্ঠাধরে লাগিয়া ছিল। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রই অচলা সহসা মুচকিয়া হাসিয়া ফেলিয়া লজ্জায় কুণ্ঠায় রাঙা হইয়া উঠিল। এই আরক্ত আভাসটুকু সুরেশ দুই চক্ষু দিয়া যেন আকণ্ঠ পান করিয়া লইল।

অচলা স্বামীর সংবাদের জন্য সুরেশকে ফিরিয়া ডাকিয়াছিল। তাঁহার কোন প্রকার ক্লেশ বা অসুবিধা হইতেছে কি-না, বা কিছু আবশ্যক আছে কি-না—একবার আসিতে পারেন কি-না, এইসকল একটি একটি করিয়া জানিয়া লইতে সে চাহিয়াছিল; কিন্তু ইহার পরে এ-সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন করিবারও তাহার শক্তি রহিল না। সে অসঙ্গত গাম্ভীর্য্যের সহিত শুধু জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের ত এলাহাবাদে গাড়ি বদল করতে হবে? কত রাত্রে সেখানে পৌঁছবে জানেন? একবার-জেনে এসে আমাকে বলে যেতে পারবেন?

আচ্ছা, বলিয়া সুরেশ একটু আশ্চর্য্য হইয়াই চলিয়া গেল।

অচলা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সেই মেয়েটি তাহার জায়গা ছাড়িয়া দূরে গিয়া বসিয়াছে! অচলা অন্তরের বিরক্তি গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, আপনাদের বাড়িতে বুঝি কেউ চা-রুটি খায় না?

মেয়েটি সবিনয়ে হাসিয়া বলিল, হায় হায়, ও দৌরাত্ম্য থেকে বুঝি কোন বাড়ি নিস্তার পেয়েচে ভাবেন? ও ত সবাই খায়।

অচলা কহিল, তবে যে বড় ঘৃণায় সরে বসলেন?

মেয়েটি লজ্জিত-স্বরে বলিল, না ভাই, ঘৃণায় নয়—পুরুষেরা ত সমস্ত খায়, তবে আমার শ্বশুর এ-সব পছন্দ করেন না, আর -আমাদের মেয়েমানুষের ত—

একদিন এমনি একটা খাওয়া-ছোঁয়ার ব্যাপার লইয়া মৃণালের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। সেদিনও সে যে-কারণে নিজেকে শাসন করিতে পারে নাই, আজও সে তেমনি একটা আন্তর্জ্বালায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গেল, এবং মেয়েটির কথা শেষ না হইতেই রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনাকে বিব্রত করতে আমি চাইনে, আপনি স্বচ্ছন্দে ফিরে এসে আপনার জায়গায় বসুন; বলিয়া চক্ষের নিমেষে চা এবং সমস্ত খাদ্যদ্রব্য জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মেয়েটি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে বসিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। বোধ করি, সে ইহাই ভাবিল, এতক্ষণের এত আলাপ, এত কথাবার্ত্তার যে বিন্দুমাত্র মর্য্যাদা রাখিল না, না-জানি সে এ অশ্রু দেখিয়া আবার কি একটা করিয়া বসিবে।

কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থামিলেও আকাশে যেন মেঘ উত্তরোত্তর জমা হইয়া উঠিতে-

ছিল। অপরাহ্নের কাছাকাছি পুনরায় চাপিয়া জল আসিল। এই জলের মধ্যে মেয়েটি নামিয়া যাইবে, সে তাহার উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিল।

অচলা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, একেবারে তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, নিজের ব্যবহারের জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমাকে আপনি মাপ করুন!

মেয়েটি হাসিল, কিন্তু সহসা উত্তর দিতে পারিল না।

অচলা পুনরায় কহিল, আমার মন খারাপ থাকলে কি যে করে ফেলি, তাঁর কোন ঠিকানা থাকে না। স্বামী পীড়িত, তাঁকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে যাচ্ছি—ভাল হ'ন ভালই, না হলে ঐ বিদেশে কি যে হবে, তা শুধু ভগবানই জানেন। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া উঠিল।

মেয়েটি বিস্মিত হইয়া কহিল, কিন্তু আপনার স্বামীকে দেখলে ত পীড়িত বলে মনে হয় না!

অচলা কহিল, আমার স্বামী এই গাড়িতেই আছেন, কিন্তু আপনি তাঁকে দেখেননি। উনি আমার স্বামীর বন্ধু।

মেয়েটি অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

এই বন্ধুটি তাঁহার স্বামী কি না, জিজ্ঞাসা করায় সে যে হু বলিয়া সায় দিয়াছিল, এ-কথা অচলার মনেই ছিল না, কিন্তু মেয়েটি তাহা বিস্মৃত হয় নাই; কিন্তু তাহার বিস্ময়কে অচলা সম্পূর্ণ অন্যভাবে গ্রহণ করিল। সুরেশের সহিত তাহার আচরণ ও বাক্যালাপে সে নিজের অন্তরে লজ্জা দিয়া বিকৃত করিয়া সাধারণ হিন্দুনারীর চক্ষে ইহা কিরূপ বিসদৃশ হইয়াছে, তাহাই কল্পনা করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল এবং একান্ত নিরর্থক ও বিশ্রী জবাবদিহির স্বরূপে বলিয়া ফেলিল, আমরা হিন্দু নই—ব্রাহ্ম।

মেয়েটি তবুও মৌন রহিল দেখিয়া অচলা সসঙ্কোচে তাহার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া কহিল, আমাদের আচার-ব্যবহার আপনারা সমস্তই বুঝতে না পারলেই আমাদের অদ্ভুত বলে ভাববেন না।

এইবার মেয়েটি হাসিল, কহিল, আমরা ত ভাবিনে, বরঞ্চ আপনারাই যে কোন কারণে হোক আমাদের থেকে দূরে থাকতে চান। কেমন করে জানলুম? আমাদের দুই-একটি আত্মীয় আছেন যারা আপনাদের সমাজের। তাঁদের কাছ থেকেই আমি জানতে পেরেচি, বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, সে কারণটি কি?

মেয়েটি কহিল, সে আপনি নিশ্চয়ই জানেন। না জানেন ত সমাজের কাউকে

জিজ্ঞাসা করে নেবেন, বলিয়া হাসিয়া প্রসঙ্গটা অকস্মাৎ চাপা দিয়া কহিল, আচ্ছা, অত দূরে না গিয়ে আপনার স্বামীকে নিয়ে কেন আমাদের ওখানে আসুন না!

কোথায়, আরায়?

মা গো! সেখানে কি মানুষ থাকে! আমার উনি ঠিকেদারী কাজ করেন বলেই আমাকে মাঝে মাঝে আরায় গিয়ে থাকতে হয়। আমি ডিহরীর কথা বলচি। শোন নদীর ওপর আমাদের ছোট একটি বাড়ি আছে, সেখানে দু'দিন থাকলে আপনার স্বামী ভাল হয়ে যাবেন। যাবেন সেখানে? বলিয়া মেয়েটি অচলার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া উত্তরের আশায় তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

এই অপরিচিতার ঔৎসুক্য ও আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়া অচলা মুগ্ধ হইয়া গেল। কহিল, কিন্তু আপনার স্বামীর ত অনুমতি চাই। তিনি না বললে ত যেতে পারিনে।

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, ইস, তাই বৈ কি! আমরা সেবা করতে দাসী বলে বুঝি সবতাতেই দাসী? মনেও করবেন না। হুকুম দেবার বেলায় আমরাই ত কর্ত্তা। সে দেশ পছন্দ না হলে সোজা ডিহরীতে চলে আসবেন—এতটুকু চিন্তা করবেন না, এই আপনাকে বলে দিলুম। অনুমতি নিতে হয় আমি নেব, আপনার কি গরজ? বলিয়া এই স্বামী-সৌভাগ্যবতী মেয়েটি তাহার আনন্দের আতিশয্যে অচলাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল।

আরা স্টেশন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, তাহা ট্রেনের মন্দগতিতে বুঝা গেল। সে অচলার হাত দুটি পুনরায় নিজের ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া আবেশভরে বলিল, আমার সময় হ'ল, আমি চললুম, কিন্তু আপনি ভেবে ভেবে মিথ্যে মন খারাপ করতে পাবেন না বলে যাচ্ছি। আপনার কোন ভয় নেই, স্বামী আপনার খুব শীগ্‌গির ভাল হয়ে উঠবেন। কিন্তু কথা দিন, ফেরবার পথে একটিবার আমার ওখানে পায়ের ধূলো দিয়ে যাবেন?

অচলা চোখের জল চাপিয়া বলিল, সেদিন যদি পাই নিশ্চয় আপনাকে একবার দেখে যাবো।

মেয়েটি বলিল, পাবেন বৈ-কি, নিশ্চয় পাবেন। আপনাকে আমি চিনতে পেরেচি। এই আমি বলে যাচ্ছি, আপনার এত বড় ভক্তি-ভালবাসাকে ভগবান কখনো বিমুখ করবেন না, এমন হতেই পারে না!

অচলা জবাব দিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া একটা উচ্ছ্বসিত বাষ্পোচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া লইল।

বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি আসিয়া প্লাটফর্ম্মে থামিল। মেয়েটির ছোট দেবর অন্যত্র ছিল, সে আসিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। অচলা তাহার কানের কাছে মুখ

আনিয়া চুপি চুপি কহিল, আপনার স্বামীর নাম ত মুখে আনবেন না জানি, কিন্তু আপনার নিজের নামটি কি বলুন ত? যদি কখনো ফিরে আসি, কি করে আপনার খোঁজ পাব?

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া কহিল, আমার নাম রাক্ষুসী। ডিহরীতে এসে কোন বাঙালীর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেই সে আমার সন্ধান বলে দেবে। কিন্তু দু'জনে একবার এসো ভাই। আমার মাথার দিব্যি রইল, আমি পথ চেয়ে থাকবো। শোন্ নদীর উপরেই আমাদের বাড়ি। এই বলিয়া মেয়েটি দুই হাত জোড় করিয়া হঠাৎ একটা নমস্কার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে বাহির হইয়া গেল।

বাষ্পীয় শকট আবার ধীরে ধীরে যাত্রা করিল। এইমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে; কিন্তু অবিশ্রাম বারিপাতের সঙ্গে বাতাস যোগ দিয়া এই দুর্য্যোগের রাত্রিকে যেন শতগুণ ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। জানালার কাচের ভিতর দিয়া চাহিয়া তাহার দৃষ্টি পীড়িত হইয়া উঠিল—তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল এই সূচীভেদ্য অন্ধকার তাহার আদি অন্ত যেন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। আলোর মুখ, আনন্দের মুখ আর সে কখনও দেখিবে না—ইহা হইতে এ-জীবনে আর তাহার মুক্তি নাই। সঙ্গিবিহীন নির্জ্জন কক্ষের মধ্যে সে একটা কোণের মধ্যে আসিয়া গায়ের কাপড়টা আগাগোড়া টানিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল এবং এইবার তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কেন যে এই চোখের জল, ঠিক কি যে তাহার এত বড় দুঃখ, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু কান্নাকেও সে কোনমতে আয়ত্ত করিতে পরিল না। অদম্য তরঙ্গের মত সে তাহার বুকের ভিতরটা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া গর্জ্জিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার পিতাকে মনে পড়িল, তাহার ছেলেবেলার সঙ্গী-সাথীদের মনে পড়িল, মৃণালকে মনে পড়িল, এইমাত্র যে মেয়েটি রাক্ষুসী বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিয়া গেল, তাহাকে মনে পড়িল,—যদু চাকরটা পর্য্যন্ত যেন তাহার চোখের উপর দিয়া বার বার আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকলের নিকট হইতেই সে যেন জন্মের শোধ বিদায় লইয়া কোথায় কোন্ নিরুদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে, বক্ষের মধ্যে তাহার এমনি ব্যথা বাজিতে লাগিল।

এইভাবে নিরন্তর অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া গাড়ি যখন পরের স্টেশনে আসিয়া থামিল, তখন বেদনাতুর হৃদয় তাহার অনেকটা শান্ত হইয়া গিয়াছে। সে উঠিয়া বসিয়া ব্যাকুলদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল; যদি কোন স্ত্রীলোক যাত্রী এই দুর্যোগের রাত্রেও তাহার কামরায় দৈবাৎ পদার্পণ করে। ভিজিতে ভিজিতে কেহ কেহ উঠিলও বটে, কিন্তু তাহার কামরার সন্নিকটেও কেহ আসিল না।

গাড়ি ছাড়িলে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া সে তাহার জায়গায় ফিরিয়া আসিল এবং আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়া পূর্ব্ববৎ শুইয়া পড়িতেই এবার কোন

অচিন্তনীয় কারণে তাহার দুঃখার্ত্ত চিত্ত অকস্মাৎ সুখের কল্পনায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু ইহা নতুন নহে; যেদিন বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়, সেদিনও সে এমনি স্বপ্নই দেখিয়াছিল। আজও সে তেমনি তাহার রুগ্ন স্বামীকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া এক অপরিচিত স্থানের মধ্যে আনন্দ ও সুখ-শান্তির জাল বুনিতে বুনিতে বিভোর হইয়া গেল।

কখন এবং কতক্ষণ যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার স্মরণ নাই। সহসা নিজের নাম কানে যাইবামাত্রই সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল, দ্বারের কাছে সুরেশ দাঁড়াইয়া এবং সেই খোলা দরজার ভিতর দিয়া অজস্র জল বাতাস ভিতরে ঢুকিয়া প্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছে।

সুরেশ চীৎকার করিয়া কহিল, শীগ্‌গির নেমে পড়, প্লাটফর্ম্মে গাড়ি দাঁড়িয়ে। তোমার নিজের ব্যাগটা কোথায়?

অচলার দুই চক্ষে ঘুম তখনও জড়াইয়া ছিল, কিন্তু তাহার মনে পড়িল, এলাহাবাদ স্টেশনে জব্বলপুরের গাড়ি বদল করিতে হইবে। সে ব্যাগটা দেখাইয়া দিয়া শশব্যস্তে নামিয়া পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া কহিল, কিন্তু এত জলের মধ্যে তাঁকে নামাবে কি করে? এখানে পাল্কী-টাল্কী কিছু পাওয়া যায় না? নইলে অসুখ যে বেড়ে যাবে সুরেশবাবু।

সুরেশ যে কি জবাব দিল, জলের শব্দে তাহা বুঝা গেল না। সে এক হাতে ব্যাগ ও অপর হস্তে অচলার একটা হাত দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া ও-দিকের প্লাটফর্ম্মের উদ্দেশ্যে দ্রুতবেগে টানিয়া লইয়া চলিল। এই ট্রেনটা ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারই একটা যাত্রিশূন্য ফার্স্ট ক্লাস কামরার মধ্যে অচলাকে ঠেলিয়া দিয়া সুরেশ তাড়াতাড়ি বলিল, তুমি স্থির হয়ে বসো; তাকে নামিয়ে আনি গে।

তা হলে আমার এই মোটা গায়ের কাপড়টা নিয়ে যাও, তাঁকে বেশ করে ঢেকে এনো। বলিয়া অচলা হাত বাড়াইয়া তাহার গাত্রবস্ত্রটা সুরেশের গায়ের উপর ফেলিয়া দিতেই সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায়, অচলা সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, পোস্টের উপর দূরে দূরে স্টেশনের লণ্ঠন জ্বলিতেছে; কিন্তু এই প্রচণ্ড জলের মধ্যে সে আলো এমনি অস্পষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার সাহায্যে কিছুই প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। জলে ভিজিয়া যাত্রীরা ছুটোছুটি করিতেছে, কুলীরা মোট বহিয়া আনাগোনা করিতেছে, কর্ম্মচারীরা বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে—ঝাপ্সা ছায়ার মত তাহা দেখা যায় মাত্র। ক্রমশঃ তাহাও বিরল হইয়া আসিল, স্টেশনের ঘণ্টা তীক্ষ্ণস্বরে বাজিয়া উঠিল এবং যে ট্রেন হইতে অচলা এইমাত্র নামিয়া আসিয়াছে, ভীষণ অজগরের ন্যায় ফোঁস-ফোঁস শব্দে

তাহা আকাশ-বাতাস কম্পিত করিয়া প্ল্যাটফর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল এবং অখণ্ড অন্ধকার ব্যতীত সম্মুখে আর কোন ব্যবধানই রহিল না।

আবার ঘণ্টায় ঘা পড়িল। ইহা যে এ-গাড়ির জন্য অচলা তাহা বুঝিল, কিন্তু তাঁহারা উঠিলেন কি না, কোথায় উঠিলেন, জিনিস-পত্র সমস্ত তোলা হইল কি না কিংবা কিছু রহিয়া গেল, কিছুই জানিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিল।

একজন পিয়াদা সর্ব্বাঙ্গ কম্বলে ঢাকিয়া নীল লণ্ঠন হাতে বেগে চলিয়াছে। সুমুখে পাইয়া অচলা ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, সমস্ত প্যাসেঞ্জার উঠিয়াছে কি না। প্রথম শ্রেণীর কামরা দেখিয়া লোকটা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হাঁ মেমসাহেব।

অচলা কতকটা সুস্থির হইয়া সময় জিজ্ঞাসা করায় লোকটা কহিল, নয় বাজকে—

নয় বাজ্‌কে? অচলা চমকিয়া উঠিল। কিন্তু এলাহাবাদে পৌঁছিতে ত রাত্রি প্রায় শেষ হইবার কথা। ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিল, এলাহাবাদ—

কিন্তু লোকটা আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না! উপরে ছাদ ছিল না তাই আকাশের বৃষ্টি ছাড়া গাড়ির ছাদ হইতে জল ছিটাইয়া তাহার চোখে-মুখে সূচের মত বিঁধিতেছিল। সে হাতের আলোকটা সবেগে নাড়িয়া দিয়া, মোগলসরাই! মোগলসরাই! বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। এমন সময়ে সুরেশ তাহার সম্মুখ দিয়া ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া গেল—ভয় নেই—আমি পাশের গাড়িতে আছি।

২৮

সুরেশ পাশের গাড়িতে গিয়া উঠিল সত্য, কিন্তু তিনি? এই ত সে চোখ মেলিয়া নিরন্তর বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে—তাঁহার চেহারা, তা সে যত অস্পষ্টই হোক, সে কি একবারও চোখে পড়িত না? আর এলাহাবাদের পরিবর্ত্তে এই কি-একটা নূতন স্টেশনেই বা গাড়ি বদল করা হইল কিসের জন্য? জলের ছাটে তাহার মাথার চুল, তাহার গায়ের জামা সমস্ত ভিজিয়া উঠিতে লাগিল, তবুও সে খোলা জানালা দিয়া বার বার মুখ বাহির করিয়া একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে অন্ধকারের মধ্যে কি যে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল তাহা সেই জানে, কিন্তু এ-কথা তাহার মন কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিল না যে, এ-গাড়িতে তাহার স্বামী নাই—সে একেবারে অনন্যনির্ভর, একান্ত ও একাকী সুরেশের সহিত কোন এক দিগ্বিহীন নিরুদ্দেশ-যাত্রার পথে বাহির হইয়াছে। এমন হইতে পারে না। এই গাড়িতেই তিনি কোথাও না কোথাও আছেনই আছেন।

সুরেশ যাই হোক, এবং সে যাই করুক, একজন নিরপরাধ রমণীকে তাহার সমাজ হইতে, ধর্ম্ম হইতে, নারীর সমস্ত গৌরব হইতে ভুলাইয়া এই অনিবার্য্য মৃত্যুর হাতে ঠেলিয়া দিবে, এত বড় উন্মাদ সে নয়। বিশেষতঃ ইহাতে তাহার লাভ কি? অচলার যে দেহটার প্রতি তাহার এত লোভ সেই দেহটাকে একটা গণিকার দেহে পরিণত দেখিতে অচলা যে বাঁচিয়া থাকিবে না, এ সোজা কথাটুকু যদি সে না বুঝিয়া থাকে ত ভালবাসার কথা মুখে আনিয়াছিল কোন মুখে? না না, ইহা হইতেই পারে না! ইঞ্জিনের দিকে কোথাও তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়াছেন, সে দেখিতে পায় নাই।

সহসা একটা প্রবল ঝাপ্টা তাহার চোখে-মুখে আসিয়া পড়িতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া কোণের দিকে সরিয়া আসিল এবং ততক্ষণে নিজের প্রতি চাহিয়া দেখিল, সর্ব্বাঙ্গে শুষ্ক বস্ত্র কোথাও আর এতটুকু অবশিষ্ট নাই। বৃষ্টির জলে এমন করিয়াই ভিজিয়াছে যে অঞ্চল হইতে, জামার হাতা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। এই শীতের রাত্রে সে না জানিয়া যাহা সহিয়াছিল, জানিয়া আর পারিল না এবং কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিবার মানসে কম্পিতহস্তে ব্যাগটা টানিয়া লইয়া যখন চাবি খুলিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় গাড়ির গতি অতি মন্দ হইয়া আসিল এবং অনতিবিলম্বে তাহা স্টেশনে আসিয়া থামিল। জল সমানে পড়িতেছে, কোন্ স্টেশন জানিবার উপায় নাই। তবুও ব্যাগ খোলাই পড়িয়া রহিল, সে ভিতরের অদম্য উদ্বেগের তাড়নায় একেবারে দ্বার খুলিয়া বাহিরে নামিয়া অন্ধকারে আন্দাজ করিয়া ভিজিতে ভিজিতে দ্রুতপদে সুরেশের জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

চীৎকার করিয়া ডাকিল, সুরেশবাবু!

এই কামরায় দুই-জন বাঙালী ও একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ছিলেন। সুরেশ একটা কোণে জড়সড়ভাবে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। অচলার বোধ করি ভয় ছিল, হয়ত তাহার গলা দিয়া সহজে শব্দ ফুটিবে না। তাই তাহার প্রবল উদ্যমের কণ্ঠস্বর ঠিক যেন আহত জন্তুর তীব্র আর্ত্তনাদের মত, শুধু সুরেশকেই নয় উপস্থিত সকলকেই একেবারে চমকিত করিয়া দিল। অভিভূত সুরেশ চোখ মেলিয়া দেখিল, দ্বারে দাঁড়াইয়া অচলা, তাহার অনাবৃত মুখের উপর একই কালে অজস্র জলধারা এবং গাড়ির উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া এমনিই একটা রূপের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে যে, সমস্ত লোকের মুগ্ধ দৃষ্টি বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছে। সে ছুটিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইতেই অচলা প্রশ্ন করিল, তাঁকে দেখচিসে —কৈ তিনি? কোন্ গাড়িতে তাঁকে তুলেচ?

চল দেখিয়ে দিচ্চি, বলিয়া সুরেশ বৃষ্টির মধ্যেই নামিয়া পড়িল এবং যেদিকে হইতে

অচলা আসিয়াছিল, সেইদিক পানেই তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বাঙালী দু'জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া একটু হাসিল। ইংরাজ কিছুই বুঝে নাই, কিন্তু নারী-কণ্ঠের আকুল প্রশ্ন তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল; সে ভূলুণ্ঠিত কম্বলটা পায়ের উপর টানিয়া লইয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল এবং শুষ্কমুখে বাহিরের অন্ধকারের প্রতি চাহিয়া রহিল।

অচলার কামরার সম্মুখে আসিয়া সুরেশ থমকিয়া দাঁড়াইল, ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, তোমার ব্যাগ খোলা কেন? এবং প্রত্যুত্তরের জন্য এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করিয়া দরজাটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া অচলাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ভিতরে তুলিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

সুরেশ অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, এটা খুললে কে?

অচলা কহিল, আমি। কিন্তু ও থাক্—তিনি কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও—না হয়, শুধু বলে দাও কোন্‌দিকে, আমি নিজে খুঁজে নিচ্ছি; বলিতে বলিতে সে দ্বারের দিকে পা বাড়াইতেই সুরেশ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, অত ব্যস্ত কেন? গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে দেখতে পাচ্ছো?

অচলা বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়াই বুঝিল, কথাটা সত্য। গাড়ি চলিতে শুরু করিয়াছে। তাহার দুই চক্ষে ভয় যেন মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই দৃষ্টি দিয়া শুধু পলকের জন্য সুরেশের একান্ত পাণ্ডুর শ্রীহীন মুখের প্রতি চাহিল এবং পরক্ষণেই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সশব্দে মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া দুই বাহু দিয়া সুরেশের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কোথায় তিনি? তাঁকে কি তুমি ঘুমন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েচ? রোগা মানুষকে খুন করে তোমার—

এতবড় ভীষণ অভিযোগের শেষটা কিন্তু তখনও শেষ হইতে পাইল না। অকস্মাৎ তাহার বুক-ফাটা কান্নায় যেন শতধারে ফাটিয়া পড়িয়া সুরেশকে একেবারে পাষাণ করিয়া দিয়া চতুর্দ্দিকের ইহারই মত ভয়াবহ এক উন্মত্ত যামিনীর অভ্যন্তরে গিয়া বিলীন হইয়া গেল এবং সেইখানে, সেই গদি-আঁটা বেঞ্চের গায়ে হেলান দিয়া সুরেশ অসহ্য বিস্ময়ে শুধু স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। তার পরে তার পদতলে কি যে ঘটিতেছিল, কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা যেন উপলব্ধি করিতেই পারিল না। অনেকক্ষণ পরে সে পা দুটা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, একাজ আমি পারি বলে তোমার বিশ্বাস হয়?

অচলা তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতে জবাব দিল, তুমি সব পারো। আমাদের ঘরে আগুন দিয়ে তুমি তাঁকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলে। তুমি কোথায় কি করেচ, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বল; বলিয়া সে আর একবার তাহার পা দুটা

ধরিয়া তাহারই পরে সজোরে মাথা খুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু পা দুটা যাহার, সে কিন্তু একেবারে অবশ অচেতনের ন্যায় কেবল নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

বাহিরে মত্ত রাত্রি তেমনি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমনি বারংবার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উচ্ছৃঙ্খল ঝড়-জল তেমনিভাবেই সমস্ত পৃথিবী লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু এই দুটি অভিশপ্ত নর-নারীর অন্ধ-হৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার কাছে এ-সমস্ত একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরেই পড়িয়া রহিল।

সহসা অচলা তাহার ভূ-শয্যা ছাড়িয়া তীব্রবেগে উঠিয়া দাঁড়াইতেই সুরেশের যেন স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল, পরের স্টেশন সন্নিকটবর্ত্তী হওয়ায় গাড়ির বেগ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। অচলা কেন যে এমন করিয়া দাঁড়াইল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। প্রবল চেষ্টায় আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া সুরেশ ডান হাত বাড়াইয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, বোস। মহিম এ গাড়িতে নেই।

নেই! তবে কোথায় তিনি? বলিতে বলিতে অচলা সম্মুখের বেঞ্চের উপর ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল।

সুরেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল তাহার মুখের উপর হইতে রক্তের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বোধ করি, এতক্ষণের এত কান্নাকাটি, এত মাথা-কোটা-কুটির মধ্যেও হৃদয়ে তাহার সমস্ত প্রতিকূল যুক্তির বিরুদ্ধেও একপ্রকার অব্যক্ত অন্তর্নিহিত আশা ছিল, হয়ত এ-সকল আশঙ্কা সত্য নহে, হয়ত প্রচণ্ড দুঃস্বপ্নের দুঃসহ বেদনা ঘুমভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই শুধু কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাসেই অবসান হইয়া গিয়া পুলকে সমস্ত চরাচর রাঙা হইয়া উঠিবে। এমন কিছু একটা অচিন্তনীয় পদার্থ হয়ত তখনও তাহার আগাগোড়া বুক খালি করিয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করে নাই। কেন না, এই তো তখন পর্য্যন্তও তাহার সংসারে যাহা কিছু কামনার সমস্ত বজায় ছিল; অথচ একটা রাত্রিও পোয়াইল না, আর তাহার কিছু নাই—একেবারে কিছু নাই! চক্ষের পলক ফেলিতে না-ফেলিতে জীবনটা একেবারে দুর্ভাগ্যের শেষ সীমা ডিঙাইয়া বাহির হইয়া গেল! এতবড় পরিমাণবিহীন বিপত্তিতে তাহার বাঁচিয়া থাকাটাই বোধ করি কোনমতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। উভয়ে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। গাড়ি আসিয়া একটা অজানা স্টেশনে লাগিল এবং অল্পকাল পরে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সুরেশ একবার কি একটা বলিবার চেষ্টা করিয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং জানালার কাচ তুলিয়া দিয়া কয়েকবার পায়চারি করিয়া সহসা অচলার সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মহিম ভাল আছে। এতক্ষণে বোধ হয় সে এলাহাবাদে পৌঁছেচে। একটুখানি থামিয়া

বলিল, ওখান থেকে জব্বলপুরেও যেতে পারে, কলকাতায়ও ফিরে আসতে পারে।

অচলা ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

সে অশ্রু-কলঙ্কিত মুখের উপর দুঃখ-নিরাশার চরম প্রতিমূর্ত্তি আর একবার সুরেশের চোখে পড়িল। তাহার ভুল যে কত বড় হইয়া গিয়াছে, এ-কথা আর তাহার অগোচর ছিল না এবং ইহার জন্য আজ সে নিজেকে হত্যা করিয়া ফেলিতেও পারিত। কিন্তু যাহার সহস্র ছলনা তাহার সত্য দৃষ্টিকে এমন করিয়া আবৃত করিয়া এই ভুলের মধ্যেই বারংবার অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই ছলনাময়ীর বিরুদ্ধেও তাহার সমস্ত অন্তর একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ সে অচলার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিল, বোধ হয় আমরা সশরীরে নরকেই যাচ্ছি। যে অধঃপথের পথ দেখিয়ে এতদূর টেনে এনেচ, তার মাঝখানেই ত ইচ্ছে করলেই দাঁড়াবার যায়গা পাওয়া যাবে না। এখন শেষ পর্য্যন্ত যেতেই হবে।

কথা শুনিয়া অচলার আপাদ-মস্তক একবার কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সে নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। যে মিথ্যাচারী কাপুরুষ পরস্ত্রীকে এমন করিয়া বিপথে ভুলাইয়া আনিয়াও অসঙ্কোচে এত বড় নির্লজ্জ অপবাদ মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারে, তাহাকে বলিবার আর কাহার কি থাকে!

সুরেশ আবার পায়চারি করিতে লাগিল। বোধ হয় এই পাষাণ-প্রতিমার সুমুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিবার তাহার শক্তি ছিল না। বলিতে লাগিল, তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছ, যেন একা তোমারই সর্ব্বনাশ! কিন্তু সর্ব্বনাশ বলিতে যা বোঝায়, তা আমার পক্ষে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েচে জানো ? আমি তোমাদের মত ব্রহ্মজ্ঞানী নই, আমি নাস্তিক। আমি পাপপুণ্যের ফাঁকা আওয়াজ করিনে, আমি নিরেট সত্যিকার সর্ব্বনাশের কথাই ভাবি। তোমার রূপ আছে, চোখের জল আছে, মেয়েমানুষের যা-কিছু অস্ত্র-শস্ত্র তোমার তূণে সে-সব প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত আছে, তোমার কোন পথেই বাধা পড়বে না। কিন্তু আমার পরিণাম কল্পনা করতে পারো ? আমি পুরুষমানুষ—তাই আমাকে জেলের পথ বন্ধ করতে নিজের হাতে এইখানে গুলী করতে হবে। বলিয়া সুরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বুকের মাঝখানে হাত দিয়া দেখাইল।

অচলা কি একটা বলিতে উদ্যত হইয়া মুখ তুলিয়াও নিঃশব্দে মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা যে উপচাইয়া পড়িতেছিল, তাহা দেখিতে পাইয়া সুরেশ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, ময়ূরপুচ্ছ মাথায় গুঁজে দাঁড়কাক কখনো ময়ূর হয় না অচলা। ও চাহনি আমি চিনি, কিন্তু সে তোমাকে সাজে না। যাকে সাজতো, সে মৃণাল, তুমি নয়! তুমি অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দুর ঘরের

কুল-বধূ নও, এতটুকুতে তোমাদের জাত যাবে না। তুমি যেখানে খুশি নেমে চলে যাও। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, মহিমকে দেখিও, সে ঘরে নেবে। টাকা দিচ্ছি, তোমার বাপকে দিয়ো—তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। তোমার চিন্তা কি অচলা, এ এমনি কি বেশি অপরাধ ?

সে আবার পায়চারি করিতে লাগিল, একবার চাহিয়াও দেখিল না, তাহার অলস্ত শূল কোথায় কি কাজ করিল। খাবারের লোভে বন্যপশু ফাঁদে পড়িয়া অন্ধ ক্রোধে যাহা পায়, তাহাই যেমন নিষ্ঠুর দংশনে ছিঁড়িতে থাকে, ঠিক সেইভাবে সুরেশ অচলাকে একেবারে যেন টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে চাহিল। হঠাৎ মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, এ এমন কি ভয়ানক অপরাধ ? স্বামীর ঘরে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের উপর বলেছিলে, একজন পরপুরুষকে ভালবাস—সে কি ভুলে গেছ ? যে লোক ঘরে আগুন দিয়ে তোমার স্বামীকে পোড়াতে চেয়েছিল বলে তোমার বিশ্বাস, তার সঙ্গেই চলে আসতে চেয়েছিলে—এবং এলেও তাই, স্মরণ হয় ? তার ঘরে ; তার আশ্রয়ে বাস করে গোপনে কেঁদে তাকেই সঙ্গে আসতে সেধেছিলে মনে পড়ে ? তার চেয়েও কি এটা বেশি অপরাধ ? আরও কত কি প্রতিদিনের অসংখ্য খুঁটিনাটি। তাই আজ আমার এত সাহস। আসলে তুমি একটা গণিকা, তাই তোমাকে ভুলিয়ে এনেচি। ভেবেছিলুম, প্রথমে একটুখানি চমকে উঠবে মাত্র। তার বেশি তোমার কাছে আশা করিনি। তোমাকে বার বার বলে দিচ্ছি অচলা, তুমি সতী-সাবিত্রী নও। সে তেজ, সে দর্প, তোমার সাজে না, মানায় না—সে তোমার একান্ত অনধিকারচর্চ্চা। বলিয়া সুরেশ রুদ্ধশ্বাসে নির্জ্জীব হইয়া থামিতেই অচলা মুখ তুলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, আপনি থামবেন না সুরেশবাবু, আরও বলুন। আমাকে দুই পায়ে মাড়িয়ে সংসারে যত কটু কথা, যত কুৎসিত বিদ্রূপ, যত অপমান আছে, সব করুন ; বলিয়া মেঝের উপর অকস্মাৎ উপুড় হইয়া পড়িয়া অবরুদ্ধ রোদনের বিদীর্ণ-স্বরে বলিতে লাগিল, এই আমি চাই, এই আমার দরকার ! এই আমাদের সত্যিকার সম্বন্ধ ! পৃথিবীর কাছে, ভগবানের কাছে, আপনার কাছে এই আমার একমাত্র প্রাপ্য।

সুরেশ দেয়ালে ঠেস দিয়া কাঠ হইয়া চাহিয়া রহিল। অচলার সুদীর্ঘ কেশভার স্রস্তবিপর্য্যস্ত হইয়া মাটিতে লুটাইতে লাগিল, তাহার জলসিক্ত গাত্রবাস ধূলায় কাদায় মলিন কদর্য্য হইয়া উঠিল, কিন্তু সেদিকে সুরেশ পা বাড়াইতে পারিল না। নূতন শিকারী তাহার প্রথম ভূপতিত পক্ষিণীর মৃত্যুযন্ত্রণা যেমন অবাক হইয়া চাহিয়া দেখে, তেমনি দুই মুগ্ধ চক্ষের অপলক দৃষ্টি দিয়া সে যেন কোন এক মরণাহত নারীর শেষ মুহূর্ত্তের সাক্ষ্য লইতে দাঁড়াইয়া রহিল।

আবার গাড়ির গতি মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া ধীরে ধীরে স্টেশনে আসিয়া

থামিল। সুরেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া শান্ত সহজ গলায় বলিল, লোকে তোমাকে এ অবস্থায় দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। তুমি উঠে ব'সো, আমি আমার ঘরে চললুম। সকাল হলে তুমি যেখানে নামতে চাইবে আমি নামিয়ে দেব, যেখানে যেতে চাইবে আমি পাঠিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করবার চেষ্ট ক'রো না, তাতে কোনো ফল হবে না। বলিয়া সুরেশ কপাট খুলিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং সাবধানে তাহা বন্ধ করিয়া কি ভাবিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, তুমি আমার কথা বুঝবে না, কিন্তু এইটুকু শুনে রাখো যে, এ সমস্যার মীমাংসার ভার আমি নিলুম। আর তোমার কোন অমঙ্গল ঘটতে দেব না—এর সমস্ত ঋণ আমি কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করে যাবো এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার নিজের কামরার দিকে প্রস্থান করিল।

ট্রেনের টানা ও একঘেয়ে শব্দের বিরামের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারেই সুরেশের তন্দ্রা ভাঙিতেছিল বটে, কিন্তু চোখের পাতার ভার ঠেলিয়া চাহিয়া দেখিবার শক্তি আর যেন তাহার ছিল না। ভিজা কাপড়ে তাহার অত্যন্ত শীত করিতেছিল, বস্তুতঃ সে যে অসুখে পড়িতে পারে এবং বর্ত্তমান অবস্থায় সে যে কি ভীষণ ব্যাপার, ইহা ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেও ছিল, কিন্তু ব্যাগ খুলিয়া বস্ত্রপরিবর্ত্তনের উদ্যম একটা অসাধ্য অভিলাষের মতই তাহার মনের মধ্যে অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক এমনি সময়ে তাহার কানে গিয়া একটা সুপরিচিত কণ্ঠের ডাক পৌঁছিল—কুলী! কুলী! সে অর্দ্ধসজাগভাবে চোখ মেলিয়া দেখিল, গাড়ি কোন একটা স্টেশনে থামিয়া আছে, এবং কখন অন্ধকার কাটিয়া গিয়া ক্ষান্তবর্ষণ ধূসর মেঘের মধ্য দিয়া একপ্রকারের ঘোলাটে আলোকে সমস্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে পাইল, অনেকে নামিতেছে, অনেকে চড়িতেছে, এবং তাহারই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একটি শোকাচ্ছন্ন রমণীমূর্ত্তি কিসের তরে আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছে! এ অচলা। একজন কুলী ঘাড়ে একটা মস্ত চামড়ার ব্যাগ লইয়া গাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইতে সে তাহাকে কি একটা জিজ্ঞাসা করিয়া গেটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত সুরেশ নিশ্চেষ্টভাবে শুধু চাহিয়াই ছিল। বোধ হয় তাহার চোখের দেখা ভিতরে ঢুকিবার পথ পাইতেছিল না। কিন্তু গাড়ি ছাড়িবার বেলের শব্দ প্লাটফর্ম্মের কোন্ এক প্রান্ত হইতে সহসা ধ্বনিয়া উঠিয়া তড়িৎস্পর্শের মত তাহার অন্তর-বাহিরকে এক মুহূর্ত্তে এক করিয়া তাহার সমস্ত জড়িমা ঘুচাইয়া দিল, এবং পলকের মধ্যে নিজের ব্যাগটা টানিয়া লইয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল।

টিকিটের কথা অচলার মনেই ছিল না। সে দ্বারের মুখে টিকিটবাবুকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইতেই সুরেশ পিছন হইতে স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, দাঁড়িয়ো না, চল, আমি টিকিট দিচ্ছি।

তাহার আগমন অচলা টের পায় নাই। মুহূর্তের জন্য কুণ্ঠায় ভয়ে তাহার পা উঠিল না, কিন্তু এই সঙ্কোচ অপরের লক্ষ্য-বিষয়ীভূত হওয়ার পূর্ব্বেই সে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া উভয়ের নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হইল।

সুরেশ কহিল, আমি ভেবেছিলাম, তুমি সোজা কলকাতাতেই ফিরে যেতে চাইবে, হঠাৎ এই ডিহরীতে নেমে পড়লে কেন? এখানে কি পরিচিত কেউ আছেন?

অচলা অন্যদিকে চাহিয়াছিল, সেইদিকে চাহিয়াই জবাব দিল, কলকাতায় আমি কার কাছে যাবো?

কিন্তু এখানে?

অচলা চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশ নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আমার কোন কথা হয়ত আর তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, আর সেজন্য আমার নালিশও কিছু নেই, আমি কেবল তোমার কাছে শেষ সময়ে কিছু ভিক্ষা চাই।

অচলা তেমনি নীরবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেশ কহিল, আমার কথা কাউকে বোঝাবারও নয়, আমি বোঝাতেও চাইনে। আমার জিনিস আমার সঙ্গেই যাক। যেখানে গেলে এখানের আগুন আর পোড়াতে পারবে না, আমি সেই দেশের জন্যই আজ পথ ধরলুম, কিন্তু আমার শেষ সম্বলটুকু আমাকে দাও, আমি হাত জোড় করে তোমার কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

তথাপি অচলার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

সুরেশ কহিতে লাগিল, আমি নিজে তোমাকে অনেক কটু কথা বলেচি, অনেক দুঃখ দিয়েচি; কিন্তু পরে যে ভাল থাকার দম্ভে ওপরে বসে তোমার মাথায় কলঙ্কের কালি ছিটিয়ে কালো করে তুলবে, সে আমি মরেও সইতে পারবো না। আমার জন্যে তোমাকে আর না দুঃখ পেতে হয়, বিদায় হবার আগে আমাকে একটুকু সুযোগ ভিক্ষে দিয়ে যাও অচলা।

তাহার কণ্ঠস্বরে কি যে ছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন; অকস্মাৎ তপ্ত অশ্রুতে অচলার দুই চক্ষু ভাসিয়া গেল। কিন্তু তবুও সে নিজের কণ্ঠ প্রাণপণে অবিকৃত রাখিয়া মৃদুস্বরে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কি করতে হবে বলুন?

সুরেশ পকেট হইতে টাইম-টেবিলখানা বাহির করিয়া গাড়ির সময়টা দেখিয়া লইয়া কহিল, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কিন্তু সন্ধ্যার আগে যখন কোনদিকে যাবারই উপায় নেই, তখন এইটুকু কাল আর আমাকে অবিশ্বাস করো না, এই শুধু আমি চাই। আমা হতে তোমার আর কোন অকল্যাণ হবে না, একথা তোমার নাম করেই আজ আমি শপথ করচি।

প্রত্যুত্তরে সে কোন কথাই কহিল না, কিন্তু সে সম্মত হইয়াছে তাহা বুঝা গেল।

লোকের দৃষ্টি এবং কৌতূহল আকর্ষণ করিবার আশঙ্কায় স্টেশনে ফিরিয়া তাহার ক্ষুদ্র বসিবার ঘরে গিয়া অপেক্ষা করিতে দুজনের কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। সন্ধান লইয়া জানা গেল, বড় রাস্তার উপরে সম্রাট শের শাহের নামে প্রচলিত সরাইয়ের অস্তিত্ব আজিও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। শহরের এক প্রান্তে তাহারই একটার উদ্দেশে দু'জনে ক্ষণকালের জন্য নিজের মর্ম্মান্তিক দুঃখ বিস্মৃত হইয়া একখানা গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া যাত্রা করিল।

পথে কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিল না, কেহ কাহারও মুখের প্রতিও চাহিয়া দেখিল না। শুধু গো-শকট আসিয়া যখন সরাইয়ের প্রাঙ্গণে থামিল, তখন নামিতে গিয়া পলকের জন্য সুরেশের মুখের প্রতি অচলার দৃষ্টি পড়িয়া সে মনে মনে শুধু কেবল আশ্চর্য্য নয়, উদ্বিগ্ন হইল। তাহার দুই চোখ ভয়ানক রাঙা, অথচ মুখের উপর কিসে যেন কালি মাখাইয়া দিয়াছে। সংসারের অনেক ঝড়ঝাপ্টার মধ্যেই সে তাহাকে দেখিয়াছে, কিন্তু তাহার এ মূর্ত্তি সে আর কখনও দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারিল না।

গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া বিদায় করিয়া সুরেশ মনি-ব্যাগটা সেখানে রাখিয়া দিয়া বলিল, এটা আপাততঃ তোমার কাছে রইল, যদি কিছু দরকার মনে হয়, নিতে লজ্জা করো না।

অচলার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করে, এ-কথার অর্থ কি? কিন্তু পারিল না।

সুরেশ কহিল, এই সুমুখের ঘরটাই সম্ভবতঃ কিছু ভালো, তুমি একটুখানি বিশ্রাম কর, আমি পাশের কোন একটা ঘর থেকে এই জামাকাপড়গুলো ছেড়ে আসি। কি জানি, এইগুলোর জন্যেই বোধ করি এ-রকম বিশ্রী ঠেকচে; বলিয়া সে অচলার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি আর লেশমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজের ব্যাগটা হাতে লইয়া ঠিক মাতালের মত টলিয়া টলিয়া বারান্দা পার হইয়া কোণের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সে চলিয়া গেলে অচলা একাকী পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। তাই সে অনেক কষ্টে নিজের ভারী ব্যাগটা টানিয়া সম্মুখের ঘরের মধ্যে আনিয়া

ফেলিল, এবং তাহারই উপরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রাস্তার উপরে লোকচলাচল দেখিতে লাগিল।

২৯

সেই ঘরের সম্মুখে ব্যাগের উপরে বসিয়া আশা ও আশ্বাসের স্বপ্ন দেখিয়া অচলার কোথায় দিয়া যে ঘণ্টা-দুই অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। কিছুক্ষণ সূর্য্য উঠিয়াছে। শীতের দিনের ধূলি-ধূসরিত তরুশ্রেণী কল্যকার ঝড়-জলে স্নাত ও নির্ম্মল হইয়া প্রভাতসূর্য্যকিরণে ঝলমল্ করিতেছে। সিক্ত স্নিগ্ধ রাজপথের উপর দিয়া বিগত-ক্লেশ পান্থ প্রফুল্লমুখে চলিতে শুরু করিয়াছে; কদাচিৎ দুই-একটা এক্কাগাড়ি ছোট ছোট ঘণ্টার শব্দে চারিদিক মুখরিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; মাঝে মাঝে রাখালবালকেরা গো-মহিষের দল লইয়া অদ্ভুত ও অসম্ভব আত্মীয়সম্বন্ধের অস্তিত্ব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া কোন্ গ্রামপ্রান্তে যাত্রা করিয়াছে; অদূরবর্ত্তী কোন এক কুটীর হইতে গমভাঙা যাঁতার শব্দের সঙ্গে মিশিয়া হিন্দুস্থানী গৃহস্থ-বধূর অশ্রান্ত অপরিচিত সুর ভাসিয়া আসিতেছে। সবসুদ্ধ লইয়া এই যে একটি নূতন দিনের কর্ম্ম-স্রোত তাহার চেতনায় ধীরে ধীরে গতিশীল হইয়া উঠিতেছিল, ইহারই বিচিত্র প্রবাহে তাহার দুঃখ, তাহার দুর্ভাগ্য, তাহার দুশ্চিন্তা কিছুক্ষণের নিমিত্ত কোথায় যেন ভাসিয়া গিয়াছিল। ঠিক কিসের জন্য, কেন সে এখানে এভাবে বসিয়া, তাহার স্মরণ ছিল না। অকস্মাৎ মনে পড়িল জন-দুই পল্লী-বালকের বিস্মিত দৃষ্টিপাতে। তাহারা আঙ্গিনার একপ্রান্ত হইতে শুধু বিস্ফারিতচক্ষে নিঃশব্দে চাহিয়াছিল। এই জীর্ণ মলিন পান্থশালার প্রাচীন দিনের গৌরবের ইতিহাস ছেলে দুটোর জানা ছিল না; কিন্তু তাহাদের জ্ঞান হওয়া অবধি এরূপ বিশিষ্ট অতিথির সমাগম যে এ-গৃহে কখনো ঘটে নাই, তাহাদের নীরব চোখের চাহনি সে-কথা স্পষ্ট করিয়া অচলাকে জানাইয়া দিল। ঘুম ভাঙিয়া নিত্য-নিয়মিত খেলা করিতে আসিয়া আজ সহসা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার তাহাদের চোখে পড়িয়া গিয়াছে।

অচলা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বোধ হয় কিছু প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ছেলে দুটা নিমিষে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তাহার মনে পড়িল প্রায় ঘণ্টা-দুই পূর্ব্বে সেই যে সুরেশ কাপড় ছাড়িবার নাম করিয়া পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, আর দেখা দেয় নাই। এতক্ষণ ধরিয়া সে একাকী কি করিতেছে জানিবার জন্য সে তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সেই কক্ষের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত

হইল এবং অবরুদ্ধ কবাটের ভিতর হইতে কোন প্রকার সাড়া-শব্দ না পাইয়া সে মিনিট-দুই চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর আস্তে আস্তে দ্বার ঠেলিয়া সামনেই যাহা দেখিতে পাইল তাহাতে একই কালে মুক্তির তীব্র আবেগে ও বিকট ভয়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার সমস্ত দেহমন যেন পাষাণ হইয়া গেল। ঘরটা অন্ধকার, শুধু ওদিকের একটা ভাঙা জানালা দিয়া খানিকটা আলো ঢুকিয়া মেঝের উপর পড়িয়াছে। সেইখানে সেই আলো-আঁধারের মধ্যে একান্ত অপরিচ্ছন্ন ধূলা-বালির উপরে সুরেশ চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। তাহার গায়ে তখনও সেই-সব জামা-কাপড়, শুধু কেবল খোলা ব্যাগটার ভিতর হইতে কতকগুলো জিনিসপত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো।

চক্ষের পলকে তাহার শেষ কথাগুলো অচলার মনে পড়িল, সে ডাক্তার, সে শুধু মানুষের জীবনটা ধরিয়া রাখিবার বিদ্যাই শিখিয়াছিল তাহা নয়, তাহাকে নিঃশব্দে বাহির করিয়া দিবার কৌশলও তাহার অবিদিত ছিল না। মনে পড়িল, নিদারুণ ভুলের জন্য তাহার সেই উৎকট আত্মগ্লানি; মনে পড়িল, তাহার সেই বিদায় চাওয়া, সেই আশ্বাস দেওয়া—সর্ব্বোপরি তাহার সেই বারংবার প্রায়শ্চিত্ত করার নিষ্ঠুর ইঙ্গিত; সমস্তই একসঙ্গে এক নিশ্বাসে যেন ওই অবলুণ্ঠিত দেহটার কেবল একটিমাত্র পরিণামের কথাই তাহার কানে কানে কহিয়া দিল। সেইখানে সেই দ্বার ধরিয়া সে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল—তাহার এমন সাহস হইল না যে, আর ঘরে প্রবেশ করে।

কিন্তু এইবার ওই অচেতন দেহটার প্রতি চাহিয়া তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। যে তাহারই জন্য এত বড় দুর্নামের বোঝা মাথায় লইয়া হতাশ্বাসে এমন করিয়া এই পৃথিবী হইতে চিরদিনের তরে বিদায় লইয়া গেল, অপরাধ তাহার যত গুরুতরই হোক, তাহাকে মার্জ্জনা করিতে পারে না, এত বড় কঠিন হৃদয় সংসারে অল্পই আছে; এবং আজই প্রথম তাহার কাছে তাহার নিজের অপরাধও সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল।

সুরেশের সহিত সেই প্রথম দিনের পরিচয় হইতে সেদিন পর্য্যন্ত যত কিছু কামনা-বাসনা, যত ভুল-ভ্রান্তি, যত মোহ, যত ছলনা, যত আগ্রহ-আবেগ উভয়ের মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে, সমস্তই একে একে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখা দিতে লাগিল। তাহার নিজের আচরণ, তাহার পিতার আচরণ—অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া মনে হইল, শুধু কেবল নিজের নয়, অনেকের, অনেক পাতকের গুরুভার বহন করিয়াই আজ সুরেশ যে বিচারকের পদপ্রান্তে গিয়া উপনীত হইয়াছে, সেখানে সে নিঃশব্দে মুখ বুজিয়া সমস্ত শাস্তি স্বীকার করিয়া লইবে, কিংবা একটি একটি করিয়া সকল দুঃখ অভিযোগ ব্যক্ত করিয়া তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবে।

ওই লোকটির সংসারে উপভোগ করিবার অনেক সাজ-সরঞ্জাম অনেক উপকরণই সঞ্চিত ছিল, তথাপি এই যে নীরবে, লেশমাত্র আড়ম্বর না করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, ইহার গভীর বেদনা অচলাকে আজ ফিরিয়া ফিরিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে যে যথার্থই প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল, সে-কথা আজ ওই মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিবার, অবিশ্বাস করিবার আর এতটুকু অবকাশ রহিল না।

আবার তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। গত রাত্রে গাড়ির মধ্যে তাহাদের বিস্তর কঠিন কটু কথা, বিস্তর ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়-অন্যায়ের বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে-সকল যে কত বড় অর্থহীন প্রলাপ, অচলা তখন তাহার কি জানিত। ভালবাসার যে জাতি নাই, ধর্ম্ম নাই, বিচার-বিবেক ভাল-মন্দ বোধ কিছুই নাই, যে এমন করিয়া মরিতে পারে, সে যে এইসব সমাজের হাতে-গড়া আইন-কানুনের অনেক উপরে, এ-সকল বিধি-নিষেধ যে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এই মরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ এ-কথা সে অস্বীকার করিবে কেমন করিয়া?

অচলা আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেছিল, সহসা তাহার বুকের ভিতরটা ছ্যাং করিয়া মনে হইল, মৃতদেহটা যেন একটুখানি নড়িয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই একটা অস্ফুট আর্ত্তস্বরের সঙ্গে সুরেশ পাশ ফিরিয়া শুইল। সে মরে নাই—জীবিত আছে; একটা প্রচণ্ড আগ্রহ-বেগে অচলা ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে পড়িল এবং ভগ্ন-কণ্ঠে কহিল, সুরেশবাবু!

আহ্বান শুনিয়া সুরেশ দুই আরক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

অচলা আর কোন কথা বলিতে পারিল না, শুধু অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া অশ্রুর আকারে দুই চক্ষু দিয়া নিরন্তর ঝড়িয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের অশ্রুর সহিত এ অশ্রুর কতই না প্রভেদ!

অথচ তাহার সকল চিন্তার মধ্যে যে চিন্তাটা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত সংগোপনে পীড়া দিতেছিল, তাহা ইহার বাস্তব দিকটা। এই অজানা অপরিচিত স্থানে সুরেশের মৃতদেহ লইয়া সে কি উপায় করিবে, কাহাকে ডাকিবে, কাহাকে বলিবে—হয়ত অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা, অনেক কুৎসিত প্রশ্ন উঠিবে—সে তাহার কাহাকে কি জবাব দিবে; হয়ত পুলিশে টানাটানি করিয়া সকল কথা বাহির করিয়া আনিবে—সেই-সকল অনাবৃত প্রকাশ্যতার লজ্জায় তাহার সমস্ত দেহ-মন যে অন্তরে কিরূপ পীড়িত, কিরূপ ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সমস্তটা বোধ করি সে নিজেও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে নাই। এখন সেই বিপদের অপরিমেয় লাঞ্ছনা হইতে অকস্মাৎ অব্যাহতি পাইয়া তাহার কান্না যেন আর থামিতে চাহিল না, এবং সে মরে নাই,

শুধু ইহাতে তাহার প্রতি অচলার সমস্ত হৃদয় কানায় কানায় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিলে সুরেশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কাঁদছ কেন অচলা?

অচলা ভগ্ন-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কেন তুমি এমন করে শুয়ে রইলে? কেন গেলে না? কেন আমাকে এত ভয় দেখালে?

তাহার কণ্ঠস্বরে যে স্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাহা এমনই করুণ, এমনই মধুর যে, শুধু সুরেশের নয়, অচলার নিজের মধ্যে কেমন একপ্রকার মোহের সঞ্চার করিল। সে পুনরায় কহিল, তোমার যদি এতই ঘুম পেয়েছিল, আমাকে বললে না কেন? আমি ত ওদিকের বড় ঘরটা পরিষ্কার করে যা হোক কিছু পেতে তোমার একটা বিছানা তৈরী করে দিতে পারতুম। ট্রেনের সময় হতে ত ঢের দেরি ছিল।

সুরেশ কোনো জবাব দিল না, শুধু বিগলিত স্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া অচলার ডান হাতখানি তুলিয়া নিজের উত্তপ্ত ললাটের উপর রাখিয়া কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

অচলা চকিত হইয়া কহিল, এ যে ভয়ানক গরম! তোমার কি জ্বর হয়েছে না কি!

সুরেশ কহিল, হুঁ। তা ছাড়া এ জ্বর সহজে সারবে বলেও আমার মনে হয় না। বোধ হয়—

অচলা হাতখানি আস্তে আস্তে টানিয়া লইল, এবং প্রত্যুত্তরে তাহার মুখ দিয়াও এবার কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। তাহার উদ্বেলিত সমস্ত স্নেহ-মমতা এক মুহূর্তে জমিয়া যেন পাথর হইয়া গেল। সহ্য করিবার, ধৈর্য্য ধরিবার তাহার যে কিছু শক্তি ছিল, সমস্ত একত্র করিয়া সে স্থির হইয়া আজিকার বেলাটুকু গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে, ইহাই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু এই অচিন্তনীয় ও অভাবিতপূর্ব্ব বিপদের মেঘে তাহার আশার ক্ষীণ রশ্মি-রেখাটুকু যখন নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তখন মৃত্যু ভিন্ন জগতে আর প্রার্থনীয় বস্তু তাহার দ্বিতীয় রহিল না।

ইহাকে এইভাবে এখানে একাকী ফেলিয়া যাওয়ার কথা সে কল্পনা করিতে পারিল না। কিন্তু যাহার পীড়ার সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব, সমস্ত গুরুভার তাহার মাথায় পড়িল, তাহাকে লইয়া এই অপরিচিত স্থানে সে কি করিবে, কোথায় কাহার কাছে কি সাহায্য ভিক্ষা চাহিবে, কি পরিচয়ে মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে, অহর্নিশি কি অভিনয় করিবে, এই-সকল চিন্তা বিদ্যুৎবেগে তাহার মাথায় প্রবাহিত হওয়ায় সে ছুটিয়া পলাইবে, না ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবে, না সজোরে মাথা কুটিয়া এই

অভিশপ্ত জীবনের পালাটা হাতে হাতে চুকাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, ইহার কোনটারই যেন কূল-কিনারা পাইল না।

৩০

সেদিন স্টেশন হইতে পথে কিছু কিছু জলে ভিজিয়া কেদারবাবু সাত-আটদিন গাঁটের বাত ও সর্দ্দিজ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কন্যা-জামাতার কুশল-সংবাদের অভাবে অতিশয় চিন্তিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি জব্বলপুরের বন্ধুকে একখানা পোস্টকার্ড লেখা ভিন্ন বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আজ তাহার জবাব আসিয়াছে। কেহই আসে নাই এবং তিনি কাহারও কোন খবর জানেন না, এইটুকু মাত্র খবর দিয়াছেন। ছত্র কয়টি কেদারবাবু বার বার পাঠ করিয়া বিবর্ণমুখে শূন্য-দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু চশমার কাচ দুটা ঘন ঘন মুছিতে লাগিলেন। তাহাদের কি হইল, কোথায় গেল, সংবাদের জন্য তিনি কাহাকে ডাকিবেন, কোথায় চিঠি লিখিবেন, কাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার সকল আপদে-বিপদে যে ব্যক্তি কায়মন দিয়া সাহায্য করিত সেই সুরেশও নাই, সে-ও সঙ্গে গিয়াছে।

ঠিক এমনি সময়ে বেয়ারা আসিয়া আর একখানি পত্র তাঁহার সুমুখেই রাখিয়া দিল। কেদারবাবু কোনমতে নাকের উপর চশমাখানা তুলিয়া দিয়া ব্যগ্র-হস্তে চিঠিখানি তুলিয়া দেখিলেন, চিঠি তাঁহার কন্যা অচলার নামে। মেয়েলি হাতের চমৎকার স্পষ্ট লেখা। এ পত্র কে লিখিল, কোথা হইতে আসিল, জানিবার আগ্রহে অপরের চিঠি খোল-না-খোলার প্রশ্ন তাঁহার মনে আসিল না, তাড়াতাড়ি খামখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া প্রথমেই লেখিকার নাম পড়িয়া দেখিলেন, লেখা আছে 'তোমার মৃণাল'। তাহার পর এখানিও তিনি আদ্যোপান্ত বার বার পাঠ করিয়া বাহিরের দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া চশমা-মোছার কাজে লাগিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল তাহা জগদীশ্বর জানেন। বহুক্ষণে চশমা পরিষ্কারের কাজটা স্থগিত রাখিয়া পুনরায় তাহা যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া আর একবার চিঠিখানি আগাগোড়া পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। মৃণাল স্ত্রীর সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তীব্র মধুর বহুপ্রকার উপদেশ দিয়া শেষের দিকে লিখিয়াছে—

সেজদা তোমার সম্বন্ধে কিছুই বলেন না সত্য, জিজ্ঞাসা করিলেও ভয়ানক গম্ভীর হইয়া উঠেন বটে, কিন্তু আমি ত মেয়েমানুষ, আমি ত সব বুঝিতে পারি। আচ্ছা সেজদি, ঝগড়া-বিবাদ কাহার না হয় ভাই? কিন্তু তাই বলিয়া এত অভিমান!

তোমার স্বামী তাঁহার শরীর-মনের বর্ত্তমান অবস্থা না বুঝিয়া রাগ করিতেও পারেন, অধীর হইয়া অন্যায় করিয়া চলিয়া আসিতেও পারেন, কিন্তু তুমি ত এখনো পাগল হও নাই যে, তিনি যাই বলিতেই তুমি স্বচ্ছন্দে সায় দিয়া বলিলে, আচ্ছা, তাই হোক, যাও তোমার সেই বনবাসে। তাই আমি কেবল ভাবি সেজদি, কি করিয়া প্রাণ ধরিয়া তোমার মৃত-কল্প স্বামীটিকে এত সহজে এই বনের মধ্যে বিসর্জ্জন দিলে এবং দিয়া স্থির হইয়া এই সাত-আটদিন বলি কেন, সাত-আট বৎসর নিশ্চিন্ত মনে বাপের বাড়ি বসিয়া রহিলে! সত্য বলিতেছি, সেদিন যখন তিনি জিনিসপত্র লইয়া বাড়ি ঢুকিলেন, আমি হঠাৎ চিনিতে পারি নাই। তোমাদের কেন ঝগড়া হইল, কবে হইল, কিসের জন্য পশ্চিমে যাওয়ার বদলে তিনি দেশে চলিয়া আসিলেন, এ-সকল আমি কিছুই জানি না এবং জানিতে চাই না। কিন্তু আমার মাথার দিব্যি রইল, তুমি পত্রপাঠমাত্র চলিয়া আসিবে। জানই ত ভাই, আমার শাশুড়ীকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবার জো নাই। তবুও হয়ত আমি নিজে গিয়া তোমার পা ধরিয়া টানিয়া আনিতাম, যদি না সেজদা এতটা অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। একবার এস, একবার নিজের চোখে তাঁকে দেখ, তখন বুঝিবে, এই অসঙ্গত মান করিয়া কতদূর অন্যায় করিয়াছ। এ-বাড়িও তোমার, আমিও তোমার, সেইজন্য এ-বাড়িতে আসিতে কোন দ্বিধা করিবে না। তোমার পথ চাহিয়া রহিলাম, শ্রীচরণে শত কোটী প্রণাম। আর একটা কথা। আমার এই পত্র লেখার কথা সেজদা যেন শুনিতে না পান, আমি লুকাইয়া লিখিলাম। ইতি—তোমার মৃণাল।

পত্র শেষ করিয়া মৃণাল একটা পুনশ্চ দিয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছে যে, যেহেতু স্বামীর অনুপস্থিতিতে তুমি একটা বেলাও সুরেশবাবুর বাটীতে থাকিবে না জানি, তাই তোমার বাপের বাড়ির ঠিকানাতে লিখিলাম। ভরসা করি, এ পত্র তোমার হাতে পড়িতে বিলম্ব হইবে না।

কেদারবাবুর হাত হইতে চিঠিখানা স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল, তিনি আর একবার শূন্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার চশমা-মোছার কাজে ব্যাপৃত হইলেন। এটুকু বুঝা গিয়াছে, মহিম জব্বলপুরের পরিবর্ত্তে এখন তাহার গ্রামে রহিয়াছে, এবং অচলা তথায় নাই। সে কোথায়, তাহার কি হইল, এ-সকল কথা হয় মহিম জানে না, না হয় জানিয়াও প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে না।

হঠাৎ মনে হইল, সুরেশই বা কোথায়? সে যে তাহাদের অতিথি হইবে বলিয়া সঙ্গ লইয়াছিল। সে নিশ্চয়ই বাটীতে ফিরে নাই, তাহা হইলে একবার দেখা করিতই। তাহার পরে পিতার বুকের মধ্যে যে আশঙ্কা অকস্মাৎ শূলের মত আসিয়া পড়িল, সে আঘাতে তিনি আর সোজা থাকিতে পারিলেন না, সেই আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

দুপুরবেলা দাসী সুরেশের বাটী হইতে সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, তাঁহার পিসিমা কিছুই জানেন না। কোন চিঠিপত্র না পাইয়া তিনিও অত্যন্ত চিন্তিত আছেন।

রাত্রে নিভৃত শয়ন-কক্ষে কেদারবাবু প্রদীপের আলোকে আর একবার মৃণালের পত্রখানা লইয়া বসিলেন। ইহার প্রতি অক্ষর তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন, যদি দাঁড়াইবার মত কোথাও এতটুকু জায়গা পাওয়া যায়। না হইলেও যে তিনি কোথায় গিয়া কি করিয়া মুখ লুকাইবেন, ইহা জানিতেন না। চিরদিন পুরুষানুক্রমে কলিকাতাবাসী; কলিকাতার বাহিরে কোথাও যে কোন ভদ্রলোক বাঁচিতে পারে, এ-কথা তিনি ভাবিতে পারিতেন না। সেই আজন্ম-পরিচিত স্থান, সমাজ, চিরদিনের বন্ধু-বান্ধব সমস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া কোথাও অজ্ঞাতবাসে যদি শেষ জীবনটা অতিবাহিত করিতেই হয়, তবে সেই দুঃসহ দুর্ভর দিন-কয়টা যে কি করিয়া কাটিবে সে তাঁহার চিন্তার অতীত এবং কন্যা হইয়া যে দুর্ভাগিনী এই শাস্তির বোঝা তাহার রুগ্ন বৃদ্ধ পিতার অশক্ত শিরে তুলিয়া দিল, তাহাকে যে তিনি কি বলিয়া অভিশাপ দিবেন, তাঁহাও চিন্তার অতীত।

সারারাত্রির মধ্যে তিনি একবার চোখে-পাতায় করিতে পারিলেন না এবং ভোর নাগাদ তাঁহার অম্বলের ব্যথাটা আবার দেখা দিল; কিন্তু আজ যখন নিজের বলিয়া মুখ চাহিতে দুনিয়ার আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন নির্জীবের মত শয্যাশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকিতেও তাঁহার ঘৃণা বোধ হইল। এতবড় বেদনাকেও আজ তিনি শান্তমুখে লুকাইয়া অন্যদিনের মত বাহিরে আসিলেন এবং রেলওয়ে স্টেশনের জন্য গাড়ি ডাকিতে পাঠাইয়া তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় গুছাইয়া লইতে বেয়ারাকে আদেশ করিলেন।

৩১

শীতের সূর্য্য অপরাহ্নবেলায় ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, এবং তাহারই ঈষত্তপ্ত কিরণে শোননদের পার্শ্ববর্ত্তী সুদূর বিস্তীর্ণ বালু-মরু ধূ-ধূ করিতেছিল। এমনি সময়ে একটা বাঙলোবাটীর বারান্দায় রেলিঙ ধরিয়া অচলা সেইদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার নিজের জীবনের সঙ্গে ওই দগ্ধ মরুখণ্ডের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল কি না, সে অন্য কথা, কিন্তু ঐ দুটি অপলক চক্ষুর প্রতি পলকমাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইতে পারিত যে, তেমন করিয়া চাহিয়া থাকিলে দেখা কিছুই যায় না, কেবল সমস্ত সংসার একটা বিচিত্র ও বিরাট ছায়াবাজির মত প্রতীয়মান হয়।

দিদি ?

অচলা চমকিয়া চাহিল। যে মেয়েটি একদিন 'রাক্ষসী' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া আরা স্টেশনে নামিয়া গিয়াছিল, এ সেই। কাছে আসিয়া অচলার উদ্‌ভ্রান্ত ও একান্ত শ্রীহীন মুখের প্রতি মুহূর্তকাল দৃষ্টি রাখিয়া অভিমানের স্বরে কহিল, আচ্ছা দিদি, সবাই দেখচে সুরেশবাবু ভাল হয়ে গেছেন; ডাক্তার বলেচেন, আর এক বিন্দু ভয় নেই, তবু যে দিবারাত্র তোমার ভাবনা ঘোচে না, মুখে হাসি ফুটে না, এটা কি তোমার বাড়াবাড়ি নয় ? আমাদেরও কর্তারা আছেন, তাঁদের অসুখ-বিসুখেও আমরা ভেবে সারা হই, কিন্তু মাইরি বলচি ভাই, তোমার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

অচলা মুখ ফিরাইয়া লইয়া শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল, কোন উত্তর দিল না।

মেয়েটি রাগ করিয়া বলিল, ইস্। ফোঁস করে যে কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বড়! বলিয়া কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া যখন অচলার নিকট হইতে কোনপ্রকার জবাব পাইল না, তখন তাহার একখানি হাত নিজের মুঠোর মধ্যে টানিয়া লইয়া অত্যন্ত করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সুরমাদিদি, সত্যি কথা বলো ভাই, আমাদের বাড়িতে তোমার একদণ্ডও মন টিকচে না, না ? বোধ হয় খুব অসুবিধে আর কষ্ট হচ্ছে, সত্যি না ?

অচলা নদীর দিকে যেমন চাহিয়াছিল, তেমনি চাহিয়া রহিল; কিন্তু এবার উত্তর দিল, কহিল, তোমার শ্বশুর আমার যে উপকার করেচেন, সে কি এ-জন্মে কখনো ভুলতে পারবো ভাই।

মেয়েটি হাসিল; কহিল, ভোলবার জন্যই যেন তোমাকে আমি সাধাসাধি ক'রে বেড়াচ্চি! এবং পরক্ষণেই কৃত্রিম অনুযোগের কণ্ঠে বলিল, আর সেজন্যই বুঝি তখন বাবার অত ডাকাডাকিতেও সাড়া দিলে না ? তুমি ভাবলে, বুড়ো যখন তখন—

অচলা একান্ত বিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, না, এমন কখ্খনো হতে পারে না।

রাক্ষুসী জবাব দিল, পারে না বৈ কি! তবু যদি না আমি নিজে সাক্ষী থাকতুম! ঠাকুরঘর থেকে আমার কানে গেল, সুরমা! ও-মা সুরমা! এমন চার-পাঁচবার শুনলুম, বাবা ডাকচেন তোমাকে। পুজোর সাজ করছিলুম, এক-পাশে ঠেলে রেখে ছুটে এসে দেখি, তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছেন। সত্যি বলচি দিদি, তামাসা করচিনে!

অচলাই শুধু মনে মনে বুঝিল, কেন বৃদ্ধের 'সুরমা' আহ্বান তাহার বিমনা-চিত্তের দ্বার খুঁজিয়া পায় নাই। তথাপি সে লজ্জায় অনুতাপে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কহিল, বোধ হয় তাই, ঘরের মধ্যে—

রাক্ষুসী বলিল, কোথায় ঘরের মধ্যে। যাঁর জন্যে ঘর, তিনি যে তখন বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। উঠোন থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, একা এমনি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। বলিয়া একটু থামিয়া হাসি-মুখে বলিল, কিন্তু তুমি ত আর তোমাতে ছিলে না ভাই, যে, বুড়ো-সুড়োর ডাক শুনতে পাবে! যা ভেবেছিলে, তা যদি বলি ত—

অচলা নীরবে পুনরায় নদীর পরপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, এইসকল ব্যঙ্গোক্তির উত্তর দিবার চেষ্টামাত্র করিল না। কিন্তু এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, রাক্ষুসী নামের সহিত তাহার স্বভাবের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না; এবং নামও তাহার রাক্ষুসী নয়, বীণাপাণি। জন্মকালে মা মরিয়াছিল বলিয়া পিতামহী রাগ করিয়া এই অপবাদ দিয়াছিলেন, এবং প্রতিবেশী শ্বশুর-খাশুড়ীর নিকট হইতে এ দুর্নাম সে গোপন রাখিতে পারে নাই।

অচলাকে অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া নির্ব্বাক হইতে দেখিয়া সে মনে মনে লজ্জা পাইল, অনুতপ্ত-স্বরে বলিল, আচ্ছা সুরমাদিদি, তোমাকে কি একটা ঠাট্টাও করবার জো নেই ভাই? আমি কি জানিনে, বাবাকে তুমি কত ভক্তি-শ্রদ্ধা কর? তাঁর কাছে ত আমরা সমস্ত শুনেচি। তিনি সকালে বেড়িয়ে আসছিলেন, আর তুমি এই অজানা জায়গায় কাঁদতে কাঁদতে ডাক্তার খুঁজতে ছুটেছিলে। তারপরে তিনি তোমার সঙ্গে গিয়েই সরাই থেকে তোমার স্বামীকে বাড়ি নিয়ে এলেন। এ সবই ভগবানের কাজ দিদি, নইলে এ-বাড়িতে যে তোমার পায়ের ধূলো পড়বে সেদিন গাড়িতে এ-কথা কে ভেবেছিল? কিন্তু আমার প্রশ্নের ত জবাব হ'লো না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের এখানে যে তোমার এক-দণ্ডও ভাল লাগচে না, সে আমি টের পেয়েচি। কিন্তু কেন? কি কষ্ট, কি অসুবিধে এখানে তোমাদের হচ্ছে ভাই, তাই কেবল জানতে চাইচি; বলিয়া পূর্ব্বের মত এবারও ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া হঠাৎ এই মেয়েটির মনে হইল, যে কোন কারণেই হোক, সে উত্তরের জন্য মিথ্যা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। তখন যাহাকে তাহার শ্বশুর সসম্মানে আশ্রয় দিয়াছেন এবং নিজে সুরমাদিদি বলিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহার মুখখানা জোর করিয়া টানিয়া ফিরাইবামাত্রই দেখিতে পাইল, তাহার দুই চক্ষের কোণ বাহিয়া নিঃশব্দে অশ্রুর ধারা বহিয়া যাইতেছে। বীণাপাণি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া শূন্যদৃষ্টি অন্যত্র সঞ্চারিত করিল।

পরদিন অপরাহ্নবেলায় সদ্যপ্রাপ্ত একখানা মাসিকপত্র হইতে একটা ছোটগল্প বীণাপাণি অচলাকে পড়িয়া শুনাইতেছিল। একখানা বেতের চৌকির উপর অর্দ্ধ-শায়িতভাবে বসিয়া অচলা কতক বা শুনিতেছিল, কতক বা তাহার কানের মধ্যে একেবারেই পৌঁছিতেছিল না; এমনি সময়ে বীণাপাণির শ্বশুর রামচরণ লাহিড়ী মহাশয় সিঁড়ি হইতে 'মা রাক্ষুসী' বলিয়া একটা ডাক দিয়া বারান্দার উপর আসিয়া

উপস্থিত হইলেন ; উভয়েই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বীণাপাণি একখানি চৌকি টানিয়া বৃদ্ধের সন্নিকটে স্থাপিত করিয়া উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাবা !

এই বৃদ্ধ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তিনি ধীরে-সুস্থে আসন গ্রহণ করিয়া অচলার মুখের প্রতি সস্নেহে প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, একটা কথা আছে মা। ভট্‌চায্যিমশাই এইমাত্র এসেছিলেন, তিনি তোমাদের স্বামীর-স্ত্রীর নামে সঙ্কল্প ক'রে নারায়ণকে তুলসী দিচ্ছিলেন, তা কাল শেষ হবে। তবে কাল তোমাকে মা, কষ্ট স্বীকার ক'রে একটু বেলা পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকতে হবে। তিনি আমাদের বাড়িতেই নারায়ণ এনে কাজ সমাপ্ত ক'রে যাবেন, আর কোথাও তোমাকে যেতে হবে না। কথা শুনিয়া অচলার সমস্ত মুখ একেবারে কালিবর্ণ হইয়া উঠিল। ম্লান আলোকে বৃদ্ধের তাহা নজরে পড়িল না, কিন্তু বীণাপাণির তাহা পড়িল। সে হিন্দুঘরের মেয়ে, জন্মকাল হইতে এই সংস্কারের মধ্যেই মানুষ হইয়াছে এবং পীড়িত স্বামীর কল্যাণে ইহা যে কত উৎসাহ ও আনন্দের ব্যাপার, তাহা সে সংস্কারের মতই বুঝে, কিন্তু অচলার মুখের চেহারার এই উৎকট পরিবর্ত্তনে তার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তথাপি সধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবা, নারায়ণকে তুলসী দেওয়ালে ত তুমি সুরেশবাবুর জন্যে, তবে উনি উপোস না ক'রে দিদিকে করতে হবে কেন ?

বৃদ্ধ সহাস্যে কহিলেন, তিনি আর তোমার এই দিদিটি কি আলাদা মা ? সুরেশবাবু ত তাঁর এ অবস্থায় উপবাস করতে পারবেন না, তাই তোমার সুরমাদিদিকেই করতে হবে। শাস্ত্রে বিধি আছে মা, কোন চিন্তা নাই।

অচলা ইহারও প্রত্যুত্তরে যখন হাঁ-না কোন কথাই কহিল না, তখন তাহার এই নিরুদ্যম নীরবতা অকস্মাৎ এই শুভানুধ্যায়ী বৃদ্ধেরও যেন চোখে পড়িয়া গেল। তিনি সোজা অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, এতে তোমার কোন আপত্তি আছে সুরমা ? বলিয়া একান্ত ও পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদের প্রত্যাশায় চাহিয়া রহিলেন।

অচলা সহসা ইহারও কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে কহিল, তাঁকে বললে তিনিই করবেন বোধ হয়।

তাহার পরে সকলেই নীরব হইয়া রহিল। কথাটা যে কিরূপ বিসদৃশ, কত কটু ও নিষ্ঠুর শুনাইল, তাহা যে ব্যক্তি উচ্চারণ করিল, তাহার অপেক্ষা বোধ করি কেহই অনুভব করিল না, কিন্তু অন্তর্যামী ভিন্ন সে-কথা আর কেহ জানিতে পারিল না।

বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, তবে তাই হবে, বলিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেলেন। ভৃত্য আলো দিয়া গেল, কিন্তু দুজনেই সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মাসিকপত্রের সেই অত বড় উত্তেজক ও বলশালী গল্পের বাকীটুকু শেষ করিবার মত জোরও কাহারও মধ্যে রহিল না।

বাহিরের অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহাই ভেদ করিয়া পরপারের ধূসর সৈকতভূমি এক হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এই দুইটি স্তব্ধ মৌন লজ্জিত নারীর চক্ষের উপর স্বপ্নের মত ভাসিতে লাগিল।

এইভাবেই হয়ত আরও বহুক্ষণ কাটিতে পারিত, কিন্তু কি ভাবিয়া বীণাপাণি সহসা তাহার চৌকিটা অচলার পাশে টানিয়া আনিল এবং নিজের ডান হাতখানি সখীর কোলের উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া চুপি চুপি কহিল, ও-পারের ওই চরটার পানে চেয়ে চেয়ে আমার কি মনে হচ্ছিল জান দিদি? মনে হচ্ছিল যে ঠিক তুমি। যেন অমনি অন্ধকার দিয়ে ঘেরা একটুখানি—ও কি, এমন শিউরে উঠলে কেন ভাই?

অচলা মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক থাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, হঠাৎ কেমন যেন শীত ক'রে উঠল ভাই।

বীণাপাণি উঠিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একখানা গরম কাপড় আনিয়া অচলার সর্ব্বাঙ্গে সযত্নে ঢাকিয়া দিয়া স্বস্থানে বসিল, কহিল, একটা কথা তোমাকে ভারি জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় দিদি, কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করে। যদি রাগ না কর ত—

অজানা আশঙ্কায় অচলার বুকের ভিতরটা দুলিতে লাগিল। পাছে বেশী কথা বলিতে গেলে কাঁপিয়া যায়, এই ভয়ে সে শুধু কেবল একটা 'না' বলিয়াই স্থির হইল।

বীণাপাণি আদর করিয়া তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া বলিতে লাগিল, এখন যেন তুমি আমার দিদি, আমি তোমার ছোট বোন। কিন্তু সেদিন গাড়িতে ত আমি তোমার কেউ ছিলাম না, তবে কেন নিজের পরিচয় আমার কাছ থেকে অমন ক'রে লুকোতে চেয়েছিলে? যিনি স্বামী, তাঁকে বললে কেউ নয়—বললে, পীড়িত স্বামী অন্য কামরায়, তাঁকে নিয়ে জব্বলপুরে যাচ্ছো, কিন্তু আমাকে ঠকাতে পারনি। আমি ঠিক চিনেছিলাম, উনি তোমার কে। আবার বললে, তোমরা ব্রাহ্ম, বলিয়া একবার সে একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, কিন্তু এখন দেখচি, তোমার কর্ত্তাটির পৈতের গোছা দেখলে, বিষ্ণুপুরের পাচক-ঠাকুরের দল পর্য্যন্ত লজ্জা পেতে পারে। আচ্ছা ভাই, কেন এত মিথ্যা কথা বলেছিলে বল ত?

অচলা জোর করিয়া একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, যদি না বলি?

বীণাপাণি কহিল, তা হলে আমিই বলব। কিন্তু আগে বল, যদি ঠিক কথাটি বলতে পারি, কি আমাকে দেবে?

অচলার বুকের মধ্যে রক্ত-চলাচল যেন বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইল। তাহার মুখের উপরে যে মৃত্যু-পাণ্ডুরতা ঘনাইয়া আসিল, বাতির ক্ষীণ আলোকে বীণাপাণির

তাহা চোখে পড়িল কি-না বলা কঠিন; কিন্তু সে মুখ টিপিয়া আবার একটুখানি হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, কিছু দাও আর না দাও, যদি সত্য কথাটি বলতে পারি আমাকে কি খাওয়াবে বল অচলাদিদি।

অচলার নিজের নামটা নিজের কানে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রবেশ করিল, এবং পরক্ষণ হইতেই সে একপ্রকার অর্দ্ধচেতন, অর্দ্ধ-অচেতনের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

বীণাপাণি কহিতে লাগিল, আমাদের দুই বোনের কিন্তু তত দোষ নেই ভাই, দোষ যত আমাদের কর্ত্তা দুটির। একজন জ্বরের ঘোরে তোমার সত্যি নামটি প্রকাশ করে দিলেন, আর অপরটি তাই থেকে তোমার সত্যি পরিচয়টি ভেবে বার ক'রে আনলেন।

অচলা প্রাণপণ-বলে তাহার বিক্ষুব্ধ বক্ষকে সংযত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি পরিচয়টা কি শুনি?

বীণাপাণি বলিল, সত্যি হোক আর নাই হোক ভাই, বুদ্ধি যে তার আছে, সে কিন্তু তোমাকে মানতেই হবে। তিনি একদিন রাত্রে হঠাৎ এসে বললেন, তোমার অচলাদিদির কাণ্ডটা জানো গো? তিনি ঘর থেকে পালিয়ে এসেচেন। আমি রাগ করে বললুম, যাও, চালাকি করতে হবে না। এ-কথা দিদির কানে গেলে ইহ-জন্মে আর তিনি তোমার মুখ দেখবেন না।

অচলা চেয়ারের হাতায় দুই মুঠা কঠিন করিয়া বসিয়া রহিল।

বীণাপাণি কহিতে লাগিল, তিনি বলিলেন, মুখ আমার দেখুন আর নাই দেখুন, এ-কথা সত্যি, আমি দিব্যি করে বলতে পারি। জা-ননদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রেই হোক, আর শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে বনিবনাও না হওয়াতেই হোক, স্বামী নিয়ে তিনি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে এসেচেন। সুরেশবাবুর ত ভাব-গতিক দেখে মনে হয়, তোমার দিদি তাঁকে সমুদ্রে ডুবতে হুকুম করলেও তাঁর না বলবার শক্তি নাই। তার পরে যেখানে হোক একটা ছদ্মনামে অজ্ঞাতবাসে দুটিতে থাকবেন, যতদিন না বুড়ো-বুড়ি পৃথিবী খুঁজে সেধে-কেঁদে তাঁদের বৌ-বেটাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এই যদি না আসল ঘটনা হয় ত তুমি আমাকে—

আমি বললুম, আচ্ছা, তাই যেন হ'লো, কিন্তু গাড়িতে আমার মত একটা অপরিচিত মুখ্যু মেয়েমানুষের কাছে মিথ্যে বলবার দিদির কি এমন গরজ হয়েছিল? কর্ত্তা তাতে হেসে জবাব দিলেন, তোমার দিদিটি যদি তোমার মত বুদ্ধিমতী হতেন, তা হলে হয়ত গরজই হ'ত না। কিন্তু তা তিনি মোটেই নয়! যেই শুনলেন, তোমার বাড়ি ডিহরীতে, তুমি দুদিন পরে ডিহরীতে যাবে, তখনই তিনি অচলার বদলে সুরমা, ডিহরীর বদলে জব্বলপুর-যাত্রী এবং হিন্দুর বদলে ব্রাহ্ম-মহিলা হয়ে

উঠলেন। এটা তোমার মাথায় ঢুকল না রাক্ষুসী, যাঁরা টিকিট কিনে জব্বলপুর যাত্রা করে বেরিয়েছেন, তাঁরা হঠাৎ গাড়ি বদল করে এদিকেই বা ফিরবেন কেন, আর পীড়িত স্বামী নিয়ে কোন বাঙালীর বাড়িতে না উঠে ওই অতদূরে হিন্দুস্থানী পল্লীতে একটা ভাঙা সরাইয়ের মধ্যে গিয়েই বা হাজির হবেন কেন? বলিতে বলিতেই বীণাপাণি অকস্মাৎ পার্শ্বে হেলিয়া অচলার গলা জড়াইয়া ধরিল এবং স্নেহে প্রেমে বিগলিত হইয়া তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, বল না দিদি, কি হয়েছিল?. আমি কোনদিন কাউকে কোন কথা বলব না—এই তোমাকে ছুঁয়ে আজ আমি দিব্যি করচি।

বীণাপাণির মুখে তাহাদের সম্বন্ধে এই সত্য আবিষ্কারের মিথ্যে ইতিহাস শুনিয়া অচলার সমস্ত দেহটা যেন প্রকাণ্ড অচেতন পদার্থের মত সখীর আলিঙ্গনের মধ্যে. ঢলিয়া পড়িল। ইহজীবনের চরম লজ্জা মূর্ত্তি ধরিয়া এক-পা এক-পা করিয়া যে কোথায় অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাহা সে চাহিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু সে যখন অত্যন্ত অকস্মাৎ অচিন্তনীয়রূপে মুখ ফিরাইয়া আর এক পথে চলিয়া গেল, তাহাকে-স্পর্শমাত্র করিল না, তখন এই বিপুল সৌভাগ্যকে বহন করিবার মত শক্তি আর তাহাতে ছিল না। শুধু দুই চক্ষের অবিশ্রান্ত অশ্রুপ্রবাহ ব্যতীত বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কোথাও জীবনের কোন লক্ষণ আর তাহার মধ্যে অনুভূত হইল না।

এমন কতক্ষণ কাটিল। বীণাপাণি আপন অঞ্চলে বার বার করিয়া অচলার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া সস্নেহে করুণস্বরে কহিল, সুরমাদিদি, তুমি বয়সে বড় হলেও ছোটবোনের কথাটা রাখো ভাই, এইবার বাড়ি ফিরে যাও। আমি বলচি, এ-যাত্রা তোমাদের সুযাত্রা নয়। অনেক দুঃখে হাতের নোয়াটা যদি বজায় রয়েই গেছে দিদি, তখন অভিমান করে আর গুরুজনদের দুঃখ দিয়ো না, আর তাঁদের ভাবিয়ো না। হেঁট হয়ে শ্বশুর-ঘরে ফিরে যেতে কোন লজ্জা, কোন অগৌরব নেই দিদি।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে পুনরায় কহিল, চুপ করে রইলে যে ভাই। যাবে না? মা-বাপের ওপর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে সুরেশবাবু কখনো ভাল নেই। তোমার মুখ থেকে এ কথা শুনলে তিনি খুশীই হবেন, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলচি।

অচলা চোখ মুছিয়া এইবার সোজা হইয়া বসিল। চাহিয়া দেখিল, বীণাপাণি তেমনি উৎসুক-মুখে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। প্রথমটা উত্তর দিতে তাহার অতিশয় লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু শুদ্ধমাত্র নির্ব্বাক্ রহিয়াই যে ওই মেয়েটির কাছে মুক্তি পাওয়া যাইবে না, তাহাতে যখন আর কোন সংশয় রহিল না, তখন সমস্ত সংকোচ জোর করিয়া পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমাদের বাড়ি ফিরে যাবার কোন পথ নাই বীণা।

বীণাপাণি বিশ্বাস করিল না। কহিল, কেন পথ নেই? তোমাকে আমি বেশি-দিন জানিনে সত্য, কিন্তু যতটুকু জানি, তাতে সমস্ত পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে দিব্যি ক'রে বলতে পারি, তুমি এমন কাজ কখনো করতে পারো না দিদি, যার জন্যে কেউ তোমার কোনদিকের পথ বন্ধ করতে পারে। আচ্ছা, তোমার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা ব'লে দাও, আমরা ত পরশু সকালের গাড়িতে বাড়ি যাচ্ছি, বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজে তোমাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হব, দেখি বুড়ো-বুড়ী আমাকে কি জবাব দেন। তোমার যাঁরা শ্বশুর-শাশুড়ী, তাঁরা আমারও তাই—তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আমার কোন লজ্জা নেই।

অচলা চকিত হইয়া কহিল, তোমরা পরশু দেশে যাবে, একথা ত শুনিনি? এখানে কে কে থাকবেন?

বীণাপাণি কহিল, কেউ না, শুধু চাকর-দারোয়ান বাড়ি পাহারা দেবে। আমার জ্যাঠ-শাশুড়ী অনেকদিন থেকেই শয্যাগত, তাঁর প্রাণের আশা আর নেই—তিনি সকলকেই একবার দেখতে চেয়েছেন।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শ্বশুরবাড়িটি কোথায়?

বীণাপাণি বলিল, কলকাতার পটলডাঙ্গায়।

পটলডাঙ্গা নাম শুনিয়া অচলার মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে কহিল, বীণা, তা হলে আমাদেরও এ-বাড়ি ছেড়ে কালই যেতে হয়। এখানে থাকা ত আর চলে না।

বীণাপাণি হাসিয়া উঠিল। বলিল, তাই বুঝি তোমাদের বাড়ি ফেরবার জন্যে এত সাধা-সাধি করচি? এতক্ষণে বুঝি আমার কথার তুমি এই অর্থ করলে! না দিদি, আমার ঘাট হয়েচে, তোমাকে কোথাও যেতে আর কখনো আমি বলব না; যতদিন ইচ্ছে এই কুঁড়ে-ঘরে তোমরা বাস কর, আমাদের কারও আপত্তি নেই।

কিন্তু এই সদয় নিমন্ত্রণের অচলা কোন উত্তরই দিতে পারিল না। মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের যাওয়া কি সত্যই স্থির হয়ে গেছে?

বীণাপাণি কহিল, স্থির বই কি। আজ আমাদের গাড়ি পর্য্যন্ত রিজার্ভ করা হয়েচে। বাবার ঘরে যদি একবার উঁকি মারো ত দেখতে পাবে বোধ হয়, পোনর আনা জিনিসপত্রই বাঁধাছাদা ঠিকঠাক।

দাসী আসিয়া দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া কহিল, বৌমা, মা একবার তোমাকে রান্না-ঘরে ডাকচেন।

যাই, বলিয়া সে একটুখানি হাসিয়া সহসা আর একবার দুই বাহু দিয়া অচলার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া কানে কানে কহিল, এতদিন লোকের ভিড়ে অনেক মুস্কিলেই তোমাদের দিন কেটেচে। এবার খালি বাড়ি—কেউ কোথাও নেই—আপদ-

বাল্যই আমিও দূর হয়ে যাবো—এবার বুঝলে না ভাই দিদিমণিটি। বলিয়া সখীর কপোলের উপর দুটি আঙুলের একটু চাপ দিয়াই দ্রুতবেগে দাসীর অনুসরণ করিয়া চলিয়া গেল।

একটুকরা আনন্দ, খানিকটা দক্ষিণা হাওয়ার মত এই সৌভাগ্যবতী তরুণী লঘুপদে দৃষ্টির বাহিরে অপসৃত হইয়া গেল, কিন্তু তাহার কানে বলা শেষ কথা দুটি অচলা দুই কানের মধ্যে লইয়া সেইখানে পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আজিকার রাত্রি এবং কল্যকার দিনটা মাত্র বাকী। তাহার পরে আর কোন বাধা, কোন বিঘ্ন নাই—এই নির্জ্জন নীরব পুরীর মধ্যে—কাছে এবং দূরে তাহার যতদূর দৃষ্টি যায়—ভবিষ্যতের মধ্যে চোখ মেলিয়া দেখিল—কেবল একাকী এবং কেবলমাত্র সুরেশ ব্যতীত আর কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না।

৩২

এই জনহীন পুরীর মধ্যে কেবলমাত্র সুরেশকে লইয়া জীবনযাপন করিতে হইবে এবং সেই দুর্দ্দিন প্রতি মুহূর্ত্তে আসন্ন হইয়া আসিতেছে। বাধা নাই, ব্যবধান নাই, লজ্জা নাই—আজ নয় কাল বলিয়া একটা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিবার পর্য্যন্ত সুযোগ মিলিবে না।

বীণাপাণি বলিয়াছিল, সুরমাদিদি, শ্বশুর-ঘর আপনার ঘর, সেখানে ছোট হয়ে যেতে মেয়েমানুষের কোন সরম নেই।

হায় রে, হায়! তাহার কে আছে, আর কি নাই, সে জমা-খরচের হিসাব তাহার অন্তর্যামী ভিন্ন আর কে রাখিয়াছে? তথাপি আজও তাহার আপনার স্বামী আছে এবং আপনার বলিতে সেই তাহাদের পোড়া ভিটাটা এখনও পৃথিবীর অঙ্ক হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। আজিও সে একটা নিমিষের তরেও তাহার মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারে।

আবদ্ধ পশুর চোখের উপর হইতে যতক্ষণ না এই বাহিরের ফাঁকটা একেবারে আবৃত হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেমন সে একই স্থানে বারংবার মাথা কুটিয়া মরিতে থাকে, ঠিক তেমনি করিয়াই তাহার অবাধ্য মনের প্রচণ্ড কামনা তাহার বক্ষের মধ্যে হাহাকার করিয়া বাহিরের জন্য পথ খুঁজিয়া মরিতে লাগিল। পার্শ্বের ঘরে সুরেশ নিরুদ্বেগে নিদ্রিত, মধ্যের দরজাটা ঈষৎ উন্মুক্ত এবং তাহারই একধারে মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া আপনার আপাদ-মস্তক কম্বলে ঢাকিয়া হিন্দুস্থানী দাসী অকাতরে ঘুমাইতেছে। সমস্ত বাটীর মধ্যে কেহ যে জাগিয়া আছে, তাহার আভাস

মাত্র নাই—শুধু সে-ই যেন অগ্নিশয্যার উপরে দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। অনেক-দিন এই পালঙ্কের উপরেই তাহার পার্শ্বে বীণাপাণি শয়ন করিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার স্বামী উপস্থিত, সে তাহার নিজের ঘরে শুইতে গিয়াছে, এবং পাছে এই চিন্তার সূত্র ধরিয়া নিজের বিক্ষিপ্ত পীড়িত চিত্ত অকস্মাৎ তাহাদের অবরুদ্ধ কক্ষের সুষুপ্ত পর্যঙ্কের প্রতি দৃষ্টি হানিয়া হিংসায়, অপমানে, লজ্জার অণু-পরমাণুতে বিদীর্ণ হইয়া মরে, এই ভয়ে সে যেন আপনাকে আপনি প্রচণ্ড শক্তিতে টানিয়া ফিরাইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত দেহটা তার তীব্র তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পার্শ্বের কোন একটা ঘরের ঘড়িতে দুইটা বাজিল। গায়ের গরম কাপড়খানা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিতেই অনুভব করিল, এই শীতের রাত্রেও তাহার কপালে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়াছে। তখন শয্যা ছাড়িয়া মাথার দিকের জানালাটা খুলিয়া দিতেই দেখিতে পাইল, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর খণ্ড-চন্দ্র ঠিক সম্মুখেই দেখা দিয়াছে, এবং তাহারই স্নিগ্ধ মৃদু কিরণে শোনের নীল জল বহুদূর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। গভীর রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস তাহার তপ্ত ললাটের উপর স্নেহের হাত বুলাইয়া দিল এবং সেইখানে সেই জানালার উপরে সে তাহার অদৃষ্টের শেষ সমস্যা লইয়া বসিয়া পড়িল।

এই কথাটা অচলা নিশ্চয় বুঝিয়াছিল যে, তাহার এই অভিশপ্ত হতভাগ্য জীবনের যাহা কিছু সত্য, সমস্তটাই লোকের কাছে শুধু কেবল একটা অদ্ভুত উপন্যাসের মত শুনাইবে এবং যেদিন হইতে এই কাহিনীর প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল সেইদিন হইতে যত মিথ্যা এ-জীবনে সত্যের মুখোস পরিয়া দেখা দিয়া গিয়াছে, তাহাদের একটি একটি করিয়া মনে করিয়া ক্রোধে ক্ষোভে অভিমানে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং যে ভাগ্য-বিধাতা তাহার যৌবনের প্রথম আনন্দটিকে মিথ্যা দিয়া এমন বিকৃত, এমন উপহাসের বস্তু করিয়া জগতের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিতে লেশমাত্র মমতা বোধ করিল না, সেই নির্ম্মম নিষ্ঠুরকে সে যদি শিশুকাল হইতে ভগবান বলিয়া ভাবিতে শিক্ষা পাইয়া থাকে ত সে শিক্ষা তাহার একেবারে ব্যর্থ, একেবারে নিরর্থক হইয়াছে। সে চোখ মুছিতে মুছিতে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, হে ঈশ্বর! তোমার এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই দুর্ভাগিনীর জীবনটা ভিন্ন কৌতুক করিয়া আমোদ করিবার আর কি ছাই কিছুই ছিল না!

মনে মনে কহিল, কোথায় ছিলাম আমি এবং কোথায় ছিল সুরেশ! ব্রাহ্ম-পরিবারের ছায়া মাড়াইতেও যাহার ঘৃণা ও বিদ্বেষের অবধি ছিল না, ভাগ্যের পরিহাসে আজ সেই লোকের কি আসক্তির আর আদি-অন্ত রহিল না! যাহাকে সে কোনদিন ভালবাসে নাই, সে-ই তাহার প্রাণাধিক, শুধু এই মিথ্যাটাই কি সবাই

জানিয়া রাখিল? আর যাহা সত্য, সে কি কোথাও কাহারো কাছেই আশ্রয় পাইল না? আবার সেই মিথ্যাটা কি তাহার নিজের মুখ দিয়াই প্রচার হওয়ার এত প্রয়োজন ছিল? অদৃষ্টের এত বড় বিড়ম্বনা কাহার ভাগ্যে কবে ঘটিয়াছে? স্বামীকে সে অনেক দুঃখেই পাইয়াছিল, কিন্তু সে সহিল না—তাহার চরম দুর্দ্দশার বোঝা বহিয়া অকস্মাৎ একদিন সুরেশ গিয়া অভিসম্পাতের মত তাহাদের দেশের বাটীতে উপস্থিত হইল। তাহার সুখের নীড় দগ্ধ হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাগ্যটাও সে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, এ-কথা বুঝিতে আর যখন বাকী রহিল না, তখন আবার কেন তাহার পীড়িত স্বামীকে তাহারই ক্রোড়ের উপরে আনিয়া দেওয়া হইল! যাহাকে সে একেবারে হারাইতে বসিয়াছিল, সেবার ভিতর দিয়া আবার তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ফিরাইয়া দেওয়াই যদি বিধাতার সঙ্কল্প ছিল, তবে আজ কেন তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশা, লাঞ্ছনা-অপমানের আর কুল-কিনারা নাই?

অচলা দুই হাত জোড় করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, জগদীশ্বর! রোগমুক্ত স্বামীর স্নেহাশীর্ব্বাদে সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নিঃশেষ হইয়াছে বলিয়া যদি একদিন আমাকে বিশ্বাস করিতে দিয়াছিলে, তবে এত বড় দুর্গতির মধ্যে আবার ঠেলিয়া দিলে কিসের জন্য? সে যে সঙ্কোচ মানে নাই, এত কাণ্ডের পরেও সুরেশকে সঙ্গে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, জগতে এ অপরাধের আর ক্ষালন হইবে না, কলঙ্কের এ দাগ আর মুছিবে না—কিন্তু অন্তর্যামী, আমার অদৃষ্টে তুমিও কি ভুল বুঝিলে? এই বুকের ভিতরটায় চিরদিন কি রহিয়াছে, সে কি তোমার চোখেও ধরা পড়িল না!

পিতার চিন্তা, স্বামীর চিন্তা সে যেন প্রাণপণ-বলে দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া রাখিয়া দিত, আজও সে-সকল ভাবনাকে সে কাছে ঘেঁষিতে দিল না; কিন্তু তাহার মৃণালের কথাগুলো মনে পড়িল, আর মনে পড়িল পিসিমাকে। আসিবার কালে স্নেহার্দ্র করুণ-কণ্ঠে সতী-সাধ্বী বলিয়া তিনি যত আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, সেই সব। তাহার সম্বন্ধে আজ তাহাদের মনোভাব কল্পনা করিতে গিয়া অকস্মাৎ মর্ম্মান্তিক আঘাতে কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত বোধশক্তি তাহার যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং দেহ-মনের সেই অশক্ত অভিভূত অবস্থায় জানালার গরাদের উপর মাথা রাখিয়া বোধ হয় অজ্ঞাতসারে চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, এমন সময় পিছনে মৃদু পদশব্দে চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, খালি-গায়ে খালি-পায়ে সুরেশ দাঁড়াইয়া আছে। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় হয়ত সে কিছু বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠ-রোধ করিয়া দিল। ইহাকে দমন করিয়া কথা কহিতে বোধ হয় আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না, তাই পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া সে তেমনি করিয়াই গরাদের উপর মাথা রাখিল; কিন্তু যে

অশ্রু এতক্ষণ তাহার চোখ দিয়া বিন্দুতে বিন্দুতে পড়িতেছিল, সে যেন অকস্মাৎ কূল ভাঙিয়া উন্মত্ত-ধারায় ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কোথাও কোন শব্দ নাই, রাত্রির গভীর নীরবতা গৃহের ভিতরে-বাহিরে বিরাজ করিতে লাগিল। পিছনে দাঁড়াইয়া সুরেশ পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্তব্ধ—সহসা তাহার সমস্ত দেহটা বাতাসে বাঁশপাতার মত কাঁপিতে লাগিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই সে দুই হাত বাড়াইয়া অচলার মাথাটা টানিয়া আনিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

অচলা আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া আঁচলে চোখ মুছিল, কিন্তু অতি বড় বিস্ময় এই যে, যে লোকটা তাহার এত বড় দুঃখের মূল, তাহার এই ব্যবহারে আজ অচলার উৎকট ঘৃণা বোধ হইল না, বরঞ্চ মৃদু-কণ্ঠে কহিল, তুমি এ ঘরে এসেচ কেন?

সুরেশ চুপ করিয়া রহিল। বোধ করি কণ্ঠস্বরের অভাবেই সে জবাব দিতে পারিল না।

অচলা ধীরে ধীরে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল, শীতে তোমার হাত কাঁপচে, যাও, খালি-গায়ে আর দাঁড়িয়ে থেকো না—ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় গে।

সুরেশের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার গলা কাঁপিতে লাগিল—অচলার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, তা হলে তুমিও আমার ঘরে এসো।

অচলা মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শুধু কহিল, না, আজ নয়। এই বলিয়া ধীরে ধীরে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইল।

এই শান্ত সংযত প্রত্যাখ্যানের মধ্যে ঠিক কি ছিল, তাহা নিশ্চয় বুঝিতে না পারিয়া সুরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অচলা তাহার প্রতি না চাহিয়াই পুনশ্চ কহিল, আমি জেগে আছি জানতে পেরে কি তুমি এ-ঘরে ঢুকেছিলে?

সুরেশ আহত হইয়া বলিল, নইলে কি তোমাকে ঘুমন্ত জেনেই ঢুকেছি, এই তুমি আশা কর?

আশা! অচলা মুখ ফিরাইয়া একটুখানি হাসিল। এই তীক্ষ্ণ কঠিন হাসি দীপের অত্যন্ত ক্ষীণ আলোকেও সুরেশের চক্ষু এড়াইল না। সে হাসি যেন স্পষ্ট কথা কহিয়া বলিল, ওরে কাপুরুষ! নিদ্রিত রমণীর কক্ষে চোরের মত প্রবেশ করিতে নাই, পুরুষের এ মহত্ত্ব কি তুমি আজও দাবী কর? কিন্তু মুখে কোন কথাই কহিল না। ক্ষণেক পরে গবাক্ষ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, তোমার শরীর ভাল নেই, আর রাত জেগো না—যাও শোও গে। বলিয়া সে ধীরে-ধীরে বিছানায় আসিয়া গায়ের কম্বলটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আড়ষ্টভাবে সুরেশ সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, তার পরে নিঃশব্দ পদক্ষেপে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

৩৩

দুই-একজন দাস-দাসী ব্যতীত দিন পাঁচ-ছয় হইল, বাটীর সকলেই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। কেবল যাওয়া ঘটে নাই কর্ত্তার। কি একটা জরুরী কাজের অজুহাতে তিনি শেষ সময়ে পিছাইয়া গিয়াছিলেন। এ-কয়দিন রামচরণবাবু নিজের কাজ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, বড় একটা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত না। হঠাৎ আজ প্রত্যুষেই তিনি সাড়া দিয়া উপরের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সুরমার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

শীতের দিনের এমন প্রভাতে তখন পর্য্যন্ত কেহ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠে নাই, আহ্বান শুনিয়া অচলা শশব্যস্তে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষণেক পরেই সুরেশও আর একটা দরজা খুলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিল। এই সদ্যনিদ্রোত্থিত দম্পতিকে বিভিন্ন কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া এই বৃদ্ধের প্রসন্ন দৃষ্টি যে সহসা বিস্ময়ে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল, তাহা সুরেশ দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু অচলার চক্ষে প্রচ্ছন্ন রহিল না।

রামবাবু সুরেশের দিকে চাহিয়া একটু অনুতাপের সহিত কহিলেন, তাই ত সুরেশবাবু, হাঁকা-হাঁকি ক'রে অসময়ে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম, বড় অন্যায় হয়ে গেল।

সুরেশ হাসিয়া বলিল, অন্যায় কিছুই নয়। তার কারণ আমি জেগেই ছিলুম, বাইরে থেকে ডেকে কেন, ঢাক পিটেও আমার ঘরের শান্তিভঙ্গ করিতে পারতেন না। কিন্তু এত ভোরেই যে?

বৃদ্ধ অচলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আজ আমার সুরমা মায়ের ওপর একটু উপদ্রব করবার আবশ্যক হয়ে পড়েছে, বলিয়া একবার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন, আমার পাল্কী প্রস্তুত, এখুনি বার হতে হবে, বোধ করি দুটো-তিনটের আগে আর ফিরতে পারবো না, এই বুড়োটার জন্যে আজ চারটি ডাল-ভাত ফুটিয়ে রেখো মা, অত বেলায় এসে যেন না আর আগুনে-তাতে যেতে হয়।

এই পরম নিষ্ঠাবান্ নিরামিষাহারী ব্রাহ্মণ স্ত্রী এবং পুত্রবধূ ভিন্ন আর কাহারও হাতে কখনও আহার করেন না। তাঁহার রান্নাঘরটিও একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এমন কি সকলের সে-ঘরে যাওয়ার পর্যন্ত অধিকার ছিল না; এবং স্বপাক আহার তাঁহার মাঝে মাঝে অভ্যাস ছিল বলিয়াই মেয়েরা বাড়ি ছাড়িয়া দেশে যাইতে পারিয়াছিল। এ-কয়দিন তাঁহার সেই ব্যবস্থাই চলিয়াছিল, কিন্তু আজ অকস্মাৎ এই অজ্ঞাত অপরিচিত মেয়েটির উপর ভার দেওয়ার প্রস্তাবে সে বিস্ময়ে এবং সকলের চেয়ে বেশি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

রামবাবু সেই ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহিলেন, তুমি ভাবছ মা, এ বুড়ো আজ বলে কি! রান্না-খাওয়া নিয়ে যার এত বাচ-বিচার, অত হাঙ্গামা, তার আজ হ'লো কি? তা হোক! রাক্ষুসীর হাতে খেতে যখন আপত্তি হয় না, তখন তুমিই বা দুটো ডাল-ভাত ফুটিয়ে দিলে অপ্রবৃত্তি হবে কেন? আর হোক—ভাল, না হোক ভাল, মা, অতখানি বেলায় ফিরে এসে হাঁড়ি ঠেলতে যেতে পারব না। বলিয়া অচলার নিরুত্তর মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া পুনশ্চ সহাস্যে কহিলেন, তুমি নিশ্চয় মনে মনে ভাবচ, এ বুড়োটার মধ্যে হঠাৎ যদি এত বড় ঔদার্য্যই জন্মে থাকে—তবে আমাকে কষ্ট না দিয়ে হিন্দুস্থানী বামুনঠাকুরের হাতে খেলেই ত হ'তো। না গো মা, তা হ'তো না। আজও এ বুড়োর তেমনি গোঁড়ামি, তেমনি কুসংস্কার আছে—মরে গেলেও ঐ সন্ধ্যা-গায়ত্রীহীন হিন্দুস্থানী 'মহারাজে'র অন্ন আমার গলা দিয়ে গলবে না। আর আমার রাক্ষুসী মাকে আর তোমাকে যে এরই মধ্যে একবারে এক করে নিতে পেরেচি, সেও সত্যি নয়, কিন্তু যতই দেখচি, আমার ততই মনে হচ্চে, এই মা-জননীটিও যদি একদিন রেঁধে দেন, সে যে আমার অন্নপূর্ণার অন্ন হবে না, এ আমি কোনমতেই মানব না। কিন্তু আর ত দেরি করতে পারি নে মা, বাকী যেটুকু বলবার রইল সেটুকু খেতে খেতেই বলব। আর সেই বলাই তখন সবচেয়ে সত্যিকার বলা হবে। বলিয়া বৃদ্ধ চলিবার উপক্রম করিতেই অচলা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কি বলিবে, তাহা স্থির করিতে না করিতে যে কথাটা সকলের পূর্ব্বে মুখে আসিয়া পড়িল, তাহাই বলিয়া ফেলিল, কহিল, কিন্তু আমি ত ভাল রাঁধতে জানিনে। আমার রান্না আপনার ত পছন্দ হবে না।

বৃদ্ধ রামবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিলেন! বলিলেন, এই কথাটা আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বল মা?

অচলা কহিল, সকলেই কি রাঁধতে জানে?

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, সকলেই জানে, তাই কি আমি বলচি?

অচলা এ-কথার হঠাৎ কোন প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিল; কিন্তু সুরেশের পক্ষে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। অচলার বিবর্ণ মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া সে তাহার বেদনা বুঝিল। এই বৃদ্ধের সংস্কার, তাঁহার হিন্দু আচার ভাল হোক, মন্দ হোক, সত্য হোক, মিথ্যা হোক,

তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়ানোর মধ্যে যে কদর্য্য প্রতারণা লুক্কায়িত রহিয়াছে, সে কথা যে অচলার অগোচর নাই এবং এই ভদ্র-নারীর হৃদয়ের বিবেক যে কিছুতেই এই গোপন করার গভীর দুষ্কৃতি হইতে আপনাকে অব্যাহতি দিতেছে না, ইহা তাহার শ্রীহীন পাণ্ডুর মুখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সে আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মুখ-হাত ধোয়ার আছিলায় দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

তা হলে আমি চললুম, বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে রামচরণবাবুও সুরেশের অনুসরণ করিলেন। মুহূর্ত্তকালমাত্র অচলা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পরেই নিজেকে জোর করিয়া সচেতন করিয়া ডাকিল, একবার শুনুন—

বৃদ্ধ ফিরিয়া দেখিলেন, সুরমা কি যেন বলিতে চাহিয়াও নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। তখন কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন, আর একটা কথা তোমাকে জানাবার আছে মা। তোমার সঙ্কোচ যখন কোনমতেই কাটতে চাইচে না, তখন—কি জান সুরমা, ছেলেবেলায় আমি ছিলাম পাড়ার মেজদা। তোমার বাপের চেয়ে হয়ত বয়সে ছোটও হব না। তা হলে আমাকে কেন মেজ-জ্যাঠামশাই বলে ডেকো না মা!

এই বৃদ্ধ যে তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, অচলা তাহা জানিত। ভালবাসার এই প্রকাশ্যতায় তাহার চোখের কোণে যেন জল আসিয়া পড়িল। তাই সে শুধু নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করিলেন, আর কিছু কি বলবে?

অচলা তেমনি নীরবে ক্ষণকাল মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া এইবার বোধ হয় নিজের সমস্ত শক্তিই এক করিয়া শুধু অস্ফুটে বলিল, কিন্তু আমার বাবা ব্রাহ্ম ছিলেন।

রামচরণবাবু হঠাৎ চমকিয়া গেলেন। কহিলেন, সত্যিকারের, না পাঁচজন কলকাতায় এসে দু'দিন সখ করে যেমন হয়, তেমনি? তারা ব্রাহ্মদের দলে বসে হিঁদুদের কোসে গালাগালি দেয়—তেমন গাল সত্যিকারের ব্রাহ্মরা কখনো মুখে আনতেও পারে না—তার পরে ঘরে ফিরে সমাজে দাঁড়িয়ে সেই ব্রাহ্মদের নাম করে আবার এমনি গালিগালাজ করে যে, তেমন মধুর বচন হিঁদুদের চৌদ্দপুরুষও কখনো উচ্চারণ করতে পারে না। বলি, তেমনি নয় ত মা? তা হয় ত আমার এতটুকু আপত্তি নেই।

অচলার চোখ-মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, সে কেবলমাত্র কহিল, না তিনি সত্যিকার ব্রাহ্ম।

উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ একটু যেন দমিয়া গেলেন। কিন্তু একটু পরেই প্রফুল্লমুখে বলিলেন, তা হলেনই বা বাবা ব্রাহ্ম, মেয়ে ত আর তাঁর খাতক নয় যে, এখন ভয়

করতে হবে। বরঞ্চ, যাঁর সঙ্গে তুমি ধর্ম্ম ভাগ করে নিয়েচ মা, তিনি যখন হিন্দু, তাঁর গলায় যখন যজ্ঞোপবীত শোভা পাচ্চে, তিনি যখন ওই সুতো ক'গাছার এখনো অপমান করেন নি, তখন বাপের কর্ম্ম ত তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। হাসিয়া বলিলেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে, এখন যাই। কিন্তু তুমি যত ফন্দিই কর না, সুরমা, বুড়ো জ্যাঠামশাইকে আজ আর ফাঁকি দিতে পারচ না। আজ তোমাকে রেঁধে ভাত দিতেই হবে। তাই বাপের শিক্ষার গুণে সেদিন উপোস করতে চাওনি বটে। আজ তার সুদ-সুদ্ধ উসুল করে তবে ছাড়বো। এই বলিয়া তিনি পুনরায় চলিয়া যান দেখিয়া অচলা এতক্ষণ পরে তাহার অভিভূত ভাবটাকে এক নিমিষে অতিক্রম করিয়া গেল। সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, আচ্ছা জ্যাঠামশাই, আমি ব্রাহ্ম-মহিলা হলে আপনি আমার হাতে খাবেন না ?

বৃদ্ধ বলিলেন, না। কিন্তু সে ত তুমি নও। সে ত তুমি হতে পার না।

অচলা প্রশ্ন করিল, কিন্তু তাও যদি হ'তো, তা হ'লে কি শুধু আমার ধর্ম্মমতটা আলাদা ব'লেই আমি আপনার কাছে অস্পৃশ্য হয়ে যেতুম ?

বৃদ্ধ বলিলেন, অস্পৃশ্য হবে কেন মা, অস্পৃশ্য নয়। কিন্তু তোমার হাতে খেতে পারতাম না।

এ-সম্বন্ধে আজ তাহার অনেক কথাই জানা প্রয়োজন। তাই সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না ; কহিল, কেন পারতেন না, সে কি ঘৃণায় ?

বৃদ্ধ সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল একদৃষ্টে মেয়েটির মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

অচলা সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়াছিল, বলিল, জ্যাঠামশাই, আপনার মায়া-দয়া যে কত বড়, তার অনেক সাক্ষী এ-পৃথিবীতে আছে জানি, কিন্তু আমাদের চেয়ে বড় সাক্ষী আর কেউ নেই। তবে আপনার মত মানুষের মন যে কেমন করে এত অনুদার হতে পারে, তাই আমি ভেবে পাইনে। আপনি কি করে মানুষকে এমন ঘৃণা করতে পারেন ?

বৃদ্ধ অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আমি ঘৃণা করি ? কাকে মা ? কখন মা ?

অচলা বলিল, যার হাতের ছোঁয়া আপনার অস্পৃশ্য, সেই আপনার ঘৃণার পাত্র—তাকেই আপনি মনে মনে ঘৃণা করেন। আর ঘৃণা যে করেন, তাও দীর্ঘদিনের অভ্যাসে ভুলে গেছেন। আমাদের ওই হিন্দুস্থানী চাকরটার কথা ছেড়ে দিন, পাচকটার হাতের রান্নাও যে কোনমতেই আপনার গলা দিয়ে গলবে না সেও আপনি নিজের মুখেই প্রকাশ করেচেন। এতে দেশের কত ক্ষতি, কত অবনতি হয়েচে সে ত—

বৃদ্ধ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, অচলার উত্তেজনাও লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাহার কথা হঠাৎ শেষ হইলে একটু হাসিয়া বলিলেন, মা, ঘৃণা আমরা কোন মানুষকেই করিনে। যে নালিশ তুমি করলে, যে নালিশ সাহেবেরা করে—তাদের কাছে তোমার বাবার শেখা—আর তাঁর কাছে তুমি শিখেচ। নইলে মানুষ যে ভগবান, এ জ্ঞান কেবল তাদের নয়, আমাদেরও ছিল, আজও আছে।

এই সময় নীচে হইতে একটা অস্পষ্ট কোলাহল শুনা যাইতেছিল, বৃদ্ধ সেদিকে একমুহূর্ত্ত কান পাতিয়া কহিলেন, সুরমা, খাওয়া জিনিসটা যাদের মধ্যে মস্ত বড় জিনিস, মস্ত ঘটা-পটার ব্যাপার, তাদের সঙ্গে আমাদের মিল হবে না। আমাদের ভাতে-ভাত খাওয়াটা তুচ্ছ বস্তু, সেটুকুর আজ একটু যোগাড় করে রেখো—মুখে দিতে দিতে তখন আলোচনা করা যাবে, ঘৃণাটা আমরা কাকে কত করি এবং দেশের অবনতি তাতে কতখানি হচ্চে—কিন্তু গোলমাল বাড়চে—আর নয় মা, আমি চললুম। বলিয়া তিনি দ্রুতবেগে নামিয়া গেলেন।

৩৪

প্রায় অপরাহ্ণবেলায় ভোজন সমাধা করিয়া রামবাবু তৃপ্তি ও প্রাচুর্য্যের একটা সশব্দ উদ্গার ছাড়িয়া যখন গাত্রোত্থান করিতে গেলেন, তখন অচলা অনেক কষ্টে একটুখানি হসিয়া বলিল, কিন্তু জ্যাঠামশাই, যেদিন জানতে পারবেন, আজ আপনার জাত গেছে, সেদিন কিন্তু রাগ করতে পারবেন না, তা বলে দিচ্চি।

বৃদ্ধ সস্নেহে মৃদু-হাস্যে ঘাড়টা একটু নাড়িয়া কহিলেন, আচ্ছা মা, তাই হবে, বলিয়া আচমন করিয়া বহির্ব্বাটিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার খড়মের খট্ খট্ শব্দ যতক্ষণ পর্য্যন্ত শোনা গেল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অচলা সমস্ত দৃষ্টি দিয়া যেন ওই আওয়াজটাকেই অনুসরণ করিতে লাগিল, তার পর কখন যে সে শব্দ মিলাইল, কখন সে বাহিরের সংসার তাহার চেতনা হইতে বিলুপ্ত হইয়া তাহাকে পাথর করিয়া দিল, সে টের পাইল না।

অনেকদিনের হিন্দুস্থানী দাসীটি বাঙলা কথার সঙ্গে বাঙালীর আচার-ব্যবহার কায়দা-কানুনও কতকটা আয়ত্ত করিয়াছিল, সে কি একটা কাজে এদিকে আসিয়া বহু-যার বসিয়া থাকার ভঙ্গী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল; এবং বয়োজ্যেষ্ঠের অধিকারে তাহার শেখা বাঙলার তর্জ্জন-শব্দে বেলার দিকে অচলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ খাওয়া-দাওয়ার কোন প্রয়োজন আছে, না এমনভাবে চুপ-চাপ বসিয়া থাকিলেই চলিবে?

অচলা চমকিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল, বেলা আর নাই, শীতের সন্ধ্যা সমাগত-প্রায়। একটা দীপ্তিহীন নিষ্প্রভতা শান্তির মত আকাশের সর্ব্বাঙ্গে ভরিয়া আসিয়াছে, লজ্জা পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাসিয়া কহিল, আমি যে একেবারে সন্ধ্যার পরেই খাব বলে ঠিক করেছি লালুর মা। আজ ক্ষিধে-তেষ্টা এতটুকু নেই।

লালুর মা বিস্মিত হইয়া কহিল, বড়বাবুর খাওয়া হয়ে গেলেই তুমি খাবে, একটু আগেই যে বললে বহু-মা?

নাঃ—একেবারে রাত্রিতেই খাবো, বলিয়া আর বেশি বাদানুবাদের অবসর না দিয়াই অচলা ত্বরিতপদে উপরে চলিয়া গেল!

একটু সময় পাইলেই সে উপরের বারান্দায় রেলিঙের পার্শ্বে চৌকি টানিয়া লইয়া নদীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিত। আজিকার রাত্রেও সেইরূপ বসিয়া-ছিল, হঠাৎ রামবাবুর চটিজুতার শব্দ পাইয়া অচলা ফিরিয়া দেখিল, বৃদ্ধ একেবারে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি হাতের হুঁকাটা এককোণে ঠেস দিয়া রাখিয়া আর একখানা চেয়ার কাছে টানিয়া লইয়া বসিলেন। ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সেই কথাটার একটা মীমাংসা করতে এলাম সুরমা, তোমার ব্রহ্মজ্ঞানী বাবাটি ঠিক, না এই বুড়ো জ্যাঠামশায়ের কথাটি ঠিক, তর্কটার যাই হোক একটা নিষ্পত্তি না ক'রে আজ আর নীচে যাচ্চিনে।

অচলা বুঝিল, এ সেই জাতিভেদের প্রশ্ন, শ্রান্তস্বরে বলিল, আমি তর্কের কি জানি জ্যাঠামশাই।

রামবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ওরে বাস্ রে, তুমি কি সোজা লোকের বেটি না কি মা! তবে কথাটা না কি একেবারে মিথ্যে, তাই যা রক্ষে, নইলে ও-বেলায় ত হেরে গিয়েছিলাম আর কি!

অচলার কোন বিষয় লইয়াই আলোচনা করিবার মত মনের অবস্থা নয়; সে এই তর্কযুদ্ধ হইতে আত্মরক্ষার একটুখানি ফাঁক দেখিতে পাইয়া কহিল, তা হ'লে আর তর্ক কি জ্যাঠামশাই! আপনারই ত জিৎ হয়েছে! একটুকু থামিয়া বলিল, যে হেরে গেছে, তাকে আবার দু'বার করে হারিয়ে লাভ কি আপনার?

রামবাবু তৎক্ষণাৎ কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। তাঁহার বয়স অনেক হইয়াছে, সংসারে তিনি অনেক জিনিস দেখিয়াছেন; সুতরাং, এই অবসন্ন কণ্ঠস্বরও যেমন তাঁহার অগোচর রহিল না, এই মেয়েটি যে সুখে নাই, ইহার মনের মধ্যে কি এই একটা ভয়ানক বেদনা পাজার আগুনের মত অহর্নিশ জ্বলিতেছে, ইহাও তেমনি যে শ্রান্ত-পাণ্ডুর মুখের উপরে আর একবার স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া হঠাৎ একটা হাসিবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত স্নেহের সহিত বলিলেন, নাঃ—ছুতো খাটল না মা! বুড়ো-মানুষ, বকতে ভালবাসি—সন্ধ্যাবেলায় একলাটি প্রাণটা

হাঁপিয়ে ওঠে ; তাই ভাবলাম মিথ্যে-টিথ্যে বলে মাকে একটু রাগিয়ে দিয়ে দুটো গল্প করি গে, কিন্তু ছল ধরা পড়ে গেল। বলিয়া তিনি ঝুঁকিয়া পড়িয়া হুঁকাটার জন্য একবার হাতটা বাড়াইয়া দিলেন।

তিনি যে যাইবার জন্য এটি সংগ্রহ করিতেছেন অচলা তাহা বুঝিল এবং নীচে গিয়া একাকী এই বৃদ্ধের যে অনেক দুঃখেই সময় কাটিবে, তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। তাই সে চকিতের ন্যায় চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া নিজেই তাহা তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধের প্রসারিত হস্তে দিতে দিতে বলিল, আপনি যত খুশি তামাক খেতে চান, এইখানে ব'সে খান, কিন্তু এখন উঠে যেতে আপনাকে আমি কিছুতে দেব না।

বৃদ্ধ হুঁকা হাতে লইয়া হাসিয়া বলিলেন, ওরে বাপ্ রে, একদম অতখানি রাশ ঢিলে দিও না মা, আখের সমলাতে পারবে না। আমার মুখ-বুজে তামাক খাওয়া যে কি ব্যাপার, তা ত দেখনি ! তার চেয়ে বরঞ্চ একটু-আধটু বলতে দাও যে—

মানুষের দম আটকে না যেতে পায়, না জ্যাঠামশাই ? আচ্ছা, তাই ভাল। কিন্তু কি নিয়ে বকুনি শুরু করবেন বলুন ত ?

রামবাবু মুখ হইতে একগাল ধুঁয়া উপরের দিকে মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন, তবেই মুস্কিলে ফেললে মা। মহা-বক্তার লোককেও এ-প্রশ্ন করলে তার মুখ বন্ধ হয়ে আসে যে !

আচ্ছা জ্যাঠামশায়, কোনদিন যদি জানতে পারেন, জোর ক'রে যার হাতে আজ ভাত খেয়েচেন, তার চেয়ে নীচ, তার চেয়ে ঘৃণিত পৃথিবীতে আর কেউ নেই, তখন কি করবেন ? প্রায়শ্চিত্ত ? আর শাস্ত্রে যদি তার বিধি পর্য্যন্ত না থাকে, তা হ'লে ?

বৃদ্ধ বলিলেন, তা হ'লে ত ল্যাঠা চুকেই গেল মা, প্রায়শ্চিত্ত আর করতে হবে না।

কিন্তু আমার উপর তখন কি-রকম ঘৃণাই না আপনার হবে !

কখন মা ?

যখন টের পাবেন, আমার একটা জাত পর্য্যন্ত নেই।

রামবাবু হুঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া সেই অস্পষ্ট আলোকেই ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমাদের এই কথাটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনে মা। আর 'তোমাদের' বলি কেন, জানো সুরমা, আমার নিজের ছেলের মুখ থেকেও এ নালিশ শুনেচি। সে ত স্পষ্টই বলে, এই খাওয়া-ছোঁয়া বাচ-বিচার থেকেই সমস্ত দেশটা ক্রমাগত সর্ব্বনাশের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। কারণ, এর মূলে আছে ঘৃণা, এবং ঘৃণার ভিতর দিয়ে কোনদিন কোন বড় ফল পাওয়া যায় না।

অচলা মনে মনে অতিশয় বিস্মিত হইল। এ বাড়িতেও যে এ-সকল আলোচনা কোন অবকাশ দিয়া পথ পাইতে পারে, এ তাহার ধারণাই ছিল না। কহিল, কথাটা কি তবে মিথ্যে?

রামবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, মিথ্যে কি না, সে জবাব নাই দিলাম মা; কিন্তু সত্যি নয়। শাস্ত্রের বিধিনিয়ম মেনে চলি, এইমাত্র। যারা আরও একটু বেশি যায়—এই যেমন আমার গুরুদেব, তিনি নিজে রেঁধে খান, মেয়েকে পর্য্যন্ত হাত দিতে দেন না। তাই থেকে কি এই স্থির করা যায়, তিনি তাঁর একমাত্র সন্তানকে ঘৃণা করেন।

অচলা জবাব দিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিল।

বৃদ্ধ হুঁকাটায় আর গোটা-কতক টান দিয়া বলিলেন, মা, যৌবনে আমি অনেক দেশ ঘুরে বেড়িয়েচি। কত-বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, আর কতরকমের লোক, কতরকমের আচার-ব্যবহার, সে-সব নাম হয়ত তোমরা জান না—কোথাও খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার আছে, কোথাও বা তার আভাস পর্য্যন্ত শোনেনি, তবু ত মা, তারা চিরদিন তেমনি অসভ্য, তেমনি ছোট, বলিয়া দগ্ধ হুঁকাটায় পুনরায় গোটা-দুই নিষ্ফল টান দিয়া বৃদ্ধ শেষবারের মত সেটাকে থামের কোণে ঠেস্ দিয়া রাখিলেন। অচলা যেমন নিঃশব্দে বসিয়া ছিল, তেমনি নীরবেই বসিয়া রহিল।

রামবাবু নিজেও খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, আসল কথা জান সুরমা, তোমরা সাহেবদের কাছে পাঠ নিয়েচ। তারা উন্নত, তারা রাজা, তারা ধনী। তাদের মধ্যে যদি পা উঁচু করে হাতে চলার ব্যবস্থা থাকত, তোমরা বলতে, ঠিক অমনি করে চলতে না শিখলে আর উন্নতির কোন আশা-ভরসাই নেই।

এই সকল তর্ক-যুক্তি অচলা বাংলা দৈনিক কাগজে অনেক পড়িয়াছে, তাই কোন কথা না বলিয়া শুধু একটু হাসিল। হাসিটুকু বৃদ্ধ দেখিলেন, কিন্তু যেন দেখিতে পান নাই, এইভাবে নিজের পুনরাবৃত্তিস্বরূপ কহিতে লাগিলেন, শ্রীধাম শ্রীক্ষেত্রে যখন যাই, তখন জানা-অজানা কত লোকের মধ্যে গিয়েই না পড়ি। ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার সেখানে নেই, করবার কথাও কখনো মনে হয় না; কিন্তু ঘৃণার মধ্যে এর জন্ম হলে কি এত সহজে সে কাজ পেরে উঠতাম! এই ত আমি কারও হাতেই প্রায় খাইনে, কিন্তু পথের অতিবড় দীন-দুঃখীকেও যে কখনো মনে মনে ঘৃণা করেচি—

অচলা ব্যগ্র ব্যাকুল-কণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, আমি কি আপনাকে জানিনে জ্যাঠামশাই? এত দয়া সংসারে আর কার আছে?

দয়া নয় মা, দয়া নয়,—ভালবাসা। তাদেরই আমি যেন বেশী ভালবাসি; কিন্তু আসল কথা কি জানো মা, একটা জাতই বা কি, আর একটা মানুষই বা কি, ধীরে ধীরে সে যখন হীন হয়ে যায়, তখন সবচেয়ে তুচ্ছ জিনিসটার ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা লাভ করে। মনে করে, এই সহজ বাধাটুকু সামলে নিলেই সে রাতারাতি বড় হয়ে উঠবে। আমাদেরও ঠিক সেই ভাব। কিন্তু যেটা কঠিন, যেটা মূল শিকড়—

কথাটা আর শেষ করিবার সময় পাইলেন না। সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইতেই সুরেশকে দেখিতে পাইয়া একেবারেই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, আচ্ছা সুরেশবাবু, আপনি ত হিন্দু, আপনি ত আমাদের জাতিভেদ মানেন?

সুরেশ থতমত খাইয়া গেল—এ আবার কি প্রশ্ন? যে চোরাবালির উপর দিয়া তাহারা পথ চলিয়াছে, তাহাকে প্রতি হাত যাচাই না করিয়া হঠাৎ পা বাড়াইলে যে কোন্ অতলের মধ্যে তলাইয়া যাইবে, তাহার ত স্থিরতা নাই। এখানে সত্যটাই সত্য কিনা সাবধানে হিসাব করিতে হয়। তাই সে ভয়ে ভয়ে কাছে আসিয়া একবার অচলার প্রতি চাহিয়া তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখ দেখিতে পাইল না। তখন শুষ্ক একটু হাসিয়া দ্বিধা-জড়িত স্বরে কহিল, আমরা কি; সে ত আপনি বেশ জানেন রামবাবু।

রামবাবু কহিলেন, বেশ জানি বলেই ত জানতাম। কিন্তু আপনার গৃহিণীটি যে একেবারে আগাগোড়া ওলট-পালট করে দিতে চাচ্ছেন। বলচেন, জাতি-ভেদের মত এত বড় অন্যায়, এত বড় সর্ব্বনাশকে তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে পারেন না, ম্লেচ্ছের অন্ন আহার করিতেও তাঁর আপত্তি নেই এবং এ-শিক্ষা জন্মকাল থেকে তাঁর ব্রাহ্ম বাবার কাছেই পেয়েচেন। ওঁর হাতে খেয়ে আজ আমার জাত গেছে কি না এবং একটা প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন কি না, এতক্ষণ সেই কথাই হচ্ছিল। আপনি কি বলেন?

সুরেশ নির্ব্বাক্। অচলার মেজাজ তাহার অবিদিতও নয় এবং সেখানে বিদ্রোহের অগ্নি যে অহরহ জ্বলিয়াই আছে, এ-খবরও তাহার নূতন নয়! কিন্তু সেই আগুন আজ অকস্মাৎ যে কিজন্য এবং কোথা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, ইহাই অনুমান করিতে না পারিয়া সে আশঙ্কায় ও উদ্বেগে শুষ্ক হইয়া উঠিল; কিন্তু ক্ষণেক পরেই আত্মসংবরণ করিয়া পূর্ব্বের মত আবার একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবার চেষ্টাটা শুধু হাসিকে আচ্ছন্ন করিয়া মুখখানাকে বিকৃত করিল মাত্র।

সুরেশ বলিল, উনি আপনাকে তামাসা করচেন।

রামবাবু গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, উচিত না হলেও এ-কথা ভাবতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু স্বামীর কল্যাণেও যখন হিন্দু-ঘরের মেয়ে তাঁর কর্ত্তব্য

পালন করতে চাইলেন না—তুলসী দেওয়ার দিনটাতেও কিছুতে উপবাস করলেন না—ভাল, এ যদি তামাসা হয় ত কিছু কঠিন তামাসা বটে! আচ্ছা সুরেশবাবু, বিবাহ ত আপনার হিন্দু-মতেই হয়েছিল?

সুরেশ কহিল, হ্যাঁ।

বৃদ্ধ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, তা আমি জানি। অচলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, যদিচ তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে মা, কিন্তু তোমার বাবার ব্রাহ্ম হওয়ায় আর কোন দুঃখ নাই! এমন ব্রাহ্ম আমি অনেক জানি, যারা সমাজে গিয়েও চোখ বোজেন, অল্প-স্বল্প অনাচারও করেন; কিন্তু মেয়ের বিয়ের বেলা আর হিসেবে গোল করেন না। যাক্, আমার একটা ভাবনা দূর হ'ল।

কিন্তু তাঁহার অপেক্ষাও অনেক বেশি ভাবনা দূর হইয়া গেল সুরেশের। সে তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি ঠিক বলেছেন রামবাবু, আজকাল এই দলের লোকই বেশি। তাঁরা—

হঠাৎ উভয়েই চমকিয়া উঠিল। কথার মাঝখানেই অচলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ঠিক যেন গর্জন করিয়া উঠিল। সে সুরেশের মুখের উপর দুই চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, এত অপরাধের পরেও তোমার অপরাধ বাড়াতে লজ্জা হয় না? আবার তা আমারই মুখের উপরে? তুমি জানো, এ সব মিথ্যে? তুমি জানো বাবা ঠক নন, তিনি মনে-জ্ঞানে যথার্থ-ই ব্রাহ্ম-সমাজের। তুমি জানো, তিনি—, বলিতে বলিতেই সে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুরেশ প্রথমটা থতমত খাইল, কিন্তু ঘাড় ফিরাইয়া বৃদ্ধের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের প্রতি চাহিয়া অকস্মাৎ সেও যেন জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, মিছে কথা কিসের? তোমার বাবা কি হিন্দু-ঘরে তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি ছিলেন না? তুমিও সত্যি কথা বলো।

অচলা আর প্রত্যুত্তর দিল না। বোধ হয় মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দে থাকিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, সে-কথা আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? তার হেতু কি সংসারে সকলের চেয়ে বেশী তুমি নিজেই জানো না? তুমি ঠিক জানো, আমি কি, আমার বাবা কি, এই নিয়ে তোমার সঙ্গে বচসা করতে আমার শুধু যে প্রবৃত্তি হয় না তাই নয়, আমার লজ্জা করে। তোমার যা ইচ্ছে হয় ওঁকে বানিয়ে বল, কিন্তু আমি শুনতে চাইনে। বল—আমি চললুম। বলিয়া সে একরকম দ্রুতপদেই পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণের নিমিত্ত উভয়েই যেন নিশ্চল পাথরের মত হইয়া গেল।

বৃদ্ধ বোধ করি নিতান্তই মনের ভুলে একবার তাঁর হুঁকাটার জন্য হাত

বাড়াইলেন, কিন্তু তখনই হাতটা টানিয়া লইয়া একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া, একবার কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, আজকাল শরীরটা কেমন আছে সুরেশবাবু।

সুরেশ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, চকিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, বেশ আছে, বলিয়াই বোধ হয় কথাটা স্মরণ হইল, কহিল, বুকে এইখানটায় একটুখানি ব্যথা—কি জানি কাল থেকে আবার বাড়লো না—

রামবাবু বলিলেন, তবেই দেখুন দেখি সুরেশবাবু, এ ঠাণ্ডায় এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি আপনার বাইরে ঘুরে বেড়ান ভাল ?

ঠিক ঘুরে বেড়াইনে রামবাবু। সেই বাড়িটার জন্যে আজ দু'হাজার টাকা বায়না দিয়ে এলুম!

রামবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া শেষে বলিলেন, নদীর উপর বাড়িটি ভালই, কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করতেন, আমি হয়ত নিষেধ করতাম। সেদিন কথায় কথায় যেন বুঝেছিলাম, সুরমার এখানে বাস্ করার একান্ত অনিচ্ছা। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁর মত নিয়েচেন, না কেবল নিজের ইচ্ছেতেই কিনে বসলেন ?

সুরেশ এ-প্রশ্নের জবাব না দিয়া শুধু কহিল, অনিচ্ছার বিশেষ কোন হেতু দেখিনে। তা ছাড়া, বাস করবার মত কিছু কিছু আসবাবপত্রও কলকাতা থেকে আনতে দিয়েছি, খুব সম্ভব কাল-পরশুর মধ্যে এসে পড়বে।

রামবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সহসা কি ভাবিয়া ডাক দিয়া উঠিলেন, সুরমা!

অচলা সাড়া দিল না, কিন্তু ঘরের ভিতর হইতে নীরবে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে তাহার চৌকিতে আসিয়া বসিল।

বৃদ্ধ স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, মা, তোমার স্বামী যে আমাদের দেশে মস্ত বড় বাড়ি কিনে ফেললেন। এই বুড়ো জ্যাঠামশাইকে আর ত ফেলে চলে যেতে তুমি পারবে না মা।

অচলা চুপ করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ পুনশ্চ কহিলেন, শুধু বাড়ি আর আসবাবপত্র নয়, আমি জানি গাড়ি-ঘোড়াও আসচে। আর তার চেয়েও বেশি জানি, সমস্তই কেবল তোমারি জন্যে। বলিয়া তিনি সহাস্যে একবার সুরেশ ও একবার অচলার মুখের প্রতি চাহিলেন। কিন্তু সেই গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ হইতে আনন্দের এতটুকু চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। এই অস্পষ্ট আলোকে হয়ত ইহা অপরের ঠিক লক্ষ্য না পাইতে পারিত, কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি বৃদ্ধের চোখে তাহা এড়াইল না। তথাপি তিনি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু মা, তোমার মতটা—

অচলা এইবার কথা কহিল, বলিল, আমার মতের ত আবশ্যক নেই জ্যাঠামশাই।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন; সে কি একটা কথা মা! তুমিই ত সব, তোমার ইচ্ছাতেই ত—

অচলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না জ্যাঠামশাই, না, আমার ইচ্ছায় কিছুই আসে-যায় না। আপনি সব কথা বুঝবেন না, আপনাকে বোঝাতেও আমি পারব না—কিন্তু আর আমাকে দরকার না থাকে ত আমি যাই—

বৃদ্ধের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না এবং তাহার আবশ্যকও হইল না; সহসা হিন্দুস্থানী দাসী একটা কড়ায় এক কড়া আগুন লইয়া উপস্থিত হইবামাত্র সকলের দৃষ্টি তাহারই উপর গিয়া পড়িল। রামবাবু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন; সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আমি বেয়ারাটাকে আনতে হুকুম দিয়েছিলুম, সে আবার আর একজনকে হুকুম দিয়েছে দেখচি। আমার এই ব্যথাটার একটু—

অগ্নির প্রয়োজনের আর বিশদ ব্যাখ্যা করিতে হইল না, কিন্তু তাহার জন্য ত আর একজন চাই। রামবাবু অচলার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সে নিমিষে মুখ ফিরাইয়া লইয়া শান্ত-কণ্ঠে বলিল, আমার ভারি ঘুম পেয়েচে জ্যাঠামশাই, আমি চললুম। বলিয়া উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই তাহার কপাট রুদ্ধ হওয়ার শব্দ আসিয়া পৌঁছিল।

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চৌকি ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন, এবং দাসীর হাত হইতে আগুনের মালসাটা নিজের হাতে লইয়া বলিলেন, তা হলে চলুন সুরেশবাবু—

আপনি?

হাঁ, আমিই। এ নতুন নয়, এ-কাজ এ-জীবনে অনেক হয়ে গেছে; বলিয়া একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে তাহার ঘরে টানিয়া লইয়া গেলেন এবং মালসাটা ঘরের মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া তাহার শুষ্ক ম্লান মুখের প্রতি ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া আর্দ্র-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, না সুরেশবাবু, না, এ কোনমতেই চলতে পারে না—কোনমতেই না। আমি নিশ্চয় জানচি, কি একটা হয়েচে—আমি একবার আপনার—; কিন্তু থাক্ সে-কথা—যদি প্রয়োজন হয় ত এ বুড়ো আর একবার—, বলিয়া তিনি সহসা নীরব হইলেন।

সুরেশ একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিন্তু ছেলেমানুষের মত প্রথমটা তাহার ওষ্ঠাধর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল, তার পর চোখের জল গোপন করিতে মুখ ফিরাইল।

একটা কোচের উপর সুরেশ চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিল এবং সন্নিকটে একখানা চৌকি টানিয়া বৃদ্ধ রামবাবু তাহার পীড়িত বক্ষে অগ্নির উত্তাপ দিতেছিলেন, এমন সময়ে উভয়ের দ্বার খোলার শব্দে চাহিয়া দেখিলেন, অচলা প্রবেশ করিতেছে। সে বিনা আড়ম্বরে কহিল, রাত অনেক হয়েচে, জ্যাঠামশাই, আপনি শুতে যান।

সেইজন্যেই ত অপেক্ষা করে আছি মা, বলিয়া বৃদ্ধ চট করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, এবং সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এতক্ষণ দু'জনেরই শুধু কেবল বিড়ম্বনা ভোগ হ'ল বৈ ত নয়! এ-সব কাজ কি আমরা পারি? অচলার প্রতি চেয়ারটা ঈষৎ অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, যার কর্ম্ম তাকে সাজে মা, এই নাও, ব'সো—আমি—একটু হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচি। বলিয়া বৃদ্ধ বিপুল শ্রান্তির ভারে মস্ত একটা হাই তুলিয়া গোট-দুই তুড়ি দিয়া হুঁকাটা তুলিয়া লইলেন, এবং ঘরের বাহির হইয়া সাবধানে দরজা বন্ধ করিতে করিতে সহাস্যে কহিলেন, ঢুলতে ঢুলতে যে হাত-পা পুড়িয়ে বসিনি সেই ভাগ্য, কি বলেন সুরেশবাবু?

সুরেশ কোন কথা কহিল না, শুধু নিমীলিত নেত্রের উপর দুই হাত যুক্ত করিয়া একটা নমস্কার করিল।

অচলা নীরবে তাঁহার পরিত্যক্ত আসনটি অধিকার করিয়া বসিল এবং সেক্ দিবার ফ্লানেলটা উত্তপ্ত করিতে করিতে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আবার ব্যথা হ'লো কেন? কোন্‌খানটায় বোধ হচ্চে?

সুরেশ চোখ মেলিল না, উত্তর দিল না, শুধু হাত তুলিয়া বক্ষের বাম দিকটা নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। আবার সমস্ত নিস্তব্ধ। সে এমনি যে, মনে হইতে লাগিল, বুঝিবা এই নির্ব্বাক অভিনয়ের শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত এমনি নীরবেই সমাপ্ত হইবে। কিন্তু সেরূপ ঘটিল না। সহসা অচলার ফ্লানেলশুদ্ধ হাতখানা সুরেশ তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। অচলার মুখের উপর উদ্বেগের কোন চিহ্ন প্রকাশ পাইল না; সে ইহাই যেন প্রত্যাশা করিতেছিল, কেবল কহিল, ছাড়ো, আরও একটু সেক্ দিয়ে দিই।

সুরেশ হাত ছাড়িয়া দিল, কিন্তু চক্ষের পলকে উঠিয়া বসিয়া দুই ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া অচলাকে তাহার আসন হইতে টানিয়া আনিয়া নিজের বুকের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া ফেলিল। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যেমন মনে হইয়াছিল, এই আবেগ-উচ্ছ্বাসহীন নাটকের পরিসমাপ্তি হয়ত এমনি নিস্পন্দ মৌনতার ভিতর দিয়াই ঘটিবে, কিন্তু নিমেষ না গত হইতেই আবার বোধ হইতে লাগিল, এই উন্মত্ত নির্লজ্জতার বুঝি সীমা নাই, শেষ নাই,

সর্ব্বদিক সর্ব্বকাল ব্যাপিয়াই এই মত্ততা চিরদিন বুঝি এমন অনন্ত ও অক্ষয় হইয়া রহিবে—কোনদিন কোন যুগেও ইহার আর বিরাম মিলিবে না, বিচ্ছেদ ঘটিবে না।

অচলা বাধা দিল না, জোর করিল না; মনে হইল, ইহার জন্যও সে প্রস্তুত হইয়াই ছিল, শুধু কেবল তাহার শান্ত মুখখানা একেবারে পাথরের মত শীতল ও কঠোর হইয়া উঠিল। সুরেশের চৈতন্য ছিল না—বোধ হয় সৃষ্টির কঠিনতম তমিস্রায় তাহার দুই চক্ষু একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, না হইলে এ মুখ চুম্বন করার লজ্জা ও অপমান আজ তাহার কাছে ধরা পড়িতেও পারিত। ধরা পড়িল না সত্য, কিন্তু শুদ্ধমাত্র শ্রান্তিতেই বোধ করি এই উন্মাদনা যখন স্থির হইয়া আসিল, তখন অচলা ধীরে ধীরে নিজেকেই মুক্ত করিয়া লইয়া আপনার জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

আরও ক্ষণকাল দু'জনের যখন চুপ করিয়া কাটিল, তখন সুরেশ অকস্মাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, অচলা, এমন ক'রে আর আমাদের কতদিন কাটবে? বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই কহিতে লাগিল, তোমার কষ্ট আমি জানি, কিন্তু আমার দুঃখটাও ভেবে দেখ। আমি যে গেলুম।

এ-প্রশ্নের জবাব না দিয়াই অচলা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এখানে বাড়ি কিনেচ?

সুরেশ বিপুল আগ্রহে বলিয়া উঠিল, সে ত তোমারই জন্য অচলা।

অচলা ইহার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, আসবাবপত্র, গাড়ি-ঘোড়াও কি কিনতে পাঠিয়েচ?

সুরেশ তেমন করিয়াই উত্তর দিল, কিন্তু সমস্তই ত তোমারই জন্যে।

অচলা নীরব হইয়া রহিল। এ-সকলে তাহার কি প্রয়োজন, এ সকল সে চায় কি না, ওই লোকটার কাছে এ প্রশ্ন করার মত নিজের প্রতি বিদ্রূপ আর কি আছে? তাই এ-সম্বন্ধে আর কোন কথা না কহিয়া মৌন হইয়া রহিল। মুহূর্ত্ত কয়েক পরে জিজ্ঞাসা করিল, রামবাবুর কাছে কি তুমি আমার বাবার নাম করেচ। বাড়ি কোথায় বলেচ?

সুরেশ বলিল, না।

আর কি সেক্ দেবার দরকার আছে?

না।

তা হলে এখন আমি চললুম। আমার বড় ঘুম পাচ্চে। বলিয়া অচলা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আগুনের পাত্রটা সরাইয়া রাখিয়া ঘরের বাহির হইয়া কপাট বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেই সুরেশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, আজ আর একটা কথা বলে যাও অচলা। তুমি কি আর কোথাও যেতে চাও? সত্যি বলো?

অচলা কহিল, সে কোথায় ?

সুরেশ বলিল, যেখানে হোক। যেখানে আমাদের কেউ চেনে না, কেউ জানে না—তেমন কোন দেশে। সে দেশ যত—

আগ্রহে আবেশে সুরেশের কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল, অচলা তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু নিজে সে একান্ত স্বাভাবিক ও সরল গলায় আস্তে আস্তে জবাব দিল, এদেশেও ত আমাদের কেউ চিনত না; কেউ জানত না। আজও আমাদের কেউ চেনে না।

সুরেশ উৎসাহ পাইয়া বলিতে গেল, কিন্তু ক্রমশঃ—

অচলা বাধা দিয়া কহিল, ক্রমশঃ জানতে পারবে ? খুব সম্ভব পারবে, কিন্তু সে সম্ভাবনা ত অন্য দেশেও আছে ?

সুরেশ উল্লাসে চঞ্চল হইয়া বলিতে লাগিল, তা হলে এখানেই স্থির। এখানেই তোমার সম্মতি আছে, বল অচলা ? একবার স্পষ্ট করে বলে দাও—, বলিতে বলিতে কিসে যেন তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। কিন্তু ব্যগ্র পদ মেঝের উপর দিয়াই সে সহসা স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া দেখিল, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া অচলা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন হইতে আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হইয়া এক ঝড়-বৃষ্টির সূচনা করিতেছিল। সুরেশের নূতন বাটিতে অপর্য্যাপ্ত আসবাব সাজসরঞ্জাম কলিকাতা হইতে আসিয়া গাদা হইয়া পড়িয়া আছে; তাহাদিগকে সাজাইয়া-গুছাইয়া লইবার দিকে কোন পক্ষেরই কোন গা নাই। একজোড়া বড় ঘোড়া ও একখানা অতিশয় দামী গাড়ি পরশু আসিয়া পর্য্যন্ত কোন্ একটা আস্তাবলে সহিস-কোচম্যানের জিম্মায় রহিয়াছে, কেহই খোঁজ লয় না। দিনগুলা যেমন-তেমন করিয়া কাটিয়া চলিয়াছিল, এমন সময় একদিন দুপুরবেলায় বৃদ্ধ রামবাবু এক হাতে হুঁকা এবং অপর হাতে একখানি নীলরঙের চিঠি লইয়া উপস্থিত হইলেন।

অচলা রেলিঙের পার্শ্বে বেতের সোফার উপর অর্দ্ধশায়িতভাবে পড়িয়া একখানা বাঙলা মাসিকের বিজ্ঞাপন পড়িতেছিল, জ্যাঠামশাইকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। রামবাবু চিঠিখানা অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, এই নাও সুরমা, তোমার রাক্ষসীর পত্র। সে এতদিন তোমাকে লিখতে পারেনি ব'লে আমার চিঠির মধ্যেই যেমন অসংখ্য মাপ চেয়েচে, তেমনি অসংখ্য প্রণামও করেচে। তাকে তুমি মার্জ্জনা কর। বলিয়া তিনি হাসি-মুখে কাগজটুকু তাহার হাতে দিয়া অদূরে একখানি চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন এবং নদীর দিকে চাহিয়া একমনে হুঁকা টানিয়া টানিয়া ধুঁয়ায় অন্ধকার করিয়া তুলিলেন।

অচলা পত্রখানি আদ্যোপান্ত বার-দুই পাঠ করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল, এঁরা সকলেই তা হলে পরশু সকালের গাড়িতেই এসে পড়বেন ? পিসিমা কে জ্যাঠামশাই ? আর তাঁর রাজপুত্র-বধূ, রাজপুত্র, গারজেন টিউটার—

রামবাবু হাসিয়া কহিলেন, রাক্ষুসী বেটী তামাসা করবার একটা সুযোগ পেলে ত আর ছাড়বে না। পিসীমা হলেন আমার বিধবা ছোট ভগিনী আর রাজপুত্র-বধূ হলেন তাঁর মেয়ে,—ভাঁড়ারপুরের ভবানী চৌধুরীর স্ত্রী—তা সে যাই বলুক, রাজা-রাজড়ার ঘরই সে বটে। রাজপুত্র হ'লো তার বছর-দশেকের ছেলে—আর শেষ ব্যক্তিটি যে কি, তা ত চোখে না দেখলে বলতে পারিনে, মা। হবেন কোন বেশি মাইনের চাকর-বাকর। বড়লোকের ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, এটা-ওটা-সেটা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে যুগিয়ে দিয়ে নাবালক-সাবালক উভয় পক্ষের মন রাখেন—এমনি কিছু একটা হবেন বোধ করি। কিন্তু সেজন্যে ত ভাবচিনে সুরমা, আসুন, খান-দান, পশ্চিমের জল হাওয়ায় গলাজ্বালা, বুকজ্বালা, দুদিন স্থগিত হয় ত খুব খুশীই হবো। কিন্তু চিন্তা এই যে, বাড়িটি ত আমার ছোট; রাজা-রাজড়ার কথা ভেবে তৈরীও করিনি, ঘর-দোরের বন্দোবস্তও তার উপযোগী নয়। সঙ্গে দাস-দাসীও আসবে হয়ত প্রয়োজনের তিনগুণ বেশি। আমি তাই মনে করচি, তোমার বাড়িটাকে যদি—

অচলা ব্যগ্র হইয়া বলিল, কিন্তু তার ত আর সময় নেই জ্যাঠামশাই, তা ছাড়া একলা অত দূরে থাকা কি তাঁদের সুবিধে হবে।

রামবাবু কহিলেন, সময় আছে, যদি এখন থেকেই লাগা যায়। আর জায়গা প্রস্তুত থাকলে কোথায় কার সুবিধে হবে, সে মীমাংসা সহজেই হতে পারবে। সুরেশবাবু ত শোনা-মাত্রই টম্ টম্ ভাড়া করে চলে গেছেন—তোমার গাড়িও তৈরী হয়ে এলো বলে; তুমি নিজে যদি একটু শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে নিতে পারো মা, আমিও তা হলে সে ফুরসতে জুতো জোড়াটা বদলে একখানা উড়ুনি কাঁধে ফেলে নিই। তোমার ঘর-সংসারের বিলি-ব্যবস্থা ত সত্যি সত্যি আমরা পেরে উঠবো না।

অচলা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল, আচ্ছা আমি কাপড়টা বদলে নিচ্ছি, বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রামবাবুর প্রস্তাব অসঙ্গতও নয়, অস্পষ্টও নয়। আত্মীয় রাজকুমার ও রাজমাতার স্থান-সঙ্কুলান করিতে এ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যে এবার তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে, এ-কথা অচলা সহজেই বুঝিল, কিন্তু বুঝা সহজ হইলেই কিছু তাহার ভার লঘু হইয়া ওঠে না। মনের মধ্যে সেটা যতদূর গেল, ততদূর গুরুভার ষ্টিম রোলারের ন্যায় যেন পিষিয়া দিয়া গেল।

এতদিনের মধ্যে একটা দিনের জন্যও কেহ তাহাকে বাটীর বাহির করিতে সম্মত করিতে পারেন নাই। মিনিট-পনেরো পরে আজ প্রথম যখন সে নিজের অভ্যস্ত সাজে প্রস্তুত হইয়া শুধু এইজন্যই নামিয়া আসিল, তখন চারিদিকের সমস্তই তাহার

চক্ষে নূতন এবং আশ্চর্য্য বলিয়া ঠেকিল, এমন কি আপনাকে আপনিই যেন আর একরকম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রকাণ্ড জুড়ি; নব-পরিচ্ছেদ সজ্জিত ক্যোচম্যান মনিব জানিয়া উপর হইতে সেলাম করিল; সহিস দ্বার খুলিয়া সসম্মানে সরিয়া দাঁড়াইল; এবং তাহাকেই অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধ রামবাবু যখন সম্মুখের আসন গ্রহণ করিয়া বসিলেন তখন সমস্তটাই অদ্ভুত স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল। তাহার আচ্ছন্ন দৃষ্টি গাড়ির যে অংশটার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিল তাহাই বোধ হইল, এ কেবল বহুমূল্য নয়, এ শুধু ধনবানের অর্থের দম্ভ নয়, ইহার প্রতি বিন্দুটি যেন কাহার সীমাহীন প্রেম দিয়া গড়া।

কঠিন পাথরের রাস্তার উপর চার জোড়া খুরের প্রতিধ্বনি তুলিয়া জুড়ি ছুটিল, কিন্তু অচলার কানের মধ্যে তাহা শুধু অস্পষ্ট হইয়া প্রবেশ করিল। তাহার সমস্ত অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয় হয়ত শেষ পর্য্যন্ত এমন অভিভূত হইয়াই থাকিত, কিন্তু সহসা রামবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া উঠিল। তিনি সম্মুখের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, মা, ওই তোমার বাড়ি দেখা যায়। লোকজন দাস-দাসী সবই নিযুক্ত করা হয়ে গেছে, মোটামুটি সাজানো-গোছানোর কাজও বোধ করি এতক্ষণে অনেক এগিয়ে এলো, শুধু তোমাদের শোবার ঘরটিতে মা, আমি কাউকে হাত দিতে মানা করে দিয়েচি। তাঁর যাবার সময় বলে দিলাম, সুরেশবাবু, বাড়ির আর যেখানে যা খুশি করুন গে, আমি গ্রাহ্য করিনে, শুধু মায়ের ঘরটিতে কাজ করে মায়ের আমার কাজ বাড়িয়ে দেবেন না। এই বলিয়া বৃদ্ধ একখানি সলজ্জ হাসিমুখের আশায় চোখ তুলিয়াই একেবারে চুপ করিয়া গেলেন।

তিনি কেন যে এমন করিয়া থামিয়া গেলেন, অচলা তাহা সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিল, তাই যতক্ষণ না গাড়ি নূতন বাংলার দরজায় আসিয়া পৌঁছিল, ততক্ষণ সে তাহার শুষ্ক বিবর্ণ মুখখানা বাহিরের দিকে ফিরাইয়া এই বৃদ্ধের বিস্মিত দৃষ্টি হইতে গোপন করিয়া রাখিল।

গাড়ির শব্দে সুরেশ বাহিরে আসিল, দাস-দাসীরাও কাজ ফেলিয়া অন্তরাল হইতে সভয়ে তাহাদের নূতন গৃহিণীকে দেখিতে আসিল; কিন্তু সে মুখের প্রতি চাহিয়া কেহই কোন উৎসাহ পাইল না।

রামবাবুর সঙ্গে সঙ্গে অচলা নীরবে নামিয়া আসিল, সুরেশের প্রতি একবার সে মুখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিল না; তার পরে তিনজনেই নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এই নূতন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার ভিতরে-বাহিরে উপরে-নীচে কোথাও যে আনন্দের লেশমাত্র আভাস আছে, তাহা ক্ষণকালের নিমিত্ত কোনদিকে চাহিয়া কাহারো চক্ষে পড়িল না।

কিন্তু ইহার মধ্যে ভুল যে কত বড় ছিল, তাহাও প্রকাশ পাইতে বিলম্ব ঘটিল না। বাটী সাজাইবার কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া এই সকল অত্যন্ত মহার্ঘ্য ও অপর্য্যাপ্ত উপকরণরাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া তাই সকল চিন্তাকে ছাপাইয়া একটি চিন্তা সকলের মনে বার বার ঘা দিতে লাগিল যে, যাহার টাকা আছে সে খরচ করিয়াছে, এ একটা পুরাতন কথা বটে; কিন্তু এ ত শুধু তাই নয়। এ যেন একজনকে আমার ও আনন্দ দিবার জন্য আর একজনের ব্যাকুলতার অন্ত নাই। কাজের ভিড়ের মধ্যে জিনিসপত্র নাড়ানাড়ির মধ্যে সাধারণ কথাবার্ত্তা অনেক হইল, চোখাচোখি অনেকবার হইল কিন্তু সকলের ভিতর হইতেই একটা অনুচ্চারিত বাক্য, অপ্রকাশ্য ইঙ্গিত রহিয়া রহিয়া কেবল এইদিকেই অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিতে লাগিল।

বাড়িটার-ধোয়া মোছার কাজ শেষ হয় নাই। সুতরাং ইহাকে কতকটা বাসোপযোগী করিয়া লইতেই সারা বেলাটা গেল। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া তিনজনেই যখন বাড়ি ফিরিবার জন্য গাড়িতে আসিয়া বসিলেন, তখন রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে। একটা বাতাস উঠিয়া সুমুখের কতকটা আকাশ স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছিল, শুধু মাঝে মাঝে একটা ধূসর-রঙের খণ্ড মেঘ এক দিগন্ত হইতে আসিয়া নদী পার হইয়া আর এক দিগন্তে ভাসিয়া চলিয়াছিল এবং তাঁহারই ফাঁকে ফাঁকে কভু উজ্জ্বল, কভু ম্লান জ্যোৎস্নার ধারা যেন সপ্তমীর বাঁকা চাঁদ হইতে চারিদিকের প্রান্তর ও গাছ-পালার উপর ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। এই সৌন্দর্য্য দু'চক্ষু ভরিয়া গ্রহণ করিতে বৃদ্ধ রামবাবু জানালার বাহিরে বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু যাহারা বৃদ্ধ নয়, প্রকৃতির সমস্ত রস, সমস্ত মাধুর্য্য উপভোগ করিবারই যাহাদের বয়স, তাহারাই কেবল গাড়ীর দুই গদী-আঁটা কোণে মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

অনেকদিন পূর্ব্বেকার একটা স্মৃতি অচলার মনের মধ্যে একেবারে ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছিল, অনেকদিন পরে আজ আবার তাহাই মনে পড়িতে লাগিল—যেদিন সুরেশের কলিকাতার বাটী হইতে তাহারা এমনি এক সন্ধ্যাবেলায় এমনি গাড়ি করিয়াই ফিরিতেছিল। যেদিন তাহার সম্পদ ও সম্ভোগের বিপুল আয়োজন মহিমের নিকট হইতে তাহার অতৃপ্ত মনটাকে বহুদূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। যেদিন এই সুরেশের হাতেই আত্মসমর্পণ করা একান্ত অসঙ্গত বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় নাই—বহুকাল পরে কেন যে সহসা আজ সেই কথাটাই স্মরণ হইল, ভাবিতে গিয়া নিজের অন্তরের নিগূঢ় ছবিটা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া যেন লজ্জার ঝড় বহিতে লাগিল।

লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! এই গাড়ি, ওই বাড়ি ও তাহার কত কি আয়োজন সমস্তই তাহার—সমস্তই তাহার স্বামীর আদরের উপহার বলিয়া একদিন সবাই জানিল; আবার একদিন আসিবে যখন সবাই জানিবে ইহাতে তাহার সত্যকার অধিকার কানা-কড়ির ছিল না—ইহার আগাগোড়াই মিথ্যে! সেদিন লজ্জা সে রাখিবে কোথায়? অথচ আজিকার জন্য এ-কথা কিছুতেই মিথ্যা নয় যে, ইহার সবটুকুই শুধুমাত্র তাহারই পূজার নিমিত্ত সযত্নে আহরিত হইয়াছে এবং ইহার আগাগোড়াই স্নেহ দিয়া, প্রেম দিয়া, আদর দিয়া মণ্ডিত। এই যে মস্ত জুড়ি দিগ্বিদিক কাঁপাইয়া তাহাকে বহন করিয়া ছুটিয়াছে, ইহার সুকোমল স্পর্শের সুখ, ইহার নিস্তরঙ্গ অবাধ গতির আনন্দ—সমস্তই আজ তাহার! আজ যে কেবল তাহারই মুখ চাহিয়া ওই অগণিত দাস-দাসী আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে!

দেখিতে দেখিতে তাহার মনের মধ্য দিয়া লোভ ও ত্যাগ, লজ্জা ও গৌরব ঠিক যেন গঙ্গা-যমুনার মতই পাশাপাশি বহিতে লাগিল এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত ইহার কোনটাকে সে অস্বীকার করিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি বাটী পৌঁছিয়া বৃদ্ধ রামবাবু তাঁহার সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিতে চলিয়া গেলে, সে যখন অকস্মাৎ শ্রান্তি ও মাথা-ব্যথার দোহাই দিয়া অত্যন্ত অসময়ে দ্রুতপদে গিয়া নিজের ঘরের কপাট রুদ্ধ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিল, তখন একমাত্র লজ্জা ও অপমানই যেন তাহাকে গিলিয়া ফেলিতে চাহিল। পিতার লজ্জা, স্বামীর লজ্জা, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের লজ্জা, সকলের সমবেত লজ্জাটাই কেবল চোখের উপর অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়া অপর সকল দুঃখকেই আবৃত করিয়া দিল। শুধুমাত্র এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল, এ ফাঁকি একদিন যখন ধরা পড়িবে, তখন মুখখানা লুকাইবার জায়গা পাইবে সে কোথায়?

অথচ যে সমাজ ও সংস্কারের মধ্যে সে শিশুকাল হইতে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে অজিনের শয্যা বা তরুমূল্যবাস কোনটাকেই কাহাকেও কামনার বস্তু বলিতে সে শুনে নাই। সেখানে প্রত্যেক চলা-ফেরা, মেলা-মেশা, আহার-বিহারের মধ্যে বিলাসিতার প্রতি বিরাগ নয়, অনুরাগকেই উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হইয়া উঠিতে দেখিয়াছে। যেখানে হিন্দুধর্ম্মের কোন আদর্শের সহিতই তাহার পরিচয় ঘটিতে পায় নাই—পরলোকের আশায় ইহলোকের সমস্ত সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করার নিষ্ঠুর নিষ্ঠাকে সে কোনদিন দেখিতে পায় নাই; সে দেখিয়াছে, শুধু পরের অনুকরণে গঠিত ঘরের সমাজটাকে। যাহার প্রত্যেক নর-নারীই সংসারের আকণ্ঠ-পিপাসায় দিনের পর দিন কেবল শুষ্ক হইয়াই উঠিয়াছে।

তাই এই নিরালা শয্যায় চোখ বুজিয়া সে ঐশ্বর্য্য জিনিসটাকে কিছুই না বলিয়া উড়াইয়া দিতে_ পারিল না এবং চাই না, প্রয়োজন নাই, এ-কথাতেও মন

তাহার কোনমতেই সায় দিল না। তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কার ইহার কোনটাকেই তুচ্ছ করিবার পক্ষে অনুকূল নয়, অথচ গ্লানিতেও সমস্ত হৃদয় কালো হইয়া উঠিয়াছে। তাই যত সম্পদ, যত উপকরণ—এই দেহটাকে সর্ব্বপ্রকারে সুখে রাখিবার মত বিবিধ আয়োজন—আজ অযাচিত তাহার পদতলে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহার দুর্নিবার মোহ তাহাকে অবিশ্রান্ত এক হাতে টানিতে এবং অন্য হাতে ফেলিতে লাগিল।

অথচ দুঃখের স্বপ্নের মধ্যে যেমন একটা অপরিস্ফুট মুক্তির চেতনা সঞ্চরণ করে—তেমনি এই বোধটাও তাহার একেবারে তিরোহিত হয় নাই যে, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ যাহা ফাঁকি, ইহাই একদিন সত্যি হইয়া উঠিবার পথে কোন বাধাই ছিল না। এই সুরেশই তাহার স্বামী হইতে পারিত, এবং কোন এক ভবিষ্যতে ইহা একেবারেই অসম্ভব, এমন কোথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না।

তাহাদের অনুরূপ সকল সমাজেই বিধবার আবার বিবাহ হয়, হিন্দু নারীর মত কেবল একটিমাত্র লোকের কাছেই পত্নীত্বের বন্ধন ইহকাল ও পরকাল ব্যাপিয়া বহন করিয়া ফিরিবার অলঙ্ঘ্য অনুশাসন তাহাদের মানিতে হয় না। তাই জীবন-মরণে শুধু কেবল একজনকেই অনন্যগতি বলিয়া ভাবনা করিবার মত অবরুদ্ধ মন তাহার কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। সেই মন এক স্বামীর জীবিতকালেই অপরকে স্বামী বলিতে অপরাধের ভয়ে যতই কেন না পীড়িত, লজ্জা ও অপমানের জ্বালায় যতই না জ্বলিতে থাকুক, ধর্ম্ম ও পরকালের গদা তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিবার ভয় দেখাইতে পারিল না।

বন্ধ দরজায় ঘা দিয়া রামবাবু ডাকিয়া বলিলেন, জলস্পর্শ না করে শুয়ে পড়লে মা, শরীরটা কি খুব খারাপ বোধ হচ্ছে?

অচলার চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। হঠাৎ মনে হইল, এ যেন তাহার বাবার গলা। রাগ করিয়া অসময়ে শুইয়া পড়িলে ঠিক এমনি উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে তিনি কবাটের বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেন।

এই চিন্তাটাকে সে কিছুতেই ঠাঁই দিত না, কিন্তু এই স্নেহের আহ্বানকে সে ঠেকাইতে পারিল না, চক্ষের নিমিষে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সাড়া দিল, এবং দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই বৃদ্ধ ব্যক্তি এতদিনে অত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও বরাবর একটা দূরত্ব রক্ষা করিয়াই চলিতেন; এ-বাটীতে ইহাদের আজ শেষ দিন মনে করিয়াই বোধ হয় এক নিমিষে এই ব্যবধান অতিক্রম করিয়া গেলেন। এক হাত অচলার কাঁধের উপর রাখিয়া, অন্য হাতে তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া মুহূর্ত্ত পরেই সহাস্যে বলিলেন, বুড়ো

জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দুষ্টামি মা? কিছু হয়নি এসো, বলিয়া হাত ধরিয়া আনিয়া বারান্দার একটা চেয়ারের উপর বসাইয়া দিলেন।

অদূরে আর একটা চৌকির উপর সুরেশ বসিয়াছিল; সে মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়াই আবার মাথা হেঁট করিল। কথা ছিল, রাত্রে ধীরে-সুস্থে বসিয়া সারাদিনের কাজ-কর্মের একটা আলোচনা করা হইবে, সে সেইজন্যই একাকী বসিয়া রামবাবুর ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার প্রতিই চাহিয়া বৃদ্ধ একটু হাসিয়া কহিলেন, সুরেশবাবু, আপনার ঘরের লক্ষ্মীটি ত কোন্ এক বিলিতি বাপের মেয়ে—দিন-ক্ষণ পাঁজি-পুঁথি মানেন না; তখন আপনি নিজে মানুন, না মানুন, বিশেষ যায়-আসে না—কিন্তু আমার এই তিন-কুড়ি বছরের কুসংস্কার ত যাবার নয়। কাল প্রহর-দেড়েকের ভেতরেই একটা শুভক্ষণ আছে—

সুরেশ ইঙ্গিতটা হঠাৎ বুঝিতে পারিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইয়াই প্রশ্ন করিল, কিসের শুভক্ষণ?

রাম বাবু ঠিক সোজা উত্তরটা দিতে পারিলেন না। একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, এর পরে কিন্তু সপ্তাহ-খানেকের মধ্যে পাঁজিতে আর দিন খুঁজে পেলাম না—তাই ভাবছিলাম—

কথাটা এবার সুরেশ বুঝিল বটে, কিন্তু হাঁ-না কোন প্রকার জবাব দিতে না পারিয়া সভয়ে গোপনে একবার মুখ তুলিয়া অচলার প্রতি চাহিতে গিয়া আর চোখ নামাইতে পারিল না; সেই দুটি স্থির দৃষ্টি তাহারই উপর নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে।

অচলা শান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, কাল সকালেই ত আমরা ও-বাড়ি যেতে পারি?

বিস্ময়াভিভূত সুরেশের মুখে এই সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর কিছুতেই বাহির হইল না। সে শুধু অনিশ্চিন্ত-কণ্ঠে কোনমতে এই কথাটাই বলিতে চাহিল যে, সে-বাড়ি এখনও সম্পূর্ণ বাস করিবার মত হয় নাই। তাহার মেঝেগুলা হয়ত এখনও ভিজা, নূতন দেয়ালগুলা হয়ত এখনও কাঁচা—হয়ত অচলার কোন একটা অসুখ-বিসুখ, না হয়ত তাহার—

কিন্তু আপত্তির তালিকাটি শেষ হইতে পাইল না। অচলা একটু যেন হাসিয়াই বলিল, তা হোক গে। যে দুর্দ্দিনে শিয়াল-কুকুর পর্য্যন্ত তার ঘর ছাড়তে চায় না, সেদিনও যদি আমাকে অজানা জায়গায় গাছতলায় টেনে আনতে পেরে থাকো ত একটু ভিজে মেঝে কি একটু কাঁচা দেওয়ালের ভয়ে তোমাকে আমার জন্যে ভেবে সারা হতে হবে না! সেদিন যার মরণ হয়নি সে আজও বেঁচে থাকবে।

রামবাবুর দিকে ফিরিয়া কহিল, আপনি একটুও ভাববেন না জ্যাঠামশাই। আমরা কাল সকালেই যেতে পারবো। আপনার ঋণ আমি জন্ম-জন্মান্তরেও শোধ

করতে পারবো না জ্যাঠামশাই, আমরা কালই বিদায় হবো। বলিতে বলিতেই সে কাঁদিয়া ছুটিয়া পলাইয়া নিজের ঘরে গিয়া কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

বৃদ্ধ রামবাবু ঠিক যেন বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার বিহ্বল ব্যাকুল দৃষ্টি একবার সুরেশের আনত মুখের প্রতি, একবার ওই অবরুদ্ধ দ্বারের প্রতি চাহিয়া কেবলই এই বিফল প্রশ্ন করিতে লাগিল, এ কি হইল? কেন হইল? কেমন করিয়া সম্ভব হইল? কিন্তু অন্তর্য্যামী ভিন্ন এই মর্ম্মান্তিক অভিমানের আর কে উত্তর দিবে।

৩৭

পরদিন প্রভাত হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সেই মলিন আকাশতলে সমস্ত সংসারটাই কেমন একপ্রকার বিষণ্ণ ম্লান দেখাইতেছিল। সজ্জিত গাড়ি দ্বারে দাঁড়াইয়া; কিছু কিছু তোরঙ্গ, বিছানা প্রভৃতি তাহার মাথায় তোলা হইয়াছে; পাঁজির শুভমুহূর্ত্তে অচলা নীচে নামিয়া আসিল এবং গাড়িতে উঠিবার পূর্বে রামবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিতেই তিনি জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া বলিলেন, মা; বুড়োমানুষের মা হওয়া অনেক ল্যাঠা। একটু পায়ের ধূলো নিয়ে, আর মাইল-দুই তফাতে পালিয়েই পরিত্রাণ পাবে যেন মনে করো না।

অচলা সজল চক্ষু দুটি তুলিয়া আস্তে আস্তে কহিল, আমি ত তা চাইনে জ্যাঠামশাই।

এই করুণ কথাটুকু শুনিয়া বৃদ্ধের চোখেও জল আসিয়া পড়িল। তাঁহার হঠাৎ মনে হইল, এই অপরিচিত মেয়েটি আবার যেন পরিচয়ের বাহিরে কতদূরেই না সরিয়া যাইতেছে। স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে কহিলেন, সে কি আমি জানিনে মা। নইলে স্বামী নিয়ে আপনার ঘরে যাচ্ছ, চোখে আবার জল আসবে কেন? কিন্তু তবুও ত আটকাতে পারলাম না। বলিয়া হাত দিয়া এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া আবার হাসিয়া কহিলেন, কাছে ছিলে, রাত্রিদিন উপদ্রব করতাম, এখন সেইটে পেরে উঠবো না বটে, কিন্তু এর সুদশুদ্ধ তুলে নিতেও ত্রুটি হবে না, তাও কিন্তু তুমি দেখে নিয়ো।

সুরেশ পিছনে ছিল, সে আজ এই প্রথম যথার্থ ভক্তিভরে বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিলে তিনি চুপি চুপি বলিলেন, আমার এখানে আপনি সুখে ছিলেন না, সে আমি জানি সুরেশবাবু। নিজের গৃহে এবার এইটেই যেন দূর হয়, আমি কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি।

সুরেশ কোন কথাই কহিল না, কেবল আর একবার হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া গাড়িতে গিয়া বসিল।

রামবাবু আর একদফা আশীর্ব্বাদ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জানাইয়া দিলেন যে, তিনিও একখানা এক্কা আনিতে বলিয়া দিয়াছেন। হয়ত বা বেলা পড়িতে না-পড়িতেই গিয়া হাজির হইবেন, কিন্তু তখন রাগ করিলে চলিবে না। এই বলিয়া পরিহাস করিতে গিয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইলেন।

গাড়ি চলিয়া গেলে তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ ভালই হইল যে, ইহারা সময় থাকিতে চলিয়া গেল। এখানে শুধু যে স্থানাভাব, তাই নয়, তাঁহার বিধবা ভগিনীটির স্বভাবটিও তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। অপরের নাড়ীর খবর জানিতে তাহার কৌতূহলের অবধি নাই। সে আসিয়াই সুরমাকে কঠিন পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইবে, এবং তাহার ফল আর যাহাই হোক, আহ্লাদ করিবার বস্তু হইবে না। এই মেয়েটির কিছুই না জানিয়াও তিনি জানিয়াছিলেন, সে সত্যসত্যই ভদ্রমহিলা। কোন একটা সুবিধার খাতিরে সে কিছুতেই মিথ্যা বলিতে পারিবে না। সে যে ব্রাহ্ম-পিতার কন্যা, সে যে নিজেও ছোঁয়া-ছুঁয়ি ঠাকুরদেবতা মানে না, ইহার কোনটাই গোপন করিবে না। তখন এ-বাটীতে যে বিপ্লব বাধিয়া যাইবে তাহা কল্পনা করিতে হৃদকম্প হয়। কিন্তু ইহা ত গেল তাঁহার নিজের সুখ-সুবিধার কথা। আরও একটা ব্যাপার ছিল, যাহাকে তিনি নিজের কাছেও স্পষ্ট করিয়া লইতে চাহিতেন না। তাঁহার মেয়ে ছিল না, কিন্তু প্রথম সন্তান তাঁহার কন্যা হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আজ সে বাঁচিয়া থাকিলে অচলার জননী হইতে পারিত, সুতরাং বয়স বা চেহারার সাদৃশ্য কিছুই ছিল না। কিন্তু সেই ক্ষুধাটা যে তাঁহার কত বড় ছিল, তাহা সেই অচেনা মেয়েটিকে যেদিন পথে পথে কাঁদিয়া চিকিৎসকের অনুসন্ধান করিতে দেখিয়াছিলেন সেইদিনই টের পাইয়াছিলেন। সেদিন মনে হইয়াছিল, সেই বহুদিনের হারানো সন্তানটিকে যেন হঠাৎ খুঁজিয়া পাইয়াছেন; এবং তখন হইতে সে ক্ষুধাটা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অন্তরেও অনুভব করিতেন সত্য, কিন্তু কি যেন একটা গভীর রহস্য এই মেয়েটিকে ঘেরিয়া তাঁহাদের অগোচরে আছে; তাই থাক—যাহা চোখের আড়ালে আছে, তাহা আড়ালেই থাকুক, চেষ্টা করিয়া তাহাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া আর কাজ নাই।

একদিন রাক্ষুসী একটুমাত্র আভাস দিয়াছিল যে, বোধ হয় ভিতরে একটা পারিবারিক বিবাদ আছে—বোধ হয় কলহ করিয়া সুরেশবাবু স্ত্রী লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ যেদিন অচলা আপনাকে ব্রাহ্মমহিলা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল, অথচ সুরেশের কণ্ঠে ইতিপূর্ব্বেই যজ্ঞোপবীত দেখা গিয়াছিল, সেদিন বৃদ্ধ চমকিত হইয়াছিলেন, আঘাত পাইয়াছিলেন, কিন্তু মনে মনে এই গুপ্ত রহস্যের যেন

একটা হেতু খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন; সেদিন নিশ্চয়ই মনে হইয়াছিল, সুরেশ ব্রাহ্মঘরে বিবাহ করিয়াই এই বিপত্তি ঘটাইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ এই বিশ্বাসই তাঁহার মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

এই বৃদ্ধ লোকটি সত্যই হিন্দু ছিলেন, তাই হিন্দুধর্ম্মের নিষ্ঠাকেই তিনি পাইয়াছিলেন, ইহার নিষ্ঠুরতাকে পান নাই। ব্রাহ্মণ-সন্তান সুরেশের এই দুর্গতি না ঘটিলেই তিনি খুশী হইতেন, কিন্তু এই যে ভালবাসার বিবাহ, এই যে আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদ, এই যে লুকোচুরি, ইহার সৌন্দর্য্য, ইহার মাধুর্য্য ভিতরে ভিতরে তাঁহাকে ভারি মুগ্ধ করিত। ইহাকে না জানিয়া প্রশ্রয় দিতে যেন সমস্ত মন তাঁহার রসে ডুবিয়া যাইত। তাই যখনই এই দুটি বিদ্রোহী প্রণয়ীর প্রণয়-অভিমান তাঁহার কাছে মাঝে মাঝে মনোমালিন্যের আকারে প্রকাশ পাইত, তখন অতিশয় ব্যথার সহিত তাঁহার এই কথাটাই মনে হইত, পরগৃহের অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সঙ্কুচিত গণ্ডীর মধ্যে যে মিলন কেবল ঠোকাঠুকি খাইতেছে, তাহাই হয়ত নিজের বাটীর স্বাধীন ও প্রশস্ত অবকাশে সংসারের অসংখ্য কাজে ও অকাজে শান্তি ও সামঞ্জস্যে স্থিতিলাভ করিবে।

তাঁহার স্নানের সময় হইয়াছিল, গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া নদীর পথে অগ্রসর হইয়া চলিতে চলিতে মনে মনে হাসিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, মা, যাবার সময় এই বুড়োটার উপর অভিমান করেই গেলে। ভাবলে, আপনার লোকের খাতিরে জ্যাঠামশাই আমাদের বাড়িতে জায়গা দিলে না! কিন্তু দু-চারদিন পরে যেদিন গিয়ে দেখতে পাবো, চোখে-মুখে হাসি আর আঁটচে না, সেদিন এর শোধ নেব। সেদিন বলব, এই বুড়োটার মাথার দিব্যি রইল মা, সত্য করে বল দেখি, আগেকার রাগের মাত্রাটা এখন কতখানি আছে? দেখব বেটি কি জবাব দেয়। বলিয়া প্রশান্ত নির্ম্মল হাস্যে তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সুরমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কাজের ছুতা করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই থালায় সন্দেশ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া মুখ অসম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিতে লাগিল, আমার হাতের তৈরি মিষ্টি যদি না খান জ্যাঠামশাই ত সত্যিসত্যিই ভারি ঝগড়া হয়ে যাবে!

স্নানান্তে জলে দাঁড়াইয়া গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করার মাঝে মাঝেও মেয়েটার সেই লুকাইবার চেষ্টাকে শাক দিয়া মাছ ঢাকার সঙ্গে তুলনা করিয়া বুড়ার ভারি হাসি পাইতে লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে ক্ষোভ গতরাত্রি হইতে নিরন্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল, তাহা সান্ধ্যাহ্নিক সারিয়া ফিরিবার পথেই কল্পনার স্নিগ্ধ বর্ষণে জুড়াইয়া জল হইয়া গেল।

কাল সকালেই সকলে পৌঁছিবেন, তার আসিয়াছে। সঙ্গে রাজকুমার নাতি

এবং রাজবধূ ভাগিনেয়ীর সংস্রবে সম্ভবতঃ লোকজন কিছু বেশি আসিবে। আজ তাঁহার বাটীতে কাজ কম ছিল না। উপরন্তু আকাশের গতিকও ভাল ছিল না। কিন্তু পাছে জল আসিয়া পড়ে, পাছে যাওয়ার বিঘ্ন ঘটে, এই ভয়ে রামবাবু বেলা পড়িতে-না-পড়িতে এক্কা ভাড়া করিয়া, বকশিশের আশা দিয়া দ্রুত হাঁকাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পথেই জলো হাওয়ার সাক্ষাৎ মিলিল এবং এ-বাটীতে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন, তখন কিছু কিছু বর্ষণও শুরু হইয়াছে।

অচলা বাহির হইয়া কহিল, এই দুর্য্যোগের মধ্যে আজ আবার কেন এলেন জ্যাঠামশাই? আর একটু হলেই ত ভিজে যেতেন।

তাহার মুখে বা কণ্ঠস্বরে ভাবী আনন্দের চিহ্নমাত্র না দেখিয়া বুড়ার মন দমিয়া গেল। এজন্য তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না—কে যেন তাঁহার কল্পনার মালাটাকে একটানে ছিঁড়িয়া দিল। তথাপি মুখের উৎসাহ বজায় রাখিয়া কহিলেন, ওরে বাস রে, তা হলে কি আর রক্ষা ছিল, জলে ভেজাটাকে সামলাতে পারব, কিন্তু ত্যজ্যপুত্র হয়ে চিরটা কাল কে থাকবে মা?

এই দুর্ব্বোধ মেয়েটাকে বুড়া কোনদিনই বেশ ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ কাল রাত্রির ব্যবহারে ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার আজিকার আচরণে যেন একেবারে দিশাহারা, আত্মহারা হইয়া গেলেন। সে যে কোনকালে, কোন কারণেই ওরূপ করিতে পারে, তেমন স্বপ্ন দেখাও যেন অসম্ভব। কথা ত মাত্র এইটুকু। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা ঠিক পাগল হইয়া গিয়া একেবারে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বুকের উপর উপুড় হইয়া হুহু স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, জ্যাঠামশাই, কেন আমাকে আপনি এত ভালবাসেন—আমি যে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছি।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ কোন কথা কহিতে পারিলেন না, শুধু এক হাতে তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া রাখিয়া অন্য হাতে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার স্নেহার্দ্র চিত্ত সেই-সব সামাজিক অনুমোদিত বিবাহের কথা, আত্মীয়-স্বজন, হয়ত বা বাপ-মায়ের সহিত বিদ্রোহ-বিচ্ছেদের কথা, বিবাদ করিয়া গৃহত্যাগের কথা—এইসকল পুরাতন, পরিচিত ও বহুবারের অভ্যস্ত ধারা ধরিয়াই যাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই আর একটা নতুন খাদ খনন করিবার কল্পনামাত্র করিল না। এমনি করিয়া এই নির্ব্বাক্ বৃদ্ধ ও রোরুদ্যমানা তরুণী বহুক্ষণ একভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপরে চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন, এতে আর লজ্জা কি মা। তুমি আমার মেয়ে, তুমি আমার সেই সতীলক্ষ্মী মা, অনেককাল আগে কেবল দু'দিনের জন্য আমার কোলে এসেই চলে গিয়েছিলে—মায়া কাটাতে না পেরে আবার বাপের বুকে ফিরে এসেচ—আমি যে তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম

সুরমা! বলিয়া তাহাকে নিকটবর্ত্তী একটা চেয়ারে বসাইয়া নানারকমে পুনঃ পুনঃ এই কথাটাই বুঝাইতে লাগিলেন যে, ইহাতে কোন লজ্জা, কোন সরম নাই। যুগে যুগে চিরদিনই ইহা হইয়া আসিতেছে। যিনি সতী, যিনি স্বয়ং আদ্যাশক্তি, তিনিও একবার স্বামীর ঘর করিতে বাপ মা আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গেই ঝগড়া করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। আবার সব হইবে, সব ফিরিয়া পাইবে, আজ যাহারা বিমুখ আবার তাহারা মুখ ফিরাইবে, আবার তাহাদের পুত্র-পুত্রবধূকে যত্নে তুলিয়া লইবে! দেখ দেখি মা, আমার এ আশীর্ব্বাদ কখনো নিষ্ফল হইবে না।

এমনি কত-কি বৃদ্ধ মনের আবেগে বকিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাতে সার যাহা ছিল তাহা থাক, কিন্তু তাহার ভারে যেন শ্রোতাটির আনত মাথাটি ধীরে ধীরে ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল। চাপিয়া বৃষ্টি আসিয়াছিল। এমনি সময়ে দেখিতে পাওয়া গেল, সুরেশ ভিজিয়া কাদা মাখিয়া কোথা হইতে হন্ হন্ করিয়া বাড়ি ঢুকিতেছে। দেখিবামাত্রই অচলা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া বৃষ্টির জল হাত বাড়াইয়া লইয়া অশ্রুজলের সমস্ত চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। রামবাবু বুঝিলেন, সুরমা যেজন্যই হোক, চোখের জলের ইতিহাসটা স্বামীর কাছে গোপন রাখিতে চায়।

সে উপরে উঠিয়া রামবাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কথাবার্ত্তা পরে হবে সুরেশবাবু, আমি পালাইনি। আপনি কাপড় ছেড়ে আসুন।

সুরেশ হাসিয়া কহিল, এ কিছুই না। বলিয়া একটা চৌকি টানিয়া বসিবার উদ্যোগ করিতেছিল, অচলা মুখ তুলিয়া চাহিল—জ্যাঠামশায়ের কথাটা শুনতে দোষ কি? এক মাস হয়নি তুমি এতবড় অসুখ থেকে উঠেচ—বার বার আমাকে আর কত শাস্তি দিতে চাও?

তাহার বাক্য ও চাহনির মধ্যে এত বড় ব্যবধান ছিল যে, দু'জনেই বিস্মিত হইলেন, কিন্তু এই বিস্ময়ের স্রোতটা বহিতে লাগিল ঠিক বিপরীত মুখে। সুরেশ কোন জবাব না দিয়া নীরবে আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল, আর রামবাবু বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

সেই বাহিরের বারিপাতের আর বিরাম নাই, রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, বৃষ্টির প্রকাশ যেন ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বহুদিনের আকর্ষণে ধরিত্রী শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল; মনে হইতে লাগিল, তাহার সমস্ত দীনতা, সমস্ত অভাব আজিকার এই রাত্রির মধ্যেই পরিপূর্ণ করিয়া দিতে বিধাতা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

রামবাবুর উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া অচলা আস্তে আস্তে বলিল, ফিরে যেতে বড় কষ্ট হবে জ্যাঠামশাই, আজ রাত্তিরেই কি না গেলে নয়?

তিনি হাসিলেন, মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া কহিলেন, কষ্টের জন্য না হোক, এই দুর্য্যোগে এই নূতন জায়গায় তোমাদের ছেড়ে আমি যেতাম না। কিন্তু কাল সকালেই যে ওরা সব আসবেন, রাত্রির মধ্যেই আমার ত ফিরে না গেলেই নয় সুরমা। কিন্তু মনে হচ্ছে, এ-রকম থাকবে না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কমে আসবে। আমি এই সময়টুকু অপেক্ষা করে দেখি।

এই প্রসঙ্গে কাল যাহারা আসিতেছেন, তাঁহাদের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া আলোচনা সংসারের দিকে, সমাজের দিকে, ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য ইহলোক পরলোক কত দিকেই না ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িল! উভয়ে এমনি মগ্ন হইয়া রহিলেন যে, সময় কতক্ষণ কাটিল, রাত্রি কত হইল, কাহারও চোখেও পড়িল না। বাহিরে গর্জ্জন ও বর্ষণ উত্তরোত্তর কিরূপ নিবিড়, অন্ধকার কত দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও কেহ দৃষ্টিপাত করিল না; এই বৃদ্ধের মধ্যে যে জ্ঞান, যে ভূয়োদর্শন, যে ভক্তি সঞ্চিত ছিল, তাঁহার পরম স্নেহের পাত্রীটির কাছে তাহা অবাধে উৎসারিত হইতে পাইয়া এই কেবলমাত্র দুটি লোকের নিরালা সভাটিকে যেন মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দিল। অচলার শুধু চেতনাটুকু অবশিষ্ট রহিল যে, সে এমন একটি লোকের হৃদয়ের সত্য অনুভূতির খবর পাইতেছে, যিনি নিষ্পাপ, যাঁহার স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সে একান্তভাবেই লাভ করিয়াছে।

হঠাৎ পদশব্দে চকিত হইয়া উভয়েই পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। সে কহিল, মা, রাত অনেক হয়েছে, প্রায় বারোটা বাজে—আপনার খাবার কি দিয়ে যাব?

অচলা চমকিয়া কহিল, বারোটা বাজে? বাবু?

তিনি এইমাত্র খেয়ে শুতে গেছেন।

সে সেই যে গিয়াছে, আর আসে নাই, ইহা শুধু এখনই চোখে পড়িল। অচলা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, শোবার ঘরের পর্দ্দার ফাঁক দিয়া আলো দেখা যাইতেছে। রামবাবু ক্ষুব্ধ লজ্জিত হইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে মা, বড় অন্যায় হয়েচে। তোমাকে এমন ধরে রাখলাম যে, তাঁর খাওয়া হ'ল কি না, তুমি চোখে দেখতে পেলে না; এখন যাও মা তুমি খেতে—

অচলা এ-সকল কথায় বোধ হয় কোন কান দিল না। ভৃত্যকে প্রশ্ন করিল, কোচম্যান গাড়ি জুড়ে ঠিক সময়ে আনেনি কেন?

ভৃত্য কহিল, নূতন ঘোড়া, এই ঝড়-জল অন্ধকারে বার করতে আর সাহস হয় না।

তা হলে আর কোন গাড়ি আনা হয়নি কেন?

ভৃত্য চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার অর্থ অপরাধ স্বীকার করা নয়, বরঞ্চ প্রতিবাদ করা যে, এ হুকুম ত তাহারা পায় নাই।

রামবাবু উৎকণ্ঠার পরিবর্তে লজ্জা পাইয়াই ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, গাড়ির আবশ্যক নেই—না গেলেও ক্ষতি নেই—কেবল প্রত্যূষে স্টেশনে গিয়ে হাজির হতে পারলেই চলবে। আমি রাত্রে কিছুই খাইনে, আমার সে ঝঞ্ঝাটও নেই—শুধু তুমি দুটি খেয়ে নিয়ে শুতে যাও মা, কথায় কথায় বড্ড রাত হয়ে গেছে—বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। এই বলিয়া এরকম জোর করিয়াই তাহাকে নীচে খাইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং মিনিট-পনের পরে সে উপরে আসিতেই ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়া বলিতে লাগিলেন, আর এক মিনিট দেরি নয় মা, তুমি শুতে যাও। আমি এই বসবার ঘরের কোচখানার উপর দিব্যি শুতে পারব, আমার কোন কষ্ট, কোন অসুবিধা হবে না—শুধু তুমি শুতে যাও সুরমা, আমি দেখি।

বৃদ্ধের সনির্ব্বন্ধ আবেদন ও নিবেদন এবং পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা অচলাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। যে মিথ্যা সম্মান, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সে তাহার এই নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী পিতৃব্যসম বৃদ্ধের নিকট হইতে এতকাল শুধু প্রতারণার দ্বারাই পাইয়া আসিয়াছে, সেই লোভই এই তাহার একান্ত দুঃসময়ে কণ্ঠরোধ করিয়া অপ্রতিহত বলে সুরেশের নির্জ্জন শয়নমন্দিরের দিকে ঠেলিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, এমনি এক ঝড়-জল-দুর্দ্দিনের রাত্রিই একদিন তাহাকে স্বামীহারা করিয়াছিল, আজ আবার তেমনি এক দুর্দ্দিনের দুরতিক্রম্য অভিশাপ তাহাকে চিরদিনের মত সীমাহীন অন্ধকারে ডুবাইতে উদ্যত হইয়াছে। কাল অসহ্য অপমানে, লজ্জার গভীরতর পঙ্কে তাহার আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া যাইবে, ইহা সে চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, কিন্তু তবুও আজিকার মত ওই মিথ্যাটাই জয়মাল্য করিয়া তাহাকে কোনমতেই সত্য প্রকাশ করিতে দিল না। আজ জীবনের এই চরম মুহূর্ত্তে অভিমান ও মোহই তাহার চিরজয়ী হইয়া রহিল। সে বাধা দিল না, কথা কহিল না, একবার পিছনে চাহিয়াও দেখিল না—নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সুরেশের শয়ন-কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

বাহিরের মত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া হাসিয়া উঠিতে লাগিল, সারারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।

নূতন স্থানে রামবাবুর সুনিদ্রা হয় নাই, বিশেষতঃ মনের মধ্যে চিন্তা থাকায় অতি প্রত্যূষেই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বৃষ্টি থামিয়াছে বটে কিন্তু, ঘোর কাটে নাই। চাকরেরা কেহ উঠিয়াছে কি না, দেখিবার জন্য বারান্দার এক প্রান্তে আসিয়া হঠাৎ চমকিয়া গেলেন। কে যেন টেবিলে মাথা পাতিয়া চেয়ারে বসিয়া আছে। কাছে আসিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, সুরমা, তুমি যে? এত ভোরে উঠেচ কেন মা?

সুরমা একবারমাত্র মুখ তুলিয়াই আবার তেমনি করিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিল। তাহার মুখ মড়ার মত শাদা, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা এবং কালো পাথরের গা দিয়া যেমন ঝরণার ধারা নামিয়া আসে, ঠিক যেমনি দুই চোখের কোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

বৃদ্ধ শুধু একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া একদৃষ্টে ওই অর্দ্ধমৃতা নারী-দেহের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথাই তাঁহার কণ্ঠ ভেদিয়া বাহির হইতে পারিল না।

৩৮

সকালবেলা দুটিখানি গরম মুড়ি দিয়া চা-খাওয়া শেষ করিয়া কেদারবাবু একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি লইতে মৃণাল ঘরে ঢুকিতেই কহিলেন, মা, তোমার এই গরম মুড়ি আর পাথরের বাটির চা'র ভেতরে যে কি অমৃত আছে জানিনে, কিন্তু এই একটা মাসের মধ্যে আর নড়তে পারলুম না।

অচলার সম্পর্কে মৃণাল তাঁহাকে বাবা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কহিল, কেন তুমি পালাবার জন্যে এত ব্যস্ত হও বাবা, তোমার এ—আমি কি সেবা করিতে জানিনে?

তোমার এ মেয়ে কি—এই কথাটাই মৃণাল অসাবধানে বলিতে গিয়াছিল; কিন্তু চাপিয়া গিয়া অন্যপ্রকারে প্রকাশ করিল। তাই বোধ করি, এ ইঙ্গিত কেদার-বাবু বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলেন না। কিন্তু কণ্ঠস্বর তাঁহার সহসা করুণ হইয়া উঠিল, বলিলেন, কৈ আর পালাতে ব্যস্ত হই মা! তোমার তৈরি চা, তোমার হাতের রান্না, তোমার এই মাটির ঘরখানি ছেড়ে আমার স্বর্গে যেতেও ইচ্ছা করে না। ওই ছোট্ট জানালার ধারটিতে বসে আমি কতদিন ভাবি মৃণাল, আরো দুটো বৎসর যদি ভগবানের দয়ায় বাঁচতে পাই ত কলকাতার মধ্যে থেকে সারাজীবন ধরে যত ক্ষতি নিজে করেচি, তার সবটুকু পূরণ করে নেব। আর সেই মূলধনটুকু হাতে নিয়েই যেন একদিন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।

কত বড় বেদনার ভিতর দিয়া তিনি এই কথাগুলি বলিলেন এবং কিরূপ মর্ম্মান্তিক লজ্জায় কলিকাতার আজন্মপরিচিত পল্লী ও বাসভবন ছাড়িয়া, চিরদিনের আশ্রিতসমাজ ত্যাগ করিয়া এই বনের মধ্যে পর্ণ-কুটিরে বাকী দিনগুলা কাটাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন, মৃণাল তাহা বুঝিল, এবং সেইজন্যই কোন উত্তর না দিয়া চায়ের বাটিটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

এইখানে একটু গোড়ার কথা প্রকাশ করিয়া বলা আবশ্যক। প্রায় মাস-খানেক হইল, কেদারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং সেই অবধি আর ফিরিতে পারেন নাই। মহিমের অসুখের সময় সুরেশের কলিকাতার বাটীতে এই বিধবা মেয়েটির সহিত তিনি প্রথম পরিচিত হন, কিন্তু এখানে তাহার নিজের বাটীতে আসিয়া যে পরিচয় ইহার পাইলেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত দেহ-মন যেন সোনার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া গেল। এই বন্ধন হইতেই বৃদ্ধ কোনমতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ অন্যত্র কত কাজই না তাঁহার বাকী পড়িয়া আছে।

মহিমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহার আসার সংবাদ পাইয়াই সে ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যায়। যাবার সময় মৃণাল ধরিয়া রাখিতে টানাটানি করে নাই, কারণ শিশুকাল হইতে সেজদার সংযম ও সহিষ্ণুতার প্রতি, বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি তাহার এত অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, সে নিশ্চয় বুঝিয়াছিল, অচলার সহিত দেখা করা এখন উচিত নয় বলিয়াই কেবল মহিম এমন করিয়া পলায়ন করিতেছে। সে মনে করিয়াছিল, তাহার পত্র পাইয়া কেদারবাবু কন্যা-জামাতার একটা মিটমাট করিয়া দিতে এরূপ তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। কিন্তু আসিলেন তিনি একাকী।

আজও পরিষ্কার কিছুই হয় নাই, শুধু সংশয়ের বোঝায় উত্তরোত্তর ভারাক্রান্ত দিনগুলি একটির পর একটি করিয়া নীরবে বহিয়াছে। কেবল উপরের দিকে চাহিয়া একটু বুঝা গিয়াছে যে, আকাশে দুর্ভেদ্য মেঘের স্তর যদি কোনদিন কাটে ত কাটিতে পারে, কিন্তু তাহার পিছনে অন্ধকারই সঞ্চিত হইয়া আছে, চাঁদের জ্যোৎস্না নাই।

সুরেশের পিসিমা নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া মৃণালকে পত্র লিখিয়াছেন, সে পত্র কেদারবাবুর হাতে পড়িয়াছে। মহিম কোন একটা বড় জমিদার-সরকারের গৃহশিক্ষকের কর্ম্ম লইয়াছে জানাইয়া যে সংবাদ দিয়াছে, সে চিঠিখানিও তিনি বার বার পাঠ করিয়াছেন, কোথাও কোনও পক্ষ হইতে তাঁহার কন্যার উল্লেখ-মাত্র নাই, তথাপি চিঠি দুখানির প্রতি ছত্র, প্রত্যেক বর্ণ দুর্ভাগ্য পিতার কর্ণে কেবল একটা কথাই একশবার করিয়া বলিয়াছে যাহাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিবার মত শক্তিই তাঁহার নাই।

অচলা শুধু যে তাঁহার একমাত্র সন্তান, তাই নয়; শিশুকালে যখন তাহার মা মরে, তখন হইতে তিনিই জননীর স্থান অধিকার করিয়া বুকে করিয়া এই মেয়েটিকে মানুষ করিয়া এতবড় করিয়া তুলিয়াছেন। সেই মেয়ের গভীর অকল্যাণের শঙ্কায় তাঁহার শরীর দিন দিন শীর্ণ এবং তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ কালি হইয়া আসিতেছিল, অথচ অমঙ্গল যে পথ ইঙ্গিত করিতেছিল, সে পথ সকল পিতার পক্ষেই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অবরুদ্ধ।

গ্রামের দুই-চারিজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিত, কিন্তু তিনি নিজে কখনও সঙ্কোচে কাহারও গৃহে যাইতেন না। মৃণাল অনুরোধ করিলে হাসিয়া বলিতেন, কাজ কি মা! আমার মত ম্লেচ্ছের কারও বাড়ি না যাওয়াই ত ভাল।

মৃণাল কহিত, তা হলে তাঁরাই বা আসবে কেন?

বৃদ্ধ এ-কথার কোন জবাব না দিয়া ছাতাটি মাথায় দিয়া মাঠের পথে বাহির হইয়া পড়িতেন। সেখানে চাষীদের সঙ্গে তিনি যাচিয়া আলাপ করিতেন। তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা, গৃহস্থালীর কথা, ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্যের কথা—এমনি কত কি আলোচনা করিতে বেলা বাড়িয়া উঠিলে তবে ঘরে ফিরিতেন। প্রত্যহ সকালে চা খাওয়ার পরে এই ছিল তাঁর কাজ।

জন্মকাল হইতে তাঁহারা চিরদিন কলিকাতাবাসী। শহরের বাহিরে যে অসংখ্য পল্লীগ্রাম, তাহার সহিত যোগসূত্র তাঁহাদের বহুপুরুষ পূর্ব্বেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—আত্মীয়-কটুম্বও ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে, অতএব অধিকাংশ নাগরিকের ন্যায় তিনিও যে কিছুই না জানিয়াও ইহাদের সম্বন্ধে বিবিধ অদ্ভুত ধারণা পোষণ করিবেন, তাহাও বিচিত্র নয়। যে অশিক্ষিত অগণিত কৃষিজীবী সুদূর পল্লীতেই সারাজীবন কাটাইয়া দেয়, সহরের মুখ দেখা যাহাদের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে, তাহাদিগকে তিনি একপ্রকার পশু বলিয়াই জানিতেন এবং সেই সমাজটাকেও বন্য সমাজ বলিয়াই বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু আজ দুর্ভাগ্য যখন তাহার তীক্ষ্ণ বিষ-দাঁত দুটো তাঁহার মর্ম্মের মাঝখানে বিদ্ধ করিয়া সমস্ত মনটাকে নিজের সমাজ হইতে বিমুখ করিয়া দিল, তখন যতই এইসকল লেখা-পড়া-বিহীন পল্লীবাসী দরিদ্র কৃষকদের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই একদিকে যেমন তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার আপনার সমাজ, তাহার আচার ও আচরণ, তাহার শিক্ষা ও সংস্কার, তাহার ধর্ম্ম, তাহার সভ্যতা, তাহার বিধি-বিধান সমস্তর বিরুদ্ধেই তাঁহার অন্তর বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

তিনি স্পষ্টই দেখিতে লাগিলেন, ইহারা লেখাপড়া না-জানা সত্ত্বেও অশিক্ষিত নয়। বহুযুগের প্রাচীন সভ্যতা আজও ইহাদের সমাজের অস্থিমজ্জায় মিশিয়া আছে! নীতির মোটা কথাগুলো ইহারা জানে। কোন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ইহাদের বিদ্বেষ নাই; কারণ জগতের সকল ধর্ম্মই যে মূলে এক এবং তেত্রিশ কোটী দেব-দেবীকে অমান্য না করিয়াও যে একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করা যায়, এই জ্ঞান তাহাদের আছে এবং কাহারও অপেক্ষাই কম নাই। হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানের আল্লাও যে একই বস্তু, এ সত্যও তাহাদের অবিদিত নাই।

তাঁহার মন লজ্জা পাইয়া বার বার বলিতে থাকে, ইহারা কিসে আমাদের চেয়ে ছোট? ইহাদের চেয়ে কোন্ কথা আমি বেশি জানি? কিসের জন্য ইহাদের সমাজ, ইহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া আমরা দূরে চলিয়া গিয়াছি? আর সে দূর এত বড় দূর যে, এই-সব আপনজনের কাছে আজ একেবারে ম্লেচ্ছ হইয়া উঠিয়াছি।

এমনিধারা মন লইয়া যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, তখন বেলা প্রায় দশটা। মৃণাল আসিয়া বলিল, কাল তোমার শরীর ভাল ছিল না বাবা, আজ যেন আবার পুকুরে স্নান করতে যেয়ো না। তোমার জন্যে আমি গরম জল করে রেখেচি।

একেবারে করে রেখেচ? বলিয়া কেদারবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

স্নানান্তে মৃণাল আহ্নিক করিতে বসিয়াছিল, তাঁহার সাড়া পাইয়া এইমাত্র উঠিয়া আসিয়াছে। ভিজা চুল পিঠের উপর ছড়ান, পরনে পট্টবস্ত্র, মুখখানি প্রসন্ন, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া যেন অত্যন্ত নির্ম্মল শুচিতা বিরাজ করিতেছে—তাহার প্রতি চোখ রাখিয়া বৃদ্ধ পুনশ্চ কহিলেন, এত কষ্ট কেন করতে গেলে মা, এর ত দরকার ছিল না। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আমি ত কলকাতার মানুষ, কলের জলই আমার চিরকালের অভ্যাস! কিন্তু তুমি আমাকে এমন আশ্রয় দিয়েচ মৃণাল যে, তোমার এঁদো পুকুর পর্য্যন্ত আমার খাতির না করে পারেনি। ওরে জলে আমার কোনদিন অসুখ করে না—আমি পুকুরেই নাইতে যাবো মা।

মৃণাল মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবা, সে হতে পারবে না। কাল তোমার অসুখ করেছিল, আমি ঠিক জানি, আমি জল নিয়ে আসি গে—তুমি তেল মাখতে বসো। বলিয়া সে যাইবার উদ্যোগ করিতেই কেদারবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, সে যেন হলো, কিন্তু আজ এই কথাটা আমাকে বল দেখি মৃণাল, পরকে এমন সেবা করার বিদ্যাটা তুমি এটুকু বয়সের মধ্যে কার কাছে কেমন করে শিখলে? এমনটি যে আর আমি কোথাও দেখিনি মা!

লজ্জায় মৃণালের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, কিন্তু তুমি কি আমার পর বাবা?

কেদারবাবু বলিলেন, না, পর নই—আমি তোমার ছেলে। কিন্তু এমন এড়িয়ে গেলেও চলবে না, জবাব আজ দিয়ে তবে যেতে পাবে।

মৃণাল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তেমনি সলজ্জ হাসিমুখেই উত্তর দিল, এ আর কি এমন শক্ত কাজ যে, চেষ্টা করে শিখতে হবে? এ ত আমাদের জন্মকাল থেকেই শেখা হয়ে থাকে। কিন্তু তোমার জল যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বাবা—

তা যাক, বলিয়া কেদারবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, ঠিক এই কথাটাই আমি কিছুদিন থেকে ভাবচি মৃণাল। মানুষ শিখে তবে সাঁতার কাটে, কিন্তু যে পাখী

জলচর, সে জন্মেই সাঁতার দেয়। এই শেখাটা তার কেউ দেখতে পায় না বটে, কিন্তু কাজটাকে ফাঁকি দিয়ে কেবল ফলটুকু ত পাবার জো নেই মা! এ ত ভগবানের নিয়ম নয়। কোথাও-না-কোথাও, কোন-না-কোন আকারে শেখার দুঃখ তাকে বইতেই হবে। তাই ওই জলচরটার মত যে নীড়ের মধ্যে তুমি জন্মকাল থেকে অনায়াসেই এত বড় বিদ্যে আয়ত্ত করে নিয়েচ, তোমাদের এই বিরাট-বিপুল সমাজ-নীড়টার কথাই আমি দিন-রাত ভাবচি। আমি ভাবি এই যে—

কিন্তু তোমার জল যে একেবারে—

থাক্ না মা জল। পুকুর ত আর শুকিয়ে যাচ্ছে না। আমি ভাবি এই যে, তোমার বুড়ো ছেলেটি শিশুর মত তার মায়ের কাছে গোপনে কত কথাই শিখে নিচ্ছে, সে ত আর তাঁর খবর নেই! আজও ত ঠাকুর-দেবতা, মন্ত্রে-তন্ত্রে কানাকড়ির বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু তবু যখনি মাকে দেখি, স্নানান্তে সেই পাঁশুটে রঙের মটকার কাপড়খানি পরে আহ্নিক করতে যাচ্ছেন, তখনি ইচ্ছা করে, আমিও আবার পৈতে নিয়ে অমন করে কোশা-কুশি নিয়ে বসে যাই।

মৃণাল কহিল, কেন বাবা, তোমার নিজের ধর্ম্ম, নিজের সমাজ ছেড়ে অন্য আচার পালন করতে যাবে? তাকেও ত দোষ কেউ দিতে পারে না।

কেদারবাবু বলিলেন, কেউ পারে কি-না আলাদা কথা, কিন্তু আমি তার গ্লানি করতে বসব না। সে ভাল হোক, মন্দ হোক এ-বয়সে ত্যাগ করবার সামর্থ্য নেই, বদলাবারও উদ্যম নেই। এই রাস্তা ধরেই জীবনের শেষ পর্য্যন্ত চলতে হবে। কিন্তু তোমাকে যখন দেখি—যখন দেখি, এইটুকু বয়সে এত বড় আত্ম-বিসর্জ্জন, যিনি স্বর্গে গেছেন তাঁর প্রতি এই নিষ্ঠা, তাঁর মাকেই মা জেনে—আচ্ছা থাক্ থাক্, আর বলব না। কিন্তু আমিও যার মধ্যে মানুষ হয়ে বুড়ো হয়ে গেলুম মা, তাকেও ত মনে মনে তুলনা না করে থাকতে পারিনে। সমাজ ছাড়া যে ধর্ম্ম, তার প্রতি আর যে আস্থা কোন মতেই টিকিয়ে রাখতে পারিনে মৃণাল।

মৃণাল মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইল। তাহার ব্যক্তিগত জীবনের দুর্ভাগ্যকে যে তিনি এমন করিয়া নিজের সামাজিক শিক্ষাদীক্ষার উপরেই আরোপ করিবেন, ইহা তাহার কাছে অত্যন্ত অবিচার বলিয়া মনে হইল! বলিল, বাবা, ঠিক এমনি করে যখন আমাদের সমাজটাকে দেখতে পাবেনা, তখন এর মধ্যেও অনেক ত্রুটি, অনেক দোষ আপনার চোখে পড়বে। দেখবেন আমরাও নিজেদের দোষগুলো আপনার কাঁধের বদলে সমাজের কাঁধেই তুলে দিতে ব্যস্ত। আমরাও—

কিন্তু কথাটা শেষ না হইতে কেদারবাবু বাধা দিয়া উঠিলেন। কহিলেন, কিন্তু আমি ত ব্যস্ত নয় মা! তোমাদের সমাজে থাক না দোষ, থাক না ত্রুটি—কিন্তু তুমি ত আছ। এইটিই যে আমি মাথা খুঁড়ে মলেও খুঁজে পাব না।

আবার মৃণালের মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল; বলিল, এমন করে আমাকে যদি তুমি একশবার লজ্জা দাও বাবা, তা হলে এমনি পালাব যে, কিছুতেই আর আমাকে খুঁজে পাবে না, তা কিন্তু আগে থেকে বলে রাখচি।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ কোন কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে ম্লানমুখে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তার পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, আমিও তোমাকে আজ বলে রাখছি মা, এই কাজটিই তোমাকে কিছুতে করতে দেব না। তুমি আমার চোখের মণি, তুমি আমার মা, তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়। এই অনাথ অকর্ম্মণ্য বুড়োটার ভার থেকে ছুটি নেবার দিন যেদিন তোমার আসবে মা, সে হয়ত বেশি দূরে নয়, কিন্তু সে আমাকে চোখে দেখতে হবে না, তাও আমি বেশ জানি। বলিতে বলিতেই তাঁহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল।

জামার হাতায় মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, আমার একটা কাজ এখনো বাকী রয়েচে, সেটা মহিমের সঙ্গে দেখা করা। কেন সে পালিয়ে বেড়াচ্চে, একবার স্পষ্ট করে তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। এমনও ত হতে পারে সে বেঁচে নেই?

কেন বাবা, তুমি ও-সব ভয় করচ?

ভয়? বৃদ্ধের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, কহিলেন, সন্তানের মরণটাই বাপের কাছে সবচেয়ে বড় নয় মা।

৩৯

একমাত্র কন্যার মৃত্যুর চেয়েও যে দুর্গতি পিতার চক্ষে বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আভাসমাত্রেই মৃণাল কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া যখন নিঃশব্দে সরিয়া গেল, তখন এই সাধ্বী বিধবা মেয়েটির লজ্জাটা যেন ঠিক একটা মুগুরের মত কেদারবাবুর বুকে আসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একাকী চুপ করিয়া নিজের পাকা দাড়িতে হাত বুলাইলেন, তার পরে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে তেলের বাটিটা টানিয়া লইলেন।

আজ সকালবেলাটা বেশ পরিষ্কার ছিল, কিন্তু মধ্যাহ্নের কিছু পর হইতেই মেঘলা করিয়া আসিতে লাগিল। কেদারবাবু এইমাত্র শয্যায় উঠিয়া বসিয়া পশ্চিমের জানালাটা খুলিয়া দিয়া বাহিরে চাহিয়াছিলেন, সম্মুখে একটা পুষ্পিত পেয়ারা-গাছ ফুলে ফুলে একেবারে ছাইয়া গিয়াছে এবং তাহার উপরে অসংখ্য মৌমাছির আনন্দ-কলরবের আর অন্ত নাই। অদূরে লম্বা দড়িতে বাঁধা মৃণালের স্বহস্ত-পরিমার্জ্জিত চিকন পরিপুষ্ট গাভীটি বড় বড় নিশ্বাস ফেলিয়া চরিয়া ফিরিতেছে

এবং তাহার পিঠের উপর দিয়া পল্লী-পথের কতকটা অংশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

বাবা, তোমার চা-টা এইবার নিয়ে আসি গে?

কেদারবাবু ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, এর মধ্যে নিয়ে আসবে মা!

বাঃ—বেলা বুঝি আর আছে?

তিনি একটু হাসিয়া বালিসের তলা হইতে ঘড়িটি বাহির করিয়া বলিলেন, কিন্তু এখনো যে তিনটে বাজেনি মা!

মৃণাল কহিল, নাই বাজলো বাবা তিনটে; ওবেলা যে তোমার মোটেই খাওয়া হয়নি।

কেদারবাবু মনে মনে বুঝিলেন, আপত্তি নিষ্ফল। তাই বলিলেন, আচ্ছা আনো।

মৃণাল মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিয়া কহিল, আচ্ছা বাবা, তুমি যে বল, তুমি গরম চিঁড়ে বড্ড ভালোবাসো?

কথাটা ত মিছে বলিনে মা।

তবে, তাও দুটি আনি?

তাও আনবে? আচ্ছা আনো গে, বলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া জোর করিয়া একটু হাসিলেন। মৃণাল চলিয়া গেলে আবার সেই জানালাটার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে গিয়াই দেখিলেন, সমস্ত ঝাপ্সা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; পরক্ষণেই পাঁচ-ছয় ফোঁটা তপ্ত অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া তাঁহার কোলের উপর ঝরিয়া পড়িল। ব্যস্ত হইয়া জামার হাতায় বৃদ্ধ জলের রেখা-দুটি মুছিয়া ফেলিয়া মুখখানি শান্ত এবং সহজ দেখাইবার চেষ্টায় এমার্সনের খোলা বইটা চোখের সুমুখে তাড়াতাড়ি মেলিয়া ধরিলেন।

তাহার পাতার ভিতরে যাই থাক্, মনের মধ্যে এই কথাটারই ছাপ পড়িতে লাগিল, এ কি আশ্চর্য্য অজ্ঞেয় ব্যাপার এই সৃষ্টিটা! সংসারের দিনগুলা যখন গণনার মধ্যে আসিয়া ঠেকিল, তখনই কি এই দীর্ঘ জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, সকল আয়োজন বাতিল করিয়া আবার নূতন করিয়া অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন পড়িল; বেশ দেখিতেছি, আমার মানব-জন্মের সমস্ত অতীতটাই একপ্রকার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে—অথচ এ-কথা বুঝিতেও ত বাকী নাই, এই সুদীর্ঘ ফাঁকি ভরিয়া তুলিতে এই একটা মাসই যথেষ্ট হইল।

দ্বারে পদশব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মৃণাল পাথর-বাটিতে চা এবং রেকাবিতে চিঁড়ে-ভাজা লইয়া প্রবেশ করিল। দুই হাত বাড়াইয়া সেগুলি গ্রহণ করিতে করিতে কহিলেন, আজ খাওয়া যে ভাল হয়নি তা এখন টের পাচ্চি। কিন্তু দেখ মা—

না বাবা, তুমি কথা কইতে শুরু করলে সব জুড়িয়ে যাবে।

কেদারবাবু নীরবে চায়ের বাটিটা মুখে তুলিয়া দিলেন এবং শেষ হইলে নামাইয়া রাখিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, আমি এই কামনাই কেবল করি মৃণাল, তুমি আসচে বারে যেন আমার মেয়ে হয়ে জন্মাও। বুকে করে মানুষ করার বিদ্যেটা আমার খুব শেখা আছে মা, সেইটে যেন সে-বার সারাজীবন ভরে খাটাবার অবসর পাই।

শেষ দিকটায় তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু এই ধরণের আলোচনাকেই মৃণাল সবচেয়ে ভয় করিত। তাই তাঁহার অপরিস্ফুট আবেগের প্রতি লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই সহাস্যে কহিল, বা, বেশ ত বাবা, তোমার অনেক ছেলে-মেয়ের মধ্যে আমিও যেন একজন হই।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, অনেক নয় মা, অনেক নয়; কেবল তুমি একা—আমার একটি মেয়ে। একলা তুমি আমার সমস্ত বুক জুড়ে থাকবে। এবার যা কিছু তোমার কাছে শিখে যাচ্ছি, সেগুলি আবার একটি একটি করে আমার মেয়েকে শিখিয়ে দিয়ে আবার ঠিক এমনি করে বুড়ো-বয়সে সমস্তটুকু তার কাছ থেকে ফিরে নিয়ে পরজন্মের পথে যাত্রা করব। বলিয়াই তিনি অলক্ষ্যে একবার চোখের কোণে হাত দিয়া লইলেন।

মৃণাল ক্ষুন্ন-কণ্ঠে কহিল, তুমি কেবল আমাকে অপ্রতিভ কর বাবা। আমি কি জানি বল ত?

এই যে মা আমার খাওয়া হয়নি, আমি নিজে জানলাম না, কিন্তু তুমি জানতে।

ও ত ভারি জানা! যার চোখ আছে সেই ত দেখতে পায়।

কিন্তু ওই চোখটাই যে সকলের থাকে না মৃণাল! বলিয়া একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আমি সবচেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি এই দেখে মা, ভগবান কোথায়, কবে আর কি উপায়ে যে মানুষের যথার্থ আপনার জনটিকে মিলিয়ে দেন, তা কেউ জানে না। এর না আছে আড়ম্বর, না আছে কোন সম্পর্কের বালাই, না আছে সময়ের হিসাব! নিমেষে কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়—কেবল বুক ভরে যখন তাকে পাই, তখনই মনে হয়, এতকাল এত বড় ফাঁকটা সয়েছিলুম কেমন করে?

মৃণাল আস্তে আস্তে বলিল, সে ঠিক কথা বাবা, নইলে তোমার একটা মেয়ে যে এই বনের মধ্যে ছিল, এতদিন ত তার কোন খোঁজ-খবর রাখোনি!

কেদারবাবু কহিলেন, সাধ্য কি মা রাখি, তিনি যতদিন না হুকুম করেন। আবার হুকুম যখন দিলেন তখন কোথাও এতটুকু বাধল না, কিসে যেন হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এলো। আজ লোক দেখচে, এই ত কেবল একটা মাসের পরিচয় কিন্তু আমি জানি, এ ত শুধু আমার বাসা-ভাড়ার হিসাব নয় যে, পাঁজির পাতার সঙ্গে এর মাসকাবারি গণনার মিল হবে! এ যেন কত যুগ-যুগান্তকাল ধরে কেবল তোমার

ছায়াতেই বসে আছি—এর আবার দিন মাস বছর কি! বলিয়া তিনি আবার একটু থামিলেন।

মৃণাল নিজেও কি যেন একটা বলিতে গেল, কিন্তু সহসা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া সে একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, এই বৃদ্ধের অন্তরের মধ্যে এতদিন ধরিয়া যে দুঃখের চিতা নীরবে জ্বলিতেছিল, সে যেন কেমন করিয়া নিবিয়া আসিল বলিয়া; এবং ইহারাই শেষ আভাসটুকু তাঁহার মুখের উপর যে দীপ্তিপাত করিয়াছে, সেই ম্লান আলোকে কোথাকার কোন্ সুগভীর স্নেহ যেন অসীম করুণায় মাখামাখি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা কহিল না—মৃণালের আনত দৃষ্টি মেঝের উপর তেমনি স্থির হইয়া রহিল। এই নীরবতা কেদারবাবুই ভঙ্গ করিলেন। বলিলেন, মৃণাল, আমি এক ধর্ম্মত্যাগ করে যখন আর এক ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেচি, তখন বাইরের কাছে না হোক অন্ততঃ নিজের কাছেও একটা জবাবদিহির দায়ে পড়েচি। সেটা এতদিন কোনমতে এড়িয়ে গেছি বটে, কিন্তু আর বুঝি ঠেকাতে পারিনে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এখন এই কথাটা যেন বুঝতে পারচি—

পলকের জন্য মৃণাল একটুখানি চোখ তুলিতেই কেদারবাবু বলিয়া উঠিলেন, ভয় নেই মা, ভয় নেই, আমি বারংবার তোমার নাম উল্লেখ করে আর তোমাকে সঙ্কোচে ফেলব না, কিন্তু এতকাল পরে এই সত্যটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেচি যে, লড়াই-ঝগড়া বাদাবাদি করে আর যাকেই পাওয়া যাক না, ধর্ম্ম-বস্তুটিকে পাবার জো নেই!

মৃণাল তাঁহার অন্তরের বাক্যটি অনুভব করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, সে-কথা সত্যি হতে পারে বাবা, কিন্তু যে ধর্ম্মটি আমি ভাল বলে বুঝেছি, তাকে গ্রহণ করতে হলেই যে লড়াই-ঝগড়া বাদাবাদি করতে হবে, আমি ত তার কোন প্রয়োজন দেখতে পাইনে।

কেদারবাবু বলিলেন, আমিও যে ঠিক একদিন পেয়েছিলুম তাও না। কিন্তু প্রয়োজন হয়ে পড়ে বৈ কি মৃণাল। কোন বস্তুকেই পরিত্যাগ ত আমরা প্রীতির ভেতর দিয়ে, প্রেমের ভেতর দিয়ে করিনে! যাকে ত্যাগ করে যাই, তার সম্বন্ধে সেই যে মন ছোট হয়ে থাকে, সে ত কোনকালেই ঘোচে না; সেইজন্যই ত আজ মস্ত কৈফিয়তের দায়ে ঠেকেচি মা। কিন্তু তোমরা যা জন্ম থেকেই আপনা-আপনি অতি সহজেই পেয়েচ, সে ভাল হোক, মন্দ হোক, তাকেই অবলম্বন করে চলেচ। তফাতটা একটু চিন্তা করে দেখ দেখি!

মৃণাল মৌন হইয়া রহিল, প্রতিবাদ করিবার মত জবাবটা সে সহসা খুঁজিয়া পাইল না।

কেদারবাবু নিজেই মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, মা! আজ অনেকদিনের

ভুলে-যাওয়া কথাও ধীরে ধীরে জেগে উঠেচে, কিন্তু এতকাল এরা কোথায় লুকিয়ে ছিল!

মৃণাল চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কার কথা বাবা?

কেদারবাবু বলিলেন, আমারি কথা মা। বড় হবার মত বুদ্ধিও ভগবান দেননি, বড় কখনো হতে পারিনি। আমি সাধারণ মানুষ, সাধারণের সঙ্গে মিশেই কাটিয়েচি, কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁরা বড়, যাঁরা সমাজের মাথা, সমাজের আচার্য্য হয়ে গেছেন, তাঁদের উপদেশই চিরকাল ভক্তির সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে এসেচি। তাঁদের সেইসব কতদিনের কত বিস্মৃত বাক্যই না আজ আমার স্মরণ হচ্ছে। তুমি বলেছিলে মৃণাল, ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের মধ্যে, ভালটাকে বেছে নেবার মধ্যে রেষারেষি থাকবেই বা কেন, থাকার প্রয়োজন হবেই বা কিসের জন্যে? আমিও ত এতকাল তাই বুঝেচি, তাই বলে বেড়িয়েচি। কিন্তু আজ দেখতে পেয়েচি, প্রয়োজন ছিলই। আজ দেখতে পেয়েচি, হিন্দুদের মধ্যে যারা এই বলে অভিযোগ করে যে, দেশে-বিদেশে তাদের মাথা আমরা যতখানি হেঁট করে দিতে পেরেচি, ততখানি খ্রীষ্টান পাদ্রীরাও পেরে ওঠেনি—নালিশটা ত আজ তাদের মিথ্যে বলেও ওড়াতে পারিনে মা। বস্তুতঃ বিদেশী বিধর্ম্মীর হাতে আমাদের মত বিভীষণ আর ত কেউ নেই।

মৃণাল অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে দৃকপাত করিলেন না। বলিতে লাগিলেন, মৃণাল, রেষারেষি যদি নাই-ই থাকবে, তা হলে আমাদের মধ্যে যারা সকল বিষয়েই আদর্শ, এমন কি, সমস্ত মানুষের মধ্যেই যাঁরা আদর্শপদবাচ্য, তাঁদের মুখ দিয়ে ধর্ম্মের মন্দিরে, ধর্ম্মের বেদীতে দাঁড়িয়ে 'রাম'কে রেমো, 'হরি'কে হোরে, 'নারায়ণ'কে নারাণ বেরুবে কেন? সকলকে আহ্বান করে উচ্চকণ্ঠে কিসের জন্যে একথা ঘোষণা করবেন যে, দুর্ভাগারা যদি আঘাটায় ডুবে মরতে না চায় ত আমাদের এই বাঁধা-ঘাটে আসুক। মা, ধর্ম্মোপদেশের এই প্রচণ্ড তাল ঠোকায় আমাদের সমাজ-সুদ্ধ সকলের রক্তই তখন ভক্তিতে যেমন গরম, শ্রদ্ধায় তেমনি রুক্ষ হয়ে উঠত—আলোচনায় পুলকের মাত্রাও কোথাও এক তিল কম পড়ত না, কিন্তু আজ জীবনের এই শেষ-প্রান্তে পৌঁছে যেন স্পষ্ট উপলব্ধি করচি, তার মধ্যে উপদেশ যদি বা কিছু থাকে, তা থাক, কিন্তু ধর্ম্মের লেশমাত্রই কোনখানে থাকবার জো ছিল না।

মৃণাল ব্যথিত-কণ্ঠে কহিল, বাবা, এ-সব কথা আমাকে তুমি কেন শোনাচ্ছ? তাঁরা সকলেই যে আমার পূজনীয়, আমার নমস্য! বলিয়া সে দুই হাত জোড় করিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিল। এই ভক্তিমতী তরুণীর নম্রনত মুখখানির পানে চাহিয়া বৃদ্ধ যেন বিভোর হইয়া রহিলেন এবং ক্ষণপরে বাহিরে দাসীর আহ্বানে

মৃণাল উঠিয়া চলিয়া গেলেও তিনি তেমনি একভাবেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শাশুড়ী কেন ডাকিতেছিলেন শুনিয়া খানিক পরে মৃণাল ফিরিয়া আসিতেই কেদারবাবু অকস্মাৎ দুই হাত প্রসারিত করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, মৃণাল, এমনি পরের দোষ-ত্রুটির নালিশ করতে কি সারা জীবনটা আমার কাটবে? এর থেকে কি কোন কালেই মুক্তি পাব না মা?

মৃণাল কহিল, তোমার মশারির কোণটা একটু ছিঁড়ে গেছে বাবা, একবারটি সরে বসো না, ওটুকু সেলাই করে দি। বলিয়া সে কুলুঙ্গি হইতে সেলাইয়ের ক্ষুদ্র কৌটাটি পাড়িয়া লইতেই বৃদ্ধ শয্যা হইতে উঠিয়া একটা মোড়ায় গিয়া বসিলেন এবং ওই কর্ম্মনিরত নির্ব্বাক মেয়েটির আনত মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সে কোনদিকে মুখ না তুলিয়াই আপন মনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু চাহিয়া চাহিয়া কেদারবাবুর দুই চক্ষু নিতান্ত অকারণেই বারংবার অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং কোঁচার খুট দিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন।

সেলাই শেষ করিয়া মৃণাল কৌটাটি তাহার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও-বেলা তুমি কি খাবে বাবা?

প্রশ্ন শুনিয়া কেদারবাবু হঠাৎ একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার অশ্রু-করুণ ওষ্ঠপ্রান্তে একটুখানি হাসির ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ও-বেলায় খাবার কথা ভাববার জন্যে এ-বেলায় ব্যাকুল হবার আবশ্যক নেই মা, সে চিন্তা যথাসময়েই হতে পারবে। কিন্তু তুমি একবার স্থির হয়ে বসো দিকি মা! একটু থামিয়া বলিলেন, এ অপবাদের আজই শেষ। আমার মুখ থেকে আর কখনো কারও নামে অভিযোগ শুনবে না মৃণাল। একটু থামিয়াই পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার উপর তুমি বিরক্ত হয়ো না মা, আমি ঠিক এর জন্যেই এ-প্রসঙ্গের অবতারণা করিনি!

তাঁহার সজল কণ্ঠস্বরে মৃণাল চকিত হইয়া বলিল, অমন কথা তুমি কেন বললে বাবা, আমি কি কোনদিন তোমার প্রতি বিরক্ত হয়েচি!

কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ সবেগে মাথা নাড়িয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, কখনো না মা, কখনো না। তুমি আমার মা কি না, তাই এই বুড়ো ছেলের সকল অত্যাচার উপদ্রবই সস্নেহে হাসিমুখে সয়ে আসচ। কিন্তু এতকাল পরে যে সত্যটা আজ বুকের রক্ত দিয়ে পেয়েচি, তাকেই কেবল তোমাকে দেখাতে চেয়েচি মৃণাল, পরের নিন্দা-গ্লানি করতে চাইনি। আজ যেন নিশ্চয় জানতে পেরেচি, ধর্ম্ম জিনিসটিকে একদিন যেমন আমরা দল বেঁধে মতলব এঁটে ধরতে চেয়েচি, তেমন করে তাকে ধরা যায়-না। নিজে ধরা না দিলে হয়ত তাকে ধরাই যায় না। পরম দুঃখের মূর্ত্তিতে যে-দিন মানুষের চরম বেদনার উপর পা দিয়ে তিনি একাকী এসে দাঁড়ান, তখন কিন্তু

তাঁকে চিনতে পারা চাই। এতটুকু ভুল-ভ্রান্তির তর সয় না মা, তিনি মুখ ফিরিয়ে ফিরে যান। কিন্তু তার মত দুর্ভাগ্য আমার অতিবড় শত্রুর জন্যও আমি কামনা করতে পারিনে মৃণাল।

যে প্রসঙ্গকে মৃণাল ক্রমাগত বাধা দিয়া কাটাইয়া চলিয়াছে, এ যে তাহার ইঙ্গিত, ইহা অনুভব করিয়াই তাহার সঙ্কোচ ও বেদনার অবধি রহিল না, কিন্তু আজ আর সে যে-কোন একটা ছুতা করিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল না, নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

ক্রমান্বয়ে বাধা পাইয়া কেদারবাবুর নিজের দৃষ্টিও এদিকে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, আজ কিন্তু তিনিও কোন খেয়াল করিলেন না, বলিতে লাগিলেন, মা, এক কথা বার বার বলেও আমার তৃপ্তি হচ্ছে না যে, তুমি ছাড়া এত বড় সংসারে আমার আপনার জন আর কেউ কোনদিন ছিল না; তাই বুঝি আমার শেষ-জীবনের সমস্ত বোঝা সমস্ত ভাল-মন্দ কি করে জানিনে, তোমার উপরে এসেই স্থিতিলাভ করেচে। যিনি সকল বিধি-ব্যবস্থার মালিক, এ তাঁরই ব্যবস্থা, আমি অসংশয়ে বুঝে নিয়েচি বলেই আর আমার কোন লজ্জা, কোন কুণ্ঠা নেই। গলগ্রহ বলে প্রথম আমার ভারি বাধ বাধ ঠেকেছিল, কিন্তু আজ আমার মন থেকে তার সমস্ত বালাই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মৃণাল মুখ তুলিয়া একটু হাসিল। কেদারবাবু একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, তবু কেমন বাধে মৃণাল, তবু কেমন গলা দিয়ে কথাটা কিছুতে বার হতে চায় না।

তবে থাক না বাবা—নাই বললে আজ তেমন কথা।

কেদারবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না না, আর থাকবে না—আর থাকলে চলবে না, আমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে, সে সুরেশের সঙ্গেই—

এ সংশয় মৃণালের নিজের মনেও বহুবার ঘা দিয়া গিয়াছে, তাই সে শুধু মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল, কিছুই বলিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বহিয়া গেল, কেদারবাবু প্রবল চেষ্টায় যেন আপনাকে আপনি পরাভূত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, একবার মহিমের কাছে যেতে চাই মৃণাল, একটিবার তার মুখের কথা শুনতে চাই—শুধু এরি জন্য আমার বুকের মধ্যেটা যেন অনুক্ষণ হু হু করে জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু একাকী গিয়ে তার কাছে আমি কেমন করে দাঁড়াব?

মৃণাল তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া তাহার সকরুণ চক্ষু দুটি দুর্ভাগ্য বৃদ্ধের লজ্জিত ভীত মুখের প্রতি স্থির করিয়া কহিল, কেন বাবা তুমি একলা যাবে—যদি যেতেই হয় ত আমরা দুজনেই একসঙ্গে যাবো।

সত্যি যাবে মা?

যাবো বৈকি বাবা। তা ছাড়া, তোমাকে একলা আমি ছেড়েই বা দেব কেন? তুমি যেখানেই যাও না, আমি সঙ্গে না গিয়ে কিছুতেই ছাড়ব না, তা বলে রাখচি। আমাকে কেউ সঙ্গে নিতে চায় না বাবা, আমি কোথাও একটু বেড়াতে পাইনে।

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ কোন কথা বলিলেন না, কেবল দুই করতল মুখের উপর চাপা দিয়া নিজের দুই জানুর উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই দেখিতে পাওয়া গেল, এই শুষ্ক শীর্ণ দেহখানির একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভেতরের অব্যক্ত বেদনায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

মৃণাল নিঃশব্দে তাঁহার শিয়রের কাছে বসিয়া রহিল, একটি কথা একটি সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ পর্য্যন্ত করিল না! একমাত্র কন্যার ঘৃণ্যতম দুর্গতিতে যে পিতার হৃদয় বিদ্ধ হইতেছে, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার তাহার কি-ই বা ছিল।

এমন করিয়া বহুক্ষণ কাটিলে পরে বৃদ্ধ আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন, মা!

তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া মৃণালের বুক ফাটিয়া গেল, কিন্তু সে প্রাণপণে অশ্রু নিরোধ করিয়া সাড়া দিল, কেন বাবা?

সংসারে ব্যথার পরিমাণ যে এত বড়ও হতে পারে, এ ত' কখনো ভাবিনি মৃণাল? এর থেকে পরিত্রাণের কি কোথাও কোন পথ নেই? কেউ কি জানে না?

কিন্তু বাবা, লোকে মৃত্যুর শোকও ত সহ্য করতে পারে!

কেদারবাবু বলিলেন, আমার পক্ষে সে মৃত, এই ত তুমি বলচ মা! এক হিসাবে তাই বটে। অনেকবার আমার মনেও হয়েচে—কিন্তু মৃত্যুর শোক যেমন বড়, তার শান্তি, তার মাধুর্য্য তেমনি বড়। কিন্তু সে সান্ত্বনার উপায় কৈ মৃণাল? এর দুঃসহ গ্লানি, অসহ্য লজ্জা আমার বুকের পথ জুড়ে এমনি বেধে আছে যে কোথাও তাদের নাড়িয়ে রাখবার এতটুকু ফাঁক নেই। বলিয়া চক্ষু মুদিয়া বুকের উপর হাতখানি পাতিয়া রাখিয়া আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, মা, সন্তানের মৃত্যু যিনি দেন, তাঁকে আমরা এই বলে ক্ষমা করি যে, তাঁর কার্য্যকরণ আমরা জানিনে! আমরা—

মৃণাল হঠাৎ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, বাবা, আমরাও তা হলে তাই করতে পারি! যে কেউ হোক না, যার কার্য্যকরণ আমাদের জানা নেই, তাকে মাপ করতেই যদি না পারি, অন্ততঃ মনে মনে তার বিচার করে তাকে অপরাধী করে রাখব না।

বৃদ্ধ ঠিক যেন চমকিয়া উঠিলেন, এবং দুই চক্ষের তীব্র দৃষ্টি অপরের মুখের প্রতি একাগ্র করিয়া পাথরের মত নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন।

মৃণাল সলজ্জমুখে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, তা ছাড়া আমি সেজদার

কাছেই শুনেচি বাবা, যে সংসারে এমন অপরাধ অল্পই আছে ইচ্ছে করলে যাকে ক্ষমা করা না যায়।

কেদারবাবু উত্তেজনায় সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এ অপরাধও কি কেউ কোনদিন মাপ করতে পারে মৃণাল?

মৃণাল চুপ করিয়া রহিল। তিনি তেমনি তীব্রস্বরে কহিতে লাগিলেন, কখনও নয়, কখনও নয়। বাপ হয়ে তার এ দুষ্কৃতি আমি কোনমতেই ক্ষমা করব না। ক্ষমার যোগ্য নয়, ক্ষমা করা উচিত নয়—এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলে দিলাম।

মৃণাল ধীরে ধীরে বলিল, যোগ্য অযোগ্য ত বিচারের কথা বাবা, তাকে ক্ষমা বলা চলে না। তা ছাড়া ক্ষমার ফল কি শুধু অপরাধীই পায়, যে ক্ষমা করে, সে কি কিছুই পায় না বাবা?

বৃদ্ধ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। মেয়েটির এই শান্ত স্নিগ্ধ কথাগুলি এক মুহূর্ত্তেই তাঁকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, এমন করে ত আমি ভেবে দেখিনি মৃণাল! তোমার কাছে আজ যেন আবার এক নূতন তত্ত্ব লাভ করলুম মা। ঠিক কথাই ত! যে গ্রহণ করে, লাভের খাতায় তাকে কি কেবল ষোল-আনা উসুল দিয়ে দাতার অঙ্কে শূন্য বসাতে হবে? এমন কিছুতেই সত্য হতে পারে না। ঠিক ঠিক। কার অপরাধ কত বড়, সে বিচার যার খুশি সে করুক, আমি ক্ষমা করব কেবল আমার পানে চেয়ে। এই না মা তোমার উপদেশ?

কেন বাবা, এই সব বলে আমার অপরাধ বাড়াচ্ছ?

তোমার অপরাধ? সংসারে তারও কি স্থান আছে মা?

মৃণাল হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ঐ বুঝি মা আমাকে আবার ডাকচেন—আমি এখনি আসচি বাবা। বলিয়া সে দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৪০

মৃণাল উঠিয়া গেল, কিন্তু কেদারবাবু সেদিকে আর যেন লক্ষ্যই করিলেন না। কেবল নিজের কথার সুরে মগ্ন থাকিয়া আপনমনে কহিতে লাগিলেন, আমি বাঁচিলাম! আমি বাঁচিলাম মা, আমাকে তুমি বাঁচাইয়া দিলে। দুর্গতির দুর্গম অরণ্যে যখন দু'চক্ষু বাঁধা, মৃত্যু ভিন্ন আর যখন আমার সমস্ত রুদ্ধ, তখন হাতের পাশেই যে মুক্তির এত বড় রাজপথ উন্মুক্ত ছিল, এ খবর তুমি ছাড়া আর কে দিতে পারিত! ক্ষমার কথা ত কখনো ভাবিতেই পারি নাই। যদি কখনো মনে

হইয়াছে, তখনি তাহাকে দুই হাতে ঠেলিয়া দিয়া সজোরে, সগর্ব্বে ইহাই বলিয়াছি, না, কদাচ না! মেয়ে হইয়া এত বড় অপরাধ যে করিতে পারিল, বাপ হইয়া এত বড় দান তাহাকে কোনমতেই দিতে পারি না। কিন্তু ওরে অন্ধ, ওরে মূঢ়, ওরে কৃপণ, পিতা হইয়া তুই যাহা দিতে পারিস্ না, অপরে তাহা দিবে কি করিয়া? আর সে তোর কতটুকু বা লইয়া যাইবে? তোর ক্ষমার সবটুকু যে তোর আপন ঘরেই ফিরিয়া আসিবে। তোর মৃণাল মায়ের এই তত্ত্বটাকে একবার দু'চক্ষু মেলিয়া দেখ্। বলিয়া তিনি ঠিক যেন কিছু একটা দেখিবার জন্যই দু'চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মেঘলা আকাশের পানে চাহিয়া মনে মনে প্রাণপণ বলে কহিতে লাগিলেন, আমি ক্ষমা করিলাম, আমি ক্ষমা করিলাম! সুরেশ, তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম। অচলা, তোমাকেও ক্ষমা করিলাম! পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ যে কেহ যেখানে আছে, আমি সকলকে ক্ষমা করিলাম! আজ হইতে কাহারো বিরুদ্ধে আমার কোন অভিমান, কোন নালিশ নাই, আজ আমি মুক্ত, আজ আমি স্বাধীন, আজ আমি পরমানন্দময়! বলিতে বলিতেই অনির্ব্বচনীয় করুণায় তাঁহার দু'চক্ষু মুদিয়া আসিল, এবং হাতদুটি একত্র করিয়া ধীরে ধীরে ক্রোড়ের উপর রাখিতেই সেই নিমীলিত নেত্র-প্রান্ত হইতে পিতৃস্নেহ যেন অজস্র অশ্রু-ধারায় ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আর কম্পিত ওষ্ঠাধর দুটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিতে লাগিল, মা! তুই কোথায় আছিস— একবার কেবল ফিরিয়া আয়! আমি তোকে পৃথিবীতে আনিয়াছি, আমি তোকে বুকে করিয়া বড় করিয়াছি—মা, তোর সমস্ত অপরাধ, সমস্ত অপমান লাঞ্ছনা লইয়া আর একবার পিতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আয় অচলা, আমি বুক দিয়া তোর সকল ক্ষত, সকল জ্বালা মুছিয়া লইয়া আবার তেমনি করিয়াই মানুষ করিব। আমরা লোকালয়ে আসিব না, ঘরের বাহির হইব না, শুধু তুই আর আমি—

বাবা?

বৃদ্ধ মুখ ফিরিয়া মৃণালের মুখের পানে চাহিলেন, বোধ করি একবার আপনাকে সংযত করিবার চেষ্টাও করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বালকের মত আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন—মা! মা! আমার বুক ফেটে গেল! সবাই তাকে কত দুঃখ, কত ব্যথাই না দিচ্চে! আর আমি পারি না!

মৃণাল কিছুই বলিল না, শুধু কাছে আসিয়া তাঁহার ভূলুণ্ঠিত মাথাটি নীরবে কোলে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। তাঁহার নিজের দু'চোখ বহিয়াও জল পড়িতে লাগিল।

প্রথম ফাল্গুনের এই মেঘ-ঢাকা দিনটি হয়তো এমনভাবেই শেষ হইয়া যাইত, কিন্তু হঠাৎ কেদারবাবু চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন; কহিলেন, মৃণাল, মহিমকে চিঠি লিখলে কি জবাব পাওয়া যাবে না?

কেন যাবে না বাবা? আমার ত মনে হয় কাল-পরশুর মধ্যেই তাঁর উত্তর পাবে?

তুমি কি তাঁকে কিছু লিখেচ?

মৃণাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

চিঠিতে কি লেখা হয়েচে, এ-কথা বৃদ্ধ সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলেন না। বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এখনো খানিক বেলা আছে, আমি একটু ঘুরে আসি। বলিয়া তিনি গায়ের কাপড়খানি টানিয়া লাঠিটি হাতে করিলেন, কিন্তু দুই-এক পদ অগ্রসর হইয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কিন্তু দেখ মা—

কি বাবা?

আমি ভয় করচি—না ভয় ঠিক নয়—কিন্তু আমি ভাবচি যে—

কিসের বাবা?

কি জানো মা, আমি ভাবচি—আচ্ছা, তুমি কি মনে কর মৃণাল, আমরা যেতে চাইলে মহিম আপত্তি করবে?

এই ভয় এবং ভাবনা-দুই-ই মৃণালের যথেষ্ট ছিল এবং মনে মনে ইহার জবাবটাও সে একপ্রকার ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল; তাই তৎক্ষণাৎ কহিল, এখন সে খোঁজে আমাদের কাজ কি বাবা? তাঁর ঠিকানা জানলেই আমরা চলে যাবো—তার পরে সেজদা যখন আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন, তখন দুনিয়ায় জানবার মত অনেক কথা আপনি জানা যাবে বাবা। সে আর কাউকে প্রশ্ন করতে হবে না।

কেদারবাবু মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, তা হলে সত্যিই তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

মৃণাল কহিল, সত্যি, কিন্তু আমি ত তোমার সঙ্গে যাবো না বাবা, বরঞ্চ তুমিই আমার সঙ্গে যাবে।

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ আবার একটা কি বলিতে গেলেন, কিন্তু কেবলমাত্র ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

ঠিক এমনি এক ফাল্গুনের অপরাহ্নবেলায় এই বাঙলাদেশের বাহিরে আরও দুটি নর-নারীর চোখের জল সেদিন এমনি অসংবরণীয় হইয়া উঠিতেছিল; সুরেশ যখন শিলমোহরকরা বড় খামখানি অচলার হাতে দিয়া কহিল, এতদিন দিই দিই করেও এ কাগজখানি তোমার হাতে দিতে আমার সাহস হয়নি, কিন্তু আজ আমার আর না দিলেই নয়।

অচলা খামখানি হাতে লইয়া দ্বিধাভাবে কহিল, তার মানে?

সুরেশ একটু হাসিয়া বলিল, দুনিয়ায় আমার সাহস হয় না, এমন ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য বস্তু আবার কি ছিল, এ ত তুমি ভাবচো? ভাবতে পারো—আমিও অনেক ভেবেচি। এর মানে যদি কিছু থাকে, একদিন তা প্রকাশ পাবেই। কিন্তু অনেক অপমান, অনেক দুঃখের বোঝাই ত সংসারে তুমি আমার কাছে অর্থ না বুঝেই নিয়েচ—একে তেমনি নাও অচলা।

অচলা শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এর মধ্যে কি আছে?

সুরেশ হাত জোড় করিয়া কহিল, এতদিন যা কিছু তোমার কাছে পেয়েচি, ডাকাতের মত জোর করেই পেয়েচি। কিন্তু আজ শুধু একটি জিনিস ভিক্ষে চাইচি—এ-কথা তুমি জানতে চেয়ো না।

অচলা চুপ করিয়া রহিল, ইহার পরে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

বাহিরে পর্দ্দার আড়াল হইতে বেয়ারা ডাকিয়া কহিল, বাবুজী, এক্কাওয়ালা বলচে, আর দেরি করলে পৌঁছুতে রাত্রি হয়ে যাবে। পথে হয়ত ঝড়-বৃষ্টিও হতে পারে।

অচলা চকিত হইয়া কহিল, আজ আবার তুমি কোথায় যাবে? এমন সময়ে?

সুরেশ হাসিমুখে সংশোধন করিয়া কহিল, অর্থাৎ এমন অসময়ে। যাচ্ছি ওই মাঝুলিতেই! প্লেগের ডাক্তার কিছুতে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ গ্রামগুলো একেবারে শ্মশান হয়ে পড়েচে। এবার পাঁচ-সাত দিন থাকতে হবে—আর কে জানে, হয়ত একেবারেই বা থেকে যেতে হবে। বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

অচলা স্থির হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে নিজেও কিছু কিছু সংবাদ জানিত; সাত-আট ক্রোশ দূরে কতকগুলো গ্রাম যে সত্যই এ-বৎসর প্লেগে শ্মশান হইয়া যাইতেছে, এ খবর সে শুনিয়াছিল! সদর হইতে এতদূরে এই ভীষণ মহামারীতে দরিদ্রের চিকিৎসা করিতে যে চিকিৎসকের অভাব ঘটিবে, ইহাও বিচিত্র নয়। সুরেশ বহু টাকার ঔষধ-পথ্য যে গোপনে দিকে দিকে প্রেরণ করিতেছে, ইহাও সে টের পাইয়াছিল; এবং নিজেও প্রায় ভোরে উঠিয়া কোথাও না-কোথাও চলিয়া যায়। ফিরতে কখনো সন্ধ্যা, কখনো রাত্রি হয়—পরন্তু ত আসিতে পারে নাই, কিন্তু সে যে বাড়ি ছাড়িয়া, তাহাকে ছাড়িয়া একেবারে কিছুদিনের মত সেই মরণের মাঝখানে গিয়া বাস করিবার সঙ্কল্প করিবে, ইহা সে কল্পনাও করে নাই। তাই কথাটা শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য সে কেবল নিঃশব্দে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। এই যে মহাপাপিষ্ঠ, যে ভগবান মানে না, পাপ-পুণ্য মানে না, যে একমাত্র বন্ধু ও তাহার নিরপরাধা স্ত্রীর এত বড় সর্ব্বনাশ অবলীলাক্রমে সাধিয়া বসিল, কোন বাধা মানিল না—তাহার মুখের প্রতি সে যখনই চাহিয়াছে, তখনই সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় বিষ হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে তাহারই

পানে চাহিয়া সমস্ত অন্তর তাহার বিবে নয়, অকস্মাৎ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ওই লোকটির ওষ্ঠের কোণে তখনও একটুখানি হাসির রেখা ছিল—অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু সেইটুকু হাসির মধ্যেই যেন অচলা বিশ্বের সমস্ত বৈরাগ্য ভরা রহিয়াছে দেখিতে পাইল। মুখে তাহার উদ্বেগ নাই, এই যে মৃত্যুর মধ্যে গিয়া নামিয়া দাঁড়াইতে যাত্রা করিয়াছে—তথাপি মুখের উপর শঙ্কার চিহ্নমাত্র নাই। তবে এই নিরীশ্বর ঘোর স্বার্থপরের কাছেও কি তাহার নিজের প্রাণটা এতই সস্তা! সংসারে ভোগ ছাড়া যে লোক আর কিছুই বুঝে না—ভোগের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে মগ্ন রহিয়াও কি বাঁচিয়া থাকাটা তাহার এমনি অকিঞ্চিৎকর, এমনি অবহেলার বস্তু যে, এতই সহজে সমস্ত ছাড়িয়া যাইতে এক নিমিষে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল? হয়ত না ফিরতেও পারি! ইহা আর যাহাই হোক, পরিহাস নয়। কিন্তু কথাটা কি এতই সহজে বলিবার?

অকস্মাৎ ভিতরের ধাক্কায় সে যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, হাতের কাগজখানা দেখাইয়া প্রশ্ন করিল, এটা কি তোমার উইল?

সুরেশও প্রশ্ন করিল, যা এইমাত্র ভিক্ষে দিলে অচলা, তাই কি তবে ফিরে নিতে চাও?

অচলা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আচ্ছা আমি জানতে চাইনে। কিন্তু আমি তোমাকে যেতে দিতে পারবো না।

কেন?

প্রত্যুত্তরে অচলা এই খামখানাই পুনরায় নাড়াচাড়া করিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তুমি আমার যাই কেন না করে থাকো, আমার জন্যে তোমাকে আমি মরতে দেবো না।

সুরেশ জবাব দিল না। অচলা নিজের কথায় একটু লজ্জা পাইয়া কথাটাকে হাল্কা করিবার জন্য পুনশ্চ কহিল, তুমি বলবে, তোমার জন্যে মরতে যাবো কোন্ দুঃখে, আমি যাচ্ছি গরীবদের জন্য প্রাণ দিতে, বেশ তাও আমি দেব না।

কথাটা শুনিয়াই দপ্ করিয়া সুরেশের মহিমকে মনে পড়িল এবং বুকের ভিতর হইতে একটা নিশ্বাস উত্থিত হইয়া স্তব্ধ ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। কারণ জীবনের মমতা যে কত তুচ্ছ এবং কতই না সহজ, ইহাকে সে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার একটিমাত্র সাক্ষী আজও আছে, সে কেবল মহিম। আজিকার এই যাত্রাই যদি তাহার মহাযাত্রা হয় ত সেই সঙ্গিহীন একান্ত নীরব মানুষটিই কেবল মনে মনে বুঝিবে, সুরেশ লোভে নয়, ক্ষোভে নয়, ঘৃণায় নয়—ইহকাল-পরকাল কোন কিছুর আশাতে প্রাণ দেয় নাই, সে মরিয়াছে শুধু কেবল মরণটা আসিয়াছিল বলিয়াই।

চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিতে চাহিল, কিন্তু সংবরণ করিয়া ফেলিল। বরঞ্চ মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, আমি কারও জন্তেও মরতে চাইনে অচলা! চুপ করিয়া নিরর্থক বসে বসে আর ভাল লাগে না, তাই যাচ্ছি একটু ঘুরে বেড়াতে। মরব কেন অচলা, আমি মরব না।

তবে এ উইল কিসের জন্য?

কিন্তু এটা যে উইল, সে ত প্রমাণ হয়নি।

না হোক, কিন্তু আমাকে একলা ফেলে তুমি চলে যাবে?

চলেই যে যাবো, আর যে ফিরব না, সেও ত স্থির হয়ে যায়নি।

যায়নি বৈ কি! এই বিদেশে আমাকে একেবারে নিরাশ্রয় করে তুমি- বলিয়াই অচলা কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরেশ উঠিতে গিয়াও বসিয়া পড়িল। একটা অদম্য আবেগ জীবনে আজ সে এই প্রথম সংযত করিয়া লইয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে থাকিয়া শান্ত-কণ্ঠে কহিল, অচলা, আমি ত তোমার সঙ্গী নই। আজও তুমি একা, আর সেদিন যদি সত্যিই এসে পড়ে ত তখনও এর চেয়ে তোমাকে বেশি নিরাশ্রয় হতে হবে না।

অচলার চোখ দিয়া জল পড়িতেই ছিল, সেই অশ্রুভরা দু'চক্ষু তুলিয়া সুরেশের মুখের প্রতি নিবদ্ধ করিল, কিন্তু ওষ্ঠাধর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তার পরে দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া সেই কম্পন নিবারণ করিতে গিয়া অকস্মাৎ ভগ্নকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, আমার কাছে আর তুমি কি চাও, আর আমার কি আছে? এবং বলিতে বলিতেই মুখে আঁচল গুঁজিয়া দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বেয়ারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, এক্কাওয়ালা—

আচ্ছা, আচ্ছা, তাকে সবুর করতে বল।

অনতিবিলম্বে সহিস আসিয়া জানাইল যে, গাড়ি তৈরী হইয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছে।

গাড়ি কেন?

সহিস যাহা কহিল তাহাতে বুঝা গেল, মাইজি ও-বাড়িতে বেড়াইতে যাইবেন বলিয়া হুকুম দিয়াছিলেন, কিন্তু দাসী বলিতেছে, ঘরের দরজা বন্ধ এবং অনেক ডাকাডাকিতেও সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। ঘোড়া খুলিয়া দেওয়া হইবে কি না, ইহাই সে জানিতে চায়।

আচ্ছা, সবুর কর।

এ-ঘরের ভিতরের দিকের কবাটটা খোলাই ছিল, ইহারই পর্দা সরাইয়া সুরেশ নিঃশব্দে তাহাদের শয়ন-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তেমনি নিঃশব্দে অদূরে একটা চৌকির উপর উপবেশন করিল। এ কক্ষ তাহাদের দু'জনের, এখানে সে

অনধিকার প্রবেশ করে নাই, কিন্তু ওই যে প্রশস্ত শুভ্র-সুন্দর শয্যার উপর সুন্দরী নারী উপুড় হইয়া কাঁদিতেছে, উহার কোনটাই আজ তাহার মনকে সম্মুখে আকর্ষণ করিল না, বরঞ্চ পীড়ন করিয়া পিছনে ঠেলিতে লাগিল। তাহার আগমন অচলা টের পায় নাই, সে কাঁদিতেই লাগিল এবং তাঁহারই প্রতি নিষ্পলক দৃষ্টি রাখিয়া সুরেশ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুদিন হইতে নিজের ভুল তাহার কাছে ধরা পড়িতেছিল, কিন্তু ওই লুণ্ঠিত দেহলতা, ওই বেদনা—ইহার সম্মিলিত মাধুর্য্য তাহার চোখের ঠুলিটাকে যেন এক নিমিষে ঘুচাইয়া দিল। তাহার মনে হইল, প্রভাত-রবিকরে পল্লবপ্রান্তে যে শিশিরবিন্দু দুলিতে থাকে, তাহার অপরূপ অফুরন্ত সৌন্দর্য্যকে যে লোভী হাতে লইয়া উপভোগ করিতে চায়, ভুলটা সে ঠিক তেমনিই করিয়াছে। সে নাস্তিক, সে আত্মা মানে না; যে প্রস্রবণ বাহিয়া অনন্ত সৌন্দর্য্য নিরন্তর ঝরিতেছে, সেই অসীম তাহার কাছে মিথ্যা, তাই স্থূলটার প্রতি সমস্ত দৃষ্টি একাগ্র করিয়া সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল, এই সুন্দর দেহটাকে দখল করার মধ্যেই তাহার পাওয়াটা আপনা-আপনি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আজ তাহার আকাশস্পর্শী ভুলের প্রাসাদ একমুহূর্ত্তে চূর্ণ হইয়া গেল। প্রাপ্তির সে অদৃশ্য ধরা হইতে বিচ্যুতি করিয়া পাওয়াটা যে কত বড় বোঝা, এ যে কত বড় ভ্রান্তি, এ তথ্য আজ তাহার মর্ম্মস্থলে গিয়া বিঁধিল। শিশিরবিন্দু মুঠার মধ্যে যে কি করিয়া এক ফোঁটা জলের মত দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া উঠে, অচলার পানে চাহিয়া চাহিয়া সে কেবল এই সত্যটাই দেখিতে লাগিল। হায় রে, পল্লবপ্রান্তটুকুই যাহার ভগবানের দেওয়া স্থান, ঐশ্বর্য্যের এই মরুভূমিতে আনিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে কি করিয়া?

অজ্ঞাতসারে তাহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল, মুছিয়া ফেলিয়া ডাকিল, অচলা!

অচলা চমকিয়া উঠিল, কিন্তু তেমনি নীরবে পড়িয়া রহিল। সুরেশ বলিল, তোমার গাড়ি তৈরি, আজ রামবাবুদের ওখানে বেড়াতে যাবে?

তথাপি সাড়া না পাইয়া বলিল, যদি ইচ্ছা না থাকে ত আজ না হয় ঘোড়া খুলে দিক্। আমিও বোধ হয় আজ বার হতে পারব না। এক্কা ফিরিয়ে দিতে বলে দিই গে। বলিয়া সে বসিবার ঘরে ফিরিয়া চলিয়া গেল।

তথায় দশ-পনের মিনিট সে যে কি ভাবিতেছিল, তাহা নিজেই জানে না, হঠাৎ শাড়ির খস্ খস্ শব্দে সচেতন হইয়া সুমুখেই দেখিল অচলা। সে চোখের রক্তিমা যতদূর সম্ভব জল দিয়া ধুইয়া ধনী গৃহিণীর উপযুক্ত সজ্জায় একেবারে সজ্জিত হইয়াই আসিয়াছিল। কহিল, ওঁদের ওখানে আজ একবার যাওয়া চাই-ই।

এই সাজ-সজ্জা তাহার নিজের জন্য নয়, ইহা যে তথাকার আগন্তুক রাজ-

অতিথিদের উপলক্ষ্য করিয়া, এ-কথা সুরেশ বুঝিল; তথাপি এই মণি-মুক্তাখচিত রত্নালঙ্কার-ভূষিতা সুন্দরী নারী ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। বিস্ময়-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, চাই-ই কেন?

রাক্ষুসী জ্বর নিয়েই কলকাতা থেকে ফিরেচে—খবর পেলুম, জ্যাঠামশাই নিজেও নাকি কাল থেকে জ্বরে পড়েচেন।

আসা পর্য্যন্ত তুমি কি একদিনও তাদের বাড়ি যাওনি?

না।

তাঁরাও কেউ আসেনি।

আচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না।

রামবাবু নিজেও আসেননি?

না।

এ-বাটীতে আসিয়া পর্য্যন্ত সুরেশ প্লেগ লইয়া আপনাকে এমনি ব্যাপৃত রাখিয়াছিল যে গৃহস্থালী ও আত্মীয়তার এই সকল ছোট-খাটো ত্রুটি সে লক্ষ্য করে নাই। তাই কথা শুনিয়া যথার্থই বিস্ময়ভরে কহিল, আশ্চর্য্য! আচ্ছা যাও।

অচলা বলিল, আশ্চর্য্য তাঁদের তত নয়, যত আমাদের। একজনের জ্বর, একজন নিজেও অসুখে না পড়া পর্য্যন্ত আত্মীয়দের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন। উচিত ছিল আমাদেরই যাওয়া।

আচ্ছা, যাও। একটু সকাল সকাল ফিরো।

অচলা এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তুমিও সঙ্গে চল।

আমাকে কেন।

অচলা রাগ করিয়া কহিল, নিজের অসুখের কথা মনে করতে না পারো, অন্ততঃ ডাক্তার বলেও চল।

আচ্ছা চল, বলিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাপড় ছাড়িতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

একাওয়ালা কোন কিছুই হুকুম না পাইয়া তখনও অপেক্ষা করিয়াছিল। নীচে নামিয়া তাহাকে দেখিয়াই অচলা খামকা রাগিয়া উঠিয়া বেয়ারাকে তাহার কৈফিয়ৎ চাহিল এবং ভাড়া দিয়া তৎক্ষণাৎ বিদায় দিতে আদেশ করিল। সে সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কাল—

অচলাই তাহার জবাব দিল, কহিল, না। বাবুর যাওয়া হবে না, একার দরকার নেই।

গাড়িতে উঠিয়া সুরেশ সম্মুখের আসনে বসিতে যাইতেছিল, আজ অচলা সহসা তাহার জামার খুঁট ধরিয়া টানিয়া পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিল। গাড়ি চলিতে

লাগিল, কেহই কোন কথা কহিল না, পাশা-পাশি বসিয়া দু'জনেই দুইদিকে খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাগানের গেট পার হইয়া গাড়ি যখন রাস্তায় আসিয়া পড়িল, তখন সুরেশ আস্তে আস্তে ডাকিল, অচলা!

কেন?

আজকাল আমি কি ভাবি জানো?

না।

এতকাল যা ভেবে এসেচি ঠিক তার উল্টো। তখন ভাবতুম কি করে তোমাকে পাবো; এখন অহর্নিশি চিন্তা করি, কি উপায়ে তোমাকে মুক্তি দেব। তোমার ভার যেন আমি আর বইতে পারিনে।

এই অচিন্ত্যপূর্ব একান্ত নিষ্ঠুর আঘাতের গুরুত্বে ক্ষণকালের জন্য অচলার সমস্ত দেহ-মন একেবারে অসাড় হইয়া গেল। ঠিক যে বিশ্বাস করিতে পারিল তাহাও নয়, তথাপি অভিভূতের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, আমি জানতুম। কিন্তু এ ত—

সুরেশ বলিল, হাঁ, আমারই ভুল; তোমরা যাকে বল পাপের ফল। কিন্তু তবুও কথাটা সত্য। মন ছাড়া যে দেহ, তার বোঝা এমন অসহ্য ভারী, এ স্বপ্নেও ভাবিনি।

অচলা চোখ তুলিয়া কহিল. তুমি কি আমাকে ফেলে চলে যাবে?

সুরেশ লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া জবাব দিল, বেশ, ধর তাই।

ওই নিঃসঙ্কোচ উত্তর শুনিয়া অচলা একেবারে নীরব হইয়া গেল। তাহার রুদ্ধ হৃদয় মথিত করিয়া কেবল এই কথাটাই চারিদিকে মাথা কুটিয়া ফিরিতে লাগিল, এ সেই সুরেশ! এ সেই সুরেশ! আজ ইহারই কাছে সে দুঃসহ বোঝা, আজ সেই-ই তাহাকে ফেলিয়া যাইতে চাহে! কথাটা মুখের উপর উচ্চারণ করিতেও আজ তাহার কোথাও বাধিল না।

অথচ পরমাশ্চর্য্য এই যে, এই লোকটিই তাহার সীমাহীন দুঃখের মূল! কাল পর্য্যন্ত ইহার বাতাসে সমস্ত দেহ বিষে ভরিয়া গিয়াছে!

মেঘাবৃত অপরাহ্ণ আকাশতলে নির্জ্জন রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া গাড়ি দ্রুত বেগে ছুটিয়াছে, তাহারই মধ্যে বসিয়া এই দুটি নর-নারী একেবারে নির্ব্বাক্। সুরেশ কি ভাবিতেছিল সেই জানে, কিন্তু তাহার উচ্চারিত বাক্যের কল্পনাতীত নিষ্ঠুরতাকে অতিক্রম করিয়াও নতুন ভয়ে অচলার সমস্ত মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুরেশ নাই—সে একা। এই একাকিত্ব যে কত বৃহৎ, কিরূপ আকুল, তাহা বিদ্যুদ্বেগে তাহার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় যে তরণী বাহিয়া যে সংসার-

সমুদ্রে ভাসিয়াছে, সে যে অনিবার্য্য মৃত্যুর মধ্যেই তিল তিল করিয়া ডুবিতেছে, ইহা তাহার চেয়ে বেশি কেহ জানে না, তথাপি সেই সুপরিচিত ভয়ঙ্কর আশ্রয় ছাড়িয়া আজ সে দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে ভাসিতেছে, ইহা কল্পনা করিয়াই তাহার সর্ব্বশরীর হিম হইয়া গেল। আর তাহার কেহ নাই; তাহাকে ভালবাসিতে, তাহাকে ঘৃণা করিতে, তাহাকে রক্ষা করিতে, তাহাকে হত্যা করিতে, কোথাও কেহ নাই; সংসারে সে একেবারেই সঙ্গ-বিহীন! এই কথা মনে করিয়া তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সহসা তাহার অশক্ত অবশ ডান হাতখানি থপ্ করিয়া সুরেশের ক্রোড়ের উপর পড়িতেই সে চমকিয়া চাহিল। অচলা নিরুদ্বেগ-কণ্ঠ প্রাণপণে পরিষ্কার করিয়া কহিল, আর কি তুমি আমাকে ভালবাস না?

সুরেশ হাতখানি তাহার সযত্নে নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া কহিল, এ প্রশ্নের জবাব তেমন নিঃসংশয়ে দিতে পারিনে অচলা, মনে হয় সে যাই হোক, এ কথা সত্য যে, এই ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াবার আর আমার শক্তি নেই।

অচলা আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া অত্যন্ত মৃদু করুণকণ্ঠে কহিল, তুমি আর কোথাও আমাকে নিয়ে চল—

যেখানে কোন বাঙালী নেই?

হাঁ। যেখানে লজ্জা আমাকে প্রতিনিয়তই বিঁধবে না—

সেখানে কি আমাকে তুমি ভালবাসতে পারবে অচলা? এ কি সত্য? বলিতে বলিতেই আকস্মিক আবেগে সে তাহার মাথাটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া ওষ্ঠাধর চুম্বন করিল।

অপমানে আজও অচলার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, ঠোঁট দুটি ঠিক তেমনি বিছার কামড়ের মত জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তবুও সে ঘাড় নাড়িয়া চুপি চুপি বলিল, হাঁ। এক-সময় তোমাকে আমি ভালবাসতুম। না না - ছি—কেউ দেখতে পাবে। বলিয়া সে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিল। কিন্তু হাতখানি তাহার মুঠার মধ্যে ধরাই রহিল, সে তাহারই উপর পরম স্নেহে একটুখানি চাপ দিয়া কেবল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

গাড়ি বড় রাস্তা ছাড়িয়া রামবাবুর বাঙলোসংলগ্ন উদ্যানের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই বিরাট ওয়েলার যুগলবাহিত বিপুলভার অশ্বযান সমস্ত গৃহ প্রকম্পিত করিয়া দেখিতে দেখিতে গাড়ি-বারান্দার নীচে আসিয়া থামিল।

জমকালো নূতন পোষাকপরা সহিসেরা গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল এবং সুরেশ নিজে নামিয়া হাত ধরিয়া অচলাকে অবতরণ করাইল। অচলার দৃষ্টি ছিল উপরের

বারান্দায়। তথায় অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে রাক্ষুসীও বিছানা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; বহুদিনের পর চোখে চোখে হইতে দুই সখীর মুখেই হাসি ফুটিয়া উঠিল। রামবাবু নীচেই ছিলেন, তিনি গায়ের বালাপোষখানা ফেলিয়া দিয়া আনন্দে সস্নেহে আহ্বান করিলেন, এসো এসো, আমার মা এসো!

এই পরিচিত কণ্ঠস্বরের ব্যগ্র-ব্যাকুল আহ্বানে তাহার হাসিমাখা চোখের দৃষ্টি মুহূর্তে নামিয়া আসিয়া বৃদ্ধের উপর নিপতিত হইল; কিন্তু তাহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আজ মহিম—তাহারই প্রতি চাহিয়া যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। চোখে চোখে মিলল, কিন্তু সে চোখে আর পলক পড়িল না। সর্ব্বাঙ্গের মণি-মুক্তা অচলার তেমনি ঝলসিতে লাগিল, হীরা-মানিকের দীপ্তি লেশমাত্র নিষ্প্রভ হইল না, কিন্তু তাহাদেরি মাঝখানে প্রস্ফুটিত কমল যেন চক্ষের নিমিষে মরিয়া গেল।

কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে বৃদ্ধের ভুল হইল। অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে তাহাকে সহসা লজ্জায় ম্লান ও বিপন্ন কল্পনা করিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া অচলার আনত ললাট দুই হাতে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, থাক্ মা, তোমাকে পায়ের ধুলা নিতে হবে না, তুমি ওপরে যাও—

অচলা কিছুই বলিল না, টলিতে টলিতে চলিয়া গেল!

রামবাবু কহিলেন, সুরেশবাবু, ইনি—

সুরেশ কহিল, বিলক্ষণ! আমরা যে এক ক্লাসের—ছেলেবেলা থেকে দু'জনে আমরা—, বলিয়া সহসা হাসির চেষ্টায় মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, কি মহিম, হঠাৎ তুমি যে—

কিন্তু কথাটা আর শেষ হইতে পারিল না। মহিম মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

হতবুদ্ধি বৃদ্ধ সুরেশের মুখের প্রতি চাহিলেন এবং সুরেশও প্রত্যুত্তরে আর একটা হাসির প্রয়াস করিতে গেল, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না। উপরে যাইবার কাঠের সিঁড়িতে অকস্মাৎ গুরুতর শব্দ শুনিয়া দুইজনেই স্তব্ধ হইয়া গেলেন। একটা গোলমাল উঠিল, রামবাবু ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, অচলা উপুড় হইয়া পড়িয়া। সে দুই-তিনটি ধাপ উঠিতে পারিয়াছিল মাত্র, তাহার পরেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

৪১

ফিরিবার পথে গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া অচলা এই কথাটাই ভাবিতেছিল, আজিকার এই মূর্চ্ছাটা যদি না ভাঙিত। নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করিবার বীভৎসতাকে সে মনে স্থান দিতেও পারে না, কিন্তু এমনি কোন শান্ত স্বাভাবিক মৃত্যু। হঠাৎ জ্ঞান হারাইয়া ঘুমাইয়া পড়া—তার পরে আর না জাগিতে হয়। মরণকে এমন সহজে পাইবার কি কোন পথ নাই? কেউ কি জানে না?

সুরেশ তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিল, তুমি যে আর কোথাও যেতে চেয়েছিলে, যাবে?

চল।

এর পরে কাল ত এখানে মুখ দেখানো যাবে না।

কিন্তু তিনি ত কোন কথাই কাউকে বলবেন না!

সুরেশের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, না। মহিমকে আমি জানি, সে ঘৃণায় আমাদের দুর্নামটা পর্য্যন্ত মুখে আনতে চাইবে না।

কথাটা সুরেশ সহজেই কহিল, কিন্তু শুনিয়া অচলার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তার পর যতক্ষণ না গাড়ি গৃহে আসিয়া থামিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নির্ব্বাক হইয়া রহিল। সুরেশ তাহাকে সযত্নে, সাবধানে নামাইয়া দিয়া কহিল, তুমি একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা কর গে অচলা, আমার কতগুলো জরুরী চিঠি-পত্র লেখবার আছে। বলিয়া সে নিজের পড়িবার ঘরে চলিয়া গেল।

শয্যায় শুইয়া অচলা ভাবিতেছিল, এই ত তাহার একুশ বৎসর বয়স, ইহার মধ্যে এমন অপরাধ কাহার কাছে সে কি করিয়াছে যেজন্য এতবড় দুর্গতি তাহার ভাগ্যে ঘটিল। এ চিন্তা নূতন নয়, যখন-তখন ইহাই সে আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিত এবং শিশুকাল হইতে যতদূর স্মরণ হয় মনে করিবার চেষ্টা করিত। আজ অকস্মাৎ মৃণালের একদিন তর্কের কথাগুলি তাহার মনে পড়িল এবং তাহারই সূত্র ধরিয়া সমস্ত আলোচনাই সে একটির পর একটি করিয়া মনে মনে আবৃত্তি করিয়া গেল। নিজের বিবাহিত জীবনটা স্বামীর সহিত একপ্রকার তার বিরোধের মধ্যে দিয়াই কাটিয়াছে! কেবল শেষ কয়টিদিন তাঁহার রুগ্নশয্যায় স্বামীকে সে বড় আপনার করিয়া পাইয়াছিল। তাঁহার জীবনের যখন আর কোন শঙ্কা নাই, মন যখন নিশ্চিন্ত নির্ভর হইয়াছে, তখনকার সেই স্নিগ্ধ, সহজ ও নির্ম্মল আনন্দের মাঝে

অপরের দুর্ভাগ্য ও বেদনা যখন তাহায় বড় বেশি বাজিত তখন একদিন মৃণালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধস্বরে কহিয়াছিল, ঠাকুরঝি, তুমি যদি আমাদের সমাজের, আমাদের মতের হতে, তোমায় সমস্ত জীবনটাকে আমি ব্যর্থ হতে দিতুম না।

মৃণাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কি করতে সেজদি, আমার আবার একটা বিয়ে দিতে?

অচলা কহিয়াছিল, নয় কেন? কিন্তু থামো ঠাকুরঝি, তোমার পায়ে পড়ি, আর শাস্ত্রের দোহাই দিয়ো না। ও মল্ল-যুদ্ধ এত হয়ে গেছে যে, হবে শুনলেও আমার ভয় করে।

মৃণাল তেমনি সহাস্যে বলিয়াছিল, ভয় করবার কথাই বটে। কারণ তাঁদের হুড়োমুড়িটা যে কখন কোন্‌দিকে চেপে আসবে তার কিছুই বলবার জো নাই। কিন্তু একটা কথা তুমি ভাবোনি সেজদি যে, তাঁরা যুদ্ধ করেন কেবল যুদ্ধব্যবসা বলে, কেবল গায়ে জোর আর হাতে অস্ত্র থাকে বলে। তাই তাঁদের জিত হার শুধু তাঁদেরই, তাতে আমাদের যায়-আসে না। আমাদের ত কোন পক্ষই কোন কথা জিজ্ঞেস করেন না।

অচলা প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু করলে কি হতো?

মৃণাল বলিয়াছিল, সে ঠিক জানিনে ভাই! হয়ত তোমারি মত ভাবতে শিখতুম, হয়ত তোমার প্রস্তাবেই রাজি হতুম, একটা পাত্রও হয়ত এতদিনে জুটে যেতে পারত। বলিয়া সে হাসিয়াছিল।

এই হাসিতে অচলা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উত্তর দিয়াছিল, আমাদের সমাজের সম্বন্ধে কথা উঠলেই তুমি অবজ্ঞার সঙ্গে বল, সে আমি জানি! কিন্তু আমাদের কথা না হয় ছেড়েই দাও, যাঁরাই এই নিয়ে যুদ্ধ করেন, তাঁরা কি সবাই ব্যবসায়ী? কেউ কি সত্যিকার দরদ নিয়ে লড়াই করেন না?

মৃণাল জিভ কাটিয়া বলিয়াছিল, অমন কথা মনে আনলেও পাপ হয় সেজদি। কিন্তু তা নয় ভাই। কাল সকালেই ত আমি চলে যাচ্ছি, আবার কবে দেখা হবে জানিনে, কিন্তু যাবার আগে একটা তামাসাও কি করতে পারব না? বলিতে বলিতেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সামলাইয়া লইয়া পরে গম্ভীর হইয়া কহিয়াছিল, কিন্তু তুমি ত আমার সকল কথা বুঝতে পারবে না ভাই। বিয়ে জিনিসটা তোমাদের কাছে শুধু একটা সামাজিক বিধান। তাই তার সম্বন্ধে ভাল-মন্দ বিচার চলে, তার মতামত যুক্তিতর্কে বদলায়। কিন্তু আমাদের কাছে এ ধর্ম্ম। স্বামীকে আমরা ছেলেবেলা থেকে এই রূপেতেই গ্রহণ করে আসি। এ-বস্তুটি যে তাই সকল বিচার-বিতর্কের বাইরে।

বিস্মিত অচলা প্রশ্ন করিয়াছিল, বেশ তাও যদি হয়, ধর্ম্ম কি মানুষের বদলায় না ঠাকুরঝি?

মৃণাল কহিয়াছিল, ধর্ম্মের মতামত বদলায়, কিন্তু আসল জিনিষটি কে আর বদলায় ভাই সেজদি? তাই এত লড়াই-ঝগড়ার মধ্যেও সেই মূল জিনিষটি আজও সকল জাতিরই এক হয়ে রয়েচে। স্বামীর দোষ-গুণের আমরাও বিচার করি, তাঁর সম্বন্ধে মতামত আমাদেরও বদলায়—আমরাও ত ভাই মানুষ। কিন্তু স্বামী জিনিষটি আমাদের কাছে ধর্ম্ম, তাই তিনি নিত্য! জীবনেও নিত্য, মৃত্যুতেও নিত্য। তাঁকে আর আমরা বদলাতে পারিনে।

অচলা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিয়াছিল, এই যদি সত্যি, তবে এত অনাচার আছে কেন?

মৃণাল বলিয়াছিল, ওটা থাকবে বলেই আছে। ধর্ম্ম যখন থাকবে না, তখন ওটাও থাকবে না। বেরাল-কুকুরের ত ভাই অনাচার নেই!

অচলা হঠাৎ কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, এত যদি তোমার সমাজের শিক্ষা, তবে শিক্ষা যাঁরা দেন, তাঁদের এত সন্দেহ, এত সাবধান হওয়া তবু কিসের জন্যে? এত পর্দ্দা, এত বাঁধাবাঁধি—সমস্ত দুনিয়া থেকে আড়াল করে রাখবার এত প্রাণপণ চেষ্টা কেন? এত জোর-করা সতীত্বের দাম বুঝতুম পরীক্ষার অবকাশ থাকলে।

তাহার উত্তাপ দেখিয়া মৃণাল চমকিয়া হাসিয়া কহিয়াছিল, এ বিধি-ব্যবস্থা যাঁরা করে গেছেন, উত্তর জিজ্ঞাসা কর গে ভাই তাঁদের। আমরা শুধু বাপ-মায়ের কাছে যা শিখেচি, তাই কেবল পালন করে আসচি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জোর করে বলতে পারি সেজদি, স্বামীকে ধর্ম্মের ব্যাপার, পরকালের ব্যাপার বলে যে যথার্থ-ই নিতে পেরেচে, তার পায়ের বেড়ি বেঁধেই দাও আর কেটেই দাও, তার সতীত্ব আপনি-আপনি যাচাই হয়ে গেছে। বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া ধীরে ধীরে বলিয়াছিল, আমার স্বামীকে ত তুমি দেখেচ? তিনি বুড়োমানুষ ছিলেন, সংসারে তিনি দরিদ্র, রূপ-গুণও তাঁর সাধারণ পাঁচজনের বেশি ছিল না, কিন্তু তিনিই আমার ইহকাল, তিনিই আমার পরকাল। এই বলিয়া সে চোখ বুজিয়া পলকের জন্য বোধ করি বা তাঁহাকেই অন্তরের মধ্যে দেখিয়া লইল, তার পরে চাহিয়া একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, উপমাটা হয়ত ঠিক হবে না সেজদি, কিন্তু এটা মিথ্যা নয় যে, বাপ তাঁর কানা-খোঁড়া ছেলেটির উপরেই সমস্ত স্নেহ ঢেলে দেন। অপরের সুন্দর সুরূপ ছেলে মুহূর্ত্তের তরে হয়ত তাঁর মনে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি করে, কিন্তু পিতৃধর্ম্ম তাতে লেশমাত্র ক্ষুন্ন হয় না। যাবার সময়ে তাঁর সর্ব্বস্ব তিনি কোথায় রেখে যান, এ ত তুমি জানো। কিন্তু নিজের পিতৃত্বের প্রতি সংশয়ে

যদি কখনো তাঁর পিতৃধর্ম্ম ভেঙ্গে যায়, তখন এই স্নেহের বাষ্প কোথাও খুঁজে মেলে না। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ও চিন্তার ধারা আলাদা ভাই, আমার এই উপমাটা ও কথাগুলো তুমি হয়ত ঠিক বুঝতে পারবে না, কিন্তু এ-কথা আমার ভুলেও বিশ্বাস ক'রো না যে, স্বামীকে যে স্ত্রী ধর্ম্ম বলে অন্তরের মধ্যে ভাবতে শেখেনি, তার পায়ের শৃঙ্খল চিরদিন বদ্ধই থাক্, আর মুক্তই থাক এবং নিজের সতীত্বের জাহাজটাকে সে যত বড় যত বৃহৎই কল্পনা করুক, পরীক্ষার চোরাবালিতে ধরা পড়লে তাকে ডুবতেই হবে! সে পর্দ্দার ভিতরে ডুববে, বাইরেও ডুবরে।

তাহাই ত হইল! তখন এ সত্য অচলা উপলব্ধি করে নাই, কিন্তু আজ মৃণালের সেই চোরাবালি যখন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া অহরহ রসাতলের পানে টানিতেছে, তখন বুঝিতে আর বাকী নাই। সেদিন কি কথাটা সে অত করিয়া তাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল। নীরবরুদ্ধ সমাজের অবাধ স্বাধীনতায় চোখ-কান খোলা রাখিয়াই সে বড় হইয়াছে, নিজের জীবনটাকে সে নিজে বাছিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এই ছিল তার গর্ব্ব, কিন্তু পরীক্ষার একান্ত দুঃসময়ে এ-সকল তাহার কোন কাজে লাগিল না। তাহার বিপদ আসিল অত্যন্ত সঙ্গোপনে বন্ধুর বেশে; সে আসিল জ্যাঠামহাশয়ের স্নেহ ও শ্রদ্ধার ছদ্মরূপ ধরিয়া। এই একান্ত শুভানুধ্যায়ী স্নেহশীল বৃদ্ধের পুনঃ পুনঃ ও নির্ব্বন্ধাতিশয্যে যে দুর্য্যোগের রাত্রে সে সুরেশের শয্যায় গিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসিল, সেদিন একমাত্র যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত, সে তাহার অত্যাজ্য সতীধর্ম্ম—যাহা মৃণাল তাহাকে জীবনে মরণে অদ্বিতীয় ও নিত্য বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সেদিন তাহার বাহিরের খোলাসটাই বড় হইয়া তাহার ধর্ম্মকে পরাভূত করিয়া দিল। তাহাদের আজন্ম শিক্ষা ও সংস্কার ভিতরটাকে তুচ্ছ করিয়া কারাগার ভাবিয়া বাহিরের জগৎটাকেই চিরদিন সকলের উপর স্থান দিয়েছে; যে ধর্ম্ম গুপ্ত, যে ধর্ম্ম গুহাশায়ী, সেই অন্তরের অব্যক্ত ধর্ম্ম কোনদিন তাহার কাছে সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই বাহিরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সেদিনও সে ভদ্রমহিলার সম্ভ্রমের বহির্ব্বাসটাকেই লজ্জায় আঁকড়াইয়া রহিল, এই আবরণের মোহ কাটাইয়া আপনাকে নগ্ন করিয়া কিছুতে বলিতে পারিল না, জ্যাঠামশাই, আমি জানি, আমার এতদিনের পর্ব্বত-প্রমাণ মিথ্যার পরে আজ আমার সত্যকে সত্য বলিয়া জগতে কেহই বিশ্বাস করিবে না; জানি, কাল তুমি ঘৃণায় আর আমার মুখ দেখিবে না, তোমার সতী-সাধ্বী পুত্রবধূর ঘরের দ্বারও কাল আমার মুখের উপর রুদ্ধ হইয়া লাঞ্ছনা আমার জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। সে সমস্তই সহিবে, কিন্তু তোমার আজিকার এই ভয়ঙ্কর স্নেহ আমার সহিবে না। বরঞ্চ এই আশীর্ব্বাদ আমাকে তুমি কর জ্যাঠামশায়, আমার এতদিনের সতী নামের বদলে তোমাদের কাছে আজিকার কলঙ্কই যেন আমার অক্ষয়

হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু হায় রে! এ-কথা তাহার মুখ দিয়া সেদিন কিছুতেই বাহির হইতে পারে নাই।

আজ নিষ্ফল অভিমান ও প্রচণ্ড বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ তাহার বারংবার রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, এবং এই অখণ্ড বেদনাকে মহিমের সেই নিষ্ঠুর দৃষ্টি যেন ছুরি দিয়া চিরিতে লাগিল।

এমন করিয়া প্রায় অর্দ্ধেক রাত্রি কাটিল। কিন্তু সকল দুঃখেরই না-কি একটা বিশ্রাম আছে, তাই অশ্রু-উৎসও এক সময়ে শুকাইল এবং আর্দ্র চক্ষুপল্লব দুটিও নিদ্রায় মুদ্রিত হইয়া গেল।

এই ঘুম যখন ভাঙিল, তখন বেলা হইয়াছে। সুরেশের জন্য দ্বার খোলাই ছিল, কিন্তু সে ঘরে আসিয়াছিল কি না, ঠিক বুঝা গেল না। বাহিরে আসিতে বেয়ারা জানাইল, বাবুজি অতি প্রত্যুষেই এক্কা করিয়া মাঝুলি চলিয়া গিয়াছে।

কেউ সঙ্গে গেছে?

না। আমি যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি নিলেন না। বললেন, প্লেগে মরতে চাস্ ত চল্।

তাই তুমি নিজে গেলে না, কেবল দয়া করে এক্কা ডেকে এনে দিলে? আমাকে জাগালি না কেন?

বেয়ারা চুপ করিয়া রহিল।

অচলা নিজেও একটু চুপ করিয়া প্রশ্ন করিল, এক্কা ডেকে আনলে কে? তুই?

বেয়ারা নতমুখে জানাইল, ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন ছিল না, কাল তাহাকে বিদায় দিবার সময় আজ প্রত্যুষেই হাজির হইতে বাবু নিজেই গোপনে হুকুম দিয়াছিলেন।

শুনিয়া অচলা স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা নয়। কাল সন্ধ্যার ঘটনার সহিত ইহার সংস্রব নাই। না ঘটিলেও যাইত—যাওয়ার সঙ্কল্প সে ত্যাগ করে নাই, শুধু তাহারি ভয়ে কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখিয়াছিল মাত্র।

জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কবে ফিরবেন, কিছু বলে গেছেন?

সে আনন্দে মাথা নাড়িয়া জানাইল, খুব শীঘ্র. পরশু কিংবা তরশু, নয় তার পরের দিন নিশ্চয়।

অচলা আর কোন প্রশ্ন করিল না। কাল সিঁড়িতে পড়িয়া গিয়া আঘাত কত লাগিয়াছিল, ঠিক ঠাহর হয় নাই, আজ আগাগোড়া দেহটা ব্যথায় যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই উপর রামবাবুর তত্ত্ব লইতে আসার আশঙ্কায় সমস্ত মনটাও যেন অনুক্ষণ কাঁটা হইয়া রহিল। মহিম কোন কথাই যে প্রকাশ করিবে না, ইহা সুরেশের

অপেক্ষা সে কম জানিত না, তবুও সর্ব্বপ্রকার দৈবাতের ভয়ে অত্যন্ত ব্যথার স্থানটাকে আগলাইয়া সমস্ত চিত্ত যেমন হুঁশিয়ার হইয়া থাকে, তেমনি করিয়াই তাহার সকল ইন্দ্রিয় বাহিরের দরজায় পাহারা দিয়া বসিয়া রহিল। এমনি করিয়া সকাল গেল, দুপুর গেল, সন্ধ্যা গেল। রাত্রে আর তাহার আগমনের সম্ভাবনা নাই জানিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইয়া এইবার সে শয্যা আশ্রয় করিল। পাশের টিপয়ে শূন্য ফুলদানী চাপা দেওয়া কোথাকার এক কবিরাজী ঔষধালয়ের সুবৃহৎ তালিকাপুস্তক ছিল, টানিয়া লইয়া তাহারই পাতার মধ্যে শ্রান্ত চোখ দুটি মেলিয়া হঠাৎ এক সময়ে সে নিজের দুঃখ ভুলিয়া কোন্ এক শ্রীমন্মহারাজাধিরাজের রোগশান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বামুনঘাটি মাইনর স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের প্লীহা যকৃৎ আরোগ্য হওয়ার বিবরণ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িল।

৪২

বেয়ারা বলিয়াছিল, বাবু ফিরবেন পরশু কিংবা তরশু কিংবা তাহার পরের দিন নিশ্চয়। কিন্তু এই তাহার পরের দিনের নিশ্চয়তাকে সমস্তদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিবার মত শক্তি আর অচলার ছিল না। এই তিনদিনের মধ্যে রামবাবু একদিনও আসেন নাই। তাঁহার আসাটাকে সে সর্ব্বান্তঃকরণে ভয় করিয়াছে, অথচ এই না-আসার নিহিত অর্থকে কল্পনা করিয়াও তাহার দেহ কাঠ হইয়া গিয়াছে। তিনি অসুস্থ ছিলেন, এবং ইতিমধ্যে পীড়া যে বাড়িতেও পারে, এ-কথা তাহার মনেও উদয় হয় নাই। কেবল আজ সকালে ও-বাড়ির দরওয়ান আসিয়াছিল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে পাঁড়েজির নিকট হইতেই বিদায় লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সে কেন আসিয়াছিল, কি খবর লইয়া গেল, কোন কথা অচলা ভয়ে কাহাকেও জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার পর হইতেই এই বাড়ি, ঘর-দ্বার, এই-সব লোকজন সমস্ত হইতে ছুটিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে, তাহার এমনি মনে হইতে লাগিল।

বেয়ারাকে ডাকিয়া কহিল, রঘুবীর, তোমার বাড়ি ত এই দিকে, তুমি মাঝুলি গ্রামটা জানো?

সে কহিল, অনেককাল পূর্ব্বে একবার বরিয়াত গিয়েছিলাম মাইজী।

কতদূর হবে বলতে পারো?

রঘুবীর এদেশের লোক হইলেও বহুদিন বাঙালীর সংস্রবে তাহার অনেকটা হিসাব-বোধ জন্মিয়াছিল, সে মনে মনে আন্দাজ করিয়া কহিল, ক্রোশ ছয়-সাতের কম নয় মাইজী।

আজ তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারো?

রঘুবীর ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুমি যাবে? সেখানে যে ভারি পিলেগের বেমারী।

অচলা কহিল, তুমি না যেতে পারো, আর কোন চাকরকে রাজি করিয়ে দিতে পারো? সে যা বকশিশ চায় আমি দেবো।

রঘুবীর ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, মাইজী, তুমি যেতে পারবে, আর আমি পারব না? কিন্তু রাস্তা নেই, আমাদের ভারি গাড়ি ত যাবে না। এক্কা কিংবা খাটুলী—তার কোনটাতেই ত তুমি যেতে পারবে না মাইজী!

অচলা কহিল, যা জোটে, আমি তাতেই যেতে পারবো। কিন্তু আর ত দেরি করলে চলবে না রঘুবীর। তুমি যা পাও একটা নিয়ে এসো।

রঘুবীর আর তর্ক না করিয়া অল্পকালের মধ্যেই একটা খাটুলী সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং নিজের লোটা-কম্বল লাঠিতে ঝুলাইয়া সেটা কাঁধে ফেলিয়া বীরের মতই পদব্রজে সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। বাড়ির খবরদারীর ভার দরওয়ান ও অন্যান্য ভৃত্যদের উপর দিয়া কোন এক অজানা মাঝুলির পথে অচলা যখন একমাত্র সুরেশকেই লক্ষ্য করিয়া আজ গৃহের বাহির হইল, তখন সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার নিজের কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত স্বপ্নের মত ঠেকিতে লাগিল। তাহার বার বার মনে হইল, এই বিচিত্র জগতে এমন ঘটনাও এক দিন ঘটিবে, এ-কথা কে ভাবিতে পারিত!

ধূলা-বালির কাঁচা পথ একটা আছে। কিন্তু কখনও তাহা সুবিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে অস্পষ্ট, কখনও বা ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে লুপ্ত অবরুদ্ধ। গৃহস্থের সুবিধা ও মর্জ্জিমত তাহার আয়তন ও উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া কখনো বা নদীর ধার দিয়া, কখনো বা গৃহপ্রাঙ্গণের উপর দিয়াই সে গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে। প্রথম কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহার কৌতূহল মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। একটা মৃতদেহ একখণ্ড বাঁশে বাঁধিয়া কয়েকজন লোককে নিকট দিয়া বহন করিয়া যাইতে দেখিয়া সংক্রমণের ভয়ে তাহার দেহ সঙ্কুচিত হইয়াছিল, ইচ্ছা করিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিয়া লয়, কিসে মরিয়াছে, ইহার বয়স কত এবং কে কে আছে! কিন্তু পথের দূরত্ব যত বাড়িয়া চলিতে লাগিল, বেলা তত পড়িয়া আসিতে লাগিল এবং কাছে ও দূর গ্রামের মধ্য হইতে কান্নার রোল যত তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল, ততই সমস্ত মন যেন কি একপ্রকার জড়তায় ঝিমাইয়া পড়িতে লাগিল।

বহুক্ষণ হইতে তাহার তৃষ্ণা বোধ হইয়াছিল, এখানেই কতকটা পথ নদীর উচ্চ

পাড়ের উপর দিয়া যাইতে যাইতে একটা ঘাটের কাছে আসিয়া সে ডুলি থামাইয়া অবতরণ করিল এবং হাত মুখ ধুইয়া জল খাইবার জন্ত নীচে নামিতেই তাহার চোখে পড়িল, গোটা-দুই অর্দ্ধগলিত শব অনতিদূরে আটকাইয়া রহিয়াছে। ইহাদের বীভৎস আকৃতি তাহার মনের উপর এখন কোন আঘাতই করিল না। অত্যন্ত সহজেই সে হাত-মুখ ধুইয়া জল খাইয়া আবার ধীরে ধীরে গিয়া তাহার খাটুলিতে বসিল। কোন অবস্থাতেই ইহা যে তাহার পক্ষে সম্ভবপর, কিছুকাল পূর্ব্বে এ-কথা বোধ করি সে চিন্তাও করিতে পারিত না।

ইহার পর হইতে প্রায় গ্রামগুলাই পরিত্যক্ত, শূন্ত, কদাচিত কোন অত্যন্ত দুঃসাহসী ব্যক্তি ভিন্ন যে যেথায় পারিয়াছে পলায়ন করিয়াছে। কোথাও শব্দ নাই, সাড়া নাই, ঘর-দ্বার রুদ্ধ, অপরিচ্ছন্ন—মনে হয় যেন কুটীরগুলা পর্য্যন্ত মরণকে অনিবার্য্য জানিয়া চোখ বুজিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। এই মৃত্যুশাসিত নির্জ্জন পল্লীগুলির ভিতর দিয়া চলিতে রঘুবীর ও বাহকদিগের চাপা-গলা এবং ত্রস্ত-ভীত পদক্ষেপ প্রতিমুহূর্ত্তেই অচলাকে বিপদের বার্ত্তা জানাইতে লাগিল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার ভয়ই হইল না, ইহার সহিত তাহার যেন কোন আজন্ম পরিচয় আছে, সমস্ত অন্তঃকরণ এমনি নির্ব্বিকার হইয়া রহিল।

এইভাবে বাকী পথটা অতিবাহিত করিয়া ইহারা যখন মাঝুলিতে উপস্থিত হইল, তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। অচলার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহাদের পথের দুঃখ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হইবে। গ্রামের কৃতজ্ঞ নর-নারী ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের সংবর্দ্ধনা করিয়া ডাক্তার সাহেবের দরবারে লইয়া যাইবে, তথায় রোগী ও তাহাদের আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের আনা-গোনায়, ঔষধ-পথ্যের বিতরণের ঘটায় সমস্ত স্থানটা ব্যাপিয়া যে সমারোহ চলিতেছে, তাহার মধ্যে অচলার নিজের স্থানটা যে কোথায় হইবে, ইহার চিত্রটা সে একপ্রকার কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আসিয়া দেখিল, তাহার কল্পনা কেবল নিছক কল্পনাই। তাহার সহিত ইহার কোথাও কোন অংশে মিল নাই, বরঞ্চ যে চিত্র পথের দুই ধারে দেখিতে দেখিতে সে আসিয়াছে এখানেও সেই ছবি! এখানেও পথে লোক নাই, বাড়ি-ঘর-দ্বার রুদ্ধ, ইহার কোথায় কোন পল্লীতে যে স্বরেশ বাসা করিয়াছে, খুঁজিয়া পাওয়াই যেন কঠিন।

এই গ্রামে প্রত্যহই একটা হাট আজও বসে বটে এবং অন্য সময়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পুরা দমে চলিতেই থাকে সত্য, কিন্তু এখন দুর্দ্দিনের বেচা-কেনা সারিয়া লোকজন অপরাহ্নের বহু পূর্ব্বেই পলাইয়াছে—ভাঙা হাটের স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন পড়িয়া আছ মাত্র।

রঘুবীর খোঁজাখুঁজি করিয়া একটা দোকান বাহির করিল। বৃদ্ধ দোকানী ঝাঁপ

বন্ধ করিতেছিল, সে কহিল, তাহার ছেলে-মেয়েরা সবাই স্থানান্তরে গিয়াছে, কেবল তাহারা দুইজন বুড়া-বুড়ি দোকানের মায়া কাটাইয়া আজিও যাইতে পারে নাই। সুরেশের সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র সন্ধান দিতে পারিল যে, ডাক্তারবাবু নন্দ পাঁড়ের নিমতলার ঘরে এতদিন ছিলেন বটে, কিন্তু এখনও আছেন কিংবা মামুদপুরে চলিয়া গিয়াছেন সে অবগত নয়।

মামুদপুর কোথায়?

সিধা ক্রোশ-দুই দক্ষিণে।

নন্দ পাঁড়ের বাড়িটা কোন্‌দিকে?

বৃদ্ধ বাহির হইয়া দূরে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া একটা বিপুল নিমগাছ দেখাইয়া দিয়া কহিল, এই পথে গেলেই দেখা যাইবে।

অনতিকাল পরে ভীত পরিশ্রান্ত বাহকেরা যখন নিমতলায় আসিয়া খাটুলি নামাইল, তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। বাড়িটা বড়, পিছনের দিকে দুই-একটা পুরাতন ইটের ঘর দেখা যায়, কিন্তু অধিকাংশই খোলার। সম্মুখে প্রাচীর নাই—চমৎকার ফাঁকা। গৃহস্বামীকে দরিদ্র বলিয়াও মনে হয় না, কিন্তু একটা লোকও বাহির হইয়া আসিল না। কেবল প্রাঙ্গণের একধারে বাঁধা একটা টাট্টু-ঘোড়া ক্ষুৎপিপাসার নিবেদন জানাইয়া অত্যন্ত করুণকণ্ঠে অতিথিদের অভ্যর্থনা করিল।

সদর দরজা খোলা ছিল, রঘুবীর সাহস করিয়া ভিতরে গলা বাড়াইতেই দেখিতে পাইল, পাশের বারান্দায় চারপাইয়ের উপর সুরেশ শুইয়া আছে এবং কাছেই খুঁটিতে ঠেস দিয়া একজন অতিবৃদ্ধ স্ত্রীলোক বসিয়া ঝিমাইতেছে।

বাবুজী!

সুরেশ চোখ মেলিয়া চাহিল এবং কনুয়ে ভর দিয়া মাথা তুলিয়া ক্ষণকাল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিল, কে বেয়ারা? রঘুবীর?

রঘুবীর সেলাম করিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু প্রভুর রক্ত-চক্ষুর প্রতি চাহিয়া তাহার মুখের কথা সরিল না।

তুই এখানে?

রঘুবীর পুনরায় সেলাম করিল এবং বাহিরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া শুধু কেবল বলিল, মাইজী—

এবার সুরেশ বিস্ময়ে সোজা উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোকে পাঠিয়েচেন?

রঘুবীর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না, তিনি নিজেই আসিয়াছেন।

জবাব শুনিয়া সুরেশ এমন করিয়া তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল যেন কথাটাকে ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহার বিলম্ব হইতেছে। তার পরে চোখ বুজিয়া ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল, কিছুই বলিল না।

অচলা আসিয়া যখন নীরবে খাটিয়ার একধারে তাহার গায়ের কাছেই উপবেশন করিল, কিছুক্ষণের নিমিত্ত সে তেমনি নিমীলিত-নেত্রে মৌন হইয়া রহিল, ভদ্রতা রক্ষা করিতে সামান্ত একটা 'এসো' বলিয়াও ডাকিতে পারিল না। শিশুকাল হইতে চিরদিন অত্যধিক যত্ন-আদরে লালিত-পালিত হইয়া আবেগ ও প্রবৃত্তির বশেই সে চলিয়াছে, ইহাদের সংযত করার শিক্ষা তাহার কোনকালে হয় নাই। এই শিক্ষা জীবনে সে প্রথম পাইয়াছিল কেবল সেইদিন, যেদিন তাহার মুখের হাসিকে পদাঘাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া মহিম ঘরে চলিয়া গেল। সেদিন এক নিমেষে তাহার বুকের মধ্যে নীরবে যে কি বিপ্লব বহিয়া গেল, সে শুধু অন্তর্যামীই জানিলেন এবং আজও কেবল তিনিই দেখিলেন, ঐ শান্ত অচঞ্চল দেহটার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া কত বড় ঝড় প্রবাহিত হইতেছে। সেদিনও মহিমের আঘাতকে সে যেমন করিয়া সহ্য করিয়াছিল, আজও তেমনি করিয়াই সে তাহার উন্মত্ত আবেগের সহিত নিঃশব্দে লড়াই করিতে লাগিল—তাহার লেশমাত্র আক্ষেপ প্রকাশ পাইতে দিল না।

এমন করিয়া যে কতক্ষণ কাটিত বলা যায় না, কিন্তু বাহকদের আহ্বানে রঘুবীর বাহিরে চলিয়া গেলে, সেই শব্দে সুরেশ ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল। কহিল, তুমি আমার চিঠি পেয়েচ?

অচলা মুখ না তুলিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, না।

সুরেশ একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, চিঠি না পেয়েই এসেচ, আশ্চর্য্য! যাই হোক, এ ভালই হ'ল যে একবার দেখা হ'ল। বলিয়া একটা কথার জন্ত তাহার আনত মুখের প্রতি একমুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া নিজেই কহিল, আমার জন্ত তোমাকে অনেক দুঃখ পেতে হ'ল—খুব সম্ভব যতদিন বাঁচবে, এর জের মিটবে না, কিন্তু সমস্ত ভুল হয়েছিল এই যে, মহিমকে তুমি যে এতটা বেশি ভালবাসতে তা আমিও বুঝিনি, বোধ হয় তুমিও কোনদিন বুঝতে পারোনি! না?

কিন্তু অচলা তেমনি অধোমুখে নিরুত্তর বসিয়া রহিল দেখিয়া সে আবার বলিল, তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, মানুষের মন বলে স্বতন্ত্র কোন একটা বস্তু নেই। যা আছে, সে এই দেহটারই ধর্ম্ম। ভালবাসাও তাই। ভেবেছিলাম, তোমার দেহটাকে কোনমতে পেলে মনটাও পাবো, তোমার ভালবাসাও দুষ্প্রাপ্য হবে না—কে জানে হয়ত সত্যিই কোনদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'তো—হয়ত যা সর্ব্বস্ব দিয়ে এমন করে চেয়েছিলাম, তাই তুমি একদিন নিজের ইচ্ছেয় আমাকে ভিক্ষে দিতে। কিন্তু আর তার সময় নেই, আমি অপেক্ষা করবার অবসর পেলাম না। বলিয়া সে পুনরায় কনুয়ে ভর দিয়া মাথা তুলিল এবং সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকের মধ্যে নিজের দুই চক্ষের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া অচলার আনত মুখের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

একজনের এই একাগ্র দৃষ্টি আর একজনের সন্নত দৃষ্টিকে যেন আকর্ষণ করিয়া তুলিল—কিন্তু পলকমাত্র। অচলা তৎক্ষণাৎ চোখ নামাইয়া লইয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে অত্যন্ত লজ্জার সহিত কহিল, এদেশ থেকে ত সবাই পালিয়েছে—এখানকার কাজ যদি তোমার শেষ হয়ে থাকে ত বাড়ি, কিংবা আরও কত দেশ আছে—তুমি চল, ডিহরীতে আর এক দণ্ড টিকতে পাচ্চিনে।

সে আমার বেশি আর কে জানে? বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুরেশ বালিশে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণ নিঃশব্দে স্থিরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, অনেক কষ্টে আজ সকালে দু'খানা চিঠি পাঠাতে পেরেচি। একখানা তোমাকে, আর একখানা মহিমকে। সে যদি না এর মধ্যে চলে গিয়ে থাকে ত নিশ্চয় আসবে, আমি জানি।

শুনিয়া অচলা ভয়ে বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল, কহিল, তাঁকে কেন?

সুরেশ তেমনি ধীরে ধীরে বলিল, এখন তাকেই আমার একমাত্র প্রয়োজন। ছেলেবেলা থেকে সংসারের মধ্যে অনেকদিন অনেক গ্রন্থিই পাকিয়েচি, আর তাদের খোলবার জন্যে এই মানুষটিকে চিরদিন আবশ্যক হয়েচে। তাই আজও তাকেই আমার ডাক দিতে হয়েচে। এত ধৈর্য্য পৃথিবীতে আর ত কারও নেই।

অচলার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল, কিন্তু সে অধোমুখে স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল। সুরেশ বলিল, আমার চিঠির মধ্যে প্রায় সব কথাই লেখা আছে—পড়লেই টের পাবে। সেদিন তোমার হাতে আমার সমস্ত সম্পত্তির পাকা উইলখানাই দিয়েছি। ইচ্ছে করলে তার অনেক জিনিবই তুমি নিতে পারো, কিন্তু আমি বলি, নিয়ে কাজ নেই। বরঞ্চ আমি বেঁচে থাকলেও যেমন গরীব-দুঃখীরাই সমস্ত পেতো, আমার মরণের পরেও যেন তারাই পায়। আমার কিছুর সঙ্গেই আর তুমি নিজেকে জড়িয়ে রেখ না অচলা—তুমি নিশ্চিন্ত হও, নির্ব্বিঘ্ন হও—আমার সমস্ত সংস্রব থেকে তুমি নিজেকে যেন সর্ব্বোতোভাবে বিচ্ছিন্ন করতে পারো। চেষ্টা করলে পৃথিবীতে অনেক দুঃখই সহা যায়—আমার দেওয়া দুঃখই যেন একদিন তুমি অনায়াসে সইতে পারো।

তাহার আচরণে ও কথা বলার ভঙ্গিতে অচলার মনের মধ্যে আসিয়া পর্য্যন্তই কেমন যেন ভয় ভয় করিতেছিল; এই শেষের কথাটায় সে যথার্থই ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি ও কথা তুলচ কেন? উঠে ব'স না! যাতে আমরা এখনি বার হয়ে পড়তে পারি, তার উদ্যোগ করে দাও না!

তাহার আশঙ্কা ও উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়াও সুরেশ কোন উত্তর দিল না। যে বৃদ্ধা খুঁটি ঠেস দিয়া ঝিমাইতেছিল, সে সজাগ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, এখন ঘরের মধ্যে যাবেন, না আলোটা বাইরে এনে দেব—তাহারও কোন জবাব দিল

না ; মনে হইতে লাগিল, সহসা যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। উদ্বিগ্ন অচলা তাহার প্রশ্নের পুনারাবৃত্তি করিতে যাইতেছিল, সুরেশ চোখ মেলিয়া অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, এখনও তোমাকে আমার আসল কথাটাই বলা হয়নি অচলা, আমি মরতে বসেচি—আমার বাঁচবার বোধ করি আর কোন সম্ভাবনাই নেই।

প্রত্যুত্তরে শুধু একটা অস্ফুট অব্যক্ত কণ্ঠস্বর অচলার গলা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তার পরেই সে মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

সুরেশ বলিতে লাগিল, আগে থেকেই আমি উইল করে রেখেচি বটে, কিন্তু কেউ যদি মনে করে, আমি ইচ্ছে করে মরচি, সে অন্যায়, সে মিথ্যা—সে আমার মরার বেশি ব্যথা হবে। আমি সতর্কতার এতটুকু ত্রুটি করিনি, কিন্তু কাজে লাগল না। যদি কখনো তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, তাদের তুমি এই কথাটা ব'লো যে, সংসারে আরও পাঁচজনের যেমন মৃত্যু হয় তাঁরও তেমনি হয়েচে—মরণকে কেবল এড়াতে পারেন নি বলেই মরেচেন, নইলে মরবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। মরণের মধ্যে আমার কোন হাত, কোন বিশেষত্ব ছিল, এই অপরাধটা আমাকে যেন কেউ না দেয়।

অচলা কিছুই বলিল না। কথা কহিবার শক্তি যে তাহার শুকাইয়া গিয়াছিল, এ-কথা সেই প্রায়ান্ধকারের মধ্যে তাহার ভয়ার্ত্ত মুখের প্রতি চাহিয়া সুরেশ ধরিতে পারিল না। ক্ষণকাল আপনাকে সে সংবরণ করিয়া লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আমি না এসে থাকতে পারিনে বলেই তোমাকে লুকিয়ে সেদিন ভোরবেলায় পালিয়ে এসেছিলুম। এসে দেখি, গ্রাম প্রায় শূন্য। এ-বাড়িতে একটা চাকর মরেচে এবং তার কোন গতি না করেই বাড়িসুদ্ধ সবাই পালাতে উদ্যত হয়েচে। তাদের নিরস্ত করতে পারলুম না বটে, কিন্তু মড়াটার একটা উপায় হ'ল। ফিরে এসে ভাবলুম, আমিও বাড়ি চলে যাই ; কিন্তু দুপুরবেলা মামুদপুর থেকে একটা ছেলে কাঁদতে কাঁদতে এসে জানালে, তার মায়ের খুব অসুখ। তাকে অস্ত্র করতে গিয়েই নিজের এই বিপদ ঘটালুম। এমন অনেক ত করেচি, আমি সাবধানও কম নই, কিন্তু এবার দুর্ভাগ্য এমনি যে, একার চাকায় বুড়ো আঙুলের পিছনটা যে ঘসে গিয়েছিল, সেটা কেবল চোখে পড়ল হাতের রক্ত ধুতে গিয়ে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে যা করবার সমস্তই করলুম, বাড়ি যাবার উপায় থাকলে আমি চলেই যেতুম, কিছুতেই থাকতুম না, কিন্তু কোন উপায় করতে পারলুম না। কাল রাত্রে জ্বরবোধ হ'ল—এ যে কিসের জ্বর সে যখন বুঝতে আর বাকী রইল না, তখন অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায় একটা লোক দিয়ে দু'জনকে দুখানা চিঠি লিখে পাঠিয়েচি।

অচলা অশ্রু-ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কিন্তু এখন ত উপায় আছে, আমার ডুলিতে নিয়ে তোমাকে এখনি আমি বেরিয়ে পড়ব—আর একমিনিট থাকতে দেব না।

কিন্তু তুমি ?

আমি হেঁটে যাবো—আমার কথা তুমি কিছুতে ভাবতে পাবে না।

হেঁটে যাবে ? এতটা পথ ?

তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আর বাধা দিয়ো না, বলিতে বলিতেই অচলা কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরেশ পলকমাত্র মৌন হইয়া রহিল, তার পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা, তাই চল। কিন্তু বোধ হয়, এর আর প্রয়োজন ছিল না।

অচলা বাহিরে আসিয়া দেখিল, গাছতলায় বসিয়া রঘুবীর নীরবে চানা-ভাজা চর্ব্বণ করিতেছে। কহিল, রঘুবীর, বাবুর বড় অসুখ, তাঁকে এক্ষুনি নিয়ে যেতে হবে। ডুলিওয়ালাদের বল, তারা যত টাকা চায়, আমি তার চেয়ে বেশি দেব—কিন্তু আর একমিনিটও দেরি নয়।

প্রভু-পত্নীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে রঘুবীর চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কিন্তু তারা ত দু'জনকে বইতে পারবে না মাইজী!

না না, দু'জনকে নয়। আমি হেঁটে যাবো, কিন্তু আর এক মিনিটও দেরি চলবে না রঘুবীর, তুমি শীগ্‌গির যাও—কোথায় তারা ?

রঘুবীর কহিল, ভাড়ার টাকা নিয়ে তারা দোকানে গেছে খাবার কিনতে। এক্ষনি ডেকে আনচি মাইজী, বলিয়া সে অভুক্ত চানা-ভাজা গাত্রবস্ত্রের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে একপ্রকার ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া অচলা সুরেশের শিয়রে বসিল, এবং হাত দিয়া তাহার কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মুনিয়ার মা কেরোসিনের ডিবা জ্বালিয়া অনতিদূরে মেঝের উপর রাখিয়া গিয়াছিল, তার অপর্য্যাপ্ত ধূমে সমস্ত স্থানটা কলুষিত হইয়া উঠিতেছিল, সেইটা সরাইতে গিয়া একটা ঔষধের শিশি অচলার চোখে পড়িল ; জিজ্ঞাসা করিল, একি তোমার ওষুধ ?

সুরেশ বলিল, হাঁ, আমারই। কাল নিজেই তৈরি করেছিলুম, কিন্তু খাওয়া হয়নি। দাও—

কথাটা অচলাকে তীব্র আঘাত করিল, কিন্তু না খাওয়ার হেতু লইয়াও আর সে কথা বাড়াইতে ইচ্ছা করিল না। ঔষধ দিয়া শিয়রে আসিয়া সে আবার তেমনি নীরবে উপবেশন করিল। অনেকক্ষণ হইতেই সুরেশ মৌন হইয়াই ছিল, কিন্তু সে নিঃশব্দে কত বড় যাতনা সহিতেছে, ইহাই উপলব্ধি করিয়া অচলার বুক ফাটিতে লাগিল।

বিলম্ব হইতেছে—রঘুবীরের দেখা নাই। মাঝে মাঝে সে পা টিপিয়া উঠিয়া গিয়া দরজায় মুখ বাড়াইয়া অন্ধকারে যতদূর দেখা যায় দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও কাহারও সাড়া নাই। অথচ পাছে এই উৎকণ্ঠা তাহার কোনমতে সুরেশের কাছে ধরা পড়িয়া যায়, এই ভয়েও সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

রাত্রি বাড়িয়া যাইতে লাগিল, খুঁটির গায়ে মুনিয়ার মায়ের নাসিকা ডাকিয়া উঠিল—এমন সময় ক্ষুধিত পথশ্রান্ত রঘুবীর ভগ্নদূতের ন্যায় উপস্থিত হইয়া ম্লান-মুখে জানাইল, বেহারারা ডুলি লইয়া বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কোথাও তাহাদের সন্ধান মিলিল না।

অচলা সমস্ত ভুলিয়া বিকৃত-কণ্ঠে বারংবার প্রশ্ন করিতে লাগিল, তাহারা কখন্ গেল? কোন পথে গেল? এবং কিজন্য গেল? আমাদের যা-কিছু আছে সমস্ত দিলেও কি আর একখানা সংগ্রহ করা যায় না?

রঘুবীর আধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। এই নিদারুণ বিপত্তি তাহারই অবিবেচনায় ঘটিয়াছে, ইহা সে জানিত; তাই সে তাহার প্রাণপণ চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া তবেই ফিরিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু আরও একজন তাহারি মত নিঃশব্দে স্থির হইয়া শয্যার পরে পড়িয়া রহিল। এই চঞ্চলতার লেশমাত্রও যেন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। রঘুবীর চলিয়া গেলে সে আস্তে আস্তে বলিল, ব্যস্ত হয়ে কি হবে অচলা, তাদের পেলেও কোনও লাভ হ'তো না। এই ভাল—আমার এই ভাল।

আর অচলা কথা কহিল না, কেবল সেই অনন্ত পথযাত্রীর তপ্ত ললাটে ডান হাত খানি রাখিয়া পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় স্থির হইয়া রহিল।

তাহার চারিদিকে জনহীন পুরী মৃত্যুর মত নির্ব্বাক্ হইয়া আছে। বাহিরে গভীর রাত্রি গভীরতর হইয়া চলিয়াছে, চোখের উপর কালো আকাশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে—সেইদিকে চাহিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ইহার কি প্রয়োজন ছিল! ইহার কি প্রয়োজন ছিল!

এই যে তাহার জীবন-কুরুক্ষেত্র ঘেরিয়া এত বড় একটা কদর্য্য সংগ্রাম চলিয়াছে, সংসারে ইহার কি আবশ্যক ছিল? দুনিয়ার সমস্ত জ্বালা, সমস্ত হীনতা, সকল স্বার্থ মিটাইয়া সে কি ওই রাত্রির মত আজই শেষ হইয়া যাইবে? তার পরে সমস্ত জীবনটা কি তাহার কুরুক্ষেত্রের মত কেবল শ্মশান হইয়া যুগ যুগ পড়িয়া রহিবে? এখানে কি চিতার দাহ-চিহ্ন কোনদিন মিলাইবে না? পৃথিবীতে ইহাও কি প্রয়োজনের মধ্যে।

কিন্তু এ কুরুক্ষেত্র কেন বাধিল? কে বাধাইল? এই যে মানুষটি তাহার সকল ঐশ্বর্য্য, সকল সম্পদ, সকল আত্মীয়-পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এমন একান্ত

নিরুপায়ের মরণ মরিতে বসিয়াছে, এই কি কেবল এত বড় বিপ্লব একা ঘটাইয়াছে? আর কি কাহারও মনের মধ্যে লুকাইয়া কোন লোভ মোহ ছিল না? কোথাও কোন পাপ কি আর কেহ করে নাই?

কিন্তু সহসা চিন্তাটাকে সে যেন সজোরে ঠেলিয়া ফেলিয়া একটুখানি নাড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। কে যেন দুই হাত চাপিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিতে বসিয়াছিল। সেই সময় সুরেশও জল চাহিল। হেঁট হইয়া মুখে তাহার জল দিয়া আবার অচলা স্থির হইয়া বসিল। তাহার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, চোখ হইতে নিদ্রার আভাসটুকু পর্য্যন্ত যেন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। সেই দুটি শুষ্ক চোখ মেলিয়া আবার সে নীরব আকাশের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। বহুদিন পূর্ব্বে অনেক যত্ন করিয়া যে মহাভারতখানি শেষ করিয়াছিল—আজ তাহারই শেষ সর্ব্বনাশ যেন তাহারই মনের মধ্যে ছায়াবাজির ন্যায় প্রবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। সেখানে যেন কত রক্ত ছুটিতেছে, কত অজানা লোক মিলিয়া কাটা-কাটি মারা-মারি করিয়া মরিতেছে—কত শত-সহস্র চিতা জ্বলিতেছে, নিবিতেছে—তাহার ধূমে ধূমে সমস্ত স্বর্গ-মর্ত্ত্য একেবারে যেন আচ্ছন্ন একাকার হইয়া গিয়াছে!

কিছুক্ষণের জন্য সুরেশ বোধ হয় তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার সাড়া ছিল না। কিন্তু এমন করিয়া যে কতক্ষণ গেল, কি করিয়া বাহিরে যে সময় কাটিতে লাগিল, কি করিয়া যে রাত্রি প্রভাতের পথে অগ্রসর হইতেছিল, সেদিকেও অচলার চৈতন্য ছিল না। তাহার নিমীলিত চক্ষের কোণ বহিয়া জল পড়িতেছিল, শ্রান্ত হাতদুটি সুরেশের বালিশের উপর পড়িয়া, সে একান্ত মনে বলিতেছিল, হে ঈশ্বর, আমি অনেক দুঃখ অনেক ব্যথা পাইয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখ, সকল ব্যথার পরিবর্ত্তে একে তুমি ক্ষমা করিয়া কোলে তুলিয়া লও, আমার মা নাই, বাপ নাই, স্বামী নাই—এত বড় লজ্জা লইয়া কোথাও আমার দাঁড়াবার স্থান নাই। আমি কত যে সহিয়াছি, সে ত তুমি জান—আর আমাকে বাঁচিতে দিয়ো না প্রভু! আমাকেও তোমার কাছে টানিয়া লও!

কথাগুলি সে যে কতভাবে কতরকমে মনে মনে আবৃত্তি করিল, তাহার অবধি নাই—অশ্রুজলও যে কত ঝরিয়া পড়িল তাহারও সীমা নাই।

মাইজী!

তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে, অচলা চমকিয়া দেখিল, রঘুবীর কাহার যেন প্রবেশের অপেক্ষায় সদর-দরজা উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কি রঘুবীর? বলিয়াই যাহার সহিত তাহার চোখে চোখে দেখা হইয়া গেল, সে মহিম। একবার সে কাঁপিয়া উঠিয়াই দৃষ্টি অবনত করিল।

দ্বারের কাছে মুহূর্তের জন্ম মহিমের পা উঠিল না, এখানে এমন করিয়া যে আবার তাহার সহিত দেখা হইবে, ইহা সে প্রত্যাশা করে নাই। কিন্তু পরক্ষণেই ধীরে ধীরে সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এখন সুরেশ কেমন আছে?

অচলা মুখ তুলিল না, কথা কহিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া বোধ হয় ইহাই জানাইতে চাহিল, সে ইহার কিছুই জানে না।

মিনিট-খানেক স্থির থাকিয়া মহিম সুরেশের ললাট স্পর্শ করিতেই সে চোখ মেলিয়া চাহিল। সেই জ্যোতিহীন রক্তনেত্রের প্রতি চাহিয়া মহিমের গলা দিয়া সহসা স্বর ফুটিল না। তার পরে কহিল, কেমন আছ সুরেশ?

ভালো না—চললুম। তুমি আসবে আমি জানি—আমার সুমুখে এসে ব'স।

মহিম উঠিয়া গিয়া শয্যার একাংশে তাহার পায়ের কাছে বসিল। বলিল, ডিহরীতে ডাক্তার আছে, আমার একায় কোনমতে—

সুরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, না, টানা-টানি ক'রো না, মজুরী পোষাবে না। আমাকে quietly যেতে দাও।

কিন্তু এখনো ত—

হ্যাঁ, এখনো হুঁস আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল হচ্ছে। আমার জীবনটা গরীব-দুঃখীর কাজে লাগাতে পারলুম না, কিন্তু সম্পত্তিটা যেন তাদের কাজে লাগে মহিম। তাই কষ্ট দিয়ে এতদূর তোমাকে টেনে এনেচি, নইলে মৃত্যুকালে ক্ষমা চেয়ে কাব্য করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

মহিম নীরব হইয়া রহিল।

সুরেশ বলিতে লাগিল, ও-সব আমি বিশ্বাসও করিনে, ভালও বাসিনে। একটা দিনের ক্ষমার প্রতি আমার লোভও নেই। ভাল কথা, একটা উইল আছে। অচলাকে আমি কিছুই দিইনি—আর তাকে অপমান করতে আমার হাত উঠল না। তবে দরকার বোঝ ত সামান্য কিছু দিয়ো।

মহিম ব্যাকুল হইয়া উঠিল, আর আমাকে কেন এর মধ্যে জড়াচ্চো সুরেশ?

সুরেশ বলিল, ঠিক এই জন্যই যে, তোমাকে জড়ানো যায় না। যার লোভ নাই, যার ন্যায়ান্যায়ের বিচার—হঠাৎ উপরের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া কহিল, কিন্তু সারারাত তুমি বসে আছ অচলা - যাও, হাত-মুখ ধোও গে। মুনিয়ার মা সমস্ত দেখিয়ে দেবে—যাও—

সে উঠিয়া গেলে কহিল, কেবল একটা জিনিসের জন্ম আমার ভারি দুঃখ হয়।

অচলা যে তোমাকে কত ভালবাসত, সে আমিও বুঝিনি, তুমিও বোঝোনি—ও নিজেও বুঝতে পারেনি। সেটা তোমার দারিদ্র্যের সঙ্গে এমনি ঘুলিয়ে উঠল যে—যাক! এমন সুন্দর জিনিসটি মাটি করে ফেললুম—না পেলুম নিজে, না পেতে দিলুম অপরকে। কিন্তু কি আর করা যাবে। পিসিমাকে একটু দেখো—শোকটা তাঁর ভারি লাগবে।

বৃদ্ধ মুনিয়ার মা ঔষধের শিশি লইয়া কাছে দাঁড়াতেই সে উত্যক্তস্বরে বলিয়া উঠিল, না না, আর ঔষধ নয়। একটু জল দে। একটা নাটক লিখতে আরম্ভ করেছিলুম মহিম, আমার ড্রয়ারে আছে—পারো ত প'ড়ো।

মহিম তাহার মুখের পানে চাহিতে পারিতেছিল না, অধোমুখে শুনিতেছিল—এইবার চোখ তুলিয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সুরেশ থামাইয়া দিয়া বলিল, আর না মহিম, একটু ঘুমুই। খাবার-দাবার সমস্ত আছে, কিন্তু সে ত তোমাদের ভাল লাগবে না। বলিয়া সে চোখ বুজিল।

মহিম ক্ষণকাল চুপ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমার শেষ অনুরোধ একটা রাখবে সুরেশ?

কি?

তুমি ভগবানকে কোনদিন ভাবোনি, তাঁর কথা—

ও আমার ভাল লাগে না। বলিয়া সুরেশ মুখখানা বিকৃত করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

মহিম প্রাণপণে একটা অদম্য দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া নির্ব্বাক রহিল।

৪৩

রামবাবু বাড়ি ছিলেন না। পরদিন বক্সার হইতে ফিরিয়া মহিমের চিঠি পড়িয়া বাহির হইতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলেন না—সমস্ত পথ ঘোড়াটাকে নির্ম্মম ছুটাইয়া আধমরা করিয়া তুলিয়া যখন মাঝুলিতে পৌঁছিলেন তখন বেলা অবসান হইতেছে। পুলিশের দারোগা ভাবিয়া দোকানী স্বয়ং পথ দেখাইয়া নন্দ পাঁড়ের নিমতলায় আনিয়া উপস্থিত করিল এবং এক্কা হইতে অবতরণকালে সসম্মানে ঘোড়ার লাগাম ধরিল। ইহার কাছে খবর পাইয়া জানিলেন, অচলাও আসিয়াছে। সদর-দরজা খোলা ছিল, ভিতরে পা দিয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে বাকী রহিল না। ঘণ্টা-দুই হইল সুরেশের মৃত্যু হইয়াছে! খাটিয়ার উপর তাহার মৃতদেহ আপাদমস্তক চাপা দেওয়া এবং অনতিদূরে পায়ের কাছে অচলা চুপ করিয়া বসিয়া।

অকস্মাৎ এই দৃশ্য বৃদ্ধ সহিতে পারিলেন না—মা গো! বলিয়া উচ্ছ্বসিত শোকে কাঁদিয়া উঠিলেন।

অচলা মুখ তুলিয়া একবার চাহিল মাত্র, তার পরে তেমনি অধোমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। এই আর্ত্তকণ্ঠ যেন শুধু তাহার কানে গেল, কিন্তু ভিতরে পৌঁছিল না।

মহিম বাটীর মধ্যে কাঠের সন্ধান করিতেছিল, ক্রন্দনের শব্দে বাহির হইয়া আসিল। কহিল, সুরেশ এই কতক্ষণ মারা গেল রামবাবু। আপনি এসেচেন, ভালই হয়েচে, একলা বড় অসুবিধে হ'তো।

রামবাবু নীরবে চোখ মুছিতে লাগিলেন। তিনি কি করিবেন, কি বলিবেন, কি করিয়া ওই মেয়েটার চোখের উপর ঐ ভীষণ নিদারুণ কার্য্যে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহার কূল-কিনারা ভাবিয়া পাইলেন না।

মহিম কহিল, নদী দূরে নয়, রঘুবীর কিছু কিছু কাঠ বয়ে নিয়ে গেছে, আরও কিছু কাঠ পাওয়া গেছে—সেইটে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা তিনজনেই ওকে নিয়ে যেতে পারবো। নইলে গ্রামে আর লোক নেই, থাকলেও বোধ হয় কেউ বাঙালীর মড়া ছোঁবে না।

রামবাবু তাহা জানিতেন। অচলার অগোচরে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা দু'জন, আর কে?

মহিম বলিল, রঘুবীরও হয়ত সাহায্য করতে পারে।

শুনিয়া বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, না না, সে কিছুতেই হলে চলবে না। ব্রাহ্মণের শব আর কাকেও আমি ছুঁতে দিতে পারব না। নদী যখন দূর নয়, তখন আমাদের দু'জনকে যেমন করে হোক নিয়ে যেতে হবে।

বেশ তাই, বলিয়া মহিম পুনরায় ভিতরে গিয়া কাষ্ঠ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। রামবাবু সেই বারান্দার একপ্রান্তে মুখ ফিরাইয়া খুঁটি ঠেস দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

তাঁহার বয়স হইয়াছে; এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে অনেক মৃত্যু দেখিয়াছেন, অনেক গভীর শোকের মধ্য দিয়াও তাঁহাকে ধীরে ধীরে পথ চলিতে হইয়াছে। দুঃসহ দুঃখের সে করুণ সুর একে একে তাঁহার হৃদয়-বীণায় বাঁধা হইয়া গিয়াছে, আজিকার এই ব্যাপারটা সেই তারে ঘা দিয়া যেন কেবলি বেসুরে বাজিতে লাগিল। একদিন এই সুরমাই জ্যাঠামশাই বলিয়া তাঁহার বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিল—সে ছবি তিনি ভুলেন নাই। আজও তাঁহার পিতৃস্নেহ যেন সেই বস্তুটার লোভেই ভিতরে ভিতরে গুমরাইয়া মরিতে লাগিল। তাহাকে কি সান্ত্বনা দিবেন তিনি জানেন না, তাহাকে প্রবোধ দিবার মত সংসারে কোথায় কি আছে তাহাও তিনি অবগত নন; তবুও তাঁহার শোকাতুর মন যেন কেবলি চাহিতে

লাগিল, একবার মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলেন, ভয় কি মা! আজও যে আমি বাঁচিয়া আছি!

কিন্তু সে স্বর বাজিল কৈ? তাঁহার সে তৃষ্ণা মিটাইতে কেহ ত একপদ অগ্রসর হইয়া আসিল না! সুরমা যে তেমনি নীরবে, তেমনি দূরতম অনাত্মীয়ের ব্যবধান দিয়া আপনাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিল!

দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে, ইহাদের অনেক দুর্জ্ঞেয় বেদনা, নির্ব্বাক্ মর্ম্মপীড়ার পাশ দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে, প্রচ্ছন্ন রহস্যের ইঙ্গিত মাঝে মাঝে তাঁহাকে খোঁচা দিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোনদিন আপনাকে আহত হইতে দেন নাই—সমস্ত সংশয় স্নেহের আবরণে চাপা দিয়া, বাহিরের আকাশ নির্ম্মল মেঘমুক্ত রাখিয়াছেন; কিন্তু আজ সদ্য-বিধবার ওই একান্ত অপরিচিত নিষ্ঠুর ধৈর্য্য তাঁহার এতদিনের আড়াল-করা স্নেহের গা চিরিয়া কলুষের বাষ্পে হৃদয় যেন ভরিয়া দিতে লাগিল।

সূর্য্য অস্ত গেল। মহিম ও-দিকের কাজ একপ্রকার শেষ করিয়া কাছে আসিয়া কহিল, রামবাবু, এইবার ত ওকে নিয়ে যেতে হয়। অচলার দিকে ফিরিয়া বলিল, আলোটা জ্বেলে দিয়েছি, তুমি মুনিয়ার মার কাছে বসে থাকো, আমাদের ফিরতে বোধ হয় খুব বিলম্ব হবে না।

অচলা কোন কথাই বলিল না। রামবাবু আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি মাথা নাড়িলেন! অচলার আনত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রুদ্ধ স্বর পরিষ্কার করিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, মা, একথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু স্ত্রীর শেষ কর্ত্তব্য ত তোমাকেই করতে হবে। তোমাকেই ত মুখাগ্নি—বলিতে বলিতে তিনি হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অচলা শুষ্ক মুখ, ততোধিক শুষ্ক চোখ দুটি বৃদ্ধের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া রহিল; তার পরে শান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, মুখাগ্নির আবশ্যক হয় ত আমি করতে পারি। হিন্দুধর্ম্মে এর যদি কোন সত্যকার ফল থাকে, তা আর আমি ব্যর্থ করতে চাইনে। আমি তাঁর স্ত্রী নই।

রামবাবু বজ্রাহতের ন্যায় পলকহীন চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে আস্তে আস্তে বলিলেন, তুমি সুরেশের স্ত্রী নও?

অচলা তেমনি অবিচলিতস্বরে বলিল, না, উনি আমার স্বামী নন।

চক্ষের নিমিষে রামবাবুর সমস্ত ঘটনা স্মরণ হইয়া গেল। তাঁহার বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করা হইতে আরম্ভ করিয়া সেদিনের সেই মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত যাবতীয় ব্যাপার বিদ্যুদ্বেগে বার বার তাঁহার মনের মধ্যে আবর্ত্তিত হইয়া সংশয়ের ছায়ামাত্রও কোথাও অবশিষ্ট রহিল না। এ কে, কার মেয়ে, কি জাত—হয়ত বা বেশ্যা—ইহাকে মা বলিয়াছেন, ইহার ছোঁয়া খাইয়াছেন—ইহার হাতের অন্ন তাঁহার

ঠাকুরকে পর্য্যন্ত নিবেদন করিয়া দিয়াছেন। কথাগুলা মনে করিয়া ঘৃণায় যেন সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার ক্লেদসিক্ত হইয়া গেল এবং যে স্নেহ এতদিন তাঁহাকে শ্রদ্ধায় মাধুর্য্যে করুণায় অভিষিক্ত রাখিয়াছিল, মরুভূমির জলকণার ন্যায় সে যে কোথায় অন্তর্হিত হইল তাহার আভাস পর্য্যন্ত রহিল না।

কিন্তু কেবল তিনিই নন, মহিমও স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল, সে চকিত হইয়া কহিল, সে যখন হবার জো নেই রামবাবু, চলুন আমরা নিয়ে যাই।

চলুন, বলিয়া বৃদ্ধ স্বপ্নচালিতের ন্যায় অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নিজের দুর্ঘটনার কাছে আর সমস্ত দুর্ঘটনাই একেবারে ছায়ার মত ম্লান হইয়া গিয়াছে—তাঁহার দুই কান জুড়িয়া কেবল বাজিতেছে—জাতি গেল, ধর্ম্ম গেল, এই মানব-জন্মটাই যেন ব্যর্থ, বৃথা হইয়া গেল।

সুরেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেমন-তেমন করিয়া সমাধা করিতে অধিক সময় লাগিল না। সমস্তক্ষণ রামবাবু একটা কথাও কহিলেন না এবং ফিরিয়া আসিয়া সোজা এক্কা প্রস্তুত করিতে হুকুম দিলেন।

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি যাচ্ছেন?

রামবাবু কহিলেন, হাঁ। আমাকে ভোরের ট্রেনে কাশী যেতে হবে, এখন না বেরোলে সময়ে পৌঁছতে পারব না।

তাঁহার মনের ভাব মহিমের অবিদিত ছিল না এবং প্রায়শ্চিত্তের জন্যই যে তিনি কাশী ছুটিতেছেন, ইহাও সে বুঝিয়াছিল; তাই অতিশয় সঙ্কোচের সহিত কহিল, আমি বিদেশী লোক, এদিকের কিছুই জানিনে। দয়া করে যদি এঁর কোন যাবার ব্যবস্থা—, কথাটা শেষ হইতে পাইল না। অচলাকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাবে বৃদ্ধ অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন—দয়া! আপনি কি ক্ষেপে গেলেন মহিমবাবু?

মহিম এ প্রশ্নের প্রতিবাদ করিল না। সভয়ে, সবিনয়ে কহিল, বোধ হয় দু-তিনদিন ওঁর খাওয়া হয় নি। ওই মৃত্যুপুরীর মধ্যে ভয়ানক অবস্থায় ফেলে যাওয়া—

তাহার এ-কথাও শেষ করিবার সময় মিলিল না। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের জন্মগত সংস্কার আঘাত খাইয়া প্রতিহিংসায় ক্রূর হইয়া উঠিয়াছিল; তাই তীব্র শ্লেষে বলিয়া উঠিলেন, ওঃ—আপনিও যে ব্রাহ্ম, সেটা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু মশাই, যত বড় ব্রহ্মজ্ঞানীই হোন, আমার সর্ব্বনাশের পরিমাণ বুঝলে, এই কুলটার সম্বন্ধে দয়ামায়া মুখেও আনতেন না। বলিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, যাক, ব্রহ্মজ্ঞানে আর কাজ নেই—প্রাণ বাঁচাতে চান ত উঠে বসুন, জায়গা হবে।

মহিম নিঃশব্দে নমস্কার করিল। সর্ব্বনাশের পরিমাণ লইয়াও দ্বন্দ্ব করিল না,

প্রাণ বাঁচাইবার নিমন্ত্রণও গ্রহণ করিল না। তিনি চলিয়া গেলে শুধু বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল মাত্র।

সর্ব্বনাশের পরিমাণ! তাই বটে!

ভিতরে বসিয়া গাড়ির শব্দে অচলাও ইহা অনুভব করিল। কেন তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন না, একটা কথা পর্য্যন্ত বলিয়া গেলেন না, তাহাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

এতক্ষণ সুরেশের অনিবার্য্য মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তার উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া একটা অন্তরাল রচিয়াছিল, তাহাও নাই; এইবার মহিম অত্যন্ত সম্মুখে, অত্যন্ত কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু আর তাহার মন কিছুতেই সাড়া দিতে চাহিল না। নিজের জন্য লজ্জা বোধ করিতেও সে যেন ক্লান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

মহিম আসিয়া দেখিল, সে কেরোসিনের আলোটা সম্মুখে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে; কহিল, এখন তুমি কি করবে?

আমি? বলিয়া অচলা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কত কি যেন ভাবিতে লাগিল; শেষে বলিল, আমি ত ভেবে পাইনে। তুমি যা হুকুম করবে, আমি তাই করব।

এই অপ্রত্যাশিত বাক্য ও ব্যবহারে মহিম বিস্মিত হইল, শঙ্কিত হইল। এমন করিয়া সে একবারও চাহে নাই। এ দৃষ্টি যেমন সোজা, তেমনি স্বচ্ছ। ইহার ভিতর দিয়া তাহার বুকের অনেকখানি যেন বড় স্পষ্ট দেখা গেল। সেখানে ভয় নাই, ভরসা নাই, কামনা নাই, কল্পনা নাই—যতদূর দেখা যায়, ভবিষ্যতের আকাশ ধূ ধূ করিতেছে। তাহার রঙ নাই, মূর্ত্তি নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই—একেবারে নির্ব্বিকার, একেবারে একান্ত শূন্য।

উপদ্রুত, অপমানিত, ক্ষত-বিক্ষত নারী-হৃদয়ের এই চরম বৈরাগ্যকে সে চিনিতে পারিল না। একের অভাব অপরের হৃদয়কে এমন নিঃস্ব করিয়াছে কল্পনা করিয়া তাহার সমস্ত মন তিক্ততায় পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু নিজের দুঃখ দিয়া জগতের দুঃখের ভার সে কোনদিন বাড়াইতে চাহে না, তাই আপনাকে আপনার মধ্যে ধরিয়া রাখাই তাহার চিরদিনের অভ্যাস। পাছে এই বক্ষ-ভরা তিক্ততা তাহার কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এই ভয়ে সে অন্যত্র চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল; তার পরে সহজ গলায় বলিল, আমি কেন তোমাকে হুকুম দেব অচলা, আর তুমিই বা তা শুনতে বাধ্য হবে কিসের জন্য?

কিন্তু তুমি ছাড়া আর যে কেউ নাই, কেউ ত আমার সঙ্গে আর কথা কবে না; বলিয়া অচলা তেমনি একভাবেই মহিমের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মহিম কহিল, এই কি আমার কাছে তুমি প্রত্যাশা কর?

বোধ হয় প্রশ্নটা অচলার কানেই গেল না। সে নিজের কথার রেশ ধরিয়া যেন আপনাকে আপনিই বলিতে লাগিল, তোমাকে হারিয়ে পর্য্যন্ত ভগবানকে আমি

কত জানাচ্ছি, হে ঈশ্বর! আমি আর পারিনে—আমাকে তুমি নাও! কিন্তু তিনিও শুনলেন না, তুমিও শুনতে চাও না। আমি আর কি করব!

মহিম কোন জবাব না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল, কিন্তু এই নৈরাশ্যের কণ্ঠস্বর, এই নিরভিমান, নিঃসঙ্কোচ, নির্লজ্জ উক্তি আবার তাহার চিত্তকে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া তুলিল। এই সুর কানের মধ্যে লইয়া সে বাহিরে প্রাঙ্গণে বেড়াইতে বেড়াইতে ইহাই ভাবিতে লাগিল, কি করা যায়! আপনার ভারে সে আপনি ভারাক্রান্ত, আবার তাহারি মাথায় সুরেশ যে তাহার সুকৃতি দুষ্কৃতির গুরুভার চাপাইয়া এইমাত্র কোথায় সরিয়া গেল, এ বোঝাই বা সে কোথায় গিয়া কি করিয়া নামাইবে?

রঘুবীর অনেক পরিশ্রমে খবর লইয়া আসিল যে, ডিহরীর পথে ক্রোশ-তিনেক দূরে কাল সকালেই একটা হাট বসিবে, চেষ্টা করিলে সেখানে গো-শকট পাওয়া যাইতে পারে।

মহিমকে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিতে দেখিয়া সে সঙ্কোচের সহিত জানাইল, নিজে সে এখনি যাইতে পারে, কিন্তু এ-গ্রামে বোধ হয় কেহ ভয়ে আসিতে চাহিবে না। কিন্তু মাইজী যদি এই পথটুকু—

অচলা শুনিয়া বলিল, চল; এবং তৎক্ষণাৎ উঠিতে গিয়া সে পা টলিয়া পড়িতেছিল, মহিম হাত বাড়াইতেই সজোরে চাপিয়া ধরিয়া নিজেকে স্থির করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু লজ্জায় বিতৃষ্ণায় মহিমের সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত হইতে লাগিল, নিজের হাতটা সে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল, আজ না হয় থাক্।

কেন! এই যে তুমি বললে, এখানে থাকা উচিত নয়। আর ডিহরী থেকে গাড়ি আনিয়ে যেতেও কালকের দিন কেটে যাবে?

কিন্তু তুমি যে বড় দুর্ব্বল—

অচলা হাত ছাড়ে নাই, সে হাত ছাড়িল না। শুধু মাথা নাড়িয়া কহিল, না চল। আর আমি দুর্ব্বল নই, তোমার হাত ধরে যত দূরে বল, যেতে পারব।

চল, বলিয়া মহিম রঘুবীরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যাত্রা করিল। সে মনে মনে নিশ্বাস ফেলিয়া আপনাকে আপনি সহস্রবার প্রশ্ন করিতে লাগিল, ইহার শেষ হইবে কোথায়? এ-যাত্রা থামিবে কখন্ এবং কি করিয়া?

৪৪

ডিহরীর বাটীতে পৌঁছিয়া অচলা সেই মোটা খামখানি বাহির করিয়া বলিল, এই তার উইল। মহিম হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল। তাহার মনে পড়িল, ইহার

মধ্যে সুরেশের চিঠি আছে। পত্রে কোন্ অচিন্তনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে, কোন্ দুর্গম রহস্যের পথের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তদ্দণ্ডেই জানিবার জন্য মনের মধ্যে তাহার ঝড় বহিতে লাগিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড ইচ্ছাকে সে শান্ত-মুখে দমন করিয়া কাগজখানি পকেটে রাখিয়া দিল।

অচলা কহিল, তুমি কি আজই ডিহরী থেকে চলে যাবে?

হাঁ, এখানে থাকবার আমার সুবিধা হবে না।

আমাকে কি চিরকাল এখানেই থাকতে হবে?

মহিম এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তুমি কি আর কোথাও যেতে চাও?

অচলা কহিল, কাল থেকেই আমিও কেবল ভাবচি। শুনেচি, বিলেত অঞ্চলে আমার মত হতভাগিনীদের জন্যে আশ্রম আছে, সেখানে কি হয়, আমি জানিনে, কিন্তু এদেশে কি তেমন কিছু—, বলিতে বলিতেই তাহার বড় বড় চোখ দুটি জলে টল্ টল্ করিতে লাগিল। এই প্রথম তাহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

মহিমের বুকে করুণার তীর বিঁধিল, কিন্তু সে কেবল ধীরে ধীরে উত্তর দিল, আমিও জানিনে, তবে খোঁজ নিতে পারি।

কখনো তোমাকে চিঠি লিখলে কি তুমি জবাব দেবে না?

প্রয়োজন থাকলে দিতে পারি। কিন্তু আমার গুছিয়ে নিয়ে বার হতে দেরি হবে—আমি চললুম।

অচলা তাহার শেষ দুঃখকে আজ মনে মনে স্বামীর পায়ে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া দিয়া সেইখানেই মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং তিনি বাহির হইয়া গেলে চৌকাট ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পথে চলিতে চলিতে মহিম ভাবিতেছিল, রামবাবুর বাটীতে আর একমুহূর্ত্তও থাকা চলে না, অথচ সহরের মধ্যে আর কোথাও একটা দিনের জন্য আশ্রয় লওয়া অসম্ভব। যেমন করিয়াই হোক, এদেশ হইতে আজ তাহাকে বাহির হইতে হইবে, তা ছাড়া নিজের জন্য এমন একটা নিরালা জায়গার প্রয়োজন, যেখানে দুদণ্ড স্থির হইয়া বসিয়া শুধু কেবল খামখানার ভিতর কি আছে, তাই নয়, আপনাকে আপনি চোখ মেলিয়া দেখিবার একটুখানি অবসর মিলিবে।

অচলাকে তিল তিল করিয়া ভালবাসিবার প্রথম ইতিহাস তার কাছে অস্পষ্ট, কিন্তু এই মেয়েটিকেই কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবনের উপর দিয়া যাহা বহিয়া গিয়াছে, তাহা যেমন প্রলয়ের মত অসীম, তেমনি উপমাবিহীন। আবার নিঃশব্দ সহিষ্ণুতার শক্তিও বিধাতা তাহাকে হিসাব করিয়া দেন নাই। তাহার গৃহ যখন বাহির এবং

ভিতর হইতে জ্বলিয়া উঠিল, তখন সে ঐখানে দাঁড়াইয়াই ভস্মসাৎ হইল—এতটুকু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংসারে ছড়াইতে পাইল না। কিন্তু আজ তাহার শক্তির ডাক কেবল সহিবার জন্যে পড়ে নাই—সামঞ্জস্য করিবার জন্য পড়িয়াছে। আজ একবার তাহার জমা-খরচের খাতাখানা না মিলাইয়া দেখিলে আর চলিবে না। কোথাও এক নির্জ্জন স্থান আজ তাহার চাই-ই চাই।

বাটীতে পৌঁছিয়া নিজের জিনিসপত্রগুলা সে তাড়াতাড়ি গুছাইয়া লইল. পাঁচটার ট্রেনের আর ঘণ্টাখানেকমাত্র সময় আছে। রামবাবুর কাশী হইতে ফিরিতে সম্ভবতঃ বিলম্ব হইবে, কারণ যথার্থই তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়াছেন এবং তাহার পূর্ব্বে জলস্পর্শ করিবেন না বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বিদায় লওয়া চলে না। এই কর্ত্তব্যটা সংক্ষিপ্ত পত্রে শেষ করিয়া দিতে সে কাগজ-কলম লইয়া বসিল। দুই-এক ছত্র লিখিয়াই তাঁহার সেই ক্রুদ্ধ মুখের উগ্র উত্তপ্ত বিদ্রূপগুলাই তাহার মনে হইতে লাগিল; এবং ইহারই সহিত আর এক-জনের অশ্রুজলে অস্পষ্ট অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরের কাতর প্রার্থনাও তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। তন্দ্রার মধ্যে বেদনার ন্যায় এতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা তাহার চৈতন্যকে সম্পূর্ণ জাগ্রত রাখিয়াও রাখে নাই, ঘুমাইয়া পড়িতে দেয় নাই, কিন্তু রামবাবুর সেই কথাগুলো যেন ধাক্কা মারিয়া চমক ভাঙিয়া দিল।

এই প্রাচীন ব্যক্তির সহিত তাহার পরিচয় বেশিদিনের নয়, কিন্তু ইহার দয়া, ইহার দাক্ষিণ্য, ইহার ভদ্রতা, ইহার অকপট ভগবদ্ভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার অনেক কাহিনী সে শুনিয়াছে—এইগুলি এখন অকস্মাৎ তাহার রুদ্ধ চক্ষুতে যেন একটা সম্পূর্ণ অপরিদৃষ্ট দিক নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

এই বৃদ্ধ অচলাকে তাঁহার সুরমা-মা বলিয়া, কন্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই মেয়েটি ভিন্ন তিনি কখনো কোন পরগোত্রীয়ার হাতে অন্ন স্পর্শ করেন নাই, ইহাও মহিমের কাছে স্নেহচ্ছলে গল্প করিয়াছেন, সুতরাং সর্ব্বনাশটা যে তাঁহার কোন্ দিক দিয়া পৌঁছিয়াছিল, ইহা অনুমান করা মহিমের কঠিন নয়; কিন্তু এখন এই কথাটাই সে মনে মনে বলিতে লাগিল, অচলার অপরাধের বিচার না হয় পরে চিন্তা করিবে, কিন্তু এই আচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণের এই ধর্ম্ম কোন্ সত্যকার ধর্ম্ম, যাহা সামান্য একটা মেয়ের প্রতারণায় এক নিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল, যে ধর্ম্ম অত্যাচারীর আঘাত হইতে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করিতে পারে না, বরঞ্চ তাহাকেই মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে সমস্ত শক্তি অহরহ উদ্যত রাখিতে হয়, সে কিসের ধর্ম্ম, এবং মানব-জীবনে তাহার প্রয়োজন কোন্‌খানে? যে ধর্ম্ম স্নেহের মর্য্যাদা রাখিতে দিল না, নিঃসহায় আর্ত্ত নারীকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া যাইতে এতটুকু দ্বিধা-বোধ করিল না, আঘাত খাইয়া যে ধর্ম্ম এতবড় স্নেহশীল বৃদ্ধকেও এমন চঞ্চল প্রতিহিংসায় এরূপ

নিষ্ঠুর করিয়া দিল, সে কিসের ধর্ম্ম ? ইহাকে যে স্বীকার করিয়াছে, সে কোন্ সত্য বস্তু বহন করিতেছে ? যাহা ধর্ম্ম সে ত বর্ম্মের মত আঘাত সহিবার জন্যই। সেই ত তার শেষ পরীক্ষা।

তাহার সহসা মনে হইল তবে কি তাহার নিজের পলায়নটাও—কিন্তু চিন্তাটাকেও সে তেমনি সহসা দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া কলমটাকে তুলিয়া লইল এবং ক্ষুদ্র পত্র অবিলম্বে শেষ করিয়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

ট্রেন আসিলে যে কামরার দ্বার খুলিয়া মহিম ভিতরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিল, সেই পথেই একজন বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক একটি বিধবা মেয়ের হাত ধরিয়া নীচে নামিয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধ কহিল, এ কি, মহিম যে ?

মৃণাল পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, সেজদা, যাচ্ছো কোথায় ? বলিয়া উভয়েই বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিল মহিম গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছে।

মহিম কহিল, আমি কলকাতায় যাচ্ছি; সুরেশবাবুর বাড়ি বললেই গাড়োয়ান ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। সেখানে অচলা আছে।

কেদারবাবু আচ্ছন্নের মত একদৃষ্টে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহিম বলিল, সুরেশের মৃত্যু হয়েচে। অচলা আমাকে একটা আশ্রয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল মৃণাল, কিন্তু আমি তার জবাব দিতে পারিনি। তোমার কাছে হয়ত সে একটা উত্তর পেতেও পারে।

মৃণাল তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শুধু কহিল, পাবে বৈ কি সেজদা। কিন্তু আমার সকল শিক্ষা ত তোমারি কাছে। আশ্রমই বল আর আশ্রয়ই বল, সে যে তার কোথায়, এ-খবর সেজদিকে আমি দিতে পারব, কিন্তু সে ত তোমারই দেওয়া হবে।

মহিম কথা কহিল না। বোধ হয় নিজেকে সে এই তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রমণীর কাছ হইতে গোপন করিবার জন্যেই মুখ ফিরাইয়া লইল।

গাড়ির বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মৃণাল স্খলিত ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, চল বাবা, আমরা যাই।

বিন্দুর ছেলে

১

যাদব মুখুয্যে ও মাধব মুখুয্যে যে সহোদর ছিলেন না, সে-কথা নিজেরা ত ভুলিয়াই ছিলেন, বাহিরের লোকও ভুলিয়াছিল। দরিদ্র যাদব অনেক কষ্টে ছোট-ভাই মাধবকে আইন পাশ করাইয়াছিলেন এবং বহু চেষ্টায় ধনাঢ্য জমিদারের একমাত্র সন্তান বিন্দুবাসিনীকে ভ্রাতৃবধূরূপে ঘরে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিন্দুবাসিনী অসামান্যা রূপসী। প্রথম যেদিন সে এই অতুল রূপ ও দশ সহস্র টাকার কাগজ লইয়া ঘর করিতে আসিয়াছিল সেদিন বড়বৌ অন্নপূর্ণার চোখে আনন্দাশ্রু বহিয়াছিল; বাড়িতে শাশুড়ী-ননদ ছিল না, তিনিই ছিলেন গৃহিণী। ছোটবধূর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া গ্রামবাসীদের কাছে সগর্বে বলিয়াছিলেন, ঘরে বৌ আনতে হয় ত এমনি। একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। কিন্তু দুইদিনেই তাঁহার এ-ভুল ভাঙিল। দুদিনেই টের পাইলেন, ছোটবৌ যে ওজনে রূপ ও টাকা আনিয়াছে, তাহার চতুর্গুণ অহঙ্কার-অভিমানও সঙ্গে আনিয়াছে।

একদিন বড়বৌ স্বামীকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, হাঁ গা, রূপ আর টাকার পুঁটলি দেখে ঘরে বৌ আনলে, কিন্তু এ যে কেউটে সাপ!

যাদব কথাটা বিশ্বাস করিলেন না। মাথা চুলকাইয়া বার-দুই তাই ত, তাই ত, করিয়া কাছারি চলিয়া গেলেন।

যাদব অতিশয় শান্ত-প্রকৃতির লোক। জমিদারী সেরেস্তার নায়েবী এবং ঘরে আসিয়া পূজা-অর্চ্চনা করিতেন। মাধব দাদার চেয়ে দশ-বারো বছরের ছোট, উকিল হইয়া সম্প্রতি ব্যবসা শুরু করিয়াছিল।

সে আসিয়া কহিল, বৌঠান, টাকাটাই কি দাদার বেশি হ'ল? দুদিন সবুর করলে আমিও ত রোজগার করে দিতে পারতাম।

অন্নপূর্ণা চুপ করিয়া রহিলেন।

এ-ছাড়া আরও একটা বিপদ এই হইয়াছিল, ছোটবৌকে শাসন করিবারও জো ছিল না। তাহার এমনি ভয়ঙ্কর ফিটের ব্যামো ছিল যে, সেদিকে চাহিয়া দেখিলেও বাড়িসুদ্ধ লোকের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে থাকিত এবং ডাক্তার না ডাকিলে আর উপায় হইত না। সুতরাং সাধের বিবাহটা যে ভুল হইয়া গিয়াছে, এই ধারণাই সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল; শুধু যাদব হাল ছাড়িল না। তিনি সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, না গো না, তোমরা পরে দেখো।

মায়ের আমার অমন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, সে কি একেবারে নিষ্ফল যাবে? এ হতেই পারে না।

একদিন কি একটা কথার পরে ছোটবৌ মুখ অন্ধকার করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া ভয়ে অন্নপূর্ণার প্রাণ উড়িয়া গেল। হঠাৎ তাঁহার কি মনে হইল, ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া তাঁর দেড় বছরের ঘুমন্ত ছেলে অমূল্যচরণকে টানিয়া আনিয়া বিন্দুর কোলের উপর নিক্ষেপ করিয়াই তিনি পলাইয়া গেলেন।

অমূল্য কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

বিন্দু প্রাণপণ-বলে নিজেকে সংবরণ করিয়া মূর্চ্ছার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ছেলে বুকে করিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিলেন এবং ফিটের ব্যামোর এ অমোঘ দৈব ঔষধ বাহির করিয়া পুলকিত হইলেন।

সংসারের সমস্ত ভার অন্নপূর্ণার মাথায় ছিল বলিয়া তিনি ছেলে মানুষ করিতে পারিতেন না। বিশেষ, সমস্তদিনের কাজ-কর্মের পর রাত্রে ঘুমাইতে না পাইলে তাঁহার বড় অসুখ করিত; তাই এই ভারটা ছোটবৌ লইয়াছিল।

মাসখানেক পরে একদিন সকালবেলা সে ছেলে কোলে লইয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল, দিদি, অমূল্যধনের দুধ কই?

অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি হাতের কাজটি ফেলিয়া রাখিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন, এক মিনিট সবুর কর বোন, জ্বাল দিয়ে দিচ্চি।

বিন্দু ঘরে ঢুকিয়াই তাহা দেখিয়া রাগিয়া গিয়াছিল, তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলিল, কালও তোমাকে বলেচি, আমার আটটার আগে দুধ চাই, তা সে ত নটা বাজে! কাজটা তোমার যদি এতই ভারি ঠেকে দিদি, স্পষ্ট করে বললেই ত পার, আমি অন্য উপায় দেখি। হাঁ বামুনমেয়ে, তোমার কি একটু হুঁস থাকতে নেই গা, বাড়িসুদ্ধ লোকের পিণ্ডি-রান্না না হয়, দু'মিনিট পরেই হ'ত।

বামুনঠাকরুণ চুপ করিয়া রহিলেন।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, তোর মত শুধু ছেলেকে টিপ পরানো আর কাজল দেওয়া নিয়ে থাকলে আমাদেরও হুঁস থাকত। এক মিনিট আর দেরি সয় না ছোটবৌ?

ছোটবৌ তাহার উত্তরে বলিল, তোমার অতি বড় দিব্যি রইল, যদি কোনদিন আর অমূল্যের দুধে হাত দাও, আমারও দিব্যি রইল, আর কোনদিন যদি তোমাকে বলি।

এই বলিয়া সে মেঝের উপর অমূল্যকে দুম্ করিয়া বসাইয়া দিয়া দুধের কড়া তুলিয়া আনিয়া উনানের উপর চড়াইয়া দিল। এই অভাবনীয় ব্যাপারে অমূল্য চীৎকার করিয়া উঠিতেই, বিন্দু তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, চুপ কর্ হারামজাদা, চুপ কর, চেঁচালে একেবারে মেরে ফেলব। বিন্দুর ব্যাপারে বাড়ির দাসী কদম ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে কোলে লইতে গেলে বিন্দু তাহাকে ধমকাইয়া উঠিল, দূর হ, সামনে থেকে দূর হ!

সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিন্দু আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া রোরুদ্যমান শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া দুধ জ্বাল দিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে বিন্দু দুধ লইয়া চলিয়া গেলে তিনি পাচিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শুনলে মেয়ে, ওর কথা? সেই যে একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলুম, অমূল্যকে নে। সেই জোরে আজ আমাকেও দিব্যি দিয়ে গেল!

যাহা হৌক, এমনি করিয়া অন্নপূর্ণার ছেলে বিন্দুবাসিনীর কোলে মানুষ হইতে লাগিল এবং তাহার ফল হইল এই যে, অমূল্য খুড়িকে মা এবং মাকে দিদি বলিতে শিখিল।

ইহার বছর-চারেক পরে যেদিন খুব ঘটা করিয়া অমূল্যের হাতে-খড়ি হইয়া গেল, তাহার পরদিন সকালে অন্নপূর্ণা রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন; বাহির হইতে বিন্দুবাসিনী ডাকিয়া কহিল, দিদি, অমূল্যধন প্রণাম করতে এসেছে, একবারটি বাইরে এস।

অন্নপূর্ণা বাহিরে আসিয়া অমূল্যর সাজগোজ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তাহার চোখে কাজল, কপালে টিপ, গলায় সোনার হার, মাথার উপর চুল ঝুঁটি করিয়া বাঁধা, পরনে একটি হলদে-রঙের ছাপান কাপড়, একহাতে দড়ি-বাঁধা মাটির দোয়াত, বগলে ক্ষুদ্র একখানি মাদুর-জড়ানো গুটিকয়েক তালপাতা।

বিন্দু বলিল, দিদিকে প্রণাম কর ত বাবা!

অমূল্য জননীকে প্রণাম করিল।

তাহার পায়ে জুতা নাই, মোজা নাই, পরনে নানাবিধ বিলাতী পোষাক নাই—অন্নপূর্ণা এই অপরূপ সাজ দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, এতও তোর আসে ছোটবৌ। ছেলে বুঝি পড়তে যাচ্ছে?

বিন্দু হাসিমুখে বলিল, হাঁ, গঙ্গা পণ্ডিতের পাঠশালে পাঠিয়ে দিচ্চি। আশীর্বাদ কর দিদি, আজকের দিন যেন ওর সার্থক হয়।

চাকরের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, ভৈরব, পণ্ডিতমশাইকে আমার নাম করে বিশেষ করে বলে দিস্, ছেলেকে আমার যেন কেউ মার-ধোর না করে।

দিদি, এই পাঁচটা টাকা ধর, বেশ করে একখানি সিদে সাজিয়ে টাকা কটি দিয়ে কদমের হাতে পাঠশালায় পাঠিয়ে দাও। বলিয়া গভীর স্নেহে চুমা খাইয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণার দুই চোখে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; তিনি বামুনঠাকরুণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, ছেলে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তবু পেটে ধরেনি—তা হলে না জানি ও কি করত।

পাচিকা কহিল, সেজন্যেই ভগবান বোধ করি দিলেন না, আঠার-উনিশ বছর বয়স হ'ল—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। ছোটবৌ একা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দিদি, বঠ্‌ঠাকুরকে বলে আমাদের বাড়ির সামনে একটা পাঠশালা করে দেওয়া যায় না? আমি সমস্ত খরচ দেব।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, এখনো সে দু-পা যায়নি ছোটবৌ, এর মধ্যেই তোর মতলব ঘুরে গেল। না হয় তুইও যা না, পাঠশালায় গিয়ে বসে থাকবি।

বিন্দু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, মতলব ঘোরেনি দিদি। কিন্তু ভাবচি আড়ালে থাকা এক, আর চোখের সামনে এক। পোড়োরা সব দুষ্ট ছেলে, ওকে ছোটটি পেয়ে যদি মার-ধোর করে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, করলেই বা। ছেলেরা মারামারি করেই। তা ছাড়া সকলের ছেলেই সমান ছোটবৌ, তাদের বাপ-মা প্রাণ ধরে যদি পাঠশালে দিতে পেরে থাকে, তুই পারবিনে কেন?

পরের সঙ্গে তুলনা করাটা বিন্দু একেবারে পছন্দ করিত না। তাই বোধ করি মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল—তোমার এক কথা দিদি! ধর কেউ যদি ওর চোখে কলমের খোঁচাই দেয়—তা হলে?

অন্নপূর্ণা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন, তা হলে ডাক্তার দেখাবি। কিন্তু সত্যি বলচি তোকে, আমি ত সাত দিন সাত রাত ভাবলেও খোঁচাখুঁচির কথা মনে করতে পারতুম না! এত ছেলে পড়ে, কে কার চোখে কলমের খোঁচা দেয় তাও ত শুনিনি।

বিন্দু কহিল, তুমি শোননি বলেই কি এমন কাণ্ড হতে পারে না? দৈবাজের

কথা কে বলতে পারে? আচ্ছা, বেশ ত তুমি একবার বলেই দেখ না, তারপর যা হয় হবে।

অন্নপূর্ণা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, যা হবে তা দেখতেই পাচ্ছি। তুই একবার যখন ধরেচিস্ তখন কি আর না করে ছাড়বি? কিন্তু আমি অমন অনাছিষ্টি কথা মুখে আনতে পারব না। আর তুইও ত কথা ক'স—নিজেই বস্ গে যা।

এবার বিন্দু রাগ করিল, বলিল, বলবই ত। এত দূরে রোজ রোজ আমি ছেলে পাঠাতে পারব না—এতে কারুর ভাল লাগুক, না লাগুক, আর এতে ওর বিছে হোক আর নাই হোক। হাঁ কদম, তোকে না বললুম সিদে দিয়ে আসতে? হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস্ যে?

তাহার ক্রুদ্ধ ভাব লক্ষ্য করিয়া অন্নপূর্ণা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, সিদে দিচ্চি। একেবারে এত উতলা হস্‌নে ছোটবৌ! আচ্ছা, ছেলে কি তোর বড় হবে না? তুই কি চিরকাল তাকে আঁচল-চাপা দিয়ে রাখতে পারবি? এটা ভাবিস্ না কেন?

ছোটবৌ সে-কথার জবাব না দিয়া বলিল, কদম, সিদে দিয়ে গুরুমশায়ের পায়ের ধূলো একটু তার মাথায় দিয়ে, ছেলে ফিরিয়ে আন্ গে। তাঁকেও একবার বিকেলবেলা আসতে বলিস্। যে বুঝবে না, তাকে আর বোঝাব কি করে? বলচি, ছোটটি পেয়ে যদি কেউ মার-ধোর করে—না, চিরকাল কি তুই আঁচল-চাপা দিয়ে রাখতে পারবি? কি পারব, না পারব, সে পরামর্শ ত নিতে আসিনি। বলিয়া সে উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা অবাক হইয়া, দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কদম বলিল, আর দাঁড়িয়ে থেকো না মা, হয়ত এখনি আবার এসে পড়বেন। উনি যা ধরেচেন বিধাতা-পুরুষেরও সাধ্যি নেই যে তা রদ করেন।

সেইদিন সন্ধ্যার পর বড়কর্ত্তা আফিং খাইয়া শয্যার উপর কাত হইয়া শুইয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া নেশার পৃষ্ঠে চাবুক দিতেছিলেন, এমন সময় দরজার শিকলটা ঝন্ ঝন্ করিয়া নড়িয়া উঠিল।

যাদব কষ্টে চোখ খুলিয়া বলিলেন, কে ও?

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ছোটবৌ কি বলতে এসেচে, শোন।

যাদব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ছোটমা? কেন মা?

ছোটবৌকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ছোটবৌ কথা কহিল না, তাহার হইয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া দিলেন, ওর ছেলের চোখে পোড়োরা কলমের খোঁচা মারবে, তাই বাড়ির মধ্যে একটা পাঠশালা করে দিতে হবে।

যাদব হাতের নলটা ফেলিয়া দিয়া শঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কে চোখে খোঁচা মারলে? কৈ দেখি, কি রকম হ'ল?

অন্নপূর্ণা তাহার হাতের নলটা তুলিয়া দিয়া হাসিয়া বলিলেন, এখনো কেউ মারেনি—যদির কথা হচ্ছে।

যাদব সুস্থির হইয়া বলিলেন, ওঃ যদির কথা। আমি বলি বুঝি—

বিন্দু আড়ালে দাঁড়াইয়া হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া মৃদুস্বরে বলিল, দিদি, এই না তুমি বললে অনাছিষ্টি কথা মুখে আনতে পারবে না—আবার বলতে এলে কেন?

অন্নপূর্ণা নিজেও বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার কথা বলিবার ধরণটা ভাল হয় নাই এবং ইহার ফলও মধুর হইবে না। এখন এই চাপা গলার নিগূঢ় অর্থ স্পষ্ট অনুভব করিয়া তিনি যথার্থ-ই ভীত হইয়া উঠিলেন! তাঁহার রাগটা পড়িল নিরীহ স্বামীর উপর, এবং তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আফিং-এর নেশায় মানুষের চোখই বুজে যায়, কানও কি বুজে যায়? বললুম কি, আর ও শুনলে কি! 'কৈ দেখি কি-রকম হ'ল।' আমি কি বলেচি তোমাকে, অমূল্যর চোখ কানা করে দিয়েচে? আমার হয়েচে যেন সবদিকে জ্বালা!

নির্ব্বিরোধী যাদবের আফিং-এর মৌজ ছুটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তিনি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া বলিলেন, কেন, কি হ'ল গো?

অন্নপূর্ণা রাগিয়া গিয়া বলিলেন, যা হ'ল তা ভালই। এমন মানুষের সঙ্গে কথা কইতে যাওয়া ঝকমারি—অধর্ম্মের ভোগ, বলিয়া সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

যাদব বলিলেন, কি হয়েচে মা খুলে বল ত?

বিন্দু দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, বাইরে গোলার ধারে একটি পাঠশালা হলে—

যাদব বলিলেন, এ আর বেশি কথা কি মা। কিন্তু পড়াবে কে?

বিন্দু কহিল, পণ্ডিতমশাই এসেছিলেন, তিনি মাসে দশ টাকা করে পেলে পাঠশালা তুলে আনবেন। আমি বলি, আমার সুদের জমা টাকা থেকে যেন সব খরচ দেওয়া হয়।

যাদব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বেশ ত মা, কালই আমি লোক লাগিয়ে দেব, গঙ্গারাম এইখানেই যদি তার পাঠশালা তুলে আনে সে ত ভাল কথাই।

ভাশুরের হুকুম পাইয়া বিন্দুর রাগ পড়িয়া গেল। সে হাসি-মুখে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিল, অন্নপূর্ণা মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছেন এবং কাছে বসিয়া কদম হাত-মুখ নাড়িয়া কি যেন ব্যাখ্যা করিতেছে। বিন্দুকে ঢুকিতে দেখিয়াই সে পাংশুমুখে 'ওমা এই যে'—বলিয়াই বক্তব্য শেষ করিয়া ফেলিল। বিন্দু বুঝিল তাহার কথাই হইতেছিল, সামনে আসিয়া বলিল, ও মা কি, তাই বল্ না?

ভয়ে কদমের গলা কাঠ হইয়া গিয়াছিল; সে ঢোক গিলিয়া বলিল, না দিদি, এই কি না—বড়মা বললেন কি না—এই ধর না, কেন—

বিন্দু রুক্ষস্বরে বলিল, ধরেচি তুই কাজ কর্ গে যা।

কদম দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গিয়া বাঁচিল।

তখন বিন্দু অন্নপূর্ণাকে কহিল, বড়গিন্নীর পরামর্শদাতাগুলি বেশ! বঠ্‌ঠাকুরকে বলে ওদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

বিন্দু খুশী থাকিলে অন্নপূর্ণাকে দিদি বলিত, রাগিলে বড়গিন্নী বলিত।

অন্নপূর্ণা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, যা না, বল্ গে না—বঠ্‌ঠাকুর আমার মাথাটা কেটে নেবে। আর বঠ্‌ঠাকুরও তেমনি। সে তখনি শুরু করবে, কি মা! কি বলচ মা, ঠিক কথা মা! ঢের ঢের বরাত দেখেচি ছোটবৌ, কিন্তু তোর মত দেখিনি। কি কপাল নিয়েই জন্মেছিলি, মাইরি, বাড়িসুদ্ধ সবাই যেন ভয়ে জড়সড়।

বিন্দুর রাগ হয়েছিল বটে, অন্নপূর্ণার কথার ভঙ্গিতে সে হাসিয়া ফেলিল। বলিল, কৈ, তুমি ত ভয় কর না!

অন্নপূর্ণা বলিলেন, করিনে আবার! তোমার রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখলে যার বুকের রক্ত জল হয়ে না যায় সে এখনো মায়ের পেটে আছে! কিন্তু অত রাগ ভাল নয় ছোটবৌ! এখনো কি ছোটটি আছিস্? ছেলে হলে যে এতদিন চার-পাঁচ ছেলের মা হতিস্, আর তোকেই বা দোষ দেব কি, ঐ বুড়ো মিনসেই আদর দিয়ে তোর মাথা খেলে।

বিন্দু বলিল, কপাল নিয়ে জন্মেছিলুম দিদি, সে কথা তোমার মানি; ধন-দৌলত আদর-আহ্লাদ অনেকেই পায়, সেটা বেশি কথা নয়, কিন্তু এমন দেবতার মত ভাশুর পেতে অনেক জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল থাকা চাই। আমার অদৃষ্ট দিদি, তুমি হিংসে করে কি করবে? কিন্তু আদর দিয়ে তিনি ত মাথা খাননি, আদর দিয়ে যদি কেউ মাথা খেয়ে থাকে ত সে তুমি।

অন্নপূর্ণা হাত নাড়িয়া বলিলেন, আমি? সে-কথা কারো বলবার জো নেই। আমার শাসন কড়া শাসন কিন্তু কি করব, আমার কপাল মন্দ, কেউ আমাকে ভয় করে না—দাসী-চাকরগুলো পর্য্যন্ত মুখের সামনে দাঁড়িয়ে সমানে ঝগড়া করে, যেন তারাই মনিব, আমি দাসী-বাঁদী! আমি তাই সয়ে থাকি, অন্য কেউ হলে—

তাঁহার এই উল্টা-পাল্টা কথায় বিন্দু খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, দিদি, তুমি সত্য-যুগের মানুষ, কেন মরতে একালে এসে জন্মেছিলে? কই, আমার সঙ্গে ত কেউ ঝগড়া করে না? বলিয়া সহসা সুমুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই বাহু দিয়া অন্নপূর্ণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, একটা গল্প বল দিদি।

অন্নপূর্ণা রাগিয়া বলিলেন, যা সরে যা।

কদম ছুটিয়া আসিয়া বলিল, দিদি, অমূল্যধন জাঁতিতে হাত কেটে ফেলে কাঁদচে।

বিন্দু তৎক্ষণাৎ গলা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, জাঁতি পেলে কোথায় ? তোরা কি কচ্ছিলি ?

আমি ও-ঘরে বিছানা করছিলুম দিদি, জানিওনে যে কখন ও বড়মার ঘরে ঢুকে—

আচ্ছা হয়েচে—হয়েচে—যা, বলিয়া বিন্দু ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। খানিক পরে অমূল্যের আঙুলের ডগায় ভিজা ন্যাকড়ার পটি বাঁধিয়া কোলে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা দিদি, কতদিন বলেচি তোমাকে, ছেলে-পুলের ঘরে জাঁতি-টাতিগুলো একটু সাবধান করে রেখো—তা—

অন্নপূর্ণা আরো রাগিয়া গিয়া বলিলেন, কি কথা যে তুই বলিস্ ছোটবৌ, তার মাথা-মুণ্ডু নেই। কখন তোর ছেলে ঘরে ঢুকে হাত কাটবে বলে কি জাঁতি নোয়ার সিন্ধুকে বন্ধ করে রাখবো ?

বিন্দু বলিল, না, কাল থেকে ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবো, তা হলে আর ঢুকবে না, বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, শুনলি কদম, ওর জবরদস্তি কথাগুলো। জাঁতি কি মানুষে সিন্দুকে তুলে রাখে ?

কদম কি একটা বলিতে গিয়া হাঁ করিয়া থামিয়া গেল।

বিন্দু ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ফের যদি তুমি দাসী-চাকরদের মধ্যস্থ মানবে ত সত্যি বলচি তোমাকে, ছেলে-নিয়ে আমি বাপের বাড়ি চলে যাব।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, যা না, যা। কিন্তু মাথা খুঁড়ে মলেও আর ফিরিয়ে আনবার নামটি করবো না। সে-কথা মনে রাখিস।

আমি আসতেও চাইনে, বলিয়া বিন্দু মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-দুই পরে অন্নপূর্ণা দুম্ দুম করিয়া পা ফেলিয়া ছোটবৌয়ের ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। ঘরের একধারে একটি ছোট টেবিলের উপর মাধবচন্দ্র মকদ্দমার কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন এবং বিন্দু অমূল্যকে লইয়া খাটের উপর শুইয়া আস্তে আস্তে গল্প বলিতেছিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, খাবি আয়।

বিন্দু বলিল, আমার ক্ষিদে নাই।

অমূল্য তাড়াতাড়ি খুড়ির গলা ধরিয়া বলিল, ছোটমা খাবে না, তুমি যাও!

অন্নপূর্ণা ধমক দিয়া বলিলেন, তুই চুপ কর। এই ছেলেটিই হচ্ছে সকল নষ্টের গোড়া। কি আদুরে ছেলেই কচ্ছিস্ ছোটবৌ! শেষে টের পাবি। তখন কাঁদবি আর বলবি, হাঁ বলেছিল বটে!

বিন্দু ফিস্ ফিস্ করিয়া অমূল্যকে শিখাইয়া দিল ; অমূল্য চেঁচাইয়া বলিল, তুমি যাও না দিদি—ছোটমা রূপকথা বলচে।

অন্নপূর্ণা ধমকাইয়া বলিলেন, ভাল চাস্ ত আয় ছোটবৌ! না হলে কাল তোদের দু'জনকে না বিদেয় করি ত আমার নাম অন্নপূর্ণা নয়, বলিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছিলেন, তেমনি করিয়া পা ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মাধব জিজ্ঞাসা করিল, আজ আবার তোমাদের হ'ল কি?

বিন্দু বলিল, দিদি রাগলে যা হয় তাই। আজ অপরাধের মধ্যে বলেছিলুম, ছেলে-পুলের ঘর, জাঁতি-টাঁতিগুলো একটু সাবধান করে রেখো—তাই এত কাণ্ড হচ্ছে।

মাধব বলিল, আর গোলমাল ক'রো না, যাও। বৌঠান যেমন করে পা ফেলে বেড়াচ্ছেন, দাদা এখনি উঠে পড়বেন।

বিন্দু অমূল্যকে কোলে তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

৩

এক মায়ের দুই ছেলে জননীকে আশ্রয় করিয়া যেমন করিয়া বাড়িয়া উঠিতে থাকে, দুইটি মাতা তেমনি একটিমাত্র সন্তানকে আশ্রয় করিয়া আরো ছয় বৎসর কাটাইয়া দিলেন। অমূল্য এখন বড় হইয়াছে, সে এণ্ট্রান্স স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। ঘরে মাস্টার নিযুক্ত আছেন, তিনি সকালবেলা পড়াইয়া যাইবার পর অমূল্য খেলা করিতে বাহির হইয়াছিল। আজ রবিবার, স্কুল ছিল না।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ছোটবৌ, কি করি বল ত?

বিন্দু তাহার ঘরের মেঝের উপর আলমারি উজাড় করিয়া অমূল্যর পোষাক বাছিতেছিল, সে কাকার সহিত কোন মক্কেলের বাড়ি নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে যাইবে। বিন্দু মুখ না তুলিয়া বলিল, কিসের দিদি?

তাহার মেজাজটা অপ্রসন্ন। অন্নপূর্ণা রকমারি পোষাকের বাহার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন, তাই তার মুখের ভাবটা লক্ষ্য করিলেন না, কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি সমস্তই অমূল্যর পোষাক নাকি?

বিন্দু বলিল, হাঁ।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, কত টাকাই না তুই অপব্যয় করিস্। এর একটার দামে গরীব ছেলের সারা বছরের কাপড়-চোপড় হতে পারে।

বিন্দু বিরক্ত হইল, কিন্তু সহজভাবে বলিল, তা পারে। কিন্তু গরীবে বড়লোকে একটু তফাত থাকেই, সেজন্য দুঃখ করে কি হবে দিদি?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, তা হোক বড়লোক, কিন্তু তোর সব কাজেই একটু বাড়াবাড়ি আছে।

বিন্দু মুখ তুলিয়া বলিল, কি বলতে এসেচ তাই বল না দিদি, এখন আমার সময় নেই।

তোমার সময় আর কখন থাকে ছোটবৌ। বলিয়া তিনি রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভৈরব অমূল্যকে ডাকিয়া আনিতে গিয়াছিল। সে ঘণ্টা-খানেক পরে খুঁজিয়া আনিল।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কোথা ছিলি এতক্ষণ?

অমূল্য চুপ করিয়া রহিল।

ভৈরব বলিল, ও-পাড়ায় চাষাদের সঙ্গে ডাং-গুলি খেলছিল।

এই খেলাটায় বিন্দুর বড় ভয় ছিল, তাই নিষেধ করিয়া দিয়াছিল; বলিল, ডাং-গুলি খেলতে তোকে মানা করিনি না?

অমূল্য ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া বলিল, আমি দাঁড়িয়েছিলুম, তারা জোর করে আমাকে—

জোর করে তোমাকে? আচ্ছা, এখন যাও, তার পর হবে। বলিয়া তাহার পোষাক পরাইতে লাগিল।

মাস-দুই পূর্ব্বে অমূল্যর পৈতা হইয়াছিল; সে নেড়া মাথায় জরির টুপি পরিতে ভয়ঙ্কর আপত্তি করিল। কিন্তু বিন্দু ছাড়িবার লোক নয়, সে জোর করিয়া পরাইয়া দিল। অমূল্য নেড়া-মাথায় জরির টুপি পরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাধব ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, আর ওর কত দেরি হবে গো?

পরক্ষণেই অমূল্যর দিকে দৃষ্টি পড়িলে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, বাঃ—এই যে মথুরার কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হয়েছেন।

অমূল্য লজ্জায় টুপিটা ফেলিয়া দিয়া খাটের উপর গিয়া উপুড় হইয়া পড়িল।

বিন্দু রাগিয়া উঠিল। বলিল, একে ছেলেমানুষ কাঁদচে, তার উপর তুমি—

মাধব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, কাঁদিসনে অমূল্য ওঠ্, লোকে পাগল বলে ত আমায় বলবে, তুই আয়।

ঠিক এই কথাটাই ইতিপূর্ব্বে আর একদিন হইয়া গিয়াছিল এবং বিন্দু তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। সেই কথাটার পুনরাবৃত্তিতে সে হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া

বলিল, আমি সব কাজ পাগলের মত করি, না। বলিয়া উঠিয়া গিয়া অমূল্যকে তুলিয়া আনিয়া পাখার বাঁটের বাড়ি ঘা-কতক দিয়া দামী মখমলের পোষাক টানিয়া টানিয়া খুলিয়া ফেলিতে লাগিল।

মাধব ভয়ে ভয়ে বাহির হইয়া গিয়া অন্নপূর্ণাকে সংবাদ দিলেন, মাথায় ভূত চেপেচে বৌঠান, একবার যাও।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, বিন্দু সমস্ত পোষাক লইয়া একটা সাধারণ বস্ত্র পরাইয়া দিতেছে, অমূল্য ভয়ে বিবর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, বেশ ত হয়েছিল ছোটবৌ, খুললি কেন?

বিন্দু অমূল্যকে ছাড়িয়া দিয়া হঠাৎ গলায় আঁচল দিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, তোমাদের পায়ে পড়ি বড়গিন্নি, সামনে থেকে একটু যাও। তোমাদের পাঁচজনের মধ্যস্থতার জ্বালায় ওর প্রাণটাই মার খেয়ে যাবে।

অন্নপূর্ণা বাকশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিন্দু অমূল্যর একটা কান ধরিয়া টানিয়া আনিয়া ঘরের এক কোণে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিল, যেমন বজ্জাত ছেলে তুমি, তেমনি তোমার শাস্তি হওয়া চাই। সমস্তদিন ঘরে বন্ধ থাক। দিদি বাইরে এস। আমি দোর বন্ধ করব। বলিয়া বাহিরে আসিয়া শিকল তুলিয়া দিল।

বেলা তখন প্রায় একটা বাজে, অন্নপূর্ণা আর থাকিতে না পারিয়া বলিল, হাঁ ছোটবৌ, সত্যি আজ তুই অমূল্যকে খেতে দিবিনে? তার জন্য কি বাড়িসুদ্ধ লোক উপোস থাকবে?

বিন্দু জবাব দিল, বাড়িসুদ্ধ লোকের ইচ্ছে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, এ তোর কি-রকম কথা ছোটবৌ। বাড়ির মধ্যে ঐ একটি ছেলে, সে উপোস করে থাকলে, তোর আমার কথা ছেড়ে দে, দাসী-চাকরেই বা মুখে ভাত তোলে কি করে বল্ দেখি।

বিন্দু জিদ্ করিয়া বলিল, তা আমি জানিনে।

অন্নপূর্ণা বুঝিলেন তর্ক করিয়া আর লাভ হইবে না, বলিলেন আমি বলচি, বড়বোনের কথাটা রাখ্, আজ তাকে মাপ কর। তা ছাড়া পিত্তি পড়ে অসুখ হলে তোকেই ভুগতে হবে।

বেলার দিকে চাহিয়া বিন্দু নিজেই নরম হইয়া আসিতেছিল. কদমকে ডাকিয়া বলিল, যা নিয়ে আয় তাকে। তোমাদেরও বলে রাখচি দিদি, ভবিষ্যতে আমার কথায় কথা কইলে ভাল হবে না।

গোলযোগটা এইখানেই সেদিনের মত থামিয়া গেল।

ছোটভায়ের ওকালতিতে পসার হওয়ার পর হইতে যাদব চাকরি ছাড়িয়া দিয়া নিজের বিষয়-আশয় দেখিতেছিলেন। ছোটবধূর দরুন হাতে যে দশ হাজার টাকা ছিল, তাহাও সুদে খাটাইয়া প্রায় দ্বিগুণ করিয়াছিলেন। সেই টাকার কিয়দংশ লইয়া এবং মাধবের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া তিনি গত বৎসর হইতে প্রায় পোয়াটাক পথ দূরে একখানি বড় রকমের বাড়ি ফাঁদিয়াছিলেন। দিন-দশেক হইল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কথা ছিল, দুর্গাপূজার পরে ভাল দিন দেখিয়া সকলেই তথায় উঠিয়া যাইবেন। তাই একদিন যাদব আহারে বসিয়া ছোটবৌকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার বাড়ি ত তৈরি হ'ল মা, এখন একদিন গিয়ে দেখে এস, আর কিছু বাকী রয়ে গেল কিনা।

বিন্দুর একটা অভ্যাস ছিল, সে সহস্র কাজ ফেলিয়া রাখিয়াও ভাশুরের খাবার সময় দরজার আড়ালে বসিয়া থাকিত। ভাশুরকে সে দেবতার মতই ভক্তি করিত—সকলেই করিত। বলিল, আর কিছু বাকী নেই।

যাদব হাসিয়া বলিলেন, না দেখেই রায় দিলে মা! আচ্ছা, ভাল কথা। তবে, আরো একটি কথা আছে। আমার ইচ্ছে হয়, আত্মীয়-স্বজন আমাদের যে যেখানে আছেন, সকলকেই এক করে একটি সুদিন দেখে উঠে যাই, গৃহদেবতার পূজা দিই, কি বল মা?

বিন্দু আস্তে আস্তে বলিল, দিদিকে বলি, তিনি যা বলবেন তাই হবে।

যাদব বলিলেন, তা বল। কিন্তু তুমি আমার সংসারের লক্ষ্মী, মা তোমার ইচ্ছাতেই কাজ হবে।

অন্নপূর্ণা একটু অদূরেই বসিয়াছিলেন, হাসিয়া বলিলেন, তবু তোমার মা-লক্ষ্মীটি যদি একটু শান্ত হতেন।

যাদব বলিলেন, শান্ত আবার কি বড়বৌ, মা আমার জগদ্ধাত্রী। বরও দেন, আবশ্যক হলে খাঁড়াও ধরেন। ওই ত আমি চাই। মাকে এনে অবধি সংসারে আমার এতটুকু দুঃখ-কষ্ট নেই।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, সে-কথা তোমার সত্যি। ও আসবার আগের দিনগুলো এখন মনে করলেও ভয় হয়।

বিন্দু লজ্জা পাইয়া সে-কথা চাপা দিয়া বলিল, আপনি সকলকে আনান। আমাদের ও-বাড়ি বেশ বড়, কারো কোন কষ্ট হবে না। ইচ্ছে করলে তাঁরা দু'মাস থাকতেও পারবেন।

যাদব বলিলেন, তাই হবে মা, কালই আমি আনবার বন্দোবস্ত করব।

৪

ইহাদের পিসতুত বোন এলোকেশীর অবস্থা ভাল ছিল না। যাদব তাঁহাকে অর্থ-সাহায্য করিয়া পাঠাইতেন। কিছুদিন হইতে তিনি তাঁহার পুত্র নরেনকে এইখানে রাখিয়া লেখা-পড়া শিখাইবার ইচ্ছা জানাইয়া চিঠিপত্র লিখিতেছিলেন,এমন সময় তিনি ছেলে লইয়া উত্তরপাড়া হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্বামী প্রিয়নাথ সেখানে কি করিতেন, তাহা ঠিক করিয়া কেহই বলিতে পারে না, দিন-দুয়ের মধ্যে তিনিও আসিয়া পড়িলেন। নরেনের বয়স ষোল-সতের। সে চওড়া পাড়ের কাপড় ফের দিয়া পরিত এবং দিনের মধ্যে আট-দশবার চুল আঁচড়াইত। টেরিটা তাহার বাস্তবিক একটা দেখিবার বস্তু ছিল।

আজ সন্ধ্যার পর রান্নাঘরের বারান্দায় সকলে একত্রে বসিয়াছিলেন এবং এলোকেশী তাঁহার পুত্রের অসাধারণ রূপ-গুণের পরিচয় দিতেছিলেন।

বিন্দু জিজ্ঞাস করিল, কোন ক্লাসে পড় তুমি?

নরেন বলল, ফোর্থ ক্লাসে। রয়েল রিডার, গ্রামার, জিয়োগ্রাফি, এরিথ্‌মেটিক আরো কত কি, ডেসিমল্‌ টেসিমেল্‌—ও-সব তুমি বুঝবে না মামী।

এলোকেশী সগর্ব্বে পুত্রের মুখের দিকে একবার চাহিয়া বিন্দুকে বলিলেন, সেকি এক-আধখানা বই ছোটবৌ? বইয়ের পাহাড়, কাল বইগুলো বাক্স থেকে বার করে তোমার মামীদের একবার দেখিও ত বাবা।

নরেন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা দেখাব।

বিন্দু বলিল, পাশ করতে এখনো ত দেরি আছে।

এলোকেশী বলিলেন, দেরি কি থাকত ছোটবৌ, দেরি থাকত না। এতদিন একটা কেন, চারটে পাশ করে ফেলতো। শুধু মুখপোড়া মাস্টারের জন্যই হচ্ছে না। তার সর্ব্বনাশ হোক, বাছাকে সে যে কি বিষ নজরেই দেখেছে, তা সেই জানে। ওকে কি তুলে দিচ্ছে? দিচ্ছে না, হিংসে করে বছরের পর বছর একটা কেলাসেই ফেলে রেখেচে।

বিন্দু বিস্মিত হইয়া কহিল, কৈ, এ রকম ত হয় না।

এলোকেশী বলিলেন, হচ্চে, আবার হয় না! মাস্টারগুলো সব একজোট হয়ে ঘুস চায়; আমি গরীব-মানুষ, ঘুষের টাকা কোথা থেকে যোগাই বল ত?

বিন্দু চুপ করিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা আন্তরিক দুঃখিত হইয়া বলিলেন, এমন করে কি মানুষের পিছনে লাগতে আছে? সেটা কি ভাল কাজ? কিন্তু আমাদের

এখানে ও-সব নেই। আমাদের অমূল্য ত ফি বছর ভাল ভাল প্রাইজ বই ঘরে আনে, কিন্তু কখ্‌খন ঘুষটুষ দিতে হয় না।

এই সময় অমূল্য কোথা হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে তাহার ছোটমার কোলে গিয়া বসিল। আসিয়াই গলা ধরিয়া কানে কানে বলিল, কাল রবিবার, ছোটমা, আজ মাস্টারমশায়কে যেতে বলে দাও না।

বিন্দু হাসিয়া বলিল, এই ছেলেটি দেখচ ঠাকুরঝি, এটি গল্প পেলে আর উঠবে না —কদম, মাষ্টারমশায়কে বলে দে, অমূল্য আজ আর পড়বে না।

নরেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, ও কি রে অমূল্য, অতবড় ছেলে এখনও মেয়েমানুষের কোলে গিয়ে বসিস।

বিন্দু হাসিয়া বলিল, শুধু এই বুঝি? এখনও রাত্তিরে—

অমূল্য ব্যাকুল হইয়া তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, ব'লো না ছোট মা, ব'লো না।

বিন্দু বলিল না, কিন্তু অন্নপূর্ণা বলিয়া দিলেন; বলিলেন, এখনোও রাত্তিরে ছোট মার কাছে শোয়।

বিন্দু বলিল, শুধু শোয় দিদি, এখনো সমস্ত রাত্তিরে বাদুড়ের মত আঁকড়ে ঘুমোয়।

অমূল্য লজ্জায় তাহার ছোটমার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া রহিল।

নরেন কহিল, ছি, ছি, তুই কি রে। তুই ইংরাজী পড়িস?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, পড়ে বৈ কি। ইস্কুলে ও ত ইংরাজী পড়ে।

নরেন বলিল, ইস, ইংরাজী পড়ে! কই, ইন্‌জিন্ বানান করুক্ ত দেখি? তা আর করতে হয় না।

এলোকেশী বলিলেন, ও-সব শক্তকথা, ও কি ছেলেমানুষ পারে?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, কই অমূল্য বানান কর না?

অমূল্য কিন্তু কিছুতেই মুখ তুলিল না।

বিন্দু তাহার মাথাটা একবার বুকে চাপিয়ে ধরিয়া বলিল, তোমরা সবাই মিলে ওকে লজ্জা দিলে ও আর কি করে বানান করে?

তারপর এলোকেশীর দিকে চাহিয়া বলিল, ও আমার আসচে বছর পাস দেবে, আমাদের মাস্টারমশাই বলেচেন, ও কুড়ি টাকা জলপানি পাবে। ও সেই টাকা দিয়ে ওর কাকার মত এক ঘোড়া কিনবে।

কথাটা সত্য হইলেও পরিহাসচ্ছলে সবাই হাসিতে লাগিলেন।

এলোকেশী বিন্দুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমার নরেন্দ্রনাথ শুধু কি লেখা-পড়াতেই ভাল, ও এমনি থিয়েটারে অ্যাক্টো করে, যে লোকে শুনে আর চোখে

জল রাখতে পারে না। সেই সীতা সেজে কি-রকমটি করে বলেছিলি, একবার মামীদের শুনিয়ে দাও ত বাবা।

নরেন তৎক্ষণাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত জোড় করিয়া উচ্চ নাকিস্বরে সুর করিয়া আরম্ভ করিয়া দিল, প্রাণেশ্বর! কি কুক্ষণে দাসী তব—

বিন্দু ব্যাকুল হইয়া উঠিল—ওরে থাম থাম, চুপ কর, বঠ্‌ঠাকুর ওপরে আছেন।

নরেন চমকিয়া চুপ করিল।

অন্নপূর্ণা ঐটুকু শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন, শুনলেই বা, ঠাকুর-দেবতার কথা, এ-ত ভাল কথা ছোটবৌ।

বিন্দু বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে শোন তুমি ঠাকুর-দেবতার কথা, আমরা উঠে যাই।

নরেন বলিল, আচ্ছা, তবে থাক্‌ আমি সাবিত্রীর পার্ট করি।

বিন্দু বলিল, না।

এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া এতক্ষণে অন্নপূর্ণার চৈতন্য হইল যে, ব্যাপারটা অনেক দূরে গিয়াছে এবং এইখানেই তাহার শেষ হইবে না। এলোকেশী নূতন লোক, তিনি ভিতরের কথা বুঝিলেন না, বলিলেন, আচ্ছা এখন থাক্‌। পুরুষেরা বেরিয়ে গেলে সে একদিন দুপুরবেলা হতে পারবে। আহা গান-বাজনাই কি ও কম শিখেচে? দময়ন্তীর সেই কেঁদে কেঁদে গানটি একবার বলিস্‌ ত বাবা, তোর মামীরা শুনলে আর ছাড়তে চাইবে না।

নরেন বলিল, এখনি বলব!

রাগে বিন্দুর সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল, সে কথা কহিল না।

অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না না, গান-টান এখন কাজ নেই।

নরেন বলিল, আচ্ছা, গানটা আমি অমূল্যকে শিখিয়ে দেব। আমি বাজাতে জানি। ব্রেকেটা তাক্‌, বাজনা বড় শক্ত মামী, আচ্ছা, এই পেতলের হাঁড়িটা একবার দাও ত দেখিয়ে দিই।

বিন্দু অমূল্যকে উঠিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিল, যা অমূল্য, ঘরে গিয়ে পড়্‌গে।

অমূল্য মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল, তাহার উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, চুপি চুপি বলিল, আরো একটু বসো না ছোটমা।

বিন্দু কোন কথা না বলিয়া তাহাকে তুলিয়া দিয়া সঙ্গে করিয়া ঘরে চলিয়া গেল। সহসা সে কেন যে অমন করিয়া গেল, অন্নপূর্ণা তাহা বুঝিলেন এবং পাছে সঙ্গোদোষে অমূল্য বিগড়াইয়া যায়, এই ভয়ে নরেনের এইখানে থাকিয়া, লেখা-পড়াও যে সে পছন্দ করিবে না, ইহা সুস্পষ্ট বুঝিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, বাবা নরেন, তোমার ছোটমামীর সামনে ঐ অ্যাক্টো-ট্যাক্টোগুলা আর ক'রো না; ও রাগী মানুষ, ও ও-সব ভালবাসে না।

এলোকেশী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছোটবৌ ও-সব ভালবাসে না বুঝি? তাই অমন করে উঠে গেল বটে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, হতেও পারে। আরো একটা কথা বাবা, তুমি খায়ে-দায়ে পড়া-শুনা করবে—যাতে মায়ের দুঃখ ঘোচে, সেই চেষ্টা করবে, তুমি অমূল্যের সঙ্গে বেশী মিশো না বাবা। ও ছেলেমানুষ, তোমার চেয়ে অনেক্ ছোট।

কথাটা এলোকেশীর ভাল লাগিল না। বলিলেন, সে ত ঠিক কথা, ও গরীবের ছেলে, ওর গরীবের মত থাকাই উচিত। তবে যদি বললে, ত বলি বড়বৌ, অমূল্যটিই তোমার কচি খোকা, আর আমার নরেনই কি বুড়ো? এক-আধ বছরের ছোট-বড়কে আর বড় বলে না। আর ও-কি কখনও বড়লোকের ছেলে চোখে দেখেনি গা, এইখানে এসে দেখচে? ওদের থিয়েটারের দলে কত রাজ-রাজড়ার ছেলে রয়েচে যে।

অন্নপূর্ণা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, না ঠাকুরঝি, সে-কথা বলিনি, আমি বলচি—

আবার কি করে বলবে বড়বৌ? আমরা বোকা বলে কি এতই বোকা, যে এ-কথাটাও বুঝিনি! তবে দাদা নাকি বললেন, নরেন এখানেই লেখা-পড়া করবে, তাই আসা, নইলে আমাদের কি দিন চলছিল না?

অন্নপূর্ণা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলেন, ভগবানই জানেন ঠাকুরঝি, আমি সে-কথা বলিনি, আমি বলচি কি, এই যাতে মায়ের দুঃখকষ্ট ঘোচে, যাতে—

এলোকেশী বললেন, আচ্ছা, তাই তাই। যা নরেন, তুই বাইরে গিয়ে বস গে, বড়লোকের ছেলের সঙ্গে মিশিস্‌নে। বলিয়া ছেলেকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া নিজেও চলিয়া গেলেন!

অন্নপূর্ণা ঝড়ের মত বিন্দুর ঘরে ঢুকিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হাঁ লা, তোর জন্যে কি কুটুম্ব-কুটুম্বিতে বন্ধ করতে হবে? কি করে চলে এলি বল্ ত?

বিন্দু অত্যন্ত সহজভাবে জবাব দিল, কেন বন্ধ করতে হবে দিদি, আত্মীয়-কুটুম্ব নিয়ে তুমি মনের সুখে ঘর কর, আমি ছেলে নিয়ে পালাই, এই!

পালাবি কোথায় শুনি?

যাবার দিন তোমায় ঠিকানা বলে যাব, ভেবো না।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, সে আমি জানি, যাতে পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাতে পারব না, সে তুই না করেই ছাড়বি? চিরকালটা এই বৌ নিয়ে আমার হাড়-মাস জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, মাধবকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া আবার জ্বলিয়া উঠিলেন, না ঠাকুরপো, তোমরা আর কোথাও গিয়ে

থাক গে, না হয় ঐ বৌটিকে বিদেয় কর, আমি আর রাখতে পারব না, আজ তা স্পষ্ট বলে গেলুম, বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মাধব আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাস করিল, ব্যাপার কি?

বিন্দু বলিল, জানিনে, বড়গিন্নী বলেচে, দাও আমাদের বিদেয় করে।

মাধব আর কিছু বলিল না। টেবিলের উপর হইতে খবরের কাগজটা তুলিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ঠাকুরঝি দেখতে বোকার মতন ছিলেন, কিন্তু সেটা ভুল। তিনি যেই দেখিলেন, নিঃসন্তান ছোটবৌয়ের অনেক টাকা, তিনি তখনি সেই দিকে চলিলেন এবং প্রতি রাত্রে স্বামী প্রিয়নাথকে একবার করিয়া ভৎ‍র্সনা করিতে লাগিলেন, তোমার জন্যই আমার সব গেল। তোমার কাছে মিছামিছি পড়ে না থেকে এখানে থাকলে আজ আমি রাজার মা। আমার সোনার চাঁদ ফেলে কি আর ঐ কাল ভূতের মত ছেলেটাকে ছোটবৌ—, বলিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসের দ্বারা ঐ কাল ভূতের সমস্ত পরমায়ুটা নিঃশব্দে উড়াইয়া দিয়া 'গরীবের ভগবান আছেন' বলিয়া উপসংহার করিয়া চুপ করিয়া শুইতেন। প্রিয়নাথও মনে মনে নিজের বোকামীর জন্য অনুতাপ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। এমনি করিয়া এই দম্পতিটির দিন কাটিতেছিল এবং ছোটবৌর প্রতি ঠাকুরঝির স্নেহ-প্রীতি বন্যার মত ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

আজ দুপুরবেলা তিনি বলিতেছিলেন, অমন মেঘের মত চুল ছোটবৌ, কিন্তু কোনদিন বাঁধতে দেখলুম না। আজ জমিদারের বাড়ির মেয়েরা বেড়াতে আসবে, এস মাথাটা বেঁধে দিই।

বিন্দু বলিল, না ঠাকুরঝি, আমি মাথায় কাপড় রাখতে পারিনে, ছেলে বড় হয়েচে, দেখতে পাবে।

ঠাকুরঝি অবাক্ হইয়া বলিলেন, ও আবার কি কথা ছোটবৌ? ছেলে বড় বলে এ'স্ত্রী-মানুষ চুল বাঁধবে না? আমার নরেন্দ্রনাথ ত শত্তুরের মুখে চাই দিয়ে আরো ছ'মাস বছরেকের বড়, তাই বলে কি আমি মাথা-বাঁধা ছেড়ে দেব।

বিন্দু বলিল, তুমি ছাড়বে কেন ঠাকুরঝি, নরেন বরাবর দেখে আসছে, ওর কথা আলাদা; কিন্তু অমূল্য হঠাৎ আজ আমার মাথায় খোঁপা দেখলে হাঁ করে চেয়ে থাকবে। হয়ত চেঁচামেচি করবে, না কি করবে—ছি ছি, সে ভারি লজ্জার কথা হবে।

অন্নপূর্ণা হঠাৎ সেইদিক দিয়া যাইতেছিলেন, বিন্দুর দিকে চাহিয়া সহসা দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোর চোখ ছলছল করছে কেন রে ছোটবৌ? আয় ত, গা দেখি।

বিন্দু এলোকেশীর সামনে ভারি লজ্জা পাইয়া বলিল, কি রোজ রোজ গা দেখবে! আমি কি কচি খুকি, অসুখ করলে টের পাব না?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, না, তুই বুড়ি। কাছে আয়, ভাদ্দর আশ্বিন মাস, দিনকাল বড় খারাপ।

বিন্দু বলিল, কখনো যাব না। বলচি কিছু হয়নি, বেশ আছি, তবু কাছে আয়!

অন্নপূর্ণা বলিলেন, দেখিস, ভাঁড়াসনে যেন? বলিয়া সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন।

এলোকেশী বলিল, বড়বৌর যেন একটু ব্যয়ের ছিট্ আছে, না?

বিন্দু একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, ঐ-রকম ছিট্ যেন সকলের থাকে ঠাকুরঝি।

এলোকেশী চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা কি একটা হাতে লইয়া সে-পথেই ফিরিয়া যাইতেছিলেন, বিন্দু ডাকিয়া বলিল, দিদি, শোন শোন, খোঁপা বাঁধবে?

অন্নপূর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া এলোকেশীকে বলিলেন, আমি কত বলেচি ঠাকুরঝি, ওকে বলা মিছে। অত চুল বাঁধবে না, অত কাপড় গয়না তা পরবে না, অত রূপ তা একবার চেয়ে দেখবে না। ওর সব ছিষ্টিছাড়া মতিবুদ্ধি। ছেলেও হচ্চে তেমনি। সেদিন অমূল্য কি বললে জানিস ছোটবৌ; বলে জামা-কাপড় পরে কি হয়? ছোটমারও অত আছে পরে কি?

বিন্দু সগর্ব্বে মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল, তবে দেখ দিদি, ছেলেকে দশের একজন করে তুলতে হলে মায়ের এইরকম ছিষ্টিছাড়া মতিবুদ্ধির দরকার কি না! যদি ততদিন বেঁচে থাক দিদি, তা হলে দেখতে পাবে, দেশের লোকে দেখিয়ে বলবে, ঐ অমূল্যের মা। বলিতে বলিতেই তাহার চোখদুটি সজল হইয়া উঠিল।

অন্নপূর্ণা তাহা দেখিতে পাইয়া সস্নেহে বলিলেন, সেইজন্যই ত তোর ছেলের সম্বন্ধে আমরা কোন কথা কইনে। ভগবান তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, কিন্তু ঐ ছেলে বড় হবে, দশের একজন হবে, অত আশা আমরা মনেও ঠাঁই দিইনে।

বিন্দু আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, কিন্তু ঐ একটি আশা নিয়ে আমি বেঁচে আছি দিদি। বাপ্‌রে! সহসা তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। সে লজ্জিত

হইয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, না দিদি, আশায় যদি কোন দিন ঘা পড়ে ত আমি পাগল হয়ে যাব।

অন্নপূর্ণা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তিনি ছোট জায়ের মনের কথাটা যে জানিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার এমন উগ্র প্রতিচ্ছবি কোনদিন নিজের মধ্যে এমন স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করেন নাই। আজ তাঁহার চৈতন্য হইল, কেন বিন্দু অমূল্য সম্বন্ধে এমন যক্ষের মত সজাগ, এমন প্রেতের মত সতর্ক। নিজের পুত্রের এই সর্ব্বমঙ্গলাকাঙ্খিণীর মুখের দিকে চাহিয়া অনির্ব্বচনীয় শ্রদ্ধার মাধুর্য্যে তাঁহার মাতৃহৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি উদগত অশ্রু গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন।

ঠাকুরঝি বলিলেন, তা হোক ছোটবৌ, আজকে তোমার—

বিন্দু তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, হাঁ ঠাকুরঝি; আজ দিদির মাথাটা বেঁধে দাও—এ-বাড়িতে ঢুকে পর্য্যন্ত কখন দেখিনি। বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন সকালবেলা বাটীর পুরাতন নাপিত যাদবের ক্ষৌর-কর্ম্ম করিয়া উপর হইতে নামিয়া যাইতেছিল, অমূল্য আসিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া বলিল, কৈলাসদা, নরেনদার মত চুল ছাঁটতে পার?

নাপিত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সে কি-রকম দাদাবাবু!

অমূল্য নিজের মাথার নানাস্থানে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, দেখ, এইখানে বার আনা, এইখানে ছ আনা, এইখানে দু আনা, আর এই ঘাড়ের কাছে একেবারে ছোট ছোট। পারবে ছাঁটতে?

নাপিত হাসিয়া বলিল, না দাদা, ও আমার বাবা এলেও পারবে না।

অমূল্য ছাড়িল না। সাহস দিয়া কহিল, এ শক্ত নয় কৈলাসদা, এইখানে বার আনা, এইখানে ছ আনা—

নাপিত নিষ্কৃতি-লাভের উপায় করিয়া বলিল, কিন্তু আজ কি বার? তোমার ছোটমা হুকুম না দিলে ত ছাঁটতে পারিনে দাদা!

অমূল্য বলিল, আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি জেনে আসি। বলিয়া এক পা গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা, তোমার ছাতিটা একবার দাও, না হলে তুমি পালিয়ে যাবে। বলিয়া জোর করিয়া সে ছাতিটা টানিয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ছোটমা শীগ্‌গির একবার এস ত?

ছোটমা সবেমাত্র স্নান সারিয়া আহ্নিকে বসিতেছিলেন, ব্যস্ত হইয়া বলিল, ওরে ছুঁসনে, আহ্নিক কচ্ছি।

আহ্নিক পরে ক'রো ছোটমা, একবারটি বাইরে এসে হুকুম দিয়ে যাও, নইলে চুল ছেঁটে দেয় না, সে দাঁড়িয়ে আছে।

বিন্দু কিছু আশ্চর্য্য হইল, তাহার চুল ছাঁটাইবার জন্য চিরদিন মারামারি করিতে হয়, আজ সে কেন স্বেচ্ছায় চুল ছাঁটিতে চাহিতেছে, বুঝিতে না পারিয়া সে বাহিরে আসিতে নাপিত কহিল, বড় শক্ত ফরমাস হয়েচে মা, নরেনবাবুর মত বার আনা, ছ আনা, তিন আনা, দু আনা, এক আনা ছাঁটতে হবে, ও কি আমি পারব!

অমূল্য বলিল, খুব পারবে। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি নরেনদাকে ডেকে আনি, বলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। নরেন বাড়ি ছিল না, খানিক খোঁজাখুঁজি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সে নেই, আচ্ছা নাই থাকল, ছোটমা তুমি দাঁড়িয়ে থেকে দেখিয়ে দাও—বেশ করে দেখো—এইখানে বার আনা, এইখানে ছ আনা, এইখানে দু আনা আর এই খানে খুব ছোট।

তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া বিন্দু হাসিয়া বলিল, আমি এখন আহ্নিক করব যে রে!

আহ্নিক পরে করো, নইলে ছুঁয়ে দেব।

বিন্দুকে অগত্যা দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

নাপিত চুল কাটিতে লাগিল। বিন্দু চোখ টিপিয়া দিল। সে সমস্ত চুল সমান করিয়া কাটিয়া দিল। অমূল্য মাথায় হাত বুলাইয়া খুশী হইয়া বলিল, এই ঠিক হয়েচে। বলিয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল।

নাপিত ছাতি বগলে করিয়া বলিল, কিন্তু মা, কাল এ-বাড়ি ঢোকা আমার শক্ত হবে।

বামুনঠাকুরণ ভাত দিয়া ডাকাডাকি করিতেছিল; বিন্দু রান্নাঘরের একধারে বসিয়া বাটীতে দুধ সাজাইতে সাজাইতে শুনিতে পাইল, অমূল্য বাড়িময় কাকার চুল আঁচড়াইবার বুরুশ খুঁজিয়া ফিরিতেছে! খানিক পরেই সে কাঁদিয়া আসিয়া বিন্দুর পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল—কিচ্ছু হয়নি ছোটমা! সব খারাপ করে দিয়েচে—কাল তাকে আমি মেরে ফেলব।

বিন্দু আর হাসি চাপিতে পারিল না। অমূল্য পিঠ ছাড়িয়া দিয়া রাগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি কি কানা? চোখে দেখতে পাও না?

অন্নপূর্ণা কান্নাকাটি শুনিয়া ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, তার আর কি, কাল ঠিক করে কেটে দিতে বলব।

অমূল্য আরো রাগিয়া গিয়া বলিল, কি করে বার আনা হবে? এখানে চুল কই?

অন্নপূর্ণা শান্ত করিবার জন্য বলিলেন, বার আনা না হোক, আট আনা দশ আনা হতে পারবে।

ছাই হবে। আট আনা দশ আনা কি ফ্যাসান? নরেনদাকে জিজ্ঞেস কর, বার আনা চাই।

সেদিন অমূল্য ভাল করিয়া ভাত খাইল না, ফেলিয়া-ছড়াইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা বলিল, তোর ছেলের টেরি বাগাবার সখ হ'ল কবে থেকে রে?

বিন্দু হাসিল, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দিদি, তুচ্ছ কথা, তাই হাসচি বটে, কিন্তু ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে সব জিনিসের সুরু এমনি করেই হয়।

অন্নপূর্ণা আর কথা কহিতে পারিলেন না।

দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। ও-পাড়ার জমিদার বাড়িতে আমোদ-আহ্লাদের প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল! দুইদিন পূর্ব্বে হইতে নরেন তাহার মধ্যে মগ্ন হইয়া গেল। সপ্তমীর রাত্রে অমূল্য আসিয়া ধরিল, ছোটমা, যাত্রা হচ্ছে দেখতে যাব?

ছোটমা বলিলেন, হচ্ছে, না হবে রে?

অমূল্য বলিল, নরেনদা বলেচে তিনটে থেকে শুরু হবে।

এখন থেকে সমস্ত রাত্তির হিমে পড়ে থাকবি? সে হবে না। কাল সকালে তোর কাকার সঙ্গে যাস, খুব ভাল জায়গা পাবি।

অমূল্য কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, না, পাঠিয়ে দাও। কাকা হয়ত যাবেন না, হয়ত কত বেলায় যাবেন।

বিন্দু বলিল, তিনটে-চারটের সময় যাত্রা শুরু হলে চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দেব, এখন শো।

অমূল্য রাগ করিয়া শয্যার এক প্রান্তে গিয়া দেওয়ালের দিক মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিল।

বিন্দু টানিতে গেল সে হাত সরাইয়া দিয়া শক্ত হইয়া পডিয়া রহিল। তার পর কিছুক্ষণের নিমিত্ত সকলেই বোধ করি একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরের বড় ঘড়ির শব্দে অমূল্যর উদ্বিগ্ন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, সে উৎকর্ণ হইয়া গনিতে লাগিল। একটা—দুটো—তিনটে—চারটে—ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া সে উঠিয়া বসিয়া বিন্দুকে সজোরে সাড়া দিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল, ওঠ ওঠ ছোটমা, তিনটে চারটে বেজে গেলো—বাহিরের ঘড়িতে বাজিতে লাগিল—পাঁচটা—ছটা সাতটা—আটটা—অমূল্য কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, সাতটা বেজে গেল, কখন যাব? বাহিরের ঘড়িতে তখনও বাজিতে লাগিল—নটা—দশটা—এগারটা—বারটা; বাজিয়া থামিল। অমূল্য নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া শুইল। ঘরের ওধারের খাটের উপর মাধব শয়ন করিত, চেঁচামেচিতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল।

উচ্চ হাস্য করিয়া মাধব বলিল, অমূল্য, কি হ'ল রে!

অমূল্য লজ্জায় সাড়া দিল না। বিন্দু হাসিয়া বলিল, ও যে করে আমাকে তুলেচে, ঘরে-দোরে আগুন ধরে গেলেও মানুষ অমন করে তোলে না।

অমূল্য নিস্তব্ধ হইয়া আছে দেখিয়া তাহার দয়া হইল; সে বলিল, আচ্ছা যা কিন্তু কারো সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি করিসনে।

তার পর ভৈরবকে ডাকিয়া আলো দিয়া, পাঠাইয়া দিল। পরদিন বেলা দশটার সময় যাত্রা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে অমূল্য ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাকাকে দেখিয়াই বলিল, কৈ গেলেন না আপনি?

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কেমন দেখলি রে?

বেশ যাত্রা ছোটমা। কাকা, আজ সন্ধ্যার সময় আবার চমৎকার খ্যাম্‌টা নাচ হবে। কলকাতা থেকে দু'জন এসেচে, নরেনদা তাদের দেখেচে, ঠিক ছোটমার মত—খুব ভাল দেখতে—তারা নাচবে, বাবাকেও বলচি।

বেশ করেচ, বলিয়া মাধব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাগে বিন্দুর সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল—তোমার গুণধর ভায়ের কথা শোন।

অমূল্যকে কহিল, তুই একবারও আর ওখানে যাবি না—হারামজাদা বজ্জাত! কে বললে আমার মত, নরেন?

অমূল্য ভয়ে ভয়ে বলিল, হাঁ সে দেখেচে যে।

কৈ নরেন? আচ্ছা, আসুক সে।

মাধব হাসি দমন করিয়া বলিল, পাগল তুমি। দাদা শুনেছেন, আর গোলমাল করো না। কাজেই বিন্দু কথাটা নিজের মধ্যে পরিপাক করিয়া রাগে পুড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অমূল্য আসিয়া অন্নপূর্ণাকে ধরিয়া বসিল, দিদি, পূজা-বাড়িতে নাচ দেখতে যাব। দেখে, এখনি ফিরে আসব।

অন্নপূর্ণা কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বলিলেন, তোর মাকে জিজ্ঞেস কর গে!

অমূল্য জিদ করিতে লাগিল, না দিদি, এখনি ফিরে আসব, তুমি বল যাই।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, না রে না, সে রাগী মানুষ, তাকে বলে যা।

অমূল্য কাঁদিতে লাগিল, কাপড় ধরিয়া টানাটানি করতে লাগিল—তুমি ছোটমাকে বলো না। আমি নরেনদার সঙ্গে যাই—এখনি ফিরে আসব।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, সঙ্গে যদি যাস ত—

অমূল্য কথাটা শেষ করিবারও সময় দিল না, এক দৌড়ে বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে অন্নপূর্ণার কানে গেল, বিন্দু খোঁজ করিতেছে। তিনি চুপ

করিয়া রহিলেন। খোঁজাখুঁজি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তখন তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কি নাচ হবে, নরেনের সঙ্গে তাই দেখতে গেছে, এখনি ফিরে আসবে তোর কোন ভয় নেই।

বিন্দু কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে যেতে বলেচে, তুমি।

অমূল্য যে সম্মতি না লইয়াই গিয়াছে এ-কথা অন্নপূর্ণা ভয়ে স্বীকার করিতে পারিলেন না, বলিলেন, এখনি আসবে।

বিন্দু মুখ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল। খানিক পরে অমূল্য বাড়ি ঢুকিয়া যেই শুনিল ছোটমা ডাকিতেছে, সে গিয়া তাহার পিতার শয্যার একধারে শুইয়া পড়িল।

প্রদীপের আলোকে বসিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া যাদব ভাগবত পড়িতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, কি রে অমূল্য?

অমূল্য সাড়া দিল না।

কদম আসিয়া বলিল, ছোটমা ডাকচেন এস।

অমূল্য তাহার পিতার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, বাবা তুমি দিয়ে আসবে চল না।

যাদব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমি দিয়ে আসব? কি হয়েছে কদম?

কদম বুঝাইয়া বলিল।

যাদব শুনিলেন, এই লইয়া একটা কলহ অবশ্যম্ভাবী। একজন নিষেধ করিয়াছে, একজন হুকুম দিয়াছে। তাই অমূল্যকে সঙ্গে করিয়া ছোট-বধূর ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিয়া বলিলেন, এইবারটি মাপ কর মা, ও বলেচে আর করবে না।

সেই রাত্রে দুই জায়ে আহারে বসিলে বিন্দু বলিল, আমি তোমার উপর রাগ কচ্চিনে দিদি, কিন্তু এখানে আমার থাকা চলবে না—অমূল্য তা হলে একেবারে বিগড়ে যাবে। আমি যদি মানা না করতুম, তা হলেও একটা কথা ছিল; কিন্তু নিষেধ করা সত্ত্বেও এত বড় দুঃসাহস ওর হল কি করে তখন থেকে আমি শুধু এই কথাই ভাবচি। তার ওপর বজ্জাতি দেখ! আমার কাছে যায়নি, এসেচে তোমার কাছে; বাড়ি ফিরে যেই শুনেচে আমি ডাকচি, অমনি গিয়ে বঠ্‌ঠাকুরকে সঙ্গে করে এনেচে। না দিদি, এতদিন এ-সব ছিল না—আমি বরং কলকাতায় বাসা-ভাড়া করে থাকব সেও ভাল, কিন্তু এক ছেলে—ব'য়ে যাবে, তাকে নিয়ে সারা-জীবন চোখের জলে ভাসতে পারব না।

অন্নপূর্ণা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, তোরা চলে গেলে আমিই বা কি করে একলা থাকি বল্।

বিন্দু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সে তুমি জান। আমি যা করব তোমাকে বলে দিলুম। বড় মন্দ ছেলে ঐ নরেন।

কেন, কি করলে নরেন? আর মনে কর, ওরা যদি দুটি ভাই হ'ত, তা হলে কি কত্তিস?

বিন্দু বলিল, আজ তা হলে চাকর দিয়ে হাত-পা বেঁধে জলবিছুটি দিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দিতুম। তা ছাড়া, 'যদি' নিয়ে কাজ হয় না দিদি— ওদের তুমি ছাড়।

অন্নপূর্ণা মনে মনে বিরক্ত হইলেন। বলিলেন ছাড়া না ছাড়া কি আমার হাতে ছোটবৌ? ওদের যে এনেচে, তাকে বল্ গে আমায় মিথ্যে গঞ্জনা দিস্‌নে।

এ-সব কথা বঠ্‌ঠাকুরকে বলব কি করে?

যেসব করে সব কথা বলিস্—তেমনি করে বল্ গে।

বিন্দু ভাতের থালাটা ঠেলিয়া দিয়া বলিল, ন্যাকা বুঝিয়ো না দিদি, আমারো সাতাশ-আঠাশ বছর বয়স হতে চলল। এ-বাড়ির দাসী-চাকর নিয়ে কথা নয়, কথা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে—তুমি বেঁচে থাকতে এ-সব কথায় কথা বলতে গেলে বঠ্‌ঠাকুর রাগ করবেন না?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, রাগ নিশ্চয়ই করবেন, কিন্তু আমি বললে আমার মুখ দেখবেন না। হাজার হই আমরা পর, ওরা ভাই-বোন—সেটা দেখিস্ না কেন? তা ছাড়া, আমি বুড়ো মাগী, এই তুচ্ছ কথা নিয়ে নেচে বেড়ালে লোকে পাগল বলবে না?

বিন্দু ভাতের থালাটা হাত দিয়ে আরো খানিকটা ঠেলিয়া দিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বুঝিলেন, সে কেবল ভাশুরের ভয়ে চুপ করিয়া গেল। বলিলেন, হাত তুলে বসে রইলি—ভাতের থালাটা কি অপরাধ করলে?

বিন্দু হঠাৎ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

অন্নপূর্ণা তাহার ভাব দেখিয়া আর জিদ করিতে সাহস করিলেন না।

শুইতে গিয়া বিন্দু বিছানায় অমূল্যকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, গেল কোথায়?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, আজ দেখচি আমার বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্চে—যাই, তুলে দিই গে।

না না, থাক, বলিয়া বিন্দু মুখ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল।

অর্দ্ধেক রাত্রে, বিন্দুর সতর্ক নিদ্রা অন্নপূর্ণার ডাকে ভাঙ্গিয়া গেল।

কি দিদি?

অন্নপূর্ণা বাহির হইতে বলিলেন, দোর খুলে তোর ছেলে নে। এত বজ্জাতি আমার বাবা এসেও সইতে পারবেন না।

বিন্দু দোর খুলিয়া দিল ; তিনি অমূল্যকে সঙ্গে করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, ঢের হারামজাদা ছেলে দেখেচি ছোটবৌ, এমনটি দেখিনি। রাত্তির দুটো বাজে, একবার চোখে পাতায় করতে দিলে না। এই বলে মশা কামড়াচ্চে,এই বলে জল খাব, বলে বাতাস কর—না ছোটবৌ, আমি সমস্তদিন খাটি-খুটি, রাত্রিতে একটু ঘুমোতে না পেলে ত বাঁচি নে।

বিন্দু হাসিয়া হাত বাড়াইতেই অমূল্য তাহার ক্রোড়ের ভিতর গিয়া ঢুকিল এবং বুকের উপর মুখ রাখিয়া এক মিনিটের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

মাধব ওদিকে বিছানা হইতে পরিহাস করিয়া কহিল, সখ মিটল বৌঠান ?

অন্নপূর্ণা বলিলেন আমি সখ করিনি ভাই, ইনিই নিজেই মায়ের ভয়ে ওখানে গিয়ে ঢুকেছেন। তবে আমারও শিক্ষা হ'ল বটে। আর কি ঘেন্নার কথা ঠাকুরপো, আমাকে বলে কি না তোমার কাছে শুতে লজ্জা করে।

তিনজনেই হাসিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, আর না, যাই একটু ঘুমোই গে, বলিয়া চলিয়া গেলেন।

দিন-দশেক পরে বিন্দুর বাবা-মা তীর্থ-যাত্রার সঙ্কল্প করিয়া মেয়েকে একবার দেখিবার জন্য পালকি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বিন্দু বড় জায়ের অনুমতি লইয়া দু-তিন দিনের জন্য অমূল্যকে লুকাইয়া বাপের বাড়ি যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় বই বগলে করিয়া ইস্কুলের জন্য প্রস্তুত হইয়া অমূল্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অনতিপূর্ব্বে সে বাহিরের পথের ধারে পাল্কী দেখিয়া আসিয়াছিল ; এখন হঠাৎ পায়ের দিকে নজর পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, পায়ে আলতা পরেচ কেন ছোটমা ?

অন্নপূর্ণা উপস্থিত ছিলেন, হাসিয়া ফেলিলেন।

বিন্দু বলিল, আজ পরতে হয়।

অমূল্য বার বার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, গায়ে এত গয়না কেন ?

অন্নপূর্ণা মুখে আঁচল দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বিন্দু হাসি চাপিয়া বলিল, কবে তোর বৌ এসে পরবে বলে, আমাদের কাউকে কিছু পরতে নেই রে ! যা, ইস্কুলে যা।

অমূল্য কথা কানে না তুলিয়া বলিল, দিদি অত হাসচে কেন ? আমি ত আজ ইস্কুলে যাব না—তুমি কোথায় যাবে ?

বিন্দু বলিল, তাই যদি যাই, তোর হুকুম নিতে হবে নাকি ?

আমিও যাব, বলিয়া সে বই লইয়া চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ও কি অত সহজে ইস্কুলে যাবে, মনে করিস্‌নি। কিন্তু কি সেয়ানা দেখেচিস্‌, বলে আলতা পরেচ কেন? গায়ে অত গয়না কেন? কিন্তু আমি বলি নিয়ে যা—নইলে ফিরে এসে তোকে দেখতে না পেলে ভারি হাঙ্গামা করবে।

বিন্দু বলিল, তুমি কি মনে কর দিদি, সে ইস্কুলে গেছে? কক্ষনো না। কোথায় লুকিয়ে বসে আছে, দেখো, ঠিক সময়ে হাজির হবে।

ঠিক তাহাই হইল। সে লুকাইয়াছিল, বিন্দু অন্নপূর্ণার পায়ের ধূলা লইয়া পাল্কীতে উঠিবার সময় কোথা হইতে বাহির হইয়া তাহার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইল। দুই জায়ে হাসিয়া উঠিলেন।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, যাবার সময় আর মার-ধোর করিস্‌নে, নিয়ে যা।

বিন্দু বলিল, তা যেন গেলুম দিদি, কিন্তু কোথাও যে আমার এক পা নড়বার জো নাই, এই বড় বিপদের কথা।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, যেমন করেচিস, তেমনি হবে। অমূল্য, থাক্‌ না তুই দু'দিন আমার কাছে।

অমূল্য মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, তোমার কাছে থাকতে পারব না। বলিয়া স পাল্কীতে গিয়া বসিল।

৬

বিন্দু বাপের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিবার দিন দশেক পরে একদিন মধ্যাহ্নে অন্নপূর্ণা তাহার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, ছোটবৌ ?

ছোটবৌ একরাশ ময়লা কাপড়-জামার সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, ধোপা এসেচে ?

ছোটবৌ কথা কহিল না। অন্নপূর্ণা এইবার তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া ভয় পাইলেন। উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েচে রে ?

বিন্দু আঙ্গুল দিয়া ছোট ছোট টুক্‌রো পোড়া সিগারেট দেখাইয়া দিয়া বলিল, অমূল্যের জামার পকেট থেকে বেরুল।

অন্নপূর্ণা নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিন্দু সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি দিদি, ওদের বিদেয় কর, না হয় আমাদের কোথাও পাঠিয়ে দাও।

অন্নপূর্ণা জবাব দিতে পারিলেন না। আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্ণে অমূল্য ইস্কুল হইতে ফিরিয়া খাবার খাইয়া খেলা করিতে গেল। বিন্দু একটি কথাও বলিল না। ভৈরব চাকর নালিশ করিতে আসিল, নরেনবাবু বিনা দোষে তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছে।

বিন্দু বিরক্ত হইয়া বলিল, দিদিকে বল গে।

আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাধব কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে কি একটা ক্ষুদ্র পরিহাস করিতে গিয়া ধমক খাইয়া চুপ করিল। অদৃষ্টে যে কতবড় ঝড় ঘনাইয়া উঠিতেছে, বাড়ির মধ্যে তাহা কেবল অন্নপূর্ণাই টের পাইলেন। উৎকণ্ঠায় সন্ধ্যাটা ছটফট করিয়া, এক সময়ে নির্জ্জনে পাইয়া ছোটবৌয়ের হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া মিনতির স্বরে বলিলেন, হাজার হোক, সে তোরই ছেলে, এইবারটি মাপ কর। বরং আড়ালে ডেকে ধমকে দে।

বিন্দু বলিল, আমার ছেলে নয়, সে কথা আমিও জানি, তুমিও জান। মিছামিছি কতকগুলো কথা বাড়িয়ে দরকার কি দিদি ?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, আমি নই, তুই তার মা—আমি তোকেই ত দিয়েচি!

যখন ছোট ছিল খাইয়েচি পরিয়েচি। এখন বড় হয়েচে, তোমাদের ছেলে তোমরা নাও—আমাকে রেহাই দাও, বলিয়া বিন্দু চলিয়া গেল।

রাত্রে কাঁদ কাঁদ মুখে অমূল্য অন্নপূর্ণার কাছে শুইতে আসিল।

অন্নপূর্ণা ব্যাপার বুঝিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, এখানে কেন? যা এখান থেকে —যা বলচি।

অমূল্য ফিরিয়া দেখিল, তাহার পিতা ঘুমাইতেছেন সে তখন কথাটি না বলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

সকালবেলা কদম রান্নাঘরে এঁটো বাসন তুলিতে আসিয়া দেখিল, বারান্দার এক কোণে কতকগুলো কাঠ-ঘুঁটের উপর অমূল্য পড়িয়া রহিয়াছে। সে ছুটিয়া গিয়া বিন্দুকে তুলিয়া আনিল। অন্নপূর্ণাও ঘুম ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বিন্দু তীক্ষ্ণভাবে বলিল, রাত্রে বড়গিন্নি বুঝি তাড়িয়ে দিয়েছিলে? ও থাকলে ঘুমের ব্যাঘাত হয়?

ছেলের অবস্থা দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে তাঁহার নিজের চক্ষে জল আসিতেছিল, কিন্তু বিন্দুর নিষ্ঠুর তিরস্কারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, নিজের দোষ তুই পরের ঘাড়ে তুলে দিতে পারলেই বাঁচিস।

বিন্দু ছেলেকে তুলিতে গিয়া দেখিল, তাহার গা গরম—জ্বর হইয়াছে। কহিল, সারারাত কার্ত্তিক মাসের হিমে, জ্বর হবেই ত! এখন ভাল হলে বাঁচি।

অন্নপূর্ণা ব্যস্ত হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলেন, জ্বর হয়েচে—কই দেখি!

বিন্দু সজোরে তাঁহার হাত ঠেলিয়া দিয়া বলিল, থাক্ আর দেখে কাজ নেই। বলিয়া ঘুমন্ত ছেলেকে সচ্ছন্দে কোলে তুলিয়া লইয়া অন্নপূর্ণার প্রতি একবার বিষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

পাঁচ-ছয় দিনেই অমূল্য আরোগ্য হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু বড়জায়ের অপরাধটা বিন্দু মার্জ্জনা করিল না। সেইদিন হইতে সে ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত বলিত না।

অন্নপূর্ণা মনে মনে সমস্তই বুঝিলেন, অথচ তিনিও মৌন হইয়া রহিলেন। সকলের সম্মুখে সমস্ত অপরাধ বিন্দু যে তাহারি উপর তুলিয়া দিয়াছে, এ অন্যায় তিনিও ভুলিতে পারিলেন না। এইটিই একদিন কি একটা কথার পর তিনি এলোকেশীর কাছে বলিয়া ফেলিলেন, ওর জ্বর ছোটবৌয়ের জন্যই। ও যে মরেনি; এই ওর ভাগ্যি।

কথাটা এলোকেশী বিন্দুর গোচর করিতে লেশমাত্র বিলম্ব করিলেন না। বিন্দু

মন দিয়া শুনিল, কিন্তু কথা কহিল না। সে যে শুনিয়াছে, তাহাও এলোকেশী ভিন্ন আর কেহ জানিল না। বিন্দু বড় জায়ের সহিত একেবারে কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিল।

কয়েকদিন হইতে নূতন বাটীতে জিনিষ-পত্র সরানো হইতেছিল, কাল সকালেই যাইতে হইবে। যাদব ছেলেদের লইয়া সে-বাড়িতে ছিলেন, মাধব মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে অন্যত্র গিয়াছিল; সেও ছিল না। ইতিমধ্যে ও বাড়িতে এক বিষম কাণ্ড ঘটিল। সন্ধ্যার সময় মাষ্টার পড়াইতে আসিয়াছিল, কি মনে করিয়া বিন্দু তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। বলিল, কাল থেকে ও-বাড়িতে গিয়ে পড়াবেন।

যে আজ্ঞে, বলিয়া মাষ্টার চলিয়া যাইতেছিল, বিন্দু প্রশ্ন করিল, আপনার ছাত্রটি আজকাল পড়ে কেমন?

মাষ্টার বলিল, লেখা-পড়ায় সে বরাবরই ভাল, প্রতিবারই ত প্রথম হয়।

বিন্দু কহিল, তা হয়। কিন্তু আজ-কাল চুরুট খেতে শিখেচে যে!

মাষ্টার বিস্মিত হইয়া বলিল, চুরুট খেতে শিখেচে?

পরক্ষণেই নিজেই বলিল, আশ্চর্য্য নয়, ছেলেরা সমস্তই দেখাদেখি শেখে।

কার দেখে শিখেচে?

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিল। বিন্দু বলিল, ওর বাবাকে ও-কথা জানাবেন।

মাষ্টার মাথা নাড়িয়া বলিল, এই দেখুন না, আজ পাঁচ-সাতদিনের কথা, ইস্কুলের পথে এক উড়ে মালির বাগানে ঢুকে তার অসময়ের আম পেড়ে গাছ ভেঙে তাকে মার-ধোর করে এক কাণ্ড করেচে।

বিন্দু রুদ্ধ-নিশ্বাসে বলিল- তারপর?

উড়ে হেডমাষ্টারকে বলে দেয়, তিনি দশ টাকা জরিমানা করিয়ে তাকে তা দিয়ে শান্ত করেচেন।

বিন্দু বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, আমার অমূল্য ছিল? সে টাকা পাবে কোথায়?

মাষ্টার কহিল, তা জানি না, কিন্তু সেও ছিল। এ-বাড়ির নরেনবাবুও ছিল, আরও তিন-চারজন ইস্কুলের বদমাস ছেলে ছিল! এই কথা আমি হেডমাষ্টার মশায়ের কাছে শুনেচি।

বিন্দু বলিল, টাকাও আদায় হয়ে গেছে?

আজ্ঞে হাঁ, তাও শুনেচি।

আচ্ছা—আপনি যান। বলিয়া বিন্দু সেইখানেই বসিয়া রহিল। তার মুখ দিয়া শুধু অস্ফুটে বাহির হইল, আমাকে না জানিয়ে টাকা দিলে, এত সাহস এ-বাড়িতে কার? একে তাহার মন খারাপ, তাহাতে দিদির সহিত কথাবার্ত্তা বন্ধ, তাহার উপর এই সংবাদ বিন্দুকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিল।

সে উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। অন্নপূর্ণা রাত্রির জন্য তরকারী কুটিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া ছোটবৌয়ের মেঘাচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

বিন্দু কহিল, দিদি, এর মধ্যে অমূল্যকে টাকা দিয়েচ?

অন্নপূর্ণা ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিলেন, ভয়ে তাঁহার গলা কাঠ হইয়া গেল; মৃদুস্বরে বলিলেন, কে বললে?

বিন্দু বলিল, সেটা দরকারী কথা নয়—দরকারী কথা, সেই বা কি বলে নিলে, আর তুমিই বা কি বলে দিলে?

অন্নপূর্ণা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিন্দু বলিল, তুমি চাও না যে, আমি তাকে শাসন করি, সেইজন্যই আমাকে লুকিয়েচ। অমূল্য আর যাই করুক, মিথ্যে কথা গুরুজনের কাছে বলবে না, তুমি জেনে-শুনে দিয়েচ, সত্যি কি না?

অন্নপূর্ণা আস্তে আস্তে বলিলেন, সত্যি, কিন্তু এইবারটি তাকে মাপ কর্ বোন, আমি মাপ চাচ্ছি।

বিন্দুর বুকের ভিতর পুড়িয়া যাইতেছিল, বলিল, একটিবার! আজ থেকে চিরকালের জন্যেই মাপ করলুম। আর বলব না। আর কথা ক'ব না! সে যে এমনি করে চোখের সামনে একটু একটু করে উচ্ছন্ন যাবে, তা সইতে পারব না—তার চেয়ে একেবারে যাক। কিন্তু তোমার কি আস্পর্দ্ধা!

শেষ-কথাটা অন্নপূর্ণাকে তীক্ষ্ণভাবে বিঁধিল, তথাপি তিনি নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন! কিন্তু বিন্দু যত বকিতেছে, তাঁহার ক্রোধ উত্তরোত্তর ততই বাড়িতেছিল। সে পুনরায় চেঁচাইয়া বলিল, সব কথায় তুমি ন্যাকা সেজে বল, এইবারটি মাপ কর, কিন্তু দোষ তার তত নয়, যত তোমার। তোমাকে আমি মাপ করব না।

বাটীর দাসী-চাকরেরা আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল।

অন্নপূর্ণার আর সহ্য হইল না, তিনি বলিলেন, কি করবি—ফাঁসি দিবি?

বহ্নিতে আহুতি পড়িল, বিন্দু বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, সেই তোমার উপযুক্ত শাস্তি।

নিজের ছেলেকে দুটো টাকা দিয়েছি, এই ত অপরাধ ?

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল, বিন্দু আসল কথা ভুলিয়া বলিয়া বসিল, তাই বা দেবে কেন ? নষ্ট করবার টাকা আসে কোথা থেকে ?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, টাকা তুই নষ্ট করিস্‌নে ?

আমি করি আমার টাকা, তুমি নষ্ট কর কার টাকা শুনি ?

অন্নপূর্ণা এবার ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি নিঃস্ব ঘরের মেয়ে ছিলেন। মনে করিলেন, বিন্দু সেই ইঙ্গিতই করিয়াছে। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, তুমি না হয় মস্ত বড় লোকের মেয়ে, কিন্তু তাই বলে আর কেউ যে দুটো টাকাও দিতে পারে না, সে অহঙ্কার করিস্‌নে।

বিন্দু বলিল, সে অহঙ্কার আমি করিনে, কিন্তু তুমিও ভেবে দেখো একটা পয়সাও দিতে গেলে তুমি কার পয়সা দাও।

অন্নপূর্ণা চেঁচাইয়া বলিলেন, কার পয়সা দিই ? তোর যা মুখে আসে তাই বলিস্‌ ? যা, দূর হয়ে যা সামনে থেকে।

বিন্দু বলিল, দূর—আমি রাত পোহালেই হব, কিন্তু কার পয়সা খরচ কর, সেটা দেখতে পাও না ? কার রোজগারে খাচ্চ-পরচ, সেটা জান না ?

হঠাৎ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বিন্দু স্তব্ধ হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছিল। তিনি ক্ষণকাল নির্নিমেষ-চোখে ছোটবৌয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, তোমার স্বামীর রোজগারে খাচ্চি-পরচি। আমি তোমার দাসী-বাঁদী, উনি তোমার চাকর-বাকর! এই না তোমার মনের কথা ? তা এতদিন বলিসনি কেন ?

তাঁহার ওষ্ঠাধর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল। তিনি দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিয়া এক-মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিলেন, কোথা ছিলি ছোটবৌ যখন ছোটভাইকে পড়াবার জন্যে ও দু'খানি কাপড় একসঙ্গে কিনে পরেনি। কোথা ছিলি তুই, যখন ঘর পুড়ে গেল গাছতলায় একবেলা রেঁধে খেয়ে এই পৈতৃক ভিটেটুকু খাড়া করেছিল ?

বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, ও যদি জানত তোদের মনের কথা, কখনো এমন আফিং খেয়ে চোখ বুজে হুঁকোর নল মুখে দিয়ে আরামে দিন কাটাতে পারত ন' —সে লোক ও নয়। ওকে জানে তোর স্বামী, ওকে জানে স্বর্গের দেবতারা। আজ আমার ছুতো করে তুই তাঁকে অপমান করলি ?

স্বামী-অভিমানে অন্নপূর্ণার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। বলিলেন, ভালই হ'ল, জানিয়ে দিলি। সতী আত্মহত্যা করেছিল, আমিও দিব্যি কচ্চি, বরং পরের বাড়ি বেঁধে খাব, তবুও তোদের ভাত আর খাব না। তুই কি করলি—ওঁকে অপমান করলি!

ঠিক এই সময়ে যাদব প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, বড়বৌ!

স্বামীর কণ্ঠস্বরে তাঁহার অভিমান ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সাগরের মত উত্তাল হইয়া উঠিল, ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, ছি ছি, যে লোক নিজের মাগ-ছেলেকে খেতে দিতে পারে না—তার গলায় দেবার দড়ি জোটে না কেন?

যাদব হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া বলিলেন, কি হ'ল গো?

কি হ'ল? কিচ্ছু না! ছোটবৌ আজ স্পষ্ট করে বলে দিলে, আমি তার দাসী তুমি তার চাকর।

ঘরের ভিতর বিন্দু জিভ কাটিয়া কানে আঙুল দিল।

অন্নপূর্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমার একটা পয়সা কাউকে হাতে তুলে দেবার অধিকার নেই—তুমি বেঁচে থাকতেও আজ আমাকে এ-কথা শুনতে হ'ল। আজ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে এই শপথ কচ্চি, ওদের ভাত খাবার আগে যেন আমাকে ব্যাটার মাথা খেতে হয়।

বিন্দুর অবরুদ্ধ কর্ণরন্ধ্রে এ-কথা অস্পষ্ট হইয়া প্রবেশ করিল; সে অস্ফুটে 'কি করলে দিদি।' বলিয়া সেইখানেই ঘাড় গুঁজিয়া আজ দ্বাদশ বর্ষ পরে অকস্মাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

৭

নূতন বাড়িতে যাদব, অন্নপূর্ণা ও অমূল্য ব্যতীত আর সকলেই আসিয়াছিল। বাহির হইতে বিন্দুর পিসি, পিসির মেয়ে, নাতি-নাতনী, বাপের বাড়ি হইতে তাহার বাপ মা, তাঁদের দাস-দাসী প্রভৃতিতে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এখানে আসিবার দিনটাতেই শুধু বিন্দুকে কিছু বিমনা দেখাইয়াছিল, কিন্তু পরদিন হইতেই সে ভাব কাটিয়া গেল। রাগ পড়িলেই অন্নপূর্ণা আসিবেন, ইহাতে বিন্দুর লেশমাত্র সংশয় ছিল না। এখানে পূজা দিয়া লোকজন খাওয়াইতে হইবে, সে তাহারই উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বিন্দুর বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, তোর ছেলেকে দেখচিনে যে?

বিন্দু সংক্ষেপে কহিল, সে ও-বাড়িতে আছে।

মা প্রশ্ন করিলেন, তোর জা বুঝি আসতে পারলেন না?

বিন্দু কহিল, না।

তিনি নিজেই তখন বলিলেন, সবাই এলে ও-বাড়িতেই বা থাকে কে? পৈতৃক ভিটে বন্ধ করেও ত রাখা চলে না।

বিন্দু চুপ করিয়া কাজে চলিয়া গেল।

যাদব এ-কয়দিন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একবার করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিতেন, কথা-বার্ত্তা বলিয়া সংবাদ লইয়া ফিরিয়া যাইতেন, কিন্তু ভিতরে ঢুকিতেন না। গৃহ-পূজার পূর্ব্বের রাত্রে তিনি ভিতরে ঢুকিয়া এলোকেশীকে ডাকিয়া তত্ত্ব লইতেছিলেন, বিন্দু জানিতে পারিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল; পিতার অধিক এই ভাশুরের কাছে ছেলেবেলা হইতে সেদিন পর্য্যন্ত সে কত আদর পাইয়াছে, কত স্নেহের ডাক শুনিয়াছে, যাদব 'মা' বলিয়া ডাকিতেন, কোনদিন 'বৌমা' পর্য্যন্ত বলেন নাই, এই ভাশুরের কাছে জায়ের সহিত কলহ করিয়া কত নালিশ করিয়াছে, কোনটি তাহার কোনদিন উপেক্ষিত হয় নাই, আজ তাঁহার কাছে অপরিসীম লজ্জায়

বিন্দুর কণ্ঠরোধ হইয়া গেছে। যাদব চলিয়া গেলেন। সে নিভৃতে ঘরের মধ্যে মুখে আঁচল গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল—চারিদিকে লোক, পাছে কেহ শুনিতে পায়।

পরদিন সকালবেলা বিন্দু স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, বেলা হচ্চে ; পুরুত বসে আছেন—বঠ্‌ঠাকুর এখনো ত এলেন না।

মাধব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কেন ?

বিন্দু ততোধিক বিস্মিত হইয়া বলিল, তিনি কেন ? তিনি ছাড়া এসব করবে কে ?

মাধব কহিল, আমি, না হয় ভগ্নীপতি প্রিয়বাবু করবেন। দাদা আসতে পারবেন না।

বিন্দু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, আসতে পারবেন না বললেই হ'ল ; তিনি থাকতে কি কারো অধিকার আছে ? না না, সে হবে না—তিনি ছাড়া আমি কাউকে কিছু করতে দেব না।

মাধব বলিল, তবে বন্ধ থাক্। তিনি বাড়ি নেই, কাজে গেছেন।

এ সমস্ত বড়গিন্নীর মতলব ! তা হলে সেও আসবে না দেখছি। বলিয়া বিন্দু কাঁদ কাঁদ হইয়া চলিয়া গেল। তাহার কাছে পূজা-অর্চ্চনা, উৎসব-আয়োজন, খাওয়ান-দাওয়ান, সমস্ত একমুহূর্ত্তে একেবারে মিথ্যা হইয়া গেল। তিনদিন ধরিয়া অনুক্ষণ সে এই চিন্তা করিয়াছে, আজ বঠ্‌ঠাকুর আসিবেন, দিদি আসিবেন, অমূল্য আসিবে। আজিকার সমস্ত দিনব্যাপী কাজকর্ম্মের উপর সে যে মনে মনে তাহার কতখানি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল, সে-কথা সে ছাড়া আর কেহই জানিত না। স্বামীর একটা কথায় সে সমস্ত মরীচিকার মত অন্তর্হিত হইয়া যাইবামাত্রই উৎসবের বিরাট পণ্ডশ্রম পাষাণের মত তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল।

এলোকেশী আসিয়া বলিলেন, ভাড়ারের চাবিটা একবার দাও ছোটবৌ, ময়রা সন্দেশ নিয়ে এসেচে।

বিন্দু ক্লান্তভাবে বলিল, ঐখানে কোথাও এখন রাখ ঠাকুরঝি, পরে হবে !

কোথায় রাখব বৌ, কাকে-টাকে মুখ দেবে যে।

তবে ফেলে দাও গে, বলিয়া বিন্দু অন্যত্র চলিয়া গেল।

পিসিমা আসিয়া বলিলেন, হাঁ বিন্দু, এ-বেলা কতখানি ময়দা মাখবে একবার যদি দেখিয়ে দিতিস।

বিন্দু মুখ ভার করিয়া বলিল, কতখানি মাখবে তার আমি কি জানি ? তোমরা গিন্নী-বান্নী, তোমরা জান না ?

পিসিমা অবাক্ হইয়া বলিলেন, শোন কথা! কত লোক তোদের এ-বেলা খাবে, আমি তার কি জানি?

বিন্দু রাগিয়া বলিল, তবে বল গে ওঁকে! সে ছিল দিদি; অমূল্যধনের পৈতের সময় তিনদিন ধরে সহরের সমস্ত লোক খেলে, একবার বলেনি, ছোটবৌ, ওটা কর্ গে, সেটা দেখ্ গে! তার একটা হাড়ের যা যোগ্যতা, এ-বাড়ির সমস্ত লোকের তা নেই। বলিয়া আর একটা ঘরে চলিয়া গেল।

কদম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দিদি, জামাইবাবু বলচেন পূজোর কাপড়-চোপড়-গুলো—

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই চেঁচাইয়া উঠিল, খেয়ে ফ্যাল্ আমাকে, তোরা খেয়ে ফ্যাল্! যা দূর হ সামনে থেকে।

কদম শশব্যস্তে পালায়ন করিল।

খানিক পরে মাধব আসিয়া কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়া বলিল, ওগো শুনতে পাচ্চ?

বিন্দু কাছে সরিয়া আসিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, পাচ্ছি না। আমি পারব না। পারব না। পারব না। হ'ল?

মাধব অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

বিন্দু বলিল, কি করবে, আমার গলায় ফাঁসি দেবে? না হয় তাই দাও, বলিয়া কাঁদিয়া দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

বিন্দু বিনা কাজে ছট্‌ফট্ করিয়া এ-ঘর ও-ঘর করিয়া কেবলি লোকের দোষ ধরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কে তাড়াতাড়ি পথের উপর কতকগুলো বাসন রাখিয়া গিয়াছিল, বিন্দু টান মারিয়া সেগুলো উঠানের উপর ফেলিয়া দিয়া, কি করিয়া কাজ করিতে হয় শিখাইয়া দিল; কার ভিজা কাপড় শুকাইতেছিল, উড়িয়া তাহার গায়ে লাগিবামাত্র টানিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, কি করিয়া কাপড় শুকাইতে হয় বুঝাইয়া দিল। যে কেহ তাহার সামনে পড়িল, সে সভয়ে পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল।

পুরোহিত-বেচারা নিজে ভিতরে আসিয়া বলিলেন, তাই ত! বেলা বাড়তে লাগল—কোন বিলি ব্যবস্থাই দেখিনে—

বিন্দু আড়ালে দাঁড়াইয়া কড়া করিয়া জবাব দিল, কাজকর্ম্মের বাড়িতে বেলা একটু হয়ই। বলিয়া আর একটা বাসন পা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আর একটা ঘরের মেঝের উপর নির্জ্জীবের মত বসিয়া রহিল! মিনিট দশেক পরে হঠাৎ তাহার কানে একটা পরিচিত কণ্ঠের শব্দ যাইবামাত্রই সে ধড়ফড় করিয়া

উঠিয়া দাঁড়াইয়া দরজা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল; অন্নপূর্ণা আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন।

বিন্দু দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল। চোখ মুছিয়া সশব্দে সুমুখে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, বেলা দশটা-এগারটা বাজে, আর কত শত্রুতা করবে দিদি? আমি বিষ খেলে যদি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ত, তাই না হয় বাড়ি গিয়ে এক বাটি পাঠিয়ে দাও। বলিয়া চাবির গোছাটা ঝনাৎ করিয়া তাঁহার পায়ের নীচে ফেলিয়া দিয়া নিজের ঘরে গিয়া দোর দিয়া মাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা নিঃশব্দে চাবির গোছা তুলিয়া লইয়া দোর খুলিয়া ভাঁড়ারে গিয়া ঢুকিলেন।

অপরাহ্নে লোকজনের যাতায়াত, খাওয়ানো-দাওয়ানোর ভিড় কমিয়া গিয়াছিল, তবুও বিন্দু কিসের জন্য কেবলি অস্থির হইয়া ঘর-বার করিতে লাগিল।

ভৈরব বলিল, অমূল্যবাবু ইস্কুলে নেই।

বিন্দু তাহার দিকে অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, হতভাগা! ছেলেরা রাত্রি পর্য্যন্ত ইস্কুলে থাকে? নূতন লোক তুমি? ও-বাড়িতে গিয়ে একবার দেখতে পারনি?

ভৈরব বলিল, সে বাড়িতেও তিনি নেই।

বিন্দু চেঁচাইয়া বলিল, কোথায় কোন্ ছোটলোকদের ছেলের সঙ্গে ডাংগুলি খেলচে। আর কি তার প্রাণে ভয় ডর আছে, এইবার একটা চোখ কানা হলেই বড়গিন্নির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তা হলে দশ হাত বার করে খায়—যা, যেখানে পাস্ খুঁজে নিয়ে আন্।

অন্নপূর্ণা ভাঁড়ারের দোরে বসিয়া আর পাঁচজন বর্ষীয়সীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। ছোটবৌর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন।

ঘণ্টা-খানেক পরে ভৈরব আসিয়া জানাইল, অমূল্যবাবু ঘরে আছে, এল না। বিন্দু বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এল না কিরে? আমি ডাকচি বলেছিলি?

ভৈরব মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ, তবু এল না।

বিন্দু এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তার দোষ কি? যেমন মা, তেমনি ছেলে হবে ত! আমারো কটু দিব্যি রইল যে, অমন মা-ব্যাটার মুখ দর্শন করব না।

অনেক রাত্রে অন্নপূর্ণা বাটিতে ফিরিতে উদ্যত হইল, পৌঁছাইয়া দিবার জন্ম মাধব নিজে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিন্দু দ্রুতপদে অদূরে আসিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া ভীষণ-কণ্ঠে বলিল, পৌঁছে দিতে যাচ্ছ, উনি জলস্পর্শ করেননি তা জান?

মাধব বলিল, সে তোমার জানবার কথা—আমার নয়। সমস্ত নষ্ট হয় দেখে নিজে গিয়ে ডেকে এনেছিলাম, এখন নিজে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

বিন্দু বলিল, বেশ ভাল কথা। তা হলে দেখচি তুমিও ঐ-দিকে।

মাধব জবাব না দিয়া বলিল, চল বৌঠান, আর দেরি ক'রো না।

চল ঠাকুরপো; বলিয়া অন্নপূর্ণা পা বাড়াইতেই বিন্দু গর্জ্জন করিয়া বলিল, লোকে কথায় বলে দেইজি শত্রু। নিজের যা মুখে এলো দশটা মিথ্যে সাজিয়ে বললে—কটু কটু করে দিব্যি করলে, চার দিন চার রাত ছেলের মুখ দেখতে দিলে না—ভগবান এর বিচার করবেন।

বলিয়া মুখে আঁচল গুঁজিয়া কান্না রোধ করিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া উপুড় হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। একটা গোলমাল উঠিল; মাধব অন্নপূর্ণা দুইজনেই শুনিতে পাইলেন। অন্নপূর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, কি হ'ল দেখি!

মাধব কহিল দেখতে হবে না চল।

কলহের কথাটা এ-কয়দিন গোপন ছিল, আর রহিল না। পরদিন বাড়ির মেয়েরা এক জায়গায় বসিল, এলোকেশী বলিয়া উঠিলেন, জায়ে জায়ে ঝগড়া হয়েচে, ছেলের কি হল যে একবার আসতে পারলে না? ছোটবৌ বড় মিথ্যে বলেনি—যেমন মা, তেমনি ছেলে হবে ত। ঢের ঢের ছেলে দেখেচি বাবা, এমন নেমকহারাম কখন দেখিনি।

বিন্দু ক্লান্তদৃষ্টিতে একবারটি তাহার দিকে চাহিয়া লজ্জায় ঘৃণায় চোখ নীচু করিল।

এলোকেশী পুনরায় কহিলেন, তুমি ছেলে ভালবাস ছোটবৌ, আমার নরেন্দ্রনাথকে নাও—ওকে তোমায় দিলুম। মেরে ফেল কেটে ফেল কোনদিন কথাটি বলবার ছেলে ও নয়—তেমন সন্তান আমরা পেটে ধরিনে।

বিন্দু নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। বিন্দুর মা জবাব দিলেন। তাঁহার বয়স হইয়াছে, জমিদারের মেয়ে, জমিদারের গৃহিণী, তিনি পাকা লোক। হাসিয়া বলিলেন, ও কি একটা কথা গা! অমূল্য ওর হাড়ে মাংসে জড়িয়ে আছে—না না, ওকে তোমরা অমন করে উতলা করে দিও না। বিন্দু, তোদের ঝগড়া দু'দিনের মা, তাই বলে ছেলে কি তোর পর হয়ে যাবে?

বিন্দু ছল ছল চোখে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় সে কদমকে ডাকিয়া বলিল, আচ্ছা কদম, তুই ত ছিলি, তুই বল, আমার এত কি দোষ হয়েছিল যে, উনি অতবড় দিব্যি করে ফেললেন?

বিন্দু তাহাকে এ আলোচনা করিতে আহ্বান করিয়াছে, সহসা কদম তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া মৌন হইয়া রহিল।

তথাপি বিন্দু বলিল, না না, হাজার হোক তোরা বয়সে বড়, তোদের দুটো কথা আমাকে শুনতেই হয়, তুই বল্ না, এতে দোষ আমার কি হয়েছিল।

কদম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না দিদি, দোষ আর কি?

বিন্দু কহিল, তবে যা না একবার ও-বাড়িতে। দু'কথা বেশ করে শুনিয়ে দিয়ে আয় না—তোর আর ভয় কি?

কদম সাহস পাইয়া বলিল, ভয় কিছু নয় দিদি, কিন্তু কাজ কি ঝগড়া-বিবাদ করে? যা হবার তা হয়ে গেছে।

বিন্দু কহিল, না না, কদম, তুই বুঝিসনে—সত্যি কথা বলা ভাল। না হলে ও মনে করবে, আমারি যেন সব দোষ, তার কিছুই নেই। বার করে দেব, দূর করে দেব, এ-সকল কথা বলেনি ও? আমি কোনদিন তাতে রাগ করেচি? কেন ও লুকিয়ে টাকা দিলে? কেন একবার জানালে না?

কদম বলিল, আচ্ছা কাল যাব, আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

বিন্দু অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, সন্ধ্যা আবার কোথায় কদম, তুই বড় কথা কাটিস্। শীতকালের বেলা বলেই অমন দেখাচ্চে; না হয় কাউকে সঙ্গে নে না—ওরে ও ভৈরব শোন্, হেবোকে ডেকে দে ত, কদমের সঙ্গে যাক।

ভৈরব বলিল, হেবোকে দিয়ে বাবু বাতি পরিষ্কার করাচ্চেন।

বিন্দু চোখ তুলিয়া বলিল, ফের মুখের সামনে জবাব করে!

ভৈরব সে চাহনির সুমুখ হইতে ছুটিয়া পলাইল। কদমকে পাঠাইয়া দিয়া বিন্দু বার-দুই এ-ঘর ও-ঘর করিয়া রান্নাঘরে আসিয়া ঢুকিল। বামুনঠাকরুণ একা বসিয়া রাঁধিতেছিল। বিন্দু একপাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আচ্ছা মেয়ে, তোমাকেই সাক্ষী মানচি—সত্যিকথা বল মেয়ে, কার দোষ বেশি?

পাচিকা বুঝিতে পারিল না, বলিল, কিসের মা?

বিন্দু বলিল, সেদিনের কথা গো! কি বলেছিলুম আমি? শুধু বলেছিলুম, দিদি, অমূল্যকে এর মধ্যে টাকা দিয়েচ? কেনা জানে ছেলেদের হাতে টাকাকড়ি দিতে নেই। বললেই ত হ'ত, অমূল্য কান্নাকাটি করেছিল, দিয়েচি, চুকে যেত। এতে, এত কথাই বা ওঠে কেন, আর এমন দিব্যি-দিলেশাই বা হয় কেন? পাঁচটা ঘটি-বাটি একসঙ্গে থাকলে ঠেকাঠেকি লাগে, এ ত মানুষ? তাই বলে এত বড় দিব্যি! ঐ একটি বংশধর—তার নাম করে দিব্যি? আমি বলচি মেয়ে তোমাকে, ইহজন্মে আমি আর ওর মুখ দেখব না। শত্রুর দিকে ফিরে চাইব ত ওর দিকে চোখ ফেরাব না।

বামুনমেয়ে স্বভাবতঃ অল্পভাষিণী, সে কি বলিবে বুঝিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিল।

বিন্দুর দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া ভাঙ্গা-গলায় পুনরায় বলিল, রাগের মাথায় কে দিব্যি না করে মেয়ে? তাই বলে জলস্পর্শ করলে না! ছেলেটাকে পর্য্যন্ত আসতে দিলে না! এইগুলো কি বড়র মত কাজ? হাজার হোক আমি ছোট, বুদ্ধি কম, যদি তার পেটের মেয়ে হতুম, কি করত তা হলে? আমি তেমনি ওর নাম কখন মুখে আনব না, তা তোমরা দেখো!

বামুনঠাকরুণ তথাপি চুপ করিয়া রহিল।

বিন্দু বলিয়া উঠিল, আর ও-ই দিব্যি দিতে জানে, আমি জানিনে? কাল যদি ও-বাড়িতে গিয়ে বলে আসি, এক বাটি বিষ পাঠিয়ে না দাও ত তোমার ওই দিব্যি রইল, কি হয় তা হলে? আমি দু'দিন চুপ করে আছি, তার পরে হয় গিয়ে ঐ দিব্যি দিয়ে আসব, না হয় নিজেই একবাটি বিষ খেয়ে বলে যাব, দিদি পাঠিয়ে দিয়েছে। দেখি, পাঁচজনে ওকে ছি ছি করে কি না! ও জব্দ হয় কি না!

বামুনঠাকরুণ ভয় পাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, ছি মা, ও-সব মতলব করতে নেই—ঝগড়া-বিবাদ চিরস্থায়ী হয় না—উনিও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না, অমূল্যধনও পারবে না। এ ক'দিন সে যে কেমন করে আছে, আমরা তাই কেবল ভাবি।

বিন্দু ব্যগ্র হইয়া বলিল, তাই বল মেয়ে। নিশ্চয়ই তাকেও মার-ধোর করে ভয় দেখিয়ে রেখেচে। যে একটা রাত আমাকে না হলে ঘুমুতে পারে না, আজ পাঁচ দিন চার রাত কেটে গেল! ও-মাগীর কি আর মুখ দেখতে আছে! ঐ যে বললুম, শত্রুর দিকে ফিরে চাইব ত ওর দিকে ইহজন্মে আর না!

বামুনঠাকরুণ নিজের কব্জির কাছে একটা কাল দাগ দেখাইয়া কহিল, এই দেখ মা, এখনো কালশিরে পড়ে আছে। সে-রাত্রে তোমার মূর্চ্ছা হয়েছিল, এ-সব কথা জান না। অমূল্যধন কোথা থেকে ছুটে এসে তোমার বুকের উপর পড়ে সে কি কান্না! সে ত আর কখন দেখেনি, বলে, ছোটমা মরে গেল। না দেয় তোমার চোখে জল দিতে, না দেয় বাতাস করতে—আমি টানতে গেলুম, আমাকে কামড়ে দিলে; বড়মা টানতে গেলেন, তাঁকে আঁচড়ে-কামড়ে কাপড় ছিঁড়ে এক করে দিলে। লোকে রুগীর সেবা করবে কি মা, তাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। শেষে চার-পাঁচজন মিলে টেনে নিয়ে যায়।

বিন্দু নির্নিমেষ-চোখে তাহার মুখের পানে চাহিয়া যেন কথাগুলো গিলিতে লাগিল; তারপর অতি দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া নিজের ঘরে দোর দিয়া শুইল।

দিন-চারেক পরে বিন্দুর পিতা, মাতা, পিসি প্রভৃতির ফিরিবার পূর্ব্বের দিন মূর্চ্ছার পরে বিন্দু চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। কদম বাতাস করিতেছিল, আর কেহ ছিল না। বিন্দু ইঙ্গিতে তাহাকে আরও কাছে ডাকিয়া মৃদু-কণ্ঠে বলিল, কদম, দিদি এসেচেন রে?

কদম বলিল, না দিদি, আমরা এত লোক আছি, তাঁকে আর কষ্ট দেওয়া কেন?

বিন্দু ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, এই তোদের দোষ কদম। সব কাজেই নিজেদের বুদ্ধি খাটাতে যাস্। এমনি করেই আমাকে একদিন মেরে ফেলবি দেখচি। পুজোর দিনেও ত তোরা একবাড়ি লোক ছিলি, কি করতে পেরেছিলি,

যতক্ষণ না সেই এক-ফোঁটা লোকটি এসে বাড়িতে পা দিলে?—ওরে, তোরা আর সে? তার কড়ে আঙুলের ক্ষমতাও তোদের বাড়িসুদ্ধ লোকের নেই।

বিন্দুর মা ঢুকিয়া বলিলেন, জামাইয়ের মত আছে বিন্দু, তুইও দিন-কতক আমাদের সঙ্গে ঘুরে আসবি চল্।

বিন্দু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমার যাওয়া না-যাওয়া কি তাঁর মতামতের উপর নির্ভর করে মা, যে, তিনি বললেই যাব? আমার শত্রুর হুকুম না পেলে যাই কি করে?

মা কথাটা বুঝিয়া বলিলেন, তোর জায়ের কথা বলচিস্? তাঁর আর হুকুম নিতে হবে না। যখন আলাদা হয়ে তোরা চলে এসেচিস্, তখন উনি বললেই হ'ল।

বিন্দু মাথা নাড়িয়া বলিল, না, তা হয় না। যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ যেখানেই থাক্, সেই সব। আর যাই করি মা, তাকে না বলে বাড়ি ছেড়ে যেতে পারব না—বঠ্‌ঠাকুর তা হলে রাগ করবেন।

এলোকেশী এইমাত্র উপস্থিত হইয়া শুনিতেছিলেন, বলিলেন, আচ্ছা, আমি বলচি তুমি যাও।

বিন্দু সে-কথার জবাব দিল না।

মা বলিলেন, বেশ ত, না হয় লোক পাঠিয়ে তাঁর মত নে না বিন্দু।

বিন্দু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, লোক পাঠিয়ে? সে ত আরও মন্দ হবে মা? আমি তার মন জানি, মুখে বলবে 'যাক্', কিন্তু ভেতরে ভেতরে রেগে থাকবে, হয়ত বঠ্‌ঠাকুরকে পাঁচটা বানিয়ে বলবে—না মা, তোমরা যাও, আমার যাওয়া হবে না।

মা জিদ করিলেন না, চলিয়া গেলেন। এবার ফাঁকা বাড়ি প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে গিলিবার জন্য হাঁ করিতে লাগিল। নীচের একটি ঘরে এলোকেশীরা থাকেন, দোতলার একটি ঘর তাহার নিজের, আর সমস্ত খালি খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। সে শূন্য মনে ঘুরিতে ঘুরিতে তেতলার একটি ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে পুত্র-পুত্রবধূর নাম করিয়া এই ঘরখানি সে তৈরী করাইয়াছিল। এইখানে ঢুকিয়া সে কিছুতেই চোখের জল রাখিতে পারিল না। নীচে নামিয়া আসিতেছিল, পথে স্বামীর সহিত দেখা হইবামাত্রই সে বলিয়া উঠিল, হাঁ গা, কি-রকম হবে তবে?

মাধব বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কিসের?

বিন্দু আর জবাব দিতে পারিল না। হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না না, তুমি যাও—ও কিছু না।

পরদিন সকালবেলা মাধব বাহিরের ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিল, অকস্মাৎ বিন্দু ঘরে ঢুকিয়াই কান্না চাপিয়া বলিল, উনি চাকরি করচেন, না?

মাধব চোখ তুলিয়াই বলিল, হুঁ।

হুঁ কি? এই কি তাঁর চাকরির বয়স?

মাধব পূর্ব্বের মত কাগজে চোখ রাখিয়া বলিল, চাকরি কি মানুষ বয়সের জন্য করে, চাকরি করে অভাবে!

তাঁর অভাবই বা হবে কেন? আমরা পর, ঝগড়া করেচি, কিন্তু তুমি ত তাঁর ভাই।

মাধব বলিল, বৈমাত্রেয় ভাই—জ্ঞাতি।

বিন্দু স্তম্ভিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিল, তুমি বেঁচে থেকে তাঁকে কাজ করতে দেবে?

মাধব এবার মুখ তুলিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিল, তার পর সহজ শান্তকণ্ঠে বলিল, কেন দেব না? সংসারে যে যার অদৃষ্ট নিয়ে আসে, তেমনি ভোগ করে, তার জীবন্ত সাক্ষী আমি নিজে। কবে বাপ-মা মরেচেন জানিওনে; বড়বৌঠানের মুখে শুনি আমরা বড় গরীব, কিন্তু কোনোদিন দুঃখকষ্টের বাষ্পও টের পেলাম না। কোথা থেকে চিরকাল পরিষ্কার ধপধপে কাপড়-জামা এসেচে, কোথা থেকে ইস্কুল-কলেজের মাইনে, বইয়ের দাম, বাসাখরচ এসেচে, তা আজও বলতে পারিনে। তার পরে উকিল হয়ে মন্দ টাকা পাইনে। ইতিমধ্যে কোথা থেকে কেমন করে তুমি একরাশ টাকা নিয়ে ঘরে এলে—এমন অট্টালিকাও তৈরী হ'ল—অথচ দাদাকে দেখ, চিরকালটা নিঃশব্দে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেচেন, ছেঁড়া সেলাই-করা কাপড় পরেচেন—শীতের দিনে তাঁর গায়ে কখন জামা দেখিনি—একবেলা একমুঠো খেয়ে কেবল আমাদের জন্যে—সব কথা আমার মনেও পড়ে না, পড়বার দরকারও দেখিনে—শুধু দিন-কতক আরাম করছিলেন, তা ভগবান সুদসুদ্ধ আদায় করে নিচ্চেন। বলিয়া সহসা সে মুখ ফিরাইয়া একটা দরকারী কাগজ খুঁজিতে লাগিল।

বিন্দু নির্ব্বাক, স্তব্ধ। স্বামীর কত বড় তিরস্কার যে এই অতীত দিনের সহজ কাহিনীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, সে-কথা বিন্দুর প্রতি রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত অনুভব করিতে লাগিল, সে মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

মাধব কাগজ খুঁজিতে খুঁজিতে কতকটা নিজের মনেই বলিল, চাকরি বলে চাকরি! রাধাপুরের কাছারিতে যেতে আসতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ—ভোর চারটেয় বেরিয়ে সমস্তদিন অনাহারে থেকে রাত্রে ফিরে এসে দুটি খাওয়া, মাইনে বার টাকা।

বিন্দু শিহরিয়া উঠিল—সমস্তদিন অনাহার! মোটে বার টাকা!

হাঁ, বার টাকা। বয়স হয়েচে, তাতে আফিংখোর মানুষ, একটু-আধটু দুধটুকুও পান না; ভগবান দেখচি, এতদিন পরে দয়া করে দাদার ভবযন্ত্রণা মোচন করে দিচ্চেন।

বিন্দুর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল এবং যাহা কোনদিন করে নাই, আজ তাহাও করিল। হেঁট হইয়া স্বামীর দুই পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, একটি উপায় করে দাও, রোগা মানুষ এমন করে দুটো দিনও বাঁচবেন না।

মাধব নিজের চোখের জল কোনগতিকে মুছিয়া লইয়া কহিল, আমি কি উপায় করব? বৌঠান আমাদের এক কণা পর্য্যন্ত নেবেন না; কিছু না করলে তাঁদের সংসারই বা চলবে কি করে?

বিন্দু রুদ্ধস্বরে বলিল, তা আমি জানিনে। ওগো, তুমি আমার দেবতা, তিনি তোমাদের চেয়েও বড় যে! ছি ছি, যে-কথা মনেও আনা যায় না, সেই কথা কি না—বিন্দু আর বলিতে পারিল না।

মাধব বলিল, বেশ ত, অন্ততঃ বৌঠানের কাছে যাও। যাতে তাঁর রাগ পড়ে, তিনি প্রসন্ন হন, তাই কর। আমার পা ধরে সমস্ত দিন বসে থাকলেও উপায় হবে না।

বিন্দু তৎক্ষণাৎ পা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, পায়ে-ধরা অভ্যাস আমার নয়। এখন দেখচি, কেন সে-রাত্রে তিনি জলস্পর্শ করেননি, অথচ তুমি সমস্ত জেনে-শুনে শত্রুর মত চুপ করে রইলে! আমার অপরাধ বেড়ে গেল, তুমি কথা কইলে না!

মাধব কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিয়া কহিল, না। ও বিদ্যে আমার দাদার কাছে শেখা। ঈশ্বর করুন যেন এমনি চুপ করে থেকেই একদিন যেতে পারি।

বিন্দু আর কথা কহিল না। উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে দোর দিয়া পড়িয়া রহিল।

মাধব তখন উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, বিন্দু আবার আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার দুই চোখ রাঙা। মাধবের দয়া হইল, বলিল, যাও একবার তাঁর কাছে। জান ত তাঁকে, একবারটি গিয়ে শুধু দাঁড়াও, তাহলেই সব হবে।

বিন্দু অত্যন্ত করুণ-কণ্ঠে বলিল, তুমি যাও—ওগো আমি ছেলের দিব্যি কচ্চি—

মাধব তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কিছু উষ্ণ হইয়াই জবাব দিল, হাজার দিব্যি

করলেও আমি দাদাকে বলতে পারব না। তিনি নিজে জিজ্ঞেসা না করলে গিয়ে বলব, এত সাহস আমার গলা কেটে ফেললেও হবে না।

বিন্দু তথাপি নড়িল না।

মাধব কহিল, পারবে না যেতে?

বিন্দু জবাব দিল না, হেঁটমুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

৮

বাড়ির সুমুখ দিয়া ইস্কুলে যাইবার পথ। প্রথম কয়েকদিন অমূল্য ছাতি আড়াল দিয়া এই পথেই গিয়াছিল, আজ দু'দিন ধরিয়া সেই লাল রঙের ছাতিটি আর পথের একধার বহিয়া গেল না। চাহিয়া চাহিয়া বিন্দুর চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল, তবুও সে চিলের ছাদের আড়ালে বসিয়া তেমনি একদৃষ্টে পথের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সকাল নটা-দশটার সময় কত রকমের ছাতি মাথায় দিয়া কত ছেলে হাঁটিয়া গেল; ইস্কুলে ছুটির পর কত ছেলে সেই পথে আবার ফিরিয়া আসিল; কিন্তু সেই চলন, সেই ছাতি বিন্দুর চোখে পড়িল না। সে সন্ধ্যার সময় চোখ মুছিতে মুছিতে নামিয়া আসিয়া নরেনকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ নরেন, এই ত ইস্কুলে যাবার সোজা পথ, তবে সে এদিক দিয়ে আর যায় না?

নরেন চুপ করিয়া রহিল।

বিন্দু বলিল, বেশ ত রে, তোরা দুটি ভাই গল্প করতে করতে যাবি আসবি—সেই ত ভাল!

নরেন তাহার নিজের ধরনে অমূল্যকে ভালবাসিয়াছিল, চুপি চুপি বলিল, সে লজ্জায় আর যায় না মামী, ঐ হোথা দিয়ে ঘুরে যায়।

বিন্দু কষ্টে হাসিয়া বলিল, তার আবার লজ্জা কিসের রে? না না, তুই বলিস তাকে, সে যেন এই পথেই যায়!

নরেন মাথা নাড়িয়া বলিল, কক্ষনো যাবে না মামী। কেন যাবে না জান?

বিন্দু উৎসুক হইয়া বলিল, কেন?

নরেন বলিল, তুমি রাগ করবে না?

না।

তাদের বাড়িতে বলে পাঠাবে না?

না।

আমার মাকেও বলে দেবে না?

বিন্দু অধীর হইয়া বলিল, না রে না,—বল্, আমি কাউকে কিছু বল্‌ব না।

নরেন ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, থার্ডমাস্টার অমূল্যর আচ্ছা করে কান মলে দিয়েছিল।

একমুহূর্তে বিন্দু আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কেন দিলে? গায়ে হাত তুলতে আমি মানা করে দিয়েচি না?

নরেন হাত নাড়িয়া বলিল, তার দোষ কি মামী, সে নূতন লোক। আমাদের চাকর এই হেবো শালাই বজ্জাত, সে এসে মাকে বলেচে। আমার মা-টিও কম বজ্জাত নয় মামী, সে মাস্টারকে বলে দিতে বলে দিয়েচে, থার্ডমাস্টার অমনি আচ্ছাসে কান মলেচে—কি রকম করে জান মামী—এই রকম করে ধরে—

বিন্দু তাহাকে তাড়াতাড়ি থামাইয়া বলিল, হেবো কি বলে দিয়েচে?

নরেন বলিল, কি জানি মামী, হেবো টিফিনের সময় আমার খাবার নিয়ে যায় ত, সে ছুটে গিয়ে বলে; কি খাবার দেখি নরেনদা? মা শুনে বলে, অমূল্য নজর দেয়!

অমূল্যর কেউ খাবার নিয়ে যায় না?

নরেন কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিল, কোথা পাবে মামী, তারা গরীব-মানুষ, সে পকেটে করে দুটি ছোলা-ভাজা নিয়ে যায়, তাই টিফিনের সময় ওদিকের গাছতলায় লুকিয়ে বসে খায়।

বিন্দুর চোখের উপর ঘরবাড়ি সমস্ত সংসার দুলিতে লাগিল; সে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া বলিল; নরেন তুই যা।

সেরাত্রে অনেক ডাকাডাকির পর বিন্দু খাইতে বসিয়া কোনমতেই হাত মুখে তুলিতে পারিল না, শেষে অসুখ করিতেছে বলিয়া উঠিয়া গেল। পরদিনও প্রায় উপবাস করিয়া পড়িয়া রহিল, অথচ, কাহাকেও কোন কথা বলিতেও পারিল না, একটা উপায়ও খুঁজিয়া পাইল না। তাহার কেবল ভয় করিতে লাগিল, পাছে কথা কহিলেই তাহার নিজের অপরাধ আরও বাড়িয়া যায়। অপরাহ্নে স্বামীর আহারের সময় অভ্যাসমত কাছে গিয়া বসিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। কোনরূপ ভোজ্য পদার্থের দিকে কাল হইতে সে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না।

ঘরে বাতি জ্বলিতেছে, মাধব নিমীলিত চোখে চুপ করিয়া পড়িয়াছিল, বিন্দু আসিয়া পায়ের কাছে বসিল। মাধব চাহিয়া দেখিয়া বলিল, কি?

বিন্দু নতমুখে স্বামীর পায়ের একটা আঙুলের নখ খুঁটিতে লাগিল।

মাধব স্ত্রীর মনের কথাটা অনুমান করিয়া লইয়া আর্দ্র হইয়া বলিল, সমস্তই বুঝি বিন্দু, কিন্তু আমার কাছে কাঁদলে কি হবে। তাঁর কাছে যাও।

বিন্দু সত্যই কাঁদিতেছিল, বলিল, তুমি যাও।

আমি গিয়ে তোমার কথা বলব, দাদা শুনতে পাবেন না?

বিন্দু সে-কথার জবাব না দিয়া বলিল, আমি ত বলচি আমার দোষ হয়েচে—আমি ঘাট মানচি, তুমি তাঁদের বল গে।

আমি পারব না, বলিয়া মাধব পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিন্দু আরও কতক্ষণ আশা করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু মাধব কোন কথাই আর যখন বলিল না, তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল; স্বামীর ব্যবহারে তাহার বুকের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা প্রস্তর-কঠিন ধিক্কার যোজন-ব্যাপী পর্ব্বতের মত এক নিমিষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল! আজ সে নিঃসংশয়ে বুঝিল, তাহাকে সবাই ত্যাগ করিয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকালেই যাদব ছোটবধূর যাইবার অনুমতি দিয়া একখানি পত্র পাঠাইয়া দিলেন। বিন্দুর পিতা পীড়িত, সে যেন অবিলম্বে যাত্রা করে। বিন্দু সজল-নেত্রে গাড়িতে গিয়া উঠিল।

বামুনঠাকরুণ গাড়ির কাছে আসিয়া বলিলেন, বাপকে ভাল দেখে শীগ্‌গির ফিরে এসো মা।

বিন্দু নামিয়া আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইতেই তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন।

বিন্দুকে এমন নত, এমন নম্র হইতে কেহ কোনদিন দেখে নাই। পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বিন্দু কহিল, না মেয়ে, যাই হোক তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বয়সে বড়—আশীর্ব্বাদ কর, যেন আর ফিরতে না হয়, এই যাওয়াই যেন আমার শেষ যাওয়া হয়।

বামুনের মেয়ে তদুত্তরে কিছুই বলিতে পারিলেন না—বিন্দুর শীর্ণ ক্লিষ্ট মুখখানির পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এলোকেশী উপস্থিত ছিলেন, খন্ খন্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ও কি কথা ছোটবৌ? আর কারো বাপ-মায়ের কি অসুখ হয় না?

বিন্দু জবাব দিল না, মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, তোমাকে নমস্কার করি ঠাকুরঝি—চললুম আমি।

ঠাকুরঝি বলিলেন, যাও দিদি, যাও। আমি ঘরে রইলুম, দেখতে শুনতে পারব।

বিন্দু আর কথা কহিল না, কোচম্যান গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

অন্নপূর্ণা বামুনঠাকরুণের মুখে এ-কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন! ইতিপূর্ব্বে কোন দিন বিন্দু অমূল্যকে ছাড়িয়া বাপের বাড়ি যায় নাই—আজ এক মাসের উপর হইল, সে একবার তাহাকে চোখের দেখা দেখিতে পায় নাই—তার দুঃখ অন্নপূর্ণা বুঝিলেন।

রাত্রে অমূল্য বাপের কাছে শুইয়া আস্তে আস্তে গল্প করিতেছিল।

নীচে প্রদীপের আলোকে কাঁথা সেলাই করিতে করিতে অন্নপূর্ণা সহসা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, ষাট! ষাট! যাবার সময় বলে গেল কি না, এই যাওয়াই যেন শেষ যাওয়া হয়! মা দুর্গা করুন, বাছা আমার ভালয় ভালয় ফিরে আসুক।

কথাটা শুনিতে পাইয়া যাদব উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, আগাগোড়াই কাজটা ভাল করনি বড়বৌ! আমার মাকে তোমরা কেউ চিনলে না।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, সেও ত একবার দিদি বলে এলো না! তার ছেলেকেও ত সে জোর করে নিয়ে যেতে পারত, তাও করলে না! সেদিন সমস্তদিন খাটুনির পরে ঘরে ফিরে এলুম—উল্টে কতকগুলো শক্ত কথা শুনিয়ে দিলে!

যাদব বলিলেন, আমার মায়ের কথা শুধু আমি বুঝি। কিন্তু বড়বৌ, এই যদি না মাপ করতে পারবে, বড় হয়েছিলে কেন? তুমিও যেমন, মাধুও তেমনি, তোমরা ধরে-বেঁধে বুঝি আমার মায়ের প্রাণটা বধ করবে!

অন্নপূর্ণার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

অমূল্য বলিল, ছোটমা কেন আসবে না বলেচে?

অন্নপূর্ণা চোখ মুছিয়া বলিলেন, যাবি তোর ছোটমার কাছে?

অমূল্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

না কেন রে? ছোটমা তোর দাদামশায়ের বাড়ি গেছে, তুইও কাল যা!

অমূল্য চুপ করিয়া রহিল। যাদব বলিলেন, যাবি অমূল্য!

অমূল্য বালিশে মুখ লুকাইয়া পূর্ব্বের মত মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, না।

কতকটা রাত্রি থাকিতেই যাদব কর্ম্মস্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন। দিন পাঁচ-ছয় পরে এমনি এক শেষ-রাত্রে তিনি প্রস্তুত হইয়া অন্যমনস্কের মত তামাক টানিতেছিলেন।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, বেলা হয়ে যাচ্ছে।

বিন্দুর ছেলে

যাদব ব্যস্ত হইয়া হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া বলিলেন, আজ মনটা বড় খারাপ বড়বৌ, কাল রাত্রে আমার মা যেন ঐ দোরের আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুর্গা! দুর্গা! বলিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

সকালবেলা অন্নপূর্ণা ক্লান্তভাবে রান্নাঘরে কাজ করিতেছিল, ও বাড়ির চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু কাল রাত্রে ফরাসডাঙ্গায় চলে গেছেন—মা'র নাকি বড় ব্যামো। স্বামীর কথাটা স্মরণ করিয়া অন্নপূর্ণার বুক কাঁদিয়া উঠিল—কি ব্যামো?

চাকর বলিল, তা জানিনে মা, শুনলুম কি-রকম অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে কি-রকম শক্ত অসুখ হয়ে দাঁড়িয়েচে।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া যাদব খবর শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কত সাধ করে সোনার প্রতিমা ঘরে আনলুম বড়বৌ, জলে ভাসিয়ে দিলে? আমি এখনি যাব।

দুঃখে আত্মগ্লানিতে অন্নপূর্ণার বুক ফাটিতেছিল; অমূল্যের চেয়েও বোধ করি তিনি ছোটবৌকে ভালবাসিতেন। নিজের চোখ মুছিয়া, তিনি স্বামীর পা ধুইয়া জোর করিয়া সন্ধ্যা করিতে বসাইয়া দিয়া, অন্ধকার বারান্দায় আসিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিক পরেই বাহিরে মাধবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অন্নপূর্ণা প্রাণপণে বুক চাপিয়া ধরিয়া দুই কানে আঙুল দিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মাধব রান্নাঘর অন্ধকার দেখিয়া, এ-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া অন্ধকারে অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া শুষ্কস্বরে বলিল, বৌঠান, শুনেচ বোধ হয়?

অন্নপূর্ণা মুখ তুলিতে পারিলেন না।

মাধব কহিল, অমূল্যর যাওয়া একবার দরকার, বোধ করি শেষ সময় উপস্থিত হয়েচে।

অন্নপূর্ণা উপুড় হইয়া ফুকারিয়া উঠিলেন। যাদব ও-ঘর হইতে পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, এমন হয় না মাধু! আমি বলচি হয় না! আমি জ্ঞানে অজ্ঞানে কাউকে দুঃখ দিইনি, ভগবান আমাকে এ-বয়সে কখনো এমন শাস্তি দেবেন না।

মাধব চুপ করিয়া রহিল।

যাদব বলিলেন, আমাকে সব কথা খুলে বল্—আমি গিয়ে মাকে ফিরিয়ে আনবো—তুই উতলা হসনে মাধু—গাড়ি সঙ্গে আছে?

মাধব বলিল, আমি উতলা হইনি দাদা, আপনি নিজে কি-রকম কচ্চেন?

কিছুই করিনি। ওঠ বড়বৌ, আয় অমূল্য—

মাধব বাধা দিয়া বলিল, রাত্রিটা যাক না দাদা।

না, সে হবে না—তুই অস্থির হ'সনে মাধু—গাড়ি ডাক, নইলে আমি হেঁটে যাব।

মাধব আর কিছু না বলিয়া গাড়ি আনিল, চারজনেই উঠিয়া বসিলেন। যাদব বলিলেন, তার পরে?

মাধব কহিল, আমি ত ছিলুম না—ঠিক জানিনে। শুনলুম, দিন-চারেক আগে খুব জ্বরের ওপর ঘন ঘন মূর্চ্ছা হয়, তার পরে এখন পর্য্যন্ত কেউ ওষুধ কি এক ফোঁটা দুধ অবধি খাওয়াতে পারেনি। ঠিক বলতে পারিনে কি হয়েচে, কিন্তু আশা আর নেই।

যাদব জোর দিয়া বলিয়া উঠিলেন, খুব আছে, একশবার আছে। মা আমার বেঁচে আছেন। মাধু, ভগবান আমার মুখ দিয়ে এই শেষ বয়সে মিথ্যা বার করবেন না—আমি আজ পর্য্যন্ত মিথ্যে বলিনি!

মাধব তৎক্ষণাৎ অবনত হইয়া অগ্রজের পদধূলি মাথায় লইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

৯

কতদিন হইতে যে বিন্দু অনাহারে নিজেকে ক্ষয় করিয়া আনিতেছিল, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। বাপের বাড়ি আসিয়া জ্বর হইল। দ্বিতীয় দিন দুই-তিনবার মূর্চ্ছা হইল—তাহার শেষ মূর্চ্ছা আর ভাঙিতে চাহিল না। অনেক চেষ্টায়, অনেক পরে যখন তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তখন দুর্ব্বল নাড়ী একেবারে বসিয়া গিয়াছে। সংবাদ পাইয়া মাধব আসিল। সে স্বামীর পায়ের ধুলা মাথায় লইল, কিন্তু দাঁতে দাঁত চাপিয়া রহিল, শত অনুনয়েও এক ফোঁটা দুধ পর্য্যন্ত গিলিল না।

মাধব হতাশ হইয়া বলিল, আত্মহত্যা ক'চ্চ কেন?

বিন্দুর নিমীলিত চোখের কোণ বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমার সমস্ত অমূল্যর। শুধু হাজার-দুই টাকা নরেনকে দিয়ো, আর তাকে পড়িয়ো, সে আমার অমূল্যকে ভালবাসে।

মাধব দাঁত দিয়া জোর করিয়া নিজের ঠোঁট চাপিয়া কান্না থামাইল।

বিন্দু ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে আরও কাছে আনিয়া চুপি চুপি বলিল, সে ছাড়া আর কেউ যেন আমাকে আগুন না দেয়।

মাধব সে ধাক্কাও সামলাইতে কানে কানে বলিল, দেখবে কাউকে?

বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না থাক্।

বিন্দুর মা আর একবার ঔষধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিলেন, বিন্দু তেমনি দৃঢ়ভাবে দাঁত চাপিয়া রহিল।

মাধব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সে হবে না বিন্দু। আমাদের কথা শুনলে না,

কিন্তু যাঁর কথা ঠেলতে পারবে না, আমি তাঁকে আনতে চললুম। শুধু, এই কথাটি আমার রেখো, যেন ফিরে এসে দেখতে পাই, বলিয়া মাধব বাহিরে আসিয়া চোখ মুছিলেন। সে-রাত্রে বিন্দু শান্ত হইয়া ঘুমাইল।

তখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছিল; মাধব ঘরে ঢুকিয়া দীপ নিভাইয়া জানালা খুলিয়া দিতেই বিন্দু চোখ চাহিয়া সুমুখেই প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে স্বামীর মুখ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, কখন এলে?

এই আসচি। দাদা পাগলের মত ভয়ানক কান্নাকাটি কচ্চেন।

বিন্দু আস্তে আস্তে বলিল, তা জানি। তাঁর একটু পায়ের ধুলো এনেচ?

মাধব বলিলেন, তিনি বাইরের ঘরে তামাক খাচ্চেন। বৌঠান্ হাত-পা ধুচ্চেন, অমূল্য গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ওপরে শুইয়ে দিয়েচি, তুলে আনব?

বিন্দু কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া 'না, ঘুমোক' বলিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া শুইল।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া মাথায় হাত দিতেই সে চমকিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা মিনিট-খানেক নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিলেন, ওষুধ খাসনি কেন রে ছোটো, মরবি বলে?

বিন্দু জবাব দিল না। অন্নপূর্ণা তাহার কানের উপর মুখ রাখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, তা বুঝতে পাচ্ছিস্!

বিন্দু তেমনি চুপি চুপি উত্তর দিল, পাচ্ছি দিদি।

তবে মুখ ফেরা। তোর বঠ্ঠাকুর তোকে নিয়ে যাবার জন্যে নিজে এসেচেন। তোর ছেলে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েচে। কথা শোন্, মুখ ফেরা।

বিন্দু তথাপি মুখ ফিরাইল না। মাথা নাড়িয়া বলিল, না দিদি, আগে—

অন্নপূর্ণা বলিলেন, বলচি রে ছোটো, বলচি, শুধু তুই একবার বাড়ি ফিরে আয়? এই সময় যাদব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই অন্নপূর্ণা বিন্দুর মাথার উপর চাদর টানিয়া দিলেন। যাদব একমুহূর্ত্ত আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃতা তাঁহার অশেষ স্নেহের পাত্রী ছোটবধূর পানে চাহিয়া থাকিয়া অশ্রু নিরোধ করিয়া বলিলেন, বাড়ি চল মা, আমি নিতে এসেচি।

তাহার শুষ্ক শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া উপস্থিত সকলের চক্ষুই সজল হইয়া উঠিল। যাদব আর একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিলেন, আর একদিন যখন এতটুকুটি ছিলে মা, তখন আমিই এসে আমার সংসারের মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আবার আসতে হবে ভাবিনি; তা মা শোন, যখন এসেচি, তখন হয় সঙ্গে নিয়ে যাব, না হয় ও-মুখো আর হব না। জান ত মা, আমি মিথ্যে কথা বলিনে।

যাদব বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বিন্দু মুখ ফিরাইয়া বলিল, দাও দিদি, কি খেতে দেবে। আর অমূল্যকে আমার কাছে শুইয়ে দিয়ে তোমরা সবাই গিয়ে বিশ্রাম কর গে। আর ভয় নেই—আমি মরব না।

অনুপমার প্রেম

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিরহ

একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে অনুপমা নভেল পড়িয়া পড়িয়া মাথাটা একেবারে বিগড়াইয়া ফেলিয়াছে। সে মনে করিল, মনুষ্য-হৃদয়ে যত প্রেম, যত মাধুরী, যত শোভা, যত সৌন্দর্য্য, যত তৃষ্ণা আছে, সব খুঁটিয়া বাছিয়া একত্র করিয়া নিজের মস্তিষ্কের ভিতর জমা করিয়া ফেলিয়াছে; মনুষ্য-স্বভাব, মনুষ্য-চরিত্র তাহার নখদর্পণ হইয়াছে। জগতের শিখিবার পদার্থ আর তাহার কিছুই নাই; সব জানিয়া ফেলিয়াছে, সব শিখিয়া ফেলিয়াছে। সতীত্বের জ্যোতি সে যেমন দেখিতে পায়, প্রণয়ের মহিমা সে যেমন বুঝিতে পারে, জগতে আর যে কেউ তেমন সমঝদার আছে, অনুপমা তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না।

অনু ভাবিল, সে একটি মাধবীলতা, সম্প্রতি মুঞ্জরিয়া উঠিতেছে, এ অবস্থায় আশু সহকার-শাখা-বেষ্টিতা না হইলে, ফোট ফোট কুঁড়িগুলি কিছুতেই পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিবে না। তাই খুঁজিয়া-পাতিয়া একটি নবীনকান্তি-সহকার মনোনীত করিয়া লইল এবং দুই-চারি দিবসেই তাহাকে মন-প্রাণ জীবন-যৌবন সব দিয়া ফেলিল। মনে মনে মন দিবার বা নিবার সকলেরই সমান অধিকার, কিন্তু জড়াইয়া ধরিবার পূর্ব্বে সহকারটার মতামতেরও ঈষৎ প্রয়োজন হয়। এইখানেই মাধবীলতা কিছু বিপদে পড়িয়া গেল। নবীন নীরোদকান্তকে সে কেমন করিয়া জানাইবে যে, সে তাহার মাধবীলতা—স্ফুটনোম্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাকে আশ্রয় না দিলে এখনই কুঁড়ির ফুল লইয়া মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে প্রাণত্যাগ করিবে।

কিন্তু সহকার এত জানিতে পারিল না। না জানুক, অনুপমার প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অমৃতে গরল, সুখে দুঃখ, প্রণয়ের বিচ্ছেদ চিরপ্রসিদ্ধ। দুই-চারি দিবসে অনুপমা বিরহ-ব্যথায় জর্জ্জরিত-তনু হইয়া মনে মনে বলিল, স্বামিন্,

তুমি আমাকে লও বা না লও, ফিরিয়া চাহ বা না চাহ, আমি তোমার চিরদাসী। প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, কিন্তু তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না। এ-জন্মে না পাই, আর জন্মে নিশ্চয়ই পাইব; তখন দেখিবে, সতী-সাধ্বীর ক্ষুদ্র বাহুতে কত বল!

অনুপমা বড়লোকের মেয়ে, বাটীসংলগ্ন উদ্যানও আছে, মনোরম সরোবরও আছে; সেথা চাঁদও উঠে, পদ্মও ফুটে, কোকিলও গান গায়, মধুপও ঝঙ্কার করে, এইখানে সে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিরহ-ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। এলোচুল করিয়া অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া, গাত্রে ধূলা মাখিয়া, প্রেমের যোগিনী সাজিয়া সরসীর জলে কখনও মুখ দেখিতে লাগিল; কখনও নয়ন-জলে ভাসাইয়া গোলাপ-পুষ্প চুম্বন করিতে লাগিল; কখনও অঞ্চল পাতিয়া তরুতলে শয়ন করিয়া হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল; আহারে রুচি নাই, শয়নে ইচ্ছা নাই, সাজ-সজ্জায় বিষম বিরাগ, গল্প-গুজবে রীতিমত বিরক্তি—অনুপমা দিন দিন শুকাইতে লাগিল।

দেখিয়া অনুর জননী মনে মনে প্রমাদ গনিলেন—এক বই মেয়ে নয়, তার আবার এ কি হইল? জিজ্ঞাসা করিলে সে কি যে বলে, কেহ বুঝিতে পারে না, ঠোঁটের কথা ঠোঁটেই মিলাইয়া যায়। অনুর জননী আর একদিবস জগবন্ধুবাবুকে বলিলেন, ওগো, একবার কি চেয়ে দেখবে না? তোমার একটি বই মেয়ে নয়, সে যে বিনি চিকিৎসায় মরে যায়।

জগবন্ধুবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কি হ'ল ওর?

তা জানিনে। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, অসুখ-বিসুখ কিছুই নাই!

তবে এমন হয়ে যায় কেন?

জগবন্ধুবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তা কেমন করে জানব?

তবে মেয়ে আমার মরে যাক?

এ ত বড় মুস্কিলের কথা, জ্বর নেই, বালাই নেই, শুধু শুধু যদি মরে যায় ত আমি কি করে ধরে রাখব!

গৃহিণী শুষ্কমুখে বড়বধূমাতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, বৌমা, অনু আমার এমন করে বেড়ায় কেন?

কেমন করে জানব মা?

তোমাদের কাছে কি কিছু বলে না?

কিছু না।

গৃহিণী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন—তবে কি হবে! না খেয়ে এমন করে সমস্তদিন বাগানে ঘুরে বেড়ালে ক' দিন আর বাঁচবে? তোরা বাছা যা হোক একটা বিহিত করে দে—না হলে বাগানের পুকুরে একদিন ডুবে মরব।

বড়বৌ কিছুক্ষণ ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিল, দেখে-শুনে একটা বিয়ে দাও; সংসারের ভার পড়লে আপনি সব সেরে যাবে।

বেশ কথা, তবে আজই এ-কথা আমি কর্তাকে জানাব।

কর্তা এ কথা শুনিয়া অল্প হাসিয়া বলিলেন, কলিকাল! দাও—বিয়ে দিয়েই দেখ, যদি ভাল হয়।

পরদিন ঘটক আসিল। অনুপমা বড়লোকের মেয়ে, তাহাতে রূপবতী, পাত্রের জন্য ভাবিতে হইল না। এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘটক ঠাকুর পাত্র স্থির করিয়া জগবন্ধুবাবুকে সংবাদ দিলেন। কর্তা এ-কথা গৃহিণীকে জানাইলেন; গৃহিণী বড়বৌকে জানাইলেন; ক্রমে অনুপমাও শুনিল।

দুই-একদিনের পরে, একদিন দ্বিপ্রহরের সময়ে সকলে মিলিয়া অনুপমার বিবাহের গল্প করিতেছিল, এমন সময়ে সে এলোচুলে, আলু-থালু বসনে একটা শুষ্ক গোলাপফুল হাতে করিয়া ছবিটির মত আসিয়া দাঁড়াইল। অনুর জননী কন্যাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, মা যেন আমার যোগিনী সেজেচে?

বড়বৌঠাকরুণও একটু হাসিয়া বলিল, বিয়ে হলে কোথায় সব চলে যাবে। দুটো-একটা ছেলে-মেয়ে হলে ত কথাই নেই।

অনুপমা চিত্রার্পিতার ন্যায় সকল কথা শুনিতে লাগিল। বৌ আবার বলিল, মা, ঠাকুরঝির বিয়ের দিন কবে ঠিক হ'ল?

দিন এখ'নো কিছু ঠিক করা হয়নি।

ঠাকুরজামাই কি পড়েন?

এইবার বি. এ. দেবেন।

তবে ত বেশ ভাল বর। তাহার পর একটু হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিল, দেখতে কিন্তু খুব ভাল না হলে ঠাকুরঝির আমার পছন্দ হবে না।

কেন পছন্দ হবে না। জামাই বেশ দেখতে।

এইবার অনুপমা একটু গ্রীবা বক্র করিল ; ঈষৎ হেলিয়া পদনখ দিয়া মৃত্তিকা খনন করিবার মত করিয়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিল, বিবাহ আমি করব না।

জননী ভাল শুনিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মা ?

বড়বৌ অনুপমার কথা শুনিতে পাইয়াছিল। খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, ঠাকুরঝি বলচে, ও কখনও বিয়ে করবে না।

বিয়ে করবে না ?

না।

না করুক গে ! অনুর জননী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন !

গৃহিণী চলিয়া যাইলে বড়বধূ বলিল, তুই বিয়ে করবিনে ?

অনুপমা পূর্ব্বমত গম্ভীরমুখে বলিল, কিছুতেই না। যাকে তাকে গচিয়ে দেওয়ার নামই বিবাহ নয়। মনের মিল না হলে বিবাহ করাই ভুল।

বড়বৌ বিস্মিত হইয়া অনুর মুখপানে চাহিয়া বলিল, গচিয়ে দেওয়া আবার কি লো ? গচিয়ে দেবে না ত কি মেয়েমানুষে দেখে-শুনে পছন্দ করে বিয়ে করবে ?

নিশ্চয় !

তবে তোর মতে আমার বিয়েটাও ভুল হয়ে গেছে ? বিয়ের আগে ত তোর দাদার নাম পর্য্যন্ত আমি শুনিনি।

সবাই কি তোমার মত ?

বৌ আর একবার হাসিয়া বলিল, তোর কি তবে মনের মানুষ কেউ জুটেচে না-কি ?

অনুপমা বধূঠাকুরাণীর সহাস্য বিদ্রূপে মুখখানি পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ গম্ভীর করিয়া বলিল, বৌ, ঠাট্টা করচ না-কি ? এখন কি বিদ্রূপের সময় ?

কেন লো—হয়েচে কি ?

হয়েচে কি ! তবে শোন—

অনুপমার মনে হইল, তাহার সম্মুখে তাহার স্বামীকে বধ করা হইতেছে—সহসা কতলু খাঁর দুর্গে বধমঞ্চ-সম্মুখে বিমলা ও বীরেন্দ্র সিংহের দৃশ্য তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল। অনুপমা ভাবিল, তাহারা যাহা পারে, সে কি তাহা পারে না ? সতী স্ত্রী জগতে কাহাকে ভয় করে ? দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু অনৈসর্গিক প্রভায় ধক্

ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল ; দেখিতে দেখিতে অঞ্চলখানা কোমরে জড়াইয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ফেলিল। ব্যাপার দেখিয়া বড়বধূ তিন হাত পিছাইয়া গেল। নিমেষে অনুপমা পার্শ্ববর্ত্তী খাটের খুরো বেশ করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া উর্দ্ধনেত্রে চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, প্রভু, স্বামী, প্রাণনাথ, জগৎসমীপে আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব, তুমিই আমার প্রাণনাথ ; প্রভু ; তুমি আমার, আমি তোমার ! এ খাটের খুরো নয়, এ তোমার পদযুগল—আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করে তোমাকে পতিত্বে বরণ করেচি, এখনও তোমার চরণ স্পর্শ করে বলচি—এ জগতে তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমাকে স্পর্শও করতে পারবে না ; কার সাধ্য প্রাণ থাকতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে ! মা গো, জগৎজননী—

বড়বধূ চীৎকার করিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল—ও গো দেখ গে, ঠাকুরঝি কেমনধারা কচ্ছে !

দেখিতে দেখিতে গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন। বৌঠাকরুণের চীৎকার বাহির পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল—কি হয়েচে—হ'ল কি ? কর্ত্তা ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রবাবু ছুটিয়া আসিলেন। কর্ত্তা-গিন্নিতে, পুত্র-পুত্রবধূতে, দাস-দাসীতে মুহূর্ত্তে ঘরে ভিড় হইয়া গেল। অনুপমা মূর্চ্ছিত হইয়া খাটের কাছে পড়িয়া আছে। গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন, অনুর আমার কি হ'লো ? ডাক্তার ডাক্ ! জল আন্ ! বাতাস কর্ ! ইত্যাদি চীৎকারে পাড়ার অর্দ্ধেক প্রতিবাসী বাড়িতে জমিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অনুপমা ধীরে ধীরে বলিল, আমি কোথায় ?

তাহার জননী মুখের নিকট মুখ আনিয়া সস্নেহে বলিলেন, কেন মা, তুমি যে আমার কোলে শুয়ে আছ।

অনুপমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু মৃদু কহিল, ওঃ, তোমার কোলে ! ভাবছিলাম আমি আর কোথাও কোন স্বপ্নরাজ্যে তাঁর সঙ্গে ভেসে যাচ্ছি। দরবিগলিত অশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। জননী তাহা মুছাইয়া কাতর হইয়া বলিলেন, কেন কাঁদচ মা ? কার কথা বলচ ?

অনুপমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইয়া রহিল।

বড়বধূ চন্দ্রবাবুকে একপাশে ডাকিয়া বলিল, সবাইকে যেতে বল, আর কোনও ভয় নেই ; ঠাকুরঝি ভাল হয়েচে।

ক্রমশঃ সকলে প্রস্থান করিলে রাত্রে বড়বৌ অনুপমার কাছে বসিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, কার সঙ্গে বিয়ে হলে তুই সুখী হ'স ?

অনুপমা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিল, সুখ-দুঃখ আমার কিছুই নেই; সেই আমার স্বামী—

তা ত বুঝি—কিন্তু কে সে?

সুরেশ! সুরেশই আমার—

সুরেশ? রাখাল মজুমদারের ছেলে?

হাঁ, সে-ই।

রাত্রে গৃহিণী এ কথা শুনিলেন। পরদিন অমনি মজুমদারের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথার পর সুরেশের জননীকে বলিলেন, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দাও।

সুরেশের জননী হাসিয়া বলিলেন, মন্দ কি!

ভাল-মন্দর কথা নয়, দিতেই হবে।

তবে সুরেশকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসি। সে বাড়িতেই আছে; তার মত হলে কর্ত্তার অমত হবে না।

সুরেশ বাড়ি থাকিয়া তখন বি. এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল—এক মুহূর্ত্ত তাহার এক বৎসর। তাহার মা বিবাহের কথা বলিলে, সে কানেই তুলিল না। গৃহিণী আবার বলিলেন, সুরো, তোকে বিয়ে করতে হবে।

সুরেশ মুখ তুলিয়া বলিল, তা ত হবেই, কিন্তু এখন কেন? পড়ার সময় ও-সব কথা ভাল লাগে না।

গৃহিণী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, না না—পড়ার সময় কেন? এগজামিন হয়ে গেলে বিয়ে হবে।

কোথায়?

এই গাঁয়ে জগবন্ধুবাবুর মেয়ের সঙ্গে।

কি? চন্দ্রর বোনের সঙ্গে? যেটাকে খুকী বলে ডাকত?

খুকী বলে ডাকবে কেন—তার নাম অনুপমা।

সুরেশ অল্প হাসিয়া বলিল, হাঁ অনুপমা! দূর তা—দূর সেটা ভারি কুৎসিত।

কুচ্ছিত হবে কেন? সে বেশ দেখতে।

তা হোক বেশ দেখতে; এক জায়গায় শ্বশুর-বাড়ি, বাপের বাড়ি আমার ভাল লাগে না।

কেন, তাতে আর দোষ কি?

দোষের কথায় কাজ নেই, তুমি এখন যাও মা, আমি একটু পড়ি; কিছুই এখনো হয়নি।

সুরেশের জননী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, সুরো ত এক গাঁয়ে কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না।

কেন?

তা ত জানিনে।

অনুর জননী মজুমদার-গৃহিণীর হাত ধরিয়া কাতরভাবে বলিলেন, তা হবে না ভাই। এ বিয়ে তোমাকে দিতে হবে।

ছেলের অমত, আমি কি করব বল?

না হলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

তবে আজ থাক্। কাল আর একবার বুঝিয়ে দেখব—যদি মত করতে পারি।

অনুর জননী বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া জগবন্ধুকে বলিলেন, ওদের সুরেশের সঙ্গে যাতে অনুর আমার বিয়ে হয়, তা কর।

কেন বল দেখি? রায়গ্রামে ত একরকম সব ঠিক হয়েচে। সে সম্বন্ধ আবার ভেঙ্গে কি হবে?

কারণ আছে।

কি কারণ?

কারণ কিছু নয়; কিন্তু সুরেশের মত অমন রূপে-গুণে ছেলে কি পাওয়া যাবে? আর ও আমার একটিমাত্র মেয়ে, তার দূরে বিয়ে দেব না। সুরেশের সঙ্গে হলে যখন খুশি দেখতে পাব।

আচ্ছা, চেষ্টা করব।

চেষ্টা নয়—নিশ্চিত দিতে হবে।

কর্তা নথ নাড়ার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তাই হবে গো।

সন্ধ্যার পর কর্তা মজুমদার-বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, বিয়ে হবে না।

সে কি কথা।

কি করব বল? ওরা না দিলে ত আমি জোর করে ওদের বাড়িতে মেয়ে ফেলে দিয়ে আসতে পারিনে।

দেবে না কেন?

এক গাঁয়ে হয়—ওদের মত নয়।

গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, আমার কপালের দোষ! পরদিন তিনি পুনরায় সুরেশের জননীর নিকট আসিয়া বলিলেন, বিয়ে দে!

আমার ত ইচ্ছা আছে, কিন্তু ছেলের মত হয় কৈ?

আমি লুকিয়ে সুরেশকে আরো পাঁচ হাজার টাকা দেব।

টাকার লোভ বড় লোভ। সুরেশের জননী এ কথা সুরেশের পিতাকে জানাইলেন। কর্ত্তা সুরেশকে ডাকিয়া বলিলেন, সুরেশ, তোমাকে এ বিবাহ করতেই হবে।

কেন?

কেন আবার কি? এ বিবাহে তোমার গর্ভধারিণীর মত, আমারও মত; সঙ্গে সঙ্গে একটু কারণও হয়ে পড়েচে।

সুরেশ নতমুখে বলিল, এখন পড়াশুনার সময়—পরীক্ষার ক্ষতি হবে।

তা আমি জানি বাপু, পড়াশুনার ক্ষতি করে তোমাকে বলচি না। পরীক্ষা শেষ হলে বিবাহ ক'রো।

যে আজ্ঞে!

অনুর জননীর আনন্দের সীমা নাই। এ-কথা তিনি কর্ত্তাকে বলিলেন। দাস-দাসী সকলকেই মনের আনন্দে এ-কথা জানাইয়া দিলেন।

বড়বৌ অনুপমাকে ডাকিয়া বলিল, ওলো! বর যে ধরা দিয়েচে।

অনু সলজ্জে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তা আমি জানতাম।

কেমন করে জানলি? চিঠিপত্র চলত নাকি?

প্রেম অন্তর্যামী! আমাদের চিঠিপত্র অন্তরে চলত।

ধন্যি মেয়ে তুই!

অনুপমা চলিয়া যাইলে বড়বধূঠাকুরাণী মৃদু মৃদু বলিল, পাকামি শুনলে গা জ্বালা করে! আমি তিন ছেলের মা—উনি আজ আমাকে প্রেম শেখাতে এলেন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভালবাসার ফল

দুর্লভ বসু বিস্তর অর্থ রাখিয়া পরলোকগমন করিলে তাঁহার বিংশতিবর্ষীয় একমাত্র পুত্র ললিতমোহন শ্রাদ্ধ-শান্তি সমাপ্তি করিয়া একদিন স্কুলে যাইয়া মাস্টারকে বলিল, মাস্টারমশায়, আমার নামটা কেটে দিন!

কেন বাপু?

মিথ্যে পড়ে-শুনে কি হবে? যেজন্য পড়াশুনা, তা আমার বিস্তর আছে। বাবা আমার জন্যে অনেক পড়ে রেখে গিয়েচেন।

মাস্টার চক্ষু টিপিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, তবে আর ভাবনা কি? এইবার চরে খাও গে। এইখানেই ললিতমোহনের বিদ্যাভাস ইতি হইল।

ললিতমোহনের কাঁচা বয়স, তাহাতে বিস্তর অর্থ, কাজেই স্কুল ছাড়িবামাত্র বিস্তর বন্ধুও জুটিয়া গেল। ক্রমে তামাক, সিদ্ধি, গাঁজা, মদ, গায়ক, গায়িকা ইত্যাদি একটির পর একটি করিয়া ললিতমোহনের বৈঠকখানা পূর্ণ করিল। এদিকে পিতৃসঞ্চিত অর্থরাশিও জলবৎ ঢেউ খেলিয়া তর তর করিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। তাহার জননী কাঁদিয়া কাটিয়া অনেক বুঝাইলেন, অনেক বলিলেন, কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। একদিন ঘূর্ণিতলোচনে মাতৃসন্নিধানে আসিয়া বলিল, মা, এখনি আমাকে পঞ্চাশ টাকা দাও।

মা বলিলেন, একটি পয়সাও আমার নেই।

ললিতমোহন দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া একটা কুড়ুল লইয়া জননীর হাতবাক্স চিরিয়া ফেলিয়া পঞ্চাশ টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। তিনি দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।

পরদিন পুত্রের হস্তে লোহার সিন্ধুকের চাবি দিয়া বলিলেন, বাবা এই লোহার সিন্ধুকের চাবি নাও। তোমার বাপের টাকা যেমন ইচ্ছা খরচ করো, আর আমি বাধা দিতে আসব না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমি চলে গেলে তোমার চোখ ফোটে।

ললিত বিস্মিত হইয়া বলিল, কোথায় যাবে ?

তা জানিনে। আত্মঘাতী হলে কোথায় যেতে হয় তা কেউ জানে না, তবে শুনেচি, সদগতি হয় না। তা কি করব বল, আমার যেমন কপাল !

আত্মঘাতী হবে ?

না হলে আর উপায় কি ? তোমাকে পেটে ধরে আমার সব সুখই হল। এখন নিত্যি নিত্যি তোমার লাথি-ঝাঁটা খাওয়ার চেয়ে যমদূতের আগুনকুণ্ড ভাল।

ললিতমোহন জননীকে চিনিত। সে বিলক্ষণ জানিত যে, তাহার জননী মিথ্যা ভয় দেখাইবার লোক নহেন; তখন কাঁদিয়া ভূমে লুটাইয়া পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, মা, তুমি আমাকে মাপ কর, এমন কাজ আর কখন করব না। তুমি থাক, তুমি যেও না।

জননী রুক্ষভাবে বলিলেন, তাও কি হয় ? তোমার বন্ধু-বান্ধব—তারা সব যাবে কোথায় ?

আমি কাউকে চাইনে। আমি টাকা-কড়ি বন্ধু-বান্ধব কিছুই চাইনে, শুধু তুমি থাক।

তোমার কথায় বিশ্বাস কি ?

কেন মা, আমি তোমার মন্দ সন্তান, তা বলে অবিশ্বাসের কাজ কি কখনও করেচি ? তুমি এখন থেকে ইচ্ছা-সুখে যা দেবে, তার অধিক এক পয়সাও চাব না।

ইচ্ছা-সুখে তোমাকে এক পয়সাও দিতে ইচ্ছা হয় না—কেন না, এক বৎসর দেড় বৎসরের মধ্যে তুমি যত টাকা উড়িয়েচ, তার অর্দ্ধেকও কখনও তোমার জীবনে উপার্জ্জন করতে পারবে না।

তুমি আমাকে কিছুই দিও না।

জননী কোমল হইলেন—না, অতটা তোমার সবে না, আমিও তা ইচ্ছে করিনে। মাসে একশ টাকা পেলে তোমার চলবে কি ?

স্বচ্ছন্দে।

তবে তাই হোক।

দুই-একদিনের মধ্যেই তার বন্ধু-বান্ধবেরা একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল। ললিতমোহন দুই-একজনের বাটীতে ডাকিতে গেল; কেহ বলিল, কাল যাব; কেহ বলিল, আজ কাজ আছে। ফলতঃ কেহই আর আসিল না। এখন সে সম্পূর্ণ একা। একা মদ খায়, একা ঘুরিয়া বেড়ায়। একবার মনে করিল, আর মদ খাইবে না; কিন্তু সময় কিরূপে কাটিবে? কাজেই মদ ছাড়া হইল না। একটা পথে সে প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইত; এ পথটা জগবন্ধুবাবুর বাগানের পার্শ্ব দিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন বলিয়া মদ খাইয়া এখানেই বেড়াইবার অধিক সুবিধা হইত। মাতাল বলিয়া তাহার গ্রামময় অখ্যাতি; কাহারও বাটীতে যাওয়া ভাল দেখায় না—কাজেই মদ খাইয়া নিজের সঙ্গে নিজে বেড়াইয়া বেড়াইত।

আজকাল তাহার আর একজন সঙ্গী জুটিয়াছে—সে অনুপমা। আসিতে যাইতে সে প্রায়ই দেখে, তাহার মত অনুপমাও বাগানের ভিতর ঘুরিয়া বেড়ায়। অনুপমাকে সে বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজকাল তাহাতে যেন একটু নূতনত্ব দেখিতে পায়। জগবন্ধুবাবুর বাগানের প্রাচীরের এক অংশ ভগ্ন ছিল, সেইখানে একটা গাছের পাশে দাঁড়াইয়া দেখে অনুপমা উদ্যানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও বা তরুতলে বসিয়া মালা গাঁথিতেছে, কখনও বা ফুল তুলিতেছে, এক এক সময় বা সরসীর জলে পদদ্বয় ডুবাইয়া বালিকা-সুলভ ক্রীড়া করিতেছে। দেখিতে তাহার বেশ লাগে; ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত চুলগুলি, অযত্নরক্ষিত দেহলতা, আলু-থালু বসন-ভূষণ ও সকলের উপর মুখখানি তাহার মদের চোখে একটি পদ্মফুলের মত বোধ হইত। মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, জগতে সে অনুপমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে। রাত্রি হইলে বাড়িতে গিয়া শয়ন করে, যতক্ষণ নিদ্রা না হয়, ততক্ষণ অনুপমার মুখই মনে পড়ে। স্বপ্নেও কখনও কখনও তাহার অনিন্দ্যসুন্দর বদনমণ্ডল জাগিয়া উঠে।

এমনই করিয়া কতদিন যায়, জগবন্ধুবাবুর উদ্যানের সেই ভগ্ন অংশটিতে বৈকাল হইতে বসিয়া থাকা আজকাল তাহার নিত্যকর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বালক নহে, অল্প দিনেই বুঝিতে পারিল যে, অনুপমাকে বাস্তবিকই অতিশয় অধিক রকম ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু এরূপ ভালবাসায় লাভ নাই—সে জানিত, সে মাতাল, শত চেষ্টাতেও তাহাকে পাওয়া সম্ভব নয়, তবে আর এমন করিয়া মন খারাপ করিয়া লাভ কি? কাল হইতে আর আসিবে না। কিন্তু থাকিতে পারিত না—সূর্য্য অস্তগত হইলে সে মদটুকু খাইয়া সেই ভাঙ্গা পাঁচীলটির উপর আসিয়া বসিত, তবে

ভিতরে একটা কথা আছে—কাহাকেও ভালবাসিলে মনে হয়, সেও বুঝি আমাকে ভালবাসে, আমাকে কেন বাসিবে না? অবশ্য এ-কথা প্রতিপন্ন করা যায় না।

একদিন ললিতমোহন প্রাচীরে উঠিয়াছে। এমন সময় চন্দ্রবাবুর চোখে পড়িল।

চন্দ্রবাবু দারোয়ানকে হাঁকিয়া বলিলেন,—কো পাকড়ো।

দারোয়ান প্রথমে বুঝিতে পারিল না, কাহাকে ধরিতে হইবে, পরে যখন বুঝিল, ললিতবাবুকে তখন সেলাম করিয়া তিন হাত পিছাইয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রবাবু পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন,—কো পাকড়কে থানামে দেও।

দারোয়ান আধা বাঙলা আধা হিন্দীতে বলিল, হামি নেহি পারবে বাবু।

ললিতমোহন ততক্ষণে ধীরে ধীরে প্রাচীর টপকাইয়া প্রস্থান করিল। সে চলিয়া যাইলে চন্দ্রবাবু বলিলেন, কাহে নেহি পাকড়া?

দারোয়ান চুপ করিয়া রহিল। একজন মালী ললিতকে বিলক্ষণ চিনিত, সে বলিল, ও বেটা ভোজপুরীর সাধ্য কি ললিতবাবুকে ধরে? ওর মত চারটে দারোয়ানের মাথা ওর এক ঘুষিতে ভেঙে যায়।

দারোয়ানও তাহা অস্বীকার করিল না, বলিল, বাবু, নোকরি করনে আয়া, না জান দেনে আয়া?

চন্দ্রবাবু কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি ললিতের উপর পূর্ব্ব হইতেই বিলক্ষণ চটা ছিলেন, এখন সময় পাইয়া, সাক্ষী জুটাইয়া অনধিকার-প্রবেশ এবং আরও কত কি অপরাধে আদালতে নালিশ করিলেন। জগবন্ধুবাবু ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই এই মকদ্দমা করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু চন্দ্রনাথ কিছুতেই শুনিলেন না। বিশেষ মর্ম্মপীড়িতা অনুপমা জিদ করিয়া বলিল যে, পাপীকে শাস্তি না দিলে তাহার মন কিছুতেই সুস্থির হইবে না।

ইন্‌স্পেক্টর বাটীতে আসিয়া অনুপমার এজাহার লইল। অনুপমা সমস্তই ঠিকঠাক বলিল। শেষে এমন দাঁড়াইল যে, ললিতের জননী বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াও পুত্রকে কিছুতেই বাঁচাইতে পারিলেন না। তিন বৎসর ললিতমোহনের সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়া গেল।

বি. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। সুরেশচন্দ্র মজুমদার একেবারে প্রথম হইয়াছে। গ্রামময় সুখ্যাতির একটা রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে। অনুপমার জননীর আনন্দের সীমা নাই। আনন্দে সুরেশের জননীকে গিয়া বলিলেন, নিজের কথা নিজে বলতে নেই, কিন্তু দেখ দেখি আমার মেয়ের পয়!

সুরেশের মা সহাস্যে বলিলেন, তা ত দেখছি।

একবার বিয়ে হোক, তারপর দেখিস্—তোর ছেলে রাজা হবে। অনু যখন জন্মায় তখন একজন গণৎকার গুনে বলেছিল যে, এ মেয়ে রাণী হবে। অত সুখে কেউ কখনও থাকে নি, থাকবে না; যত সুখ তোমার মেয়ের হবে।

কে বলেছিল?

একজন সন্ন্যাসী।

কিন্তু তুমি তোমার জামাইকে একখানা বাড়ি কিনে দিও!

তা দেব না? চন্দ্রকে আমি পেটের ছেলেই জানি, কিন্তু অনুরও ত কর্তার অর্দ্ধেক বিষয় পাওয়া উচিত, আমি বেঁচে থাকলে তা পাবেও।

তাই হোক, ওরা রাজরাণী হয়ে সুখে থাক—আমরা যেন দেখে মরি।

দুইদিন পরে রাখাল মজুমদার পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, এই বৈশাখে তোমার বিবাহের দিন স্থির করলাম।

এখন বিবাহ হয়, আমার একেবারে ইচ্ছে নয়।

কেন?

আমি Gilchrist Scholarship পেয়েচি, তাতে আমি ইচ্ছা করলে বিলাতে গিয়ে পড়তে পারি।

তুমি বিলাতে যাবে?

ইচ্ছা আছে।

পড়ে পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে। অমন কথা আর মুখে এনো না।

বিনা পয়সায় যখন এ সুবিধা পেয়েচি, তখন দোষ কি?

রাখালবাবু এ-কথায় একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন—নাস্তিক বেটা! দোষ কি? পরের পয়সায় যদি বিষ পাওয়া যায় ত কি খেতে হবে?

সে-কথায় এ-কথায় অনেক প্রভেদ।

প্রভেদ আর কোথায়? একদিকে জাত খোওয়ান, ম্লেচ্ছ হওয়া আর অপরদিকে বিষ-ভোজন, ঠিক এক নয় কি? চুল চুল মিলে গেল না কি?

সুরেশ আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া নিরুত্তরে প্রস্থান করিল। সে চলিয়া যাইলে রাখালবাবু আপনা-আপনি হাসিয়া বলিলেন, বেটা পাতা-দুই ইংরেজী পড়ে আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে আসে। কেমন কথাটা বললাম—পরের পয়সায় বিষ পেলে কি খেতে হবে? বাছাধন আর দ্বিতীয় কথাটি বলতে পারলে না। এ অকাট্য যুক্তি কি ও কাটাতে পারে!

বিবাহের সমস্ত পাকা-রকম স্থির হইয়া যাইলে বড়বধূ একদিন অনুপমাকে বলিলেন, কি লো! বরের সুখ্যাতি যে গ্রামে ধরে না।

অনুপমা মৃদু হাসিয়া বলিল, যার সতী-সাধ্বী স্ত্রী, জগতে তার সকল সুখের পথই উন্মুক্ত থাকে।

তবু ত এখনো বিয়ে হয়নি লো!

বিবাহ আমাদের অনেকদিন হয়েচে, জগৎ জানে না বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বহুদিন আমাদের পূর্ণ মিলন হয়ে গিয়েচে।

বড়বধূ অল্প হাসিল, ওষ্ঠ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া একটু থামিয়া বলিলেন, এ-কথা আর কোথাও বলিস্‌নে, আমরা বুড়ো মাগী, আমাদের ত বলা দূরে থাক—এমনধারা শুনলেও লজ্জা করে, সব কথায় তুই যেন থিয়েটারে অ্যাক্ট করতে থাকিস্‌। এমন করলে লোকে পাগল বলবে যে!

আমি প্রেমে পাগল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ

আজ ৫ই বৈশাখ। অনুপমার বিবাহ-উৎসবে আজ গ্রামটা তোলপাড় হইতেছে। জগবন্ধুবাবুর বাটীতে আজ ভিড় ধরে না। কত লোক যাইতেছে, কত লোক হাঁকাহাঁকি করিতেছে। কত খাওয়ান-দাওয়ানর ঘটা, কত বাজনা-বাদ্যের ধুম। যত সন্ধ্যা হইয়া আসিতে লাগিল, ধুমধাম তত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, সন্ধ্যা-লগ্নেই বিবাহ, এখনই বর আসিবে—সকলেই উৎসাহে আগ্রহে হইয়া আছে।

কিন্তু বর কোথায়? রাখালবাবুর বাটীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই কলরব বাধিয়া উঠিয়াছে, সুরেশ গেল কোথায়? এখানে খোঁজ, ওখানে খোঁজ, এদিকে দেখ, ওদিকে দেখ। কিন্তু কেহই সুরেশকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছে না। কুসংবাদ পঁহুছিতে বিলম্ব হয় না, বজ্রাগ্নির মত এ-কথা জগবন্ধুবাবুর বাটীতে উড়িয়া আসিয়া পড়িল। বাড়িশুদ্ধ লোক সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; সে কি কথা!

আটটার সময় বিবাহের লগ্ন, কিন্তু নয়টা বাজিতে চলিল, কোথাও বরের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। জগবন্ধুবাবু মাথা চাপড়াইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গৃহিণী কাঁদিয়া আসিয়া তাঁহার নিকটে পড়িলেন, কি হবে গো!

কর্ত্তার তখন অর্দ্ধক্ষিপ্তাবস্থা। তিনি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, হবে আমার শ্রাদ্ধ—আর কি হবে? এই হতভাগা মেয়ের জন্য বৃদ্ধ বয়সে আমার মান গেল, যশ গেল, জাতি গেল, এখন একঘরে হয়ে থাকতে হবে। কেন মরতে বুড়ো বয়সে তোমাকে আবার বিয়ে করেছিলাম, তোমারই জন্য আজ এই অপমান। শাস্ত্রেই আছে, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। তোমার কথা শুনে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেচি। যাও, তোমার মেয়ে নিয়ে আমার সাম্‌নে থেকে দূর হয়ে যাও।

আহা! গৃহিণীর দুঃখের কথা বলিয়া কাজ নাই। এ-দিকে এই, আর ও-দিকে আর এক বিপদ। অনুপমা ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছে।

এ-দিকে রাত্রি বাড়িয়া চলিতেছে—দশটা, এগারোটা, বারোটা করিয়া ক্রমশঃ একটা দুইটা বাজিয়া গেল; কিন্তু কোথাও সুরেশের সন্ধান হইল না।

সুরেশকে পাওয়া যাক আর না যাক, অনুপমার বিবাহ কিন্তু দিতেই হইবে। কেন না আজ রাত্রে বিবাহ না হইলে জগবন্ধুবাবুর জাতি যাইবে।

রাত্রি আন্দাজ তিনটার সময় পঞ্চাশদ্বর্ষীয় কাসরোগী রামদুলাল দত্তকে পাড়ার পাঁচজন—জগবন্ধুবাবুর হিতৈষী বন্ধু, বরবেশে খাড়া করিয়া লইয়া আসিল।

অনুপমা যখন শুনিল, এমনি করিয়া তাহার মাথা খাইবার উদ্যোগ হইতেছে, তখন মূর্চ্ছা ছাড়িয়া দিয়া জননীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল—ও মা! আমায় রক্ষা কর, এমন করে আমার গলায় ছুরি দিও না। এ বিয়ে দিলে আমি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হব।

মা কাঁদিয়া বলিলেন, আমি কি করব মা!

মুখে যাহাই বলুন না, কন্যার দুঃখে ও আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছিল, তাই কাঁদিয়া কাটিয়া আবার স্বামীর কাছে আসিলেন—ওগো, একবার শেষটা ভেবে দেখ, এ বিয়ে দিলে মেয়ে আমার বিষ খাবে।

কর্ত্তা কোন কথা না কহিয়া একেবারে অনুপমার নিকটে আসিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, ওঠো, ভোর হয়ে যায়।

কোথায় যাব বাবা?

এখনই সম্প্রদান করব।

অনুপমা কাঁদিয়া ফেলিল—বাবা, আমাকে মেরে ফেল, আমি বিষ খাব।

যা ইচ্ছে হয় কাল খেয়ো মা, আজ বিয়ে দিয়ে আমার জাত বাঁচাই, তারপর যেমন খুশি করো, বিষ খেও, জলে ডুবে ম'রো, আমি একবারও বারণ করব না।

কি নিদারুণ কথা! এইবার যথার্থই অনুপমার ভিতর পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল —বাবা! আমায় রক্ষা কর।

কত কাতরোক্তি, কত ক্রন্দন, কিন্তু কোন কথাই খাটিল না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জগবন্ধুবাবু সেই রাত্রেই বৃদ্ধ রামদুলাল দত্তের হস্তে অনুপমাকে সম্প্রদান করিলেন।

বহুকাল বিপত্নীক বৃদ্ধ রামদুলালের আপনার বলিতে সংসারে আর কেহ নাই। দুইখানি পুরাতন ইষ্টকনির্ম্মিত ঘর, একটু শাক-সব্জীর বাগান—ইহাই দত্তজীর সাংসারিক সম্পত্তি। বহু ক্লেশে তাঁহার দিন গুজরান হয়। বিবাহ করিয়া পরদিন অনুপমাকে বাড়ি আনিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অনেক খাদ্যদ্রব্য আসিল, অনেক দাস-দাসী আসিল—কোনও ক্লেশ নাই, ছয়-সাতদিন তাঁহার পরম সুখে অতিবাহিত হইল। বড়লোক শ্বশুর—আর তাঁহার কোনও ভাবনা নাই; বিবাহ করিয়া কপাল ফিরিয়াছে! কিন্তু অনুপমার স্বতন্ত্র কথা; আর দিন-দুই থাকিয়া সে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া দাস-দাসীরাও চক্ষু মুছিল।

বাড়ি গিয়া প্রাণত্যাগ করিব, এ পরামর্শ অনুপমা স্বামী-ভবন হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। এইবার যথার্থ মরিবার বাসনা হইয়াছে। অনেক রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে সে নিঃশব্দে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া, বাগানের পুষ্করিণীর সোপানে আসিয়া বসিল। আজ তাহাকে মরিতে হইবে, মুখের মরা নয়, কাজের মরা মরিতে হইবে। অনুপমার মনে পড়িল, আর একদিন সে এইখানে মরিতে গিয়াছিল, সেও অধিকদিন নয়, কিন্তু তখন মরিতে পারে নাই; কেন না, একজন ধরিয়া ফেলিয়াছে। আজ সে কোথায়? জেলখানায় কয়েদ খাটিতেছে। কোন্ অপরাধে? শুধু বলিতে আসিয়াছিল যে, সে তাহাকে ভালবাসে। কে জেলে দিল? চন্দ্রবাবু! কেন? তাহাকে দেখিতে পারিত না বলিয়া, সে মাতাল বলিয়া, সে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া। কিন্তু অনুপমা কি বাঁচাইতে পারিত না? পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই, বরং জেলে দিতে সহায়তাই করিয়াছে। আজ তাহার মনে হইল, ললিত কি যথার্থ-ই ভালবাসিত? হয়ত বাসিত, হয়ত বাসিত না। না বাসুক, কিন্তু তাহাকে দণ্ডিত করিয়া তাহার কি ইষ্ট-সিদ্ধ হইয়াছে? জেলে পাথর ভাঙ্গিতেছে, ঘানি টানিতেছে, আরও কত কি নীচ কর্ম্ম করিতে হইতেছে; ইহাতে হয়ত চন্দ্রবাবুর

লাভ হইয়াছে, কিন্তু তাহার কি? সে দণ্ডিত না হইলে কি তাহাকে পাইতে পারিত? যিনি এখন মনের আনন্দে নিজের উন্নতির জন্য জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাইতেছেন? অনুপমা সেইখানে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল, তাহার পর জলে নামিল। এক হাঁটু, এক বুক, গলা করিয়া ক্রমশঃ ডুবন-জলে আসিয়া পড়িল। আধ মিনিট কাল জলতলে থাকিয়া অনেক জল খাইয়া সে আবার উপরে ভাসিয়া উঠিল; আবার ডুব দিল, আবার ভাসিয়া উঠিল। সে সাঁতার দিতে জানিত, তাই সমস্ত পুষ্করিণীটা তন্ন তন্ন করিয়া কোথাও ডুবন-জল মিলিল না। অনেকবার ডুব দিল, অনেক জলও খাইল; কিন্তু একেবারে ডুবিয়া যাইতে কিছুতেই পারিল না। সে দেখিল, মরিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া ডুব দিয়া, নিশ্বাস আটকাইয়া আসিবার উপক্রম হইলেই নিশ্বাস লইতে উপরে ভাসিয়া উঠিতে হয়। এইরূপে পুষ্করিণীটা সাঁতার কাটিয়া প্রায় নিশাশেষে যখন সে তাহার ক্লান্ত অবসন্ন নির্জ্জীব দেহখানা কোনরূপে টানিয়া আনিয়া সোপানের উপর ফেলিল, দেখিল, যে কোনও অবস্থায় যে কোনও কারণেই হোক, এমন করিয়া একটু একটু করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করা বড় সহজ কথা নহে।

পূর্ব্বে সে বিরহ-ব্যথায় জর্জ্জরিত-তনু হইয়া দিনে শতবার করিয়া মরিতে যাইত, তখন ভাবিত, প্রাণটা রাখা না-রাখা নায়ক-নায়িকার একেবারে মুঠোর ভিতরে, কিন্তু আজ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া প্রাণটার সহিত ধস্তাধস্তি করিয়াও সেটাকে বাহির করিয়া ফেলিতে পারিল না। আজ সে বিলক্ষণ বুঝিল, তাহাকে জন্মের মত বিদায় দেওয়া —তাহার একাদশবর্ষীয় বিরহব্যথায় কুলাইয়া উঠে না।

ভোরবেলায় যখন সে বাটী আসিল, তখন তাহার সমস্ত শরীর শীতে কাঁপিতেছে; মা জিজ্ঞাসা করিলেন, অনু, এত ভোরেই নেয়ে এলি মা? অনু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

এ-দিকে দত্ত মহাশয় একরূপ চিরস্থায়ীরূপে শ্বশুর-ভবনে আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথম প্রথম জামাই-আদর তাহার কতকটা মিলিত, কিন্তু ক্রমশঃ তাহাও কম পড়িয়া আসিল। বাড়িশুদ্ধ কেউই প্রায় তাঁহাকে দেখিতে পারে না; চন্দ্রনাথবাবু প্রতি কথায় তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অপদস্থ, লাঞ্ছিত করেন। তাহার একটু কারণও হইয়াছিল; একে ত চন্দ্রবাবুর হিংসাপরবস অন্তঃকরণ, তাহাতে আবার অকর্ম্মণ্য জামাতা বলিয়া জগবন্ধুবাবু কিছু বিষয়-আশয় দিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন। অনুপমা কখনও আসে না; শাশুড়ী-ঠাকুরাণীও কখনও সে বিষয়ে তত্ত্ব লন না; তথাপি রামদুলালের মনের আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। যত্ন-আত্মীয়তার তিনি বড় একটা ধার ধারিতেন না, যাহা পাইতেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। তাহার উপর দু'বেলা পরিতোষজনক আহার ঘটিতেছে। বৃদ্ধাবস্থায় দত্ত মহাশয় ইহাই যথেষ্ট বলিয়া

মানিয়া লইতেন। কিন্তু তাঁহার সুখ-ভোগ করিবার অধিকদিনও আর বাকী ছিল না। একে জীর্ণ-জীর্ণ শরীর, তাহার উপর পুরাতন সখা কাসরোগ অনেকদিন হইতে তাঁহার শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছে। প্রতি বৎসরই শীতকালে তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিত, এবার শীতকালে বিষম টানাটানি করিতে লাগিল। জগবন্ধুবাবু দেখিলেন, যক্ষ্মা রামদুলালের অস্থিমজ্জায় প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাড়াগাঁয়ে সুচিকিৎসা হইবে না জানিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে কিছু সুচিকিৎসার পর সতী-সাধ্বী অনুপমার কল্যাণে দুটি বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে সদানন্দ রামদুলাল সংসার ত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৈধব্য

তথাপি অনুপমা একটু কাঁদিল। স্বামী মরিলে বাঙালীর মেয়েকে কাঁদিতে হয়, তাই কাঁদিল। তাহার স্ব-ইচ্ছায় সাদা পরিয়া সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল। জননী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, অনু, তোর এ বেশ ত আমি চোখে দেখতে পারি না, অন্ততঃ হাতে এক জোড়া বালাও রাখ্।

তা হয় না, বিধবার অলঙ্কার পরতে নেই।

কিন্তু তুই কচি মেয়ে।

তাহা হোক, বাঙালী মেয়ে বিধবা হইলে কচি বুড়ো সমস্ত এক হইয়া যায়। জননী আর কি বলিবেন? শুধু কাঁদিতে লাগিলেন। অনুপমার বৈধব্যে লোকে নূতন করিয়া শোক করিল না। দুই-এক বৎসরেই সে যে বিধবা হইবে তাহা সকলেই জানিত। কেহ বলিল, মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিলে কি আর সধবা থাকে? কর্ত্তাও এ-কথা জানিতেন, গৃহিণীও বুঝিতেন; তাই শোকটা নূতন করিয়া হইল না। যাহা হইবার তাহা বিবাহরাত্রেই হইয়া গিয়াছে—স্বামীকে ভালবাসিল না, জানিল না, শুনিল না, তথাপি অনুপমা কঠোর বৈধব্যব্রত পালন করিতে লাগিল। রাত্রে জলস্পর্শ করে না, দিনে একমুষ্টি স্বহস্তে সিদ্ধ করিয়া লয়, একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করে। আজ পূর্ণিমা, কাল অমাবস্যা, পরশু শিবরাত্রি, এমনি করিয়া মাসের পনর দিন সে কিছু খায় না। কেহ কোনও কথা বলিলে বলে, আমার ইহকাল গিয়াছে, এখন পরকালের কাজ করিতে দাও। এত কিন্তু সহিবে কেন? উপবাসে অনিয়মে অনুপমা শুকাইয়া অর্দ্ধেক হইয়া গেল। দেখিয়া দেখিয়া গৃহিণী ভাবিলেন, এইবার সে মরিয়া যাইবে। কর্ত্তাও ভাবিলেন, তাহা বড় বিচিত্র নহে। তাই একদিন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, অনুর আবার বিয়ে দিই।

গৃহিণী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তা কি হয়? ধর্ম্ম যাবে যে!

অনেক ভেবে দেখলুম, দু'বার বিবাহ দিলেই ধর্ম্ম যায় না। বিবাহের সঙ্গে ধর্ম্মের সঙ্গে এ-বিষয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই, বরং নিজের কন্যাকে এমন করে খুন করলেই ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা।

তবে দাও।

অনুপমা কিন্তু এ-কথা শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, তা হয় না।

কর্ত্তা তখন নিজে অনুকে ডাকিয়া বলিলেন, খুব হয় মা।

তা হলে আমার ইহকাল পরকাল—দুই কালই গেল।

কিছু যায় নাই, যাবে না—বরং না হলেই যাবার সম্ভাবনা! মনে কর, তুমি যদি গুণবান পতি লাভ কর, তা হলে দুই কালেরই কাজ করতে পারবে।

একা কি হয় না?

না মা, হয় না। অন্ততঃ বাঙালীর ঘরের মেয়ের দ্বারা হয় না। ধর্ম্ম-কর্ম্মের কথা ছেড়ে দিয়ে সামান্য কোন একটা কর্ম্ম করতে হলেই তাদেরকে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়; স্বামী ভিন্ন তেমন সাহায্য আর কে করতে পারে বল? আরও, কি দোষে তোমার এত শাস্তি?

অনুপমা আনতমুখে বলিল, আমার পূর্ব্বজন্মের ফল।

গোঁড়া হিন্দু জগবন্ধুবাবুর কর্ণে এ-কথাটা খট্ করিয়া লাগিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, তাই যদি হয়, তবুও তোমার একজন অভিভাবকের প্রয়োজন; আমাদের অবর্ত্তমানে কে তোমাকে দেখবে?

দাদা দেখবেন।

ঈশ্বর না করুন, কিন্তু সে যদি না দেখে? সে তোমার মার পেটের ভাই নয়; বিশেষ, আমি যতদূর জানি, তার মনও ভাল নয়।

অনুপমা মনে মনে বলিল, তখন বিষ খাব।

আরও একটা কথা আছে অনু, পিতা হলেও সে কথা আমার বলা উচিত—মানুষের মন সব সময়ে যে ঠিক একরকমই থাকবে, তা কেউ বলতে পারে না; বিশেষ, যৌবনকালে প্রবৃত্তিগুলি সর্ব্বদা বশ রাখতে মুনি-ঋষিরাও সমর্থ হয় না।

কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া অনুপমা কহিল, জাত যাবে যে!

না মা, জাত যাবে না—এখন আমার সময় হয়ে আসচে—চোখও ফুটচে।

অনুপমা ঘাড় নাড়িল। মনে মনে বলিল, তখন জাত গেল, আর এখন যাবে না! যখন চক্ষুকর্ণ বন্ধ করে তোমরা আমাকে বলিদান দিলে, তখন এ-কথা ভাবলে না কেন? আজ আমারও চক্ষু ফুটেচে—আমিও ভালরূপ প্রতিশোধ দেব।

কোনরূপে তাহাকে টলাইতে না পারিয়া জগবন্ধুবাবু বলিলেন, তবে মা, তাই ভাল; তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি বিবাহ দিতে চাই না। তোমার খাবার-পরবার ক্লেশ না হয়, তা আমি করে যাব। তার পর ধর্ম্মে মন রেখে যাতে সুখী হতে পার, ক'রো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রবাবুর সংসার

তিন বৎসর পরে খালাস হইয়াও ললিতমোহন বাড়ি ফিরিল না। কেহ বলিল, লজ্জায় আসিতেছে না। কেহ বলিল, সে গ্রামে কি আর মুখ দেখাতে পারে? ললিতমোহন নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দুই বৎসর পরে সহসা একদিন বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জননী আনন্দে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—বাবা, এবার বিবাহ করে সংসারী হও, যা কপালে ছিল, তা ঘটে গিয়েচে, এখন সেজন্য আর মনে দুঃখ ক'রো না। ললিতও যাহা হয় একটা করিবে স্থির করিল।

পাঁচ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া ললিত গ্রামে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিল, বিশেষ দেখিল জগবন্ধুবাবুর বাটীতে। কর্ত্তা গিন্নী কেহ জীবিত নাই। চন্দ্রনাথবাবু এখন সংসারের কর্ত্তা, অনুপমা বিধবা হইয়া এইখানেই আছে, কারণ তাহার অন্যত্র স্থান নাই। পূর্ব্বেই জননীর মৃত্যু হইয়াছিল, পরে পিতার মৃত্যুর পর অনুপমা ভাবিয়াছিল, পিতা যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়া কোনও তীর্থস্থানে থাকিবে এবং সেই টাকায় পুণ্যধর্ম্ম, নিয়মব্রত করিয়া অবশিষ্ট জীবনটা কাটাইয়া দিবে। কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তি হইলে উইল দেখিয়া সে মর্ম্মাহত হইল, পিতা কেবল তাহার নামে পাঁচ শত টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাহারা বড়লোক, এ সামান্য টাকা তাহাদিগের নিকট টাকাই নহে; বাস্তবিক, এই অর্থে কাহারও চিরজীবন গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। গ্রামে অনেকেই কানাঘুষা করিল, এ উইল জগবন্ধুবাবুর নহে, ভিতরে কিছু কারসাজি আছে। কিন্তু সে-কথায় ফল কি, নিরুপায় হইয়া অনুপমা চন্দ্রবাবুর বাটীতেই রহিল!

লোকে বলে পিতার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত সৎমাকে চিনতে পারা যায় না; সৎভাইকেও সেইরূপ পিতার জীবিতকাল পর্য্যন্ত চিনিতে পারা কঠিন। এতদিন পরে অনুপমা জানিতে পারিল, তাহার দাদা চন্দ্রনাথবাবু কি চরিত্রের মানুষ। যত প্রকার অধম শ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রনাথবাবু তাহাদের সর্ব্বনিকৃষ্ট।

হৃদয়ে একতিল দয়া-মায়া নাই, চক্ষে একবিন্দু চামড়া পর্য্যন্ত নাই। অনুপমার সেই নিরাশ্রয় অবস্থায় তিনি তাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রতি কথায় এমন কি উঠিতে বসিতে তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত, অপমানিত করিতেন। অনেক দিন হইতে তিনি অনুপমাকে দেখিতে পারেন না, কিন্তু আজকাল ত অধিক না দেখিতে পারিবার কারণ তিনিই ভাল জানেন। বড়বধূ পূর্ব্বে তাহাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু এখন তিনি দেখিতে পারেন না। যখন অনু বড়লোকের মেয়ে ছিল, যখন তাহার বাপ-মা বাঁচিয়াছিল, যখন তাহার একটা কথায় পাঁচজন ছুটিয়া আসিত, তখন তিনিও ভালবাসিতেন। এখন সে দুঃখিনী, আপনার বলিতে কেহ নাই, টাকা-কড়ি নাই, পরের অন্ন না খাইলে দিন কাটে না, তাহাকে কে এখন ভালবাসিবে? কে এখন যত্ন করিবে? বড়বধূর তিন-চারিটি ছেলে-মেয়ের ভার অনুর উপর; তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয়, স্নান করাইতে হয়, পরাইতে হয়, কাছে করিয়া শুইতে হয়, তথাপি কোনও বিষয়ে একটু ত্রুটি হইলেই অমনি বড়বধূঠাকুরাণী রাগ করিয়া রীতিমত পাঁচটা কথা শুনাইয়া দেন। ইহা ভিন্ন অনুপমাকে নিত্য দু'বেলা চন্দ্রবাবুর জন্য দুই-চারিটা ভাল তরকারি রাঁধিতে হয়; পাচক ব্রাহ্মণ তেমন প্রস্তুত করিতে পারে না। আর না হইলে চন্দ্রবাবুরও কিছু খাওয়া হয় না। একাদশীই হোক, আর দ্বাদশীই হোক, আর উপবাসই হোক, সে রান্না তাহাকে রাঁধিতেই হইবে। বিধবা হইয়া অনুপমা প্রাতঃকালে স্নান করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিত; এখন তাহাকে সে সময়টুকুও দেওয়া হয় না। একটু বিলম্ব হইলেই বড়বধূঠাকুরাণী বলিয়া উঠেন, ঠাকুরঝি, একটু হাত চালিয়ে নাও, ছেলেরা কাঁদচে—এখন পর্য্যন্ত কিছু খেতে পায়নি। অনুপমা যা-তা করিয়া উঠিয়া আসে, একটি কথাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। একাদশীর দীর্ঘ উপবাস করিয়াও তাহাকে রাত্রে রন্ধন করিতে যাইতে হয়, তৃষ্ণায় বুক ফাটিতে থাকে, অগ্নির উত্তাপে মাথা টিপ্ টিপ্ করিতে থাকে, গা ঝিম্ ঝিম্ করে, তবু কথা কহে না। অবস্থার পরিবর্ত্তনে সহ্য করিবার ক্ষমতাও হয়। কেন না, জগদীশ্বর তাহা শিখাইয়া দেন—না হইলে অনুপমা এতদিন মরিয়া যাইত।

এ-সংসারে তাহার অপেক্ষা দাস-দাসীরা শ্রেষ্ঠ; জোর করিয়া তাহাদের দুটো বলিলে তাহারাও দুটো জোরের কথা বলিতে পারে, অন্ততঃ আমার মাহিনা-পত্র চুকাইয়া দিন, বাড়ি যাই—এ কথাও বলিতে পারে। কিন্তু অনু তাহাও বলিতে পারে না; সে বিনামূল্যে ক্রীতদাসী; মারো, কাটো, তাহাকে এখানে থাকিতেই হইবে। আর কোথাও যাইবার জো নাই, সে বিধবা, সে বড়লোকের কন্যা। অনুপমার অবস্থা বুঝাইতে পারা যায় না, বুঝিতে হয়; বাঙালীর ঘরে পরান্নপ্রত্যাশিনী বিধবাই কেবল তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিবেন, অন্যে না বুঝিতেই পারে।

আজ দ্বাদশী। সকাল সকাল স্নান করিয়া অনুপমা পূজা করিতে লাগিল। তখনও পনের মিনিট হয় নাই; বড়বধূ ঘরের বাহির হইতেই একটু বড় গলায় বলিলেন, ঠাকুরঝি, তোমার কি আজ সমস্তদিনে হবে না? এমন করে চলবে না বাপু। অনুপমা শিবের মাথায় জল দিতেছিল, কথা কহিল না; বড়বধূ দশমিনিট পরে পুনর্ব্বার ঘুরিয়া আসিয়া সেইখান হইতেই চীৎকার করিলেন—অত পুণ্যি ছালায় আঁটবে না গো, অত পুণ্যি ক'রো না—আর অত পুণ্যি-ধর্ম্মের সখ থাকে ত বনে-জঙ্গলে গিয়ে কর গে, সংসারে থেকে অত বাড়াবাড়ি সইতে পারা যায় না।

তথাপি অনুপমা কথা কহিল না।

বড়বৌ দ্বিগুণ চেঁচাইয়া উঠিলেন—বলি, কেউ খাবে দাবে—না, না?

অনুপমা হস্তস্থিত বিল্বপত্র নামাইয়া রাখিয়া বলিল, আমার অসুখ হয়েচে, আজ আমি কিছুই পারব না।

পারবে না? তবে সবাই উপোস করুক?

কেন, আমি ছাড়া কি লোক নেই? ঠাকুরের কি হ'লা?

তার জ্বর হয়েচে—আর উনি ঠাকুরের রান্না খেতে পারেন?

না পারেন—তুমি রেঁধে দাও গে।

আমি রাঁধব? মাথার যন্ত্রণায় প্রাণ যায়, একটা কবিরাজ চব্বিশ ঘণ্টা আমার পিছনে লেগে আছে—আর আমি আগুনের তাতে যাব?

অনুপমা জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, তবে সবাইকে উপোস করতে বল গে।

তাই যাই—তোমার দাদাকে এ কথা জানাই গে। আর তোমার অসুখ হবে কেন? এই নেয়ে-ধুয়ে এলে, এখনি গিলবে কুটবে, আর বড় ভাইকে একটু রেঁধে খাওয়াতে পার না?

না, পারিনে। বড়বৌ, আমি তোমাদের কেনা বাঁদী নই যে, যা মুখে আসবে তাই বলবে। আমি এ-সব কথা দাদাকে জানাব।

বড়বৌ মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, তাই জানাও গে—তোমার দাদা এসে আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যাক!

অনুপমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; তাহার পর বলিল, তা জানি, দাদা ভাল হলে আর তোমার এত সাহস!

কেন, তিনি করেচেন কি? খেতে দিচ্চেন, পরতে দিচ্চেন—আবার কি করবেন! সত্যি সত্যি ত আর আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমায় মাথায় করে রাখতে পারেন না—এজন্য আর মিছে রাগ করলে চলবে কেন?

সমস্ত বস্তুরই সীমা আছে। অনুপমার সহিষ্ণুতারও সীমা আছে।

সে এতদিন যাহা বলে নাই, আজ তাহা বলিয়া ফেলিল; বলিল, দাদা আমাকে

খাওয়াবেন পরাবেন কি—যে বাপের টাকায় তিনি খান—আমি সেই বাপের টাকায় খাই।

বড়বৌ ক্রুদ্ধ হইল—তাই যদি হ'ত, তা হলে আর পথের কাঙাল করে রেখে যেত না।

পথের কাঙাল তিনি করে যাননি, তোমরাই করেছ। গ্রামসুদ্ধ সবাই জানে, তিনি আমাকে নিঃসম্বল রেখে যাননি। সে টাকা দাদা চুরি না করলে আজ আমাকে তোমার মুখনাড়া খেতে হতো না।

বড়বধূর মুখ প্রথমে শুকাইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল—গ্রামসুদ্ধ সবাই জানে—উনি চোর? তবে এ-কথা ওঁকে জানাব?

জানিও—আরও বলো যে, পাপের ফল তাঁকে পেতেই হবে।

সেদিন এমনই গেল। অবশ্য এ কথা চন্দ্রবাবু শুনিতে পাইলেন; কিন্তু কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না।

চন্দ্রনাথবাবুর সংসারে ভোলা বলিয়া একজন ছোঁড়া-মত ভৃত্য ছিল। পাঁচ-ছয়দিন পরে চন্দ্রবাবু একদিন তাহাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আনিয়া বেদম প্রহার করিতে লাগিলেন। চীৎকার-শব্দে অন্যান্য দাস-দাসীরা ছুটিয়া আসিল—অসম্ভব মার চলিতেছে। অনুপমা ঘরের ভিতর পূজা করিতেছিল, পূজা ফেলিয়া সেও ছুটিয়া আসিল। ভোলার নাক-মুখ দিয়া তখনও রক্ত ছুটিতেছিল। অনুপমা চিৎকার করিয়া উঠিল, দাদা কর কি—মরে গেল যে!

চন্দ্রবাবু খিঁচাইয়া উঠিলেন—আজ বেটাকে একেবারে মেরে ফেলব। তোকেও সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতাম, কিন্তু শুধু মেয়েমানুষ বলে তুই বেঁচে গেলি। আমার সংসারে এত পাপ আমি বরদাস্ত করব না। বাবা তোকে পাঁচশ টাকা দিয়ে গেছেন—তাই নিয়ে তুই আজই আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা।

অনুপমা কিছুই বুঝিতে পারিল না, শুধু বলিল, সে কি?

কিছুই নয়। আজ টাকা নাও, নিয়ে ভোলার সঙ্গে দূর হয়ে যাও। বাইরে গিয়ে যা খুশি কর গে।

অনুপমা সেখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া গেল। দাস-দাসীরা সকলেই এ-কথা শুনিল। কেউ মুখে কাপড় দিয়া হাসিল, কেহ হাসি চাপিয়া ভালমানুষের মত সরিয়া গেল, কেহ বা ছুটিয়া অনুপমাকে তুলিতে আসিল। চন্দ্রবাবু মৃতপ্রায় ভোলার মুখে আর একটা পদাঘাত করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শেষ দিন

আজ অনুপমার শেষ দিন। এ-সংসারে সে আর থাকিবে না। জ্ঞান হইয়া অবধি সে সুখ পায় নাই। ছেলেবেলায় ভালবাসিয়াছিল বলিয়া নিজের শান্তি নিজে ঘুচাইয়াছিল; অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিয়াছিল বলিয়া বিধাতা তাহাকে একতিলও সুখ দেন নাই। যাহাকে ভালবাসিত মনে করিত, তাঁহাকে পাইল না; যে ভালবাসিতে আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়াইয়া দিল। পিতা নাই, মাতা নাই, দাঁড়াইবার স্থান নাই, স্ত্রীলোকের একমাত্র অবলম্বন সতীত্বের সুযশ, তাহাও ঈশ্বর কাড়িয়া লইতে বসিয়াছেন। তাই আর সে সংসারে থাকিবে না। বড় অভিমানে তাহার হৃদয় ফাটিয়া উঠিতেছে। নিস্তব্ধ নিদ্রিত কৌমুদি-রজনীতে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া, আবার—বার বার তিনবার—পুষ্করিণীর সেই পুরাতন সোপানে আসিয়া উপবেশন করিল। এবার অনুপমা চালাক হইয়াছে। আর বার সন্তরণ-শিক্ষাটা তাহাকে মরিতে দেয় নাই, এবার তাহা বিফল করিবার জন্য কাঁকে কলসী লইয়া আসিয়াছে। এবার পুষ্করিণীর কোথায় ডুবন-জল আছে, তাহা বাহির করিয়া লইবে—এবার নিশ্চয় ডুবিয়া মরিবে!

মরিবার পূর্ব্বে পৃথিবীকে বড় সুন্দর দেখায়। ঘর-বাড়ি, আকাশ, মেঘ, চন্দ্র, তারা, জল, ফুল, লতা, বৃক্ষ—সব সুন্দর হইয়া উঠে, যেদিকে চাও সেইদিকেই মনোরম বোধ হয়। সব যেন অঙ্গুলি তুলিয়া বলিতে থাকে, মরিও না, দেখ আমরা কত সুখে আছি—তুমিও সহ্য করিয়া থাক, একদিন সুখী হইবে। না হয়, আমাদের কাছে এস, আমরা তোমাকে সুখী করিব; অনর্থক বিধাতৃদত্ত আত্মাকে নরকে নিক্ষেপ করিও না। মরিতে আসিয়াও মানুষ তাই অনেক সময়ে ফিরিয়া যায়। আবার যখন ফিরিয়া দেখে, জগতে তাহার একতিলও সুখ নাই, অসীম সংসারে দাঁড়াইবার একবিন্দু স্থান নাই, আপনার বলিতে একজনও নাই, তখন আবার মরিতে চাহে, কিন্তু পরক্ষণেই যেন ভিতর হইতে বলিতে থাকে, ছি ছি! ফিরিয়া যাও—এমন কাজ করিও না। মরিলেই কি সকল দুঃখের অবসান হইল? কেমন করিয়া জানিলে ইহা অপেক্ষা আরও গভীর দুঃখে পতিত হইবে না? মানুষ অমনি সঙ্কুচিত হইয়া পশ্চাতে হাটিয়া দাঁড়ায়। অনুপমার কি এ-সব কথা মনে হইতেছিল না? কিন্তু অনুপমা তবুও মরিবে, কিছুতেই আর বাঁচিবে না।

পিতার কথা মনে হইল, মাতার কথা মনে হইল, সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের কথা মনে হইল। যাহার কথা মনে হইল, সে ললিত। যাহারা তাহাকে ভালবাসিত, তাহারা সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছে। শুধু একজন এখনও জীবিত আছে।

সে ভালবাসিয়াছিল, ভালবাসা পাইতে আসিয়াছিল, হৃদয়ের দেবী বলিয়া পূজা দিতে আসিয়াছিল, অনুপমা সে পূজা গ্রহণ করে নাই এবং অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল! শুধু কি তাই? জেলে পর্য্যন্ত দিয়াছিল। ললিত সেখানে কত ক্লেশ পাইয়াছিল, হয়ত অনুপমাকে কত অভিসম্পাত করিয়াছিল, তাহার মনে হইল; নিশ্চিত সেই পাপেই এত ক্লেশ, এত যন্ত্রণা। সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ভাল হইয়াছে, মদ ছাড়িয়াছে, দেশের উপকার করিয়া আবার যশ কিনিতেছে। সে কি আজও তাহাকে মনে করে? হয়ত করে না, হয়ত বা করে—কিন্তু তাহাতে কি? তাহার যে কলঙ্ক রটিয়াছে। তিনি কি তাহা শুনিয়াছেন? যখন গ্রামময় রটিবে যে, আমি কলঙ্কিনী হইয়া ডুবিয়াছি, কাল যখন আমার দেহ জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে, ছি ছি! কত ঘৃণায় তার ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে!

অনুপমা অঞ্চল দিয়া গলদেশে কলসী বাঁধিল; এমন সময়ে কে একজন পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, অনুপমা!

অনুপমা চমকাইয়া ফিরিয়া দেখিল, একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আগন্তুক আবার ডাকিল। অনুপমার মনে হইল, এ স্বর আর কোথাও শুনিয়াছে, কিন্তু স্মরণ করিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

অনুপমা আত্মহত্যা ক'রো না।

অনুপমা কোনও কালেই ব্রীড়ানত লজ্জাবতী লতা নহে; সে সাহস করিয়া বলিল, আমি আত্মহত্যা করব আপনি কি করে জানলেন?

তবে গলায় কলসী বেঁধেচ কেন?

অনুপমা মৌন হইয়া রহিল। আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আত্মঘাতী হলে কি হয় জান?

কি?

অনন্ত নরক।

অনুপমা শিহরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে কলসী খুলিয়া রাখিয়া বলিল, এ সংসারে স্থান নাই।

ভুলে গিয়েচ! আমি মনে করে দিচ্চি। প্রায় ছ'বছর পূর্ব্বে ঠিক এইস্থানে একজন তোমাকে চিরজীবনের জন্য স্থান দিতে চেয়েছিল—স্মরণ হয়?

অনুপমা লজ্জায় রক্তমুখী হইয়া বলিল, হয়।

এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

আমার কলঙ্ক রটেছে—আমার বাঁচা হয় না।

মরলেই কি কলঙ্ক যায়?

যাক, না যাক, আমি তা শুনতে যাব না।

ভুল বুঝেছ অনুপমা! মরলে এ কলঙ্ক চিরকাল ছায়ার মত তোমার নামের পাশে ঘুরে বেড়াবে। বেঁচে দেখ, এ মিথ্যা কলঙ্ক কখনও চিরস্থায়ী হবে না।

কিন্তু কোথায় গিয়ে বেঁচে থাকব?

আমার সঙ্গে চল।

অনুপমার একবার মনে হইল তাহাই করিবে। চরণে লুটাইয়া পড়িবে, বলিবে, আমাকে ক্ষমা কর। বলিবে, তোমার অনেক অর্থ, আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও—আমি গিয়া কোথাও লুকাইয়া থাকি। পরে অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, আমি যাব না।

কথা শেষ হইতে না হইতে অনুপমা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

* * * *

অনুপমা জ্ঞান হইলে দেখিল সুসজ্জিত হর্ম্ম্যে পালঙ্কের উপর সে শয়ন করিয়া আছে, পার্শ্বে ললিতমোহন। অনুপমা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কাতর-স্বরে বলিল, কেন আমাকে বাঁচালে?

অপ্রকাশিত রচনাবলী

সমাজ-ধর্ম্মের মূল্য

বিড়ালকে মার্জ্জার বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস করায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ যদি বা পায়, তথাপি পণ্ডিতের কাণ্ডজ্ঞান-সম্বন্ধে লোকের যে দারুণ সংশয় উপস্থিত হইবে, তাহা আমি নিশ্চয় জানি। জানি বলিয়াই, প্রবন্ধ লেখার প্রচলিত পদ্ধতি যাই হউক, প্রথমেই 'সমাজ' কথাটা বুঝাইবার জন্য ইহার ব্যুৎপত্তিগত এবং উৎপত্তিগত ইতিহাস বিবৃত করিয়া, বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া, অবশেষে ইহা এ নয়, ও নয়, তা নয়—বলিয়া পাঠকের চিত্ত বিভ্রান্ত করিয়া দিয়া গবেষণাপূর্ণ উপসংহার করিতে আমি নারাজ। আমি জানি, এ প্রবন্ধ পড়িতে যাঁহার ধৈর্য্য থাকিবে, তাঁহাকে 'সমাজের' মানে বুঝাইতে হইবে না। দলবদ্ধ হইয়া বাস করার নামই যে সমাজ নয়—মৌরোলামাছের ঝাঁক, মৌমাছির চাক, পিঁপড়ার বাসা বা বীর হনুমানের মস্ত দলটাকে যে 'সমাজ' বলে না, এ-খবর আমার নিকট হইতে এই তিনি নূতন শুনিবেন না।

তবে, কেহ যদি বলেন, 'সমাজ' সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ঝাপ্‌সা গোছের ধারণা মানুষের থাকতে পারে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা কি প্রবন্ধকারের উচিত নয়? তাঁহাদের কছে আমার বক্তব্য এই যে, না। কারণ, সংসারে অনেক বস্তু আছে, যাহার মোটামুটি ঝাপসা ধারণাটাই সত্য বস্তু,—সূক্ষ্ম করিয়া দেখাইতে যাওয়া শুধু বিড়ম্বনা নয়, ফাঁকি দেওয়া! 'ঈশ্বর' বলিলে যে ধারণাটা মানুষের হয়, সেটা অত্যন্তই মোটা, কিন্তু সেইটাই কাজের জিনিস। এই মোটার উপরেই দুনিয়া চলে, সূক্ষ্মের উপর নয়। সমাজ ঠিক তাই। একজন অশিক্ষিত পাড়াগাঁয়ের চাষা 'সমাজ' বলিয়া যাহাকে জানে, তাহার উপরেই নির্ভয়ে ভর দেওয়া চলে—পণ্ডিতের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাটির উপরে চলে না। অন্ততঃ, আমি বোঝা-পড়া করিতে চাই এই মোটা বস্তুটিকে লইয়াই। যে সমাজ মড়া মরিলে কাঁধ দিতে আসে, আবার শ্রাদ্ধের সময় দলাদলি পাকায়, বিবাহে যে ঘটকালি করিয়া দেয়, অথচ বউভাতে হয়ত বাঁকিয়া বসে; কাজ-কর্ম্মে, হাতে-পায়ে ধরিয়া যাহার ক্রোধ শান্তি করিতে হয়, উৎসবে-ব্যসনে যে সাহায্যও করে, বিবাদও করে; যে সহস্র দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও পূজনীয়—আমি তাহাকেই সমাজ বলিতেছি এবং এই সমাজ যদ্দারা শাসিত হয়, সেই বস্তুটিকেই সমাজ-ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। তবে, এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, যে ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল দেশের, সকল জাতির সমাজকে শাসন করে, সেই সামাজিক ধর্ম্মের আলোচনা করা আমার প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কারণ, মানুষ মোটের উপর মানুষই। তাহার সুখ-দুঃখ আচার-ব্যবহারের ধারা সর্ব্বদেশেই একদিকে চলে। মড়া মরিলে সব দেশেই প্রতিবেশীরা সৎকার করিতে জড় হয়; বিবাহে সর্ব্বত্রই আনন্দ করিতে আসে; বাপ-মা সব দেশেই সন্তানের পূজ্য; বয়োবৃদ্ধের সম্মাননা সব

দেশেরই নিয়ম ; স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ ; আতিথ্য সর্ব্বদেশেই গৃহস্থের ধর্ম্ম। প্রভেদ শুধু খুঁটিনাটিতে। মৃতদেহ কেহ-বা গৃহ হইতে গাড়ি-পাল্কী করিয়া, ফুলের মালায় আবৃত করিয়া গোরস্থানে লইয়া যায়, কেহ-বা ছেঁড়া মাদুরে জড়াইয়া, বংশখণ্ডে বিচালির দড়ি দিয়া বাঁধিয়া, গোবরজলের সৌগন্ধ চড়াইয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে লইয়া চলে ; বিবাহ করিতে কোথাও বা বরকে তরবারি প্রভৃতি পাঁচ হাতিয়ার বাঁধিয়া যাইতে হয়, আর কোথাও বা জাতিটি হাতে করিয়া গেলেই পাঁচ হাতিয়ারের কাজ হইতেছে মনে করা যায়। বস্তুতঃ, এইসব ছোট জিনিস লইয়াই মানুষে মানুষে বাদ-বিতণ্ডা কলহ-বিবাদ। এবং যাহা বড়, প্রশস্ত, সমাজে বাস করিবার পক্ষে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই, হইতেও পারে না। আর পারে না বলিয়াই এখনও ভগবানের রাজ্য বজায় রহিয়াছে ; মানুষ সংসারে আজীবন বাস করিয়া জীবনান্তে তাঁহারই পদাশ্রয়ে পৌঁছিবার ভরসা করিতেছে। অতএব, মৃতদেহের সৎকার করিতে হয়, বিবাহ করিয়া সন্তান প্রতিপালন করিতে হয়, প্রতিবেশীকে সুবিধা পাইলেই খুন করিতে নাই, চুরি করা পাপ, এইসব স্থূল, অথচ অত্যাবশ্যক সামাজিক ধর্ম্ম সবাই মানিতে বাধ্য ; তা তাহার বাড়ি আফ্রিকার সাহারাতেই হউক, আর এশিয়ার সাইবিরিয়াতেই হউক। কিন্তু, এইসকল আমার প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। অথচ, এমন কথাও বলি নাই,—মনেও করি না যে, যাহা কিছু ছোট, তাহাই তুচ্ছ এবং আলোচনার অযোগ্য। পৃথিবীর যাবতীয় সমাজের সম্পর্কে ইহারা কাজে না আসিলেও বিচ্ছিন্ন এবং বিশেষ সমাজের মধ্যে ইহাদের যথেষ্ট কাজ আছে এবং সে কাজ তুচ্ছ নহে। সকল ক্ষেত্রেই এই সকল কর্ম্মসমষ্টি—যা দেশাচাররূপে প্রকাশ পায় তাহার যে অর্থ আছে, কিংবা সে অর্থ সুস্পষ্ট, তাহাও নহে ; কিন্তু, ইহারাই যে বিভিন্ন স্থানে সর্ব্বজনীন সামাজিক ধর্ম্মের বাহক, তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। বহন করিবার এই সকল বিচিত্র ধারাগুলিকে চোখ মেলিয়া দেখাই আমার লক্ষ্য।

সামাজিক মানুষকে তিন প্রকার শাসন-পাশ আজীবন বহন করিতে হয়। প্রথম রাজ-শাসন, দ্বিতীয় নৈতিক শাসন এবং তৃতীয় যাহাকে দেশাচার কহে তাহারই শাসন।

রাজ-শাসন ;—আমি স্বেচ্ছাচারী দুর্ব্বৃত্ত রাজার কথা বলিতেছি না—যে রাজা সুসভ্য, প্রজাবৎসল—তাঁহার শাসনের মধ্যে তাঁহার প্রজাবৃন্দেরই সমবেত ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাই খুন করিয়া যখন সেই শাসনপাশ গলায় বাঁধিয়া ফাঁসিকাঠে গিয়া উঠি, তখন সে ফাঁসের মধ্যে আমার নিজের ইচ্ছা যে প্রকারান্তরে মিশিয়া নাই, এ-কথা বলা যায় না। অথচ মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে আমার নিজের বেলা সেই নিজের ইচ্ছাকে যখন ফাঁকি দিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাই তখন যে আসিয়া জোর করে, সে-ই রাজশক্তি। শক্তি ব্যতীত শাসন হয় না। এমনি

নীতি এবং দেশাচারকে মান্য করিতে যে আমাকে বাধ্য করে, সে-ই আমার সমাজ এবং সামাজিক আইন।

আইনের উদ্ভব সম্বন্ধে নানা প্রকার মতামত প্রচলিত থাকলেও মুখ্যত রাজার সৃজিত আইন যেমন রাজা-প্রজা উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে, নীতি ও দেশাচার তেমনি সমাজ-সৃষ্ট হইয়াও সমাজ ও সামাজিক মনুষ্য উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে।

কিন্তু, আইনগুলি কি নির্ভুল? কেহই ত এমন কথা কহে না! ইহার মধ্যে কত অসম্পূর্ণতা, কত অন্যায়, কত অসঙ্গতি ও কঠোরতার শৃঙ্খল রহিয়াছে। নাই কোথায়? রাজার আইনের মধ্যেও আছে, সমাজের আইনের মধ্যেও রহিয়াছে।

এত থাকা সত্ত্বেও, আইন-সম্বন্ধে আলোচনা ও বিচার করিয়া যত লোক যত কথা বলিয়া গিয়াছেন—যদিচ আমি তাঁহাদের মতামত তুলিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না—মোটের উপর তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়াছেন, আইন যতক্ষণ,—তা ভুল-ভ্রান্তি তাহাতে যতই কেন থাকুক না, ততক্ষণ—শিরোধার্য্য তাহাকে করিতেই হইবে। না করার নাম বিদ্রোহ। এবং "The righteousness of a cause is never alone sufficient justification of rebellion."

সামাজিক আইন-কানুন সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে না কি?

আমি আমাদের সমাজের কথাই বলি। রাজার আইন রাজা দেখিবেন, সে আমার বক্তব্য নয়। কিন্তু সামাজিক আইন-কানুনে—ভুল-চুক অন্যায়-অসঙ্গতি কি আছে না-আছে, সে না হয় পরে দেখা যাইবে;—কিন্তু এইসকল থাকা সত্ত্বেও ত ইহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। যতক্ষণ ইহা সামাজিক শাসন-বিধি, ততক্ষণ ত শুধু নিজের ন্যায্য দাবীর অছিলায় ইহাকে অতিক্রম করিয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তোলা যায় না। সমাজের অন্যায়, অসঙ্গতি, ভুল-ভ্রান্তি বিচার করিয়া সংশোধন করা যায়, কিন্তু তাহা না করিয়া শুধু নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের বলে একা একা বা দুই-চারিজন সঙ্গী জুটাইয়া লইয়া বিপ্লব বাধাইয়া দিয়া যে সমাজ-সংস্কারের সুফল পাওয়া যায়, তাহা ত কোনমতেই বলা যায় না।

শ্রীযুক্ত রবিবাবুর 'গোরা' বইখানি যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই প্রকারের কিছু কিছু আলোচনা তাহাতে আছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার কি মীমাংসা করা হইয়াছে, আমি জানি না। তবে, ন্যায়-পক্ষ হইলে এবং উদ্দেশ্য সাধু হইলে যেন দোষ নেই, এই রকম মনে হয়। সত্যপ্রিয় পরেশবাবু সত্যকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া বিপ্লবের সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। 'সত্য' কথাটি শুনিতে মন্দ নয়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার ঠিক চেহারাটি চিনিয়া বাহির করা বড়

কঠিন। কারণ, কোন পক্ষই মনে করে না যে, সে অসত্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। উভয় পক্ষেরই ধারণা—সত্য তাহারই দিকে।

ইহাতে আরও একটি কথা বলা হইয়াছে যে, সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হাত দিতে পারে না। কারণ, ব্যক্তির স্বাধীনতা সমাজের জন্য সঙ্কুচিত হইতে পারে না। বরঞ্চ সমাজকেই, এ স্বাধীনতার স্থান যোগাইবার জন্য নিজেকে প্রসারিত করিতে হইবে। পণ্ডিত H. Spencer-এর মতও তাই। তবে, তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এই বলিয়া সীমাবদ্ধ করিয়াছেন যে, যতক্ষণ না তাহা অপরের তুল্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিতে গেলে, এই অপরের তুল্য স্বাধীনতায় যে কার্য্যক্ষেত্রে কতদিকে কতপ্রকারে টান ধরে, পরিশেষে ঐ 'সত্য' কথাটির মত কোথায় যে 'সত্য' আছে—তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, কথাটা মিথ্যা নয় যে, সামাজিক আইন বা রাজার আইন চিরকাল এমনি করিয়াই প্রসারিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হইতেছে, ততক্ষণ সমাজ যদি তাহার শাস্ত্র বা অন্যায় দেশাচারে কাহাকেও ক্লেশ দিতেই বাধ্য হয়, তাহার সংশোধন না করা পর্য্যন্ত এই অন্যায়ের পদতলে নিজের ন্যায্য দাবী বা স্বার্থ বলি দেওয়ার যে কোন পৌরুষ নাই, তাহাতে যে কোন মঙ্গল হয় না, এমন কথাও জোর করিয়া বলা চলে না।

কথাটা শুনিতে হয়ত কতকটা হেঁয়ালির মত হইল। পরে তাহাকে পরিস্ফুট করিতে যত্ন করিব। কিন্তু এইখানে একটা মোটা কথা বলিয়া রাখি যে, রাজ-শক্তির বিপক্ষে বিদ্রোহ করিয়া তাহার বল ক্ষয় করিয়া তোলায় যেমন দেশের মঙ্গল নাই —একটা ভালর জন্য অনেক ভাল তাহাতে যেমন বিপর্য্যস্ত, লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়, সমাজ-শক্তির সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে। এই কথাটা কোনমতেই ভোলা চলে না যে, প্রতিবাদ এক বস্তু, কিন্তু বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। বিদ্রোহকে চরম প্রতিবাদ বলিয়া কৈফিয়ত দেওয়া যায় না। কারণ, ইহা অনেকবার অনেক প্রকারে দেখা গিয়াছে যে, প্রতিষ্ঠিত শাসন-দণ্ডের উচ্ছেদ করিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ শাসন-দণ্ড প্রবর্ত্তিত করিলেও কোন ফল হয় না, বরঞ্চ কুফলই ফলে।

আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে এই কথাটা অনেকটা বোঝা যায়। সেই সময়ের বাঙলা দেশের সহস্র প্রকার অসঙ্গত, অমূলক ও অবোধ্য দেশাচারে বিরক্ত হইয়া কয়েকজন মহৎপ্রাণ মহাত্মা এই অন্যায়রাশির আমূল সংস্কারের তীব্র আকাঙ্ক্ষায়, প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া নিজেদের এরূপ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন যে, তাহা নিজেদের যদি বা কাজে লাগিয়া থাকে, দেশের কোন কাজেই লাগিল না। দেশ তাঁহাদের বিদ্রোহী ম্লেচ্ছ খ্রীষ্টান মনে করিতে লাগিল। তাঁহারা জাতিভেদ তুলিয়া দিলেন, আহারের

আচার-বিচার মানিলেন না, সপ্তাহ অন্তে একদিন গির্জ্জার মত সমাজগৃহে বা মন্দিরের মধ্যে জুতা-মোজা পায়ে দিয়া ভিড় করিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন! এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা এত বেশি সংস্কার করিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যকলাপই তৎকাল-প্রতিষ্ঠিত আচার-বিচারের সহিত একেবারে উল্টা বলিয়া লোকের চক্ষে পড়িতে লাগিল। ইহা যে হিন্দুর পরমসম্পদ বেদমূলক ধর্ম্ম, সে-কথা কেহই বুঝিতে চাহিল না। আজও পাড়াগাঁয়ের লোক ব্রাহ্মদের খ্রীষ্টান বলিয়াই মনে করে।

কিন্তু যে-সকল সংস্কার তাঁহারা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন, দেশের লোক যদি তাহা নিজেরাই দেশের জিনিস বলিয়া বুঝিতে পারিত এবং গ্রহণ করিত, তাহা হইলে আজ বাঙালী-সমাজের এ দুর্দ্দশা বোধ করি থাকিত না। অসীম দুঃখময় এই বিবাহ-সমস্যা, বিধবার সমস্যা, উন্নতিমূলক বিলাত-যাওয়া-সমস্যা সমস্তই একসঙ্গে একটা নির্দ্দিষ্ট কূলে আসিয়া পৌছিতে পারিত। অন্যপক্ষে গতি এবং বৃদ্ধিই যদি সজীবতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এই ব্রাহ্ম-সমাজও আজ মৃত্যুমুখে পতিত না হইলেও অকাল-বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছে।

সংস্কার মানেই প্রতিষ্ঠিতের সহিত বিরোধ; এবং অত্যন্ত সংস্কারের চেষ্টাই চরম বিরোধ বা বিদ্রোহ। ব্রাহ্ম-সমাজ এ-কথা বিস্মিত হইয়া অত্যল্পকালের মধ্যেই সংস্কার, রীতি-নীতি, আচার-বিচার সম্বন্ধে নিজেদের এতটাই স্বতন্ত্র এবং উন্নত করিয়া ফেলিলেন যে, হিন্দু-সমাজ হঠাৎ তীব্র ক্রোধ ভুলিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং নিজেদের অবসরকালে ইহাদিগকে লইয়া এখানে ওখানে বেশ একটু আমোদ করিতেও লাগিল।

হায় রে! এমন ধর্ম্ম, এমন সমাজ পরিশেষে কি না পরিহাসের বস্তু হইয়া উঠিল। জানি না, এই পরিহাসের জরিমানা কোনদিন হিন্দুকে সুদ-সুদ্ধ উসুল দিতে হইবে কি না। কিন্তু ব্রাহ্মই বল, আর হিন্দুই বল, বাঙলার বাঙালী-সমাজকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইল দুই দিক দিয়াই।

আরও একটা কথা এই যে, সমাজিক আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত হয় যে দিক দিয়া, তাহার সংস্কারও হওয়া চাই সেই দিক দিয়া; শাসন-দণ্ড পরিচালন করেন যাঁহারা, সংস্কার করিবেন তাঁহারাই। অর্থাৎ, মনু-পরাশরের বিধিনিষেধ মনু-পরাশরের দিক দিয়াই সংস্কৃত হওয়া চাই। বাইবেল কোরান হাজার ভাল হইলেও কোন কাজেই আসিবে না। দেশের ব্রাহ্মণেরাই যদি সমাজ-যন্ত্র এতাবৎকালে পরিচালন করিয়া আসিয়া থাকেন, ইহার মেরামতি-কার্য্য তাঁহাদিগকে দিয়াই করাইয়া লইতে হইবে। এখানে হাইকোর্টের জজেরা হাজার বিচক্ষণ হওয়া সত্বেও কোন সাহায্যই করিতে পারিবেন না। দেশের লোক এ-বিষয়ে পুরুষানুক্রমে যাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে অভ্যাস করিয়াছে—হাজার বদ-অভ্যাস হইলেও সে অভ্যাস তাহারা ছাড়িতে চাহিবে না!

এ-সকল স্থূল সত্য কথা। সুতরাং আশা করি, এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, সে সম্বন্ধে বিশেষ কাহারো মতভেদ হইবে না।

যদি না হয়, তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মনু-পরাশরের হাত দিয়াই যদি হিন্দুর অবনতি পৌঁছিয়া থাকে ত উন্নতিও তাহাদের হাত দিয়াই পাইতে হইবে—অন্য কোন জাতির সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা, তা সে যত উন্নতই হউক, হিন্দুকে কিছুই দিতে পারিবে না। তুলনায় সমালোচনায় দোষগুণ কিছু দেখাইয়া দিতে পারে, এইমাত্র।

কিন্তু যে-কোন বিধি-ব্যবস্থা হউক, যাহা মানুষকে শাসন করে, তাহার দোষগুণ কি দিয়া বিচার করা যায়? তাহার সুখ-সৌভাগ্য দিবার ক্ষমতা দিয়া, কিংবা তাহার বিপদ ও দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা দিয়া? Sir William Markly তাঁহার Elements of Law গ্রন্থে বলেন—"The value is to be measured not by the happiness which it procures, but by the misery from which it preserves us." আমিও ইহাই বিশ্বাস করি। সুতরাং মনু-পরাশরের বিধি-ব্যবস্থা. আমাদের কি সম্পদ দান করিয়াছে, সে তর্ক তুলিয়া নয়, কি বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, শুধু সেই আলোচনা করিয়া সমাজের দোষগুণ বিচার করা উচিত। অতএব, আজও যদি আমাদের ঐ মনু-পরাশরের সংস্কার করাই আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে ঐ ধারা ধরিয়াই করা চাই। স্বর্গই হউক আর মোক্ষই হউক, সে কি দিতেছে, সে বিচার করিয়া নয়, বরঞ্চ সব বিপদ হইতে আজ আর সে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না, শুধু সেই বিচার করিয়া। সুতরাং, হিন্দু যখন উপর দিকে চাহিয়া বলেন, ঐ দেখ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র স্বর্গের কবাট সোজা খুলিয়া দিয়াছেন, আমি তখন বলি—সেটা না হয় পরে দেখিয়ো, কিন্তু আপাততঃ নীচের দিকে চাহিয়া দেখ, নরকে পড়িবার দুয়ারটা সম্প্রতি বন্ধ করা হইয়াছে কি না! কারণ, এটা ওটার চেয়েও আবশ্যক! সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে হিন্দু-শাস্ত্র স্বর্গপ্রবেশের যে সোজা পথটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে পথটি আজও নিশ্চয় তেমনি আছে। যেখানে পৌঁছিয়া একদিন সেইরূপ আমোদ উপভোগ করিবার আশা করা বেশি কথা নয়—কিন্তু, নানা প্রকার বিজাতীয় সভ্যতা অসভ্যতার সংঘর্ষে ইতিমধ্যে নীচে পড়িয়া পিষিয়া মরিবার যে নিত্য নূতন পথ খুলিয়া যাইতেছে, সেগুলি ঠেকাইবার কোনরূপ বিধি-ব্যবস্থা শাস্ত্রগ্রন্থে আছে কি না, সম্প্রতি তাহাই খুঁজিয়া দেখ। যদি না থাকে, প্রস্তুত কর; তাহাতে দোষ নাই; বিপদে রক্ষা করাই ত আইনের কাজ। কিন্তু উদ্দেশ্য ও আবশ্যক যত বড় হউক, 'প্রস্তুত' শব্দটা শুনিবামাত্রই হয়ত পণ্ডিতের দল চেঁচাইয়া উঠিবেন। আরে এ বলে কি! এ কি যার-তার শাস্ত্র যে, আবশ্যকমত দুটো কথা বানাইয়া লইব? এ যে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ! অপৌরুষেয়—অন্ততঃ ঋষিদের তৈরী, যাঁরা ভগবানের কৃপায় ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্ত জানিয়া-শুনিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ-কথা তাঁরা স্মরণ

করেন না যে, এটা শুধু হিন্দুর উপরেই ভগবানের দয়া নয়—এমনি দয়া সব জাতির প্রতিই তিনি করিয়া গিয়াছেন। ইহুদিরাও বলে তাই, খ্রীষ্টান মুসলমান—তারাও তাই বলে। কেহই বলে না যে, তাহাদের ধর্ম্ম এবং শাস্ত্রগ্রন্থ সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনার ফল। এ-বিষয়ে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থের বিশেষ কোন একটা বিশেষত্ব আমি ত দেখিতে পাই না। সকলেরই যেমন করিয়া পাওয়া, আমাদেরও তেমনি করিয়া পাওয়া। সে যাই হউক, আবশ্যক হইলে শাস্ত্রীয় শ্লোক একটা বদলাইয়া যদি আর একটা নাও করা যায়—নতুন একটা রচনা করিয়া বেশ দেওয়া যায়। এবং এমন কাণ্ড বহুবার হইয়াও গিয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। আর তাই যদি না হবে, তবে যে কোন একটা বিধি-নিষেধের এত প্রকার অর্থ, এত প্রকার তাৎপর্য্য পাওয়া যায় কেন?

এই 'ভারতবর্ষ' কাগজেই অনেকদিন পূর্ব্বে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশবাবু বলিয়াছিলেন, "না জানিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়ো না!" কিন্তু আমি বলি, সেই একমাত্র কাজ, যাহা শাস্ত্র না জানিয়া পারা যায়। কারণ, জানিলে তাহার আর শাস্ত্রের দোহাই পাড়িবার কিছুমাত্র জো থাকে না। তখন "বাঁশবনে ডোমকানা" হওয়ার মত সে ত নিজেই কোনদিকে কূল-কিনারা খুঁজিয়া পায় না; সুতরাং, কথায় কথায় সে শাস্ত্রের দোহাই দিতেও যেমন পারে না, মতের অনৈক্য হইলেই বচনের মুগুর হাতে করিয়া তাড়িয়া মারিতে যাইতেও তাহার তেমনি লজ্জা করে।

এই কাজটা তাহারাই ভাল পারে, যাদের শাস্ত্রজ্ঞানের পুঁজি যৎসামান্য। এবং ঐ জোরে তাহারা অমন নিঃসঙ্কোচে শাস্ত্রের দোহাই মানিয়া নিজের মত গায়ের জোরে জাহির করে এবং নিজেদের বিদ্যার বাহিরে সমস্ত আচার-ব্যবহারই অশাস্ত্রীয় বলিয়া নিন্দা করে।

কিন্তু মানবের মনের গতি বিচিত্র। তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা অসংখ্য। তাহার সুখ-দুঃখের ধারণা বহুপ্রকার। কালের পরিবর্ত্তন ও উন্নতি অবনতির তালে তালে সমাজের মধ্যে সে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করে। চিরদিন করিয়াছে এবং চিরদিনই করিবে। ইহার মধ্যে সমাজ যদি নিজেকে অদম্য অপরিবর্ত্তনীয় কল্পনা করিয়া, ঋষিদের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির উপর বরাত দিয়া, নির্ভয়ে পাথরের মত কঠিন হইয়া থাকিবার সঙ্কল্প করে ত তাহাকে মরিতেই হইবে। এই নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে অনেক বিশিষ্ট সমাজও পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ দুর্ঘটনা বিরল নয়; কিন্তু, আমাদের এই সমাজ, মুখে সে যাই বলুক, কিন্তু কাজে যে সত্যই মুনিঋষির ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া তাহার শাস্ত্র জিনিসটিকে লোহার শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে নাই, তাহার সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, সে সমাজে এখনও টিকিয়া আছে। বাহিরের সহিত ভিতরের সামঞ্জস্য রক্ষা করাই ত বাঁচিয়া থাকা।

সুতরাং, সে যখন বাঁচিয়া আছে, তখন যে কোন উপায়ে, যে-কোন কলাকৌশলের দ্বারা সে যে এই সামঞ্জস্য করিয়া আসিয়াছে, তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ।

সর্ব্বত্রই সমস্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই সামঞ্জস্য প্রধানতঃ যে উপায়ে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে—তাহা প্রকাশ্যে নূতন শ্লোক রচনা করিয়া নহে। কারণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় জানা গিয়াছে যে, নব-রচিত শ্লোক বেনামীতে এবং প্রাচীনতার ছাপ লাগাইয়া চালাইয়া দিতে পারিলেই তবে ছুটিয়া চলে, না লইলে খোঁড়াইতে থাকে। অতএব, নিজের জোরে নূতন শ্লোক তৈরী করা প্রকৃত উপায় নহে। প্রকৃষ্ট উপায় ব্যাখ্যা।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—পুরাতন সভ্য-সমাজের মধ্যে শুধু গ্রীক ও রোম ছাড়া আর সকল জাতি এই দাবী করিয়াছে,—তাহাদের শাস্ত্র ঈশ্বরের দান। অথচ, সকলকেই নিজেদের বর্দ্ধনশীল সমাজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য এই ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রের পরিসর ক্রমাগত বাড়াইয়া তুলিতে হইয়াছে। এবং সে-বিষয়ে সকলেই প্রায় এক পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন—বর্ত্তমান শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া।

কোন জিনিসের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করা যায় তিন প্রকারে। প্রথম—ব্যাকরণগত ধাতুপ্রত্যয়ের জোরে; দ্বিতীয়—পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচার করিয়া; এবং তৃতীয়—কোন বিশেষ দুঃখ দূর করিবার অভিপ্রায়ে শ্লোকটি সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিয়া। অর্থাৎ চেষ্টা করিলেই দেখা যায় যে, চিরদিন সমাজ-পরিচালকেরা নিজেদের হাতে এই তিনখানি হাতিয়ার—ব্যাকরণ, সম্বন্ধ এবং তাৎপর্য্য (positive and negative) লইয়া ঈশ্বরদত্ত যে-কোন শাস্ত্রীয় শ্লোকের যে-কোন অর্থ করিয়া পরবর্ত্তী যুগের নিত্য নূতন সামাজিক প্রয়োজন ও তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহাকে সজীব রাখিয়া আসিয়াছেন।

আজ যদি আমাদের জাতীয় ইতিহাস থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় দেখিতে পাইতাম—কেন শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা এমন করিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং কেনই বা এত মুনির এতরকম মত প্রচলিত হইয়াছে; এবং কেনই বা প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে শাস্ত্র বোঝাই হইয়া গিয়াছে। সমাজের এই ধারাবাহিক ইতিহাস নাই বলিয়াই এখন আমরা ধরিতে পারি না—অমুক শাস্ত্রে অমুক বিধি কিজন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং কিজন্যই বা অমুক শাস্ত্রের দ্বারা তাহাই বাধিত হইয়াছিল। আজ সুদূরে দাঁড়াইয়া সবগুলি আমাদের চোখে এইরূপ দেখায়। কিন্তু যদি তাহাদের নিকটে যাইয়া দেখিবার কোনও পথ থাকিত ত নিশ্চয় দেখিতে পাইতাম—এই দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ বিধি একই স্থানে দাঁড়াইয়া আঁচড়া-আঁচড়ি করিতেছে না। একটি হয়ত আর একটির শতবর্ষ পিছনে দাঁড়াইয়া ঠোঁটে আঙুল দিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছে।

প্রবাহই জীবন। মানুষ যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, ততক্ষণ একটা ধারা তাহার

ভিতর দিয়া অনুক্ষণ বহিয়া যাইতে থাকে। বাহিরের প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুকে সে গ্রহণও করে, আবার ত্যাগও করে। যাহাতে তাহার আবশ্যক নাই, যে বস্তু দূষিত, তাহাকে পরিবর্জ্জন করাই তাহার প্রাণের ধর্ম্ম। কিন্তু মরিলে আর যখন ত্যাগ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, তখনই তাহাতে বাহির হইতে যাহা আসে, তাহারা কায়েম হইয়া বসিয়া যায় এবং মৃতদেহটাকে পচাইয়া তোলে। জীবন্ত সমাজ এ-নিয়ম স্বভাবতই জানে। সে জানে, যে বস্তু আর তাহার কাজে লাগিতেছে না, মমতা করিয়া তাহাকে ঘরে রাখিলে মরিতেই হইবে। সে জানে, আবর্জ্জনার মত তাহাকে ঝাঁটাইয়া না ফেলিয়া দিয়া, অনর্থক ভার বহিয়া বেড়াইলে, অনর্থক শক্তিক্ষয় হইতে থাকিবে এবং এই ক্ষয়ই একদিন তাহাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিবে।

কিন্তু জীবনীশক্তি যত হ্রাস পাইতে থাকে, প্রবাহ যতই মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া আসিতে থাকে, যতই তাহার দুর্ব্বলতা দুষ্টের ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে ভয় পায়, ততই তাহার ঘরে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় ভাল-মন্দের বোঝা জমাট বাঁধিয়া উঠিতে থাকে। এবং সেইসমস্ত গুরুভার মাথায় লইয়া সেই জরাতুর মরণোন্মুখ সমাজকে কোনমতে লাঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে সেই শেষ আশ্রয় যমের বাড়ির পথেই যাইতে হয়।

ইহার কাছে এখন সমস্তই সমান। ভালও যা, মন্দও তাই; সাদাও যেমন, কালও তেমনই। কারণ জানিলে তবেই কাজ করা যায়, অবস্থার সহিত পরিচয় থাকিলেই তবে ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। এখানকার এই জরাতুর সমাজ জানেই না—কিজন্য বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কেনই বা তাহা প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মানুষের কোন্ দুঃখ সে দূর করিতে চাহিয়াছিল, কিংবা কোন্ পাপের আক্রমণ হইতে সে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই অর্গল টানিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। নিজের বিচার-শক্তি ইহার নাই, পরের কাছেও যে সমস্ত গন্ধমাদন তুলিয়া লইয়া হাজির করিবে—সে জোরও ইহার গিয়াছে। সুতরাং, এখন এ শুধু এই বলিয়া তর্ক করে যে, এইসকল শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ আমাদেরই ভগবান ও পরমপূজ্য মুনি-ঋষির তৈরী। এই তপোবনেই তারা মৃতসঞ্জীবনী লতাটি পুতিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং, যদিচ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও নিরর্থক ব্যাখ্যারূপ গুল্ম ও কণ্টকতৃণে এই তপোবনের মাঠটি সম্প্রতি সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই পরম শ্রেয়ঃ ইহারই মধ্যে কোথাও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেই। অতএব আইস, হে সনাতন হিন্দুর দল, আমরা এই হোম-ধূম-পূত মাঠের সমস্ত ঘাস ও তৃণ চক্ষু মুদিয়া নির্ব্বিকারে চর্ব্বণ করিতে থাকি। আমরা অমৃতের পুত্র—সুতরাং সেই অমৃত-লতাটি একদিন যে আমাদের দীর্ঘ জিহ্বায় আটক খাইবেই, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ইহাতে সংশয় না থাকিতে পারে। কিন্তু অমৃতের সকল সন্তানই কাঁচা ঘাস হজম করিতে পারিবে কি না, তাহাতেও কি সংশয় নাই!

কিন্তু আমি বলি, এই উদর এবং জিহ্বার উপর নির্ভর না করিয়া বুদ্ধি এবং দৃষ্টিশক্তির সাহায্য লইয়া কাঁটাগাছগুলা বাছিয়া ফেলিয়া, সেই অমৃত-লতাটির সন্ধান করিলে কি কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং মানুষের মত দেখিতে হয় না!

ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়াছেন কিজন্য? সে কি শুধু আর একজনের লেখা শাস্ত্রীয় শ্লোক মুখস্ত করিবার জন্য? এবং একজন তাহার কি টীকা করিয়াছেন এবং আর একজন সে টীকার কি অর্থ করিয়াছেন—তাহাই বুঝিবার জন্য? বুদ্ধির আর কি কোন স্বাধীন কাজ নাই? কিন্তু বুদ্ধির কথা তুলিলেই পণ্ডিতেরা লাফাইয়া উঠেন; ক্রুদ্ধ হইয়া বারংবার চীৎকার করিতে থাকেন। শাস্ত্রের মধ্যে বুদ্ধি খাটাইবে কোন্‌খানে? এ যে শাস্ত্র! তাঁহাদের বিশ্বাস, শাস্ত্রীয় বিচার শুধু শাস্ত্র-কথার লড়াই। তাহার হেতু, কারণ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সত্য, মিথ্যা, এ-সকল নিরূপণ করা নয়। শাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা কতকাল হইতে যে এরূপ অবনত হীন হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই—কিন্তু এখন তাঁহাদের একমাত্র ধারণা যে, ব্রহ্মপুরাণের কুস্তির প্যাঁচ বায়ুপুরাণ দিয়া খসাইতে হইবে। আর পরাশরের লাঠির মার হারীতের লাঠিতে ঠেকাইতে হইবে। আর কোন পথ নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি এই কাজটা যত ভাল পারেন, তিনি তত বড় পণ্ডিত। ইহার মধ্যে শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তির স্বাভাবিক সহজ বুদ্ধির কোন স্থানই নাই। কারণ, সে শ্লোক ও ভাষ্য মুখস্থ করে নাই।

অতএব, হে শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি! তুমি শুধু তোমাদের সমাজের নিরপেক্ষ দর্শকের মত মিটমিট্ করিয়া চাহিয়া থাক, এবং শাস্ত্রীয় বিচারের আসরে স্মৃতিরত্ন আর তর্করত্ন কণ্ঠস্থ শ্লোকের গদ্‌কা ভাঁজিয়া যখন আসর গরম করিয়া তুলিবেন, তখন হাততালি দাও।

কিন্তু তামাশা এই যে, জিজ্ঞাসা করিলে এইসব পণ্ডিতেরা বলিতে পারিবেন না—কেন তাঁরা ও রকম উন্মত্তের মত ওই যন্ত্রটা ঘুরাইয়া ফিরিতেছেন! এবং কি তাঁদের উদ্দেশ্য! কেনই বা আচারটা ভাল বলিতেছেন এবং কেনই বা এটার বিরুদ্ধে এমন বাঁকিয়া বসিতেছেন। যদি প্রশ্ন করা যায়, তখনকার দিনে যে উদ্দেশ্য বা যে দুঃখের নিষ্কৃতি দেবার জন্য অমুক বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—এখনও কি তাই আছে; ইহাতেই কি মঙ্গল হইবে? প্রত্যুত্তরে স্মৃতিরত্ন তাঁহার গদ্‌কা বাহির করিয়া তোমার সম্মুখে ঘুরাইতে থাকিবেন, যতক্ষণ না তুমি ভীত ও হতাশ হইয়া চলিয়া যাও।

এইখানে আমি একটি প্রবন্ধের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, তাহাতে আপনা হইতেই অনেক কথা পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা। প্রবন্ধটি অধ্যাপক শ্রীভববিভূতি ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ এম. এ. লিখিত "ঋগ্বেদে চাতুর্ব্বর্ণ্য ও আচার"

মাঘের 'ভারতবর্ষে' প্রথমেই ছাপা হইয়া বোধ করি, ইহা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

কিন্তু আমি আকৃষ্ট হইয়াছি, ইহার শাস্ত্রীয় বিচার সনাতন পদ্ধতিতে, ইহার ঝাঁঝে এবং রৌদ্র করুণ প্রভৃতি রসের উত্তাপে এবং উচ্ছ্বাসে।

প্রবন্ধটি পড়িয়া আমার স্বর্গীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের সেই কথাটি মনে পড়িয়া গিয়াছিল।. শাস্ত্রীয় বিচারে যিনি মাথা গরম করেন, তিনি দুর্ব্বল। এইজন্য একবার মনে করিয়াছিলাম, এই প্রবন্ধের সমালোচনা না করাই উচিত। কিন্তু ঠিক এই ধরণের আর কোন প্রবন্ধ হাতের কাছে না পাওয়ায় শেষে বাধ্য হইয়া ইহারই আলোচনাকে ভূমিকা করিতে হইল। কারণ, আমি যাহার মূল্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহারই কতকটা আভাস এই 'চাতুর্ব্বর্ণ্য' প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে ভববিভূতি মহাশয় স্বর্গীয় রমেশ দত্তের উপর ভারি খাপ্পা হইয়াছেন। প্রথম কারণ, তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদাঙ্কানুসারী দেশীয় বিদ্বানগণের অন্যতম। এই পাপে তাহার টাইটেল দেওয়া হইয়াছে 'পদাঙ্কানুসারী রমেশ দত্ত'—যেমন মহামহোপাধ্যায় অমুক, রায় বাহাদুর অমুক এই প্রকার। যেখানেই স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় উল্লিখিত হইয়াছেন, সেইখানেই এই টাইটেলটি বাদ যায় নাই।' দ্বিতীয় এবং ক্রোধের মুখ্য কারণ বোধ করি এই যে, "পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রীহৃষিকেশ শাস্ত্রী মহাশয়" তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বের ৪৫ পৃষ্ঠায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীকাশীরাম বাচস্পতির টীকার নকল করিয়া 'অগ্নে' লেখা সত্ত্বেও এই পদাঙ্কানুসারী বঙ্গীয় অনুবাদকটা 'অগ্রে' লিখিয়াছে। শুধু তাই নয়। আবার 'অগ্নে' শব্দটাকে প্রক্ষিপ্ত পর্য্যন্ত মনে করিয়াছে। সুতরাং এই অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নানা প্রকার রসের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। যথা—"স্তম্ভিত হইবেন, লজ্জায় ঘৃণায় অধোবদন হইবেন এবং যদি একবিন্দুও আর্য্যরক্ত আপনাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয়, তবে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিবেন" ইত্যাদি ইত্যাদি। সব উচ্ছ্বাসগুলি লিখিতে গেলে সে অনেক স্থান এবং সময়ের আবশ্যক। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই; যাঁহার অভিরুচি হয়, তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মূল প্রবন্ধে দেখিয়া লইবেন। তথাপি এ-সকল কথা আমি তুলিতাম না। কিন্তু এই দুটা কথা আমি সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইতে চাই, আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় বিচার এবং শাস্ত্রীয় আলোচনা কিরূপ ব্যক্তিগত ও নিরর্থক উচ্ছ্বাসপূর্ণ হইয়া উঠে। এবং উৎকট গোঁড়ামি ধমনীর আর্য্যরক্তে এমন করিয়া তাণ্ডব নৃত্য বাধাইয়া দিলে মুখ দিয়া শুধু যে মান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপ-ভাষাই বাহির হয়, তাহা নয়, এমন সব যুক্তি বাহির হয়, যাহা শাস্ত্রীয় বিচারেই বল, আর যে-কোন বিচারেই বল, কোন কাজেই লাগে না। কিন্তু স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের অপরাধটা কি? পণ্ডিতের পদাঙ্ক ত পাণ্ডিত্যেই

অনুসরণ করিয়া থাকে! সে কি মারাত্মক অপরাধ? পাশ্চাত্য পণ্ডিত কি পণ্ডিত নন, যে তাঁহার মতানুযায়ী হইলেই গালিগালাজ খাইতে হইবে!

দ্বিতীয় বিবাদ ঋক্‌বেদের 'অগ্রে' শব্দ লইয়া। এই পদাঙ্কানুসারী লোকটা কেন যে জানিয়া শুনিয়াও এ শব্দটাকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়া 'অগ্রে' পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল, সে আলোচনা পরে হইবে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কি জানা নাই যে, বাঙলার অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়াও অনেক প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ, বুদ্ধিপূর্ব্বক নিরপেক্ষ আলোচনার দ্বারা যদি কোন শাস্ত্রীয় শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলাই ত শাস্ত্রের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা।

জ্ঞানতঃ চাপাচুপি দিয়া রাখা বা অজ্ঞানতঃ প্রত্যেক অনুস্বার বিসর্গটিকে পর্যন্ত নির্ব্বিচারে সত্য বলিয়া প্রচার করায় কোন পৌরুষ নাই। তাহাতে শাস্ত্রেরও মান্য বাড়ে না, ধর্ম্মকেও খাটো করা হয়। বরঞ্চ, যাহাদের শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা নাই, শুধু তাহাদেরই এই ভয় হয়, পাছে দুই-একটা কথাও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরা পড়িলে সমস্ত বস্তুটাই ঝুটা হইয়া ছায়াবাজির মত মিলাইয়া যায়। সুতরাং যাহা কিছু সংস্কৃত শ্লোকের আকারে ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সমস্তটাই হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া মানা চাই-ই।

বস্তুতঃ, এই সত্য ও স্বাধীন বিচার হইতেই ভ্রষ্ট হইয়াই হিন্দুর শাস্ত্ররাশি এমন অধঃপতিত হইয়াছে। নিছক নিজের বা দলটির সুবিধার জন্য কত যে রাশি রাশি মিথ্যা উপন্যাস রচিত এবং অনুপ্রবিষ্ট হইয়া হিন্দুর শাস্ত্র ও সমাজকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে, কত অসত্য যে বেনামীতে প্রাচীনতার ছাপ মাখিয়া ভগবানের অনুশাসন বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার সীমা-পরিসীমা নাই। জিজ্ঞাসা করি, ইহাকে মান্য করাও কি হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা করা? একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলি। কুলার্ণবের 'আমিষাসবসৌরভ্যহীনং যস্য মুখং ভবেৎ। প্রায়শ্চিত্তী স বর্জ্জ্যশ্চ পশুরেব ন সংশয়ঃ" ইহাও হিন্দুর শাস্ত্র! এ কথাও ভগবান মহাদেব বলিয়া দিয়াছেন! চব্বিশ ঘণ্টা মুখে মদ-মাংসের সুগন্ধ না থাকিলে সে একটা অন্ত্যজ জানোয়ারের সামিল। অধিকারিভেদে এই শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের দ্বারাও হিন্দু স্বর্গের আশা করে! কিন্তু তান্ত্রিকই হউক, আর যাই হউক, সে হিন্দু ত বটে। ইহা শাস্ত্রীয় বিধি ত বটে! সুতরাং স্বর্গবাসও ত সুনিশ্চিত বটে! কিন্তু তবু যদি কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত humbug বলিয়া হাসিয়া উঠেন, তাঁহার হাসি থামাইবারও কোনও উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

অথচ হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া শ্লোকটি মিথ্যা বলাতেও শঙ্কা আছে। কারণ, আর দশটা হিন্দু শাস্ত্র হইতে হয়ত বচন বাহির হইয়া পড়িবে, যে, মহেশ্বরের তৈরী এই

শ্লোকটি যদি কেহ সন্দেহ করে, তাহা হইলে সে ত সে, তাহার ৫৬ পুরুষ নরকে যাইবে। আমাদের হিন্দু শাস্ত্র ত সচরাচর একপুরুষ লইয়া বড়-একটা কথা কহে না।

শ্রীভববিভূতি ভট্টাচার্য্য এম. এ মহোদয় তাঁহার "চাতুর্ব্বর্ণ্য ও আচার" প্রবন্ধের গোড়াতেই চাতুর্ব্বর্ণ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"যে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা হিন্দু জাতির একটি মহৎ বিশেষত্ব, যাহা পৃথিবীর অন্য কোন জাতিতে দৃষ্ট হয় না—যে সনাতন সুপ্রথা শান্তি ও সুশৃঙ্খলার সহিত সমাজ পরিচালনার একমাত্র সুন্দর উপায়,—যাহাকে কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসারী দেশীয় বিদ্বান্‌গণ হিন্দুর প্রধান ভ্রম এবং তাঁহাদের অধঃপতনের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে,—সেই চাতুর্ব্বর্ণ্য কত প্রাচীন তাহা জানিতে হইলে বেদপাঠ তাহার অন্যতম সহায়।"

এই চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রসঙ্গে শুধু যদি ইনি লিখিতেন—এই কথা কত প্রাচীন, তাহা জানিতে হইলে বেদপাঠ তাহার অন্যতম সহায়, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না; কারণ, উক্ত প্রবন্ধে বলিবার বিষয়ই এই। কিন্তু ঐ যে-সব আনুষঙ্গিক বক্র কটাক্ষ, তাহার সার্থকতা কোনখানে? "যে সনাতন সুপ্রথা শান্তি ও সমাজ পরিচালনার একমাত্র সুন্দর উপায়,—" জিজ্ঞাসা করি কেন? কে বলিয়াছে? ইহা যে 'সুপ্রথা' তাহার প্রমাণ কোথায়? যে কোন একটা প্রথা শুধু পুরাতন হইলেই 'সু' হয় না। ফিজিয়ানরা যদি জবাব দেয়, "মশাই, বুড়া বাপ-মাকে জ্যান্ত পুতিয়া ফ্যালার নিয়ম যে আমাদের দেশের কত প্রাচীন, সে যদি একবার জানিতে আর আমাদের দোষ দিতে না।"

সুতরাং এই যুক্তিতে ত ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে, "হাঁ বাপু, তোমার কথাটা সঙ্গত বটে! এ-প্রথা যখন এতই প্রাচীন, তখন তো কোন দোষ নাই। তোমাকে নিষেধ করিয়া অন্যায় করিয়াছি—বেশ করিয়া জ্যান্ত কবর দাও—এমন সুবন্দোবস্ত আর হইতেই পারে না!" অতএব শুধু প্রাচীনত্বই কোন বস্তুর ভাল-মন্দর সাফাই নয়। তবে এই যে বলা হইয়াছে যে, এই প্রথা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্ত্তিত নহে, ইহা সেই পরমপুরুষের একটি 'অঙ্গবিলাস' মাত্র, তাহা হইলে আর কথা চলে না। কিন্তু আমার কথা চলুক আর না চলুক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না; কিন্তু যাহাতে যথার্থই আসিয়া যায়, অন্ততঃ আসিয়া গিয়াছে, তাহা এই যে, সেই সমস্ত প্রাচীন দিনের ঋষিদিগের অপরিমেয় অতুল্য বুদ্ধিরাশির ভরা-নৌকা এখানেই ঘা খাইয়া চিরদিনের মত ডুবিয়াছে। যে-কেহ হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই বোধ করি অত্যন্ত ব্যথার সহিত অনুভব করিয়াছেন, কি করিয়া ঋষিদিগের স্বাধীন চিন্তার শৃঙ্খল এই বেদেরই তীক্ষ্ণ খড়্গে ছিন্নভিন্ন হইয়া পথে-বিপথে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করিয়া আজ পড়িয়া আছে। চোখ মেলিলেই দেখা যায়, যখনই সেই সমস্ত বিপুল চিন্তার ধারা সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া ছুটিতে গিয়াছে, তখনই বেদ

তাহার দুই হাত বাড়াইয়া তাহাদের চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া আর একদিকে ফিরাইয়া দিয়াছে। তাহাদিগকে ফিরাইয়াছে সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত বা তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসারী দেশীয় বিদ্বানগণকে ঠিক তেমনি করিয়া নিবৃত্ত করা শক্ত। কিন্তু সে যাই হউক, কেন যে তাঁহারা এই প্রথমটিকে হিন্দুর ভ্রম এবং অধঃপতনের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অধ্যাপক মহাশয় তাহার যখন কিছুমাত্র হেতুর উল্লেখ না করিয়া শুধু উক্তিটা তুলিয়া দিয়াই ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ইহা লইয়া আলোচনা করিবার আপাততঃ প্রয়োজন অনুভব করি না।

অতঃপর অধ্যাপক মহাশয় বলেন, বৈদেশিক পণ্ডিতেরা পরমপুরুষের এই চাতুর্ব্বর্ণ্য অঙ্গবিলাসটি মানিতে চাহেন না এবং বলেন, ঋক্‌বেদের সময়ে চাতুর্ব্বর্ণ্য ছিল না। কারণ, এই বেদের আদ্য কতিপয় মণ্ডলে ভারতবাসিগণের কেবল দ্বিবিধ ভেদের উল্লেখ আছে। আর যদিই বা কোনস্থানে চাতুর্ব্বর্ণ্যের উল্লেখ থাকে, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত।

এই কথায় অধ্যাপক মহাশয় ইহাদিগকে অন্ধ বলিয়া ক্রোধে ইহাদের চোখে আঙুল দিয়া দিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। কারণ, আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ব্বিধ ভেদের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিতেও তাহা তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

তার পর 'আর্য্যং বর্ণং' শব্দটার অর্থ লইয়া উভয় পক্ষের যৎকিঞ্চিৎ বচসা আছে। কিন্তু আমরা ত বেদ জানি না সুতরাং এই 'আর্য্যং বর্ণং' শেষে কি মানে হইল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

তবে মোটামুটি বুঝা গেল যে, এই 'ব্রাহ্মণ' শব্দটা লইয়া একটু গোল আছে: কারণ, 'ব্রহ্ম' শব্দটির 'মন্ত্র' অর্থও না কি হয়!

অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন, ম্যাক্সমুলারের এত সাহস হয় নাই যে বলেন, 'ছিলই না', কিন্তু প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, হিন্দু চাতুর্ব্বর্ণ্য বৈদিক যুগে "স্পষ্টতঃ বিদ্যমান ছিল না"; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যে বিভিন্ন বৃত্তির কথা শুনা যায়—তাহার তত বাঁধাবাঁধি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে তৎকালে আবির্ভূত হয় নাই—অর্থাৎ যোগ্যতা অনুসারে যে কোন লোক যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত।

আমার ত মনে হয়, পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার জোর করিয়া 'ছিলই না' না বলিয়া নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাতেই শুধু অর্জ্জিত হয়। কিন্তু প্রত্যুত্তরে ভববিভূতিবাবু বলিতেছেন,—"সায়ণ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া না হয় তাঁহার ব্যাখ্যা উড়াইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইতে পার, কি সেই অপৌরুষেয় বেদেরই অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যখন 'ব্রাহ্মণস্পতি' অর্থে ব্রাহ্মণপুরোহিত [ঐ. ব্রা. ৮।৫।২৪, ২৬] করিলেন, তখন তাহা কি বলিয়া উড়াইয়া দিবে? ব্রাহ্মণ্যশক্তি যে সমাজ ও রাজশক্তির নিয়ন্ত্রী ছিল, তাহা আমরা ঋগ্বেদেই দেখিতে পাই।"

পাওয়াই ত উচিত। কিন্তু কে উড়াইয়া দিতেছে এবং দিবার প্রয়োজনই বা কি হইয়াছে, তাহা ত বুঝা গেল না! ব্রাহ্মণ পুরোহিত—বেশ ত! পুরোহিতের কাজ যিনি করিতেন, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা হইত। যজন-যাজন করিলে ব্রাহ্মণ বলিত; যুদ্ধ, রাজ্য-পালন করিলে ক্ষত্রিয় বলিত—এ কথা ত তাঁহারা কোথাও অস্বীকার করেন নাই। আদালতে বসিয়া যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহাদিগকে জজ বলে, উকিল বলে। শ্রীযুক্ত গুরুদাসবাবু যখন ওকালতি করিতেন, তাঁহাকে লোকে উকিল বলিত, জজ হইলে জজ বলিত। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার আছে কি? ব্রহ্মণ্যশক্তি বৈদিক যুগে রাজশক্তির নিয়ন্ত্রী ছিল। ইংরাজদের আমলে বড়লাট ও মেম্বারেরা তাহাই, সুতরাং এই মেম্বারেরা রাজশক্তির নিয়ন্ত্রী ছিল বলিয়া একটা কথা যদি ভারতবর্ষের ইংরাজী ইতিহাসে পাওয়া যায় ত তাহাতে বিস্মিত হইবার বা তর্ক করিবার আছে কি? অথচ লাটের ছেলেরা লাটও হয় না, মেম্বার বলিয়াও কোন স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব নাই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের প্রাচীনতা-সম্বন্ধে শুনিতে পাই, নানাপ্রকারের মতভেদ আছে। এই সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার একটি অতিবড় অপকর্ম্ম করিয়াছেন—তিনি লিখিয়াছেন—"কবষ শূদ্র হইয়াও দশম মণ্ডলের অনেকগুলি মন্ত্রের প্রণেতা (?)।"

'দ্রষ্টা' বলা তাঁহার উচিত ছিল! এই হেতু ভববিভূতিবাবু ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া (?) চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু আমি বলি, বিদেশীর সম্বন্ধে অত খুঁটিনাটি ধরিতে নাই। কারণ, এই দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে সোম ও সূর্য্যের বিবাহ বর্ণনা করিয়া তিনি নিজেই বলিয়াছেন, এমন পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আকাশের গ্রহ-তারার সম্বন্ধ বাঁধিবার চেষ্টা জগতের আর কোন সাহিত্যে দেখা যায় কি? এমন চেষ্টা জগতে আর কোন সাহিত্যে দেখা না যাইতে পারে; কিন্তু কোন একটা উদ্দেশ্য সাধন করিবার অভিপ্রায়ে বৈদিক কবিকে যে শ্লোকটি বিশেষ করিয়া সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, তাহাকে বিদেশীয় কেহ যদি সেই কবির রচিত বলিয়া মনে করে, তাহাতে রাগ করিতে আছে কি? কিন্তু সে যাই হোক, সূক্তটি যে রূপকমাত্র, তাহা ভববিভূতিবাবু নিজেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, অপৌরুষের বেদের অন্তর্গত সূক্তরাশির মধ্যেও এমন সূক্ত রহিয়াছে যাহা রূপকমাত্র, অতএব খাঁটি সত্য হইতে বাছিয়া ফেলা অত্যাবশ্যক। এই অত্যাবশ্যক কাজটি যাহাকে দিয়া করাইতে হইবে, সে বস্তু কিন্তু বিশ্বাসপরায়ণতা বা ভক্তি নহে—সে মানুষের সংশয় এবং তর্কবুদ্ধি। অতএব ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাহাকেই সকলের উপর স্থান দান করিতেই হইবে। না করিলে মানুষ মানুষই হইতে পারে না। কিন্তু, এই মনুষ্যত্ব চিরদিন সমভাবে থাকে না—সেইজন্য ইহাও কল্পনা করা অসম্ভব নয় যে, হয়ত এই

ভারতেই একদিন ছিল, যখন এই চন্দ্র ও সূর্য্যের বিবাহ-ব্যাপারটা খাঁটি সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে মানুষ ইতস্ততঃ করে নাই। আবার আজ যাহাকে সত্য বলিয়া আমরা অসংশয়ে বিশ্বাস করিতেছি, তাহাকেই হয়ত আমাদের বংশধরেরা রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিবে। আজ আমরা জানি, সূর্য্য এবং চন্দ্র কি বস্তু এবং এইরূপ বিবাহ-ব্যাপারটাও কিরূপ অসম্ভব; তাই ইহাকে রূপক বলিতেছি। কিন্তু এই সূক্তই যদি আজ কোন পল্লীবাসিনী বৃদ্ধা নারীর কাছে বিবৃত করিয়া বলি, তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে বিন্দুমাত্রই দ্বিধা করিবেন না! কিন্তু তাহাতে কি বেদের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবে? ভববিভূতিবাবু ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত উদ্ধৃত করিতে গিয়া কঠিন হইয়া বলিতেছেন,—"ইহাতেও কাহারও সন্দেহ থাকিলে তাহার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত বা প্রখ্যাত 'পুরুষসূক্তের' দ্বাদশ ঋক্‌টি দেখাইয়া দিব, যথা—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।

উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

অর্থ—"সেই পরমপুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে রাজন্য বা ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। ইহার অপেক্ষা চাতুর্ব্বর্ণ্যের আর স্পষ্ট উল্লেখ কি আর হইতে পারে?

এই সূক্তটির বিচার পরে হইবে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের উদ্দেশ্য ভববিভূতিবাবু যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ইনি বলিতেছেন, "আমাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথার অর্ব্বাচীনতা প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের ভারতীয় সভ্যতাকে আধুনিক জগৎসমক্ষে প্রচার করা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রধান উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যর বশবর্ত্তী হইয়া ইত্যাদি—"

এরূপ উদ্দেশ্যকে সকলেই নিন্দা করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্ত উদ্দেশ্যেরই একটা অর্থ থাকে। এখানে অর্থটা কি? একটা সত্য বস্তুর কদর্থ বা কু-অর্থ করার হেয় উপায় অবলম্বন করিয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যকে বৈদিক যুগ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া তাহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রতিপন্ন করায় এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের লাভটা কি? শুধু চাতুর্ব্বর্ণ্যই কি সভ্যতা? ইহাই কি বেদের সর্ব্বপ্রধান রত্ন? চাতুর্ব্বর্ণ্য বৈদিক যুগে থাকার প্রমাণ আমরা দাখিল না করিতে পারিলেই কি জগৎসমক্ষে প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে যে, আমাদের পিতামহেরা বৈদিক যুগে অসভ্য ছিল? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মিশর, বেবিলন প্রভৃতি দেশের সভ্যতা ৮।১০ হাজার বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের বেলাই তাঁহাদের এতটা নীচতা প্রকাশ করিবার হেতু কি?

তা ছাড়া, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ঋক্‌বেদের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া

গিয়াছেন, তাহার সহিত ভববিভূতিবাবুর এই মন্তব্য খাপ খায় না। আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না (এবং বইখানাও হাতের কাছে নাই), কিন্তু মনে যেন পড়িতেছে, তিনি Kant এর Critique of the Pure Reason এর ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—জগতে আসিয়া যদি কিছু শিখিয়া থাকি ত সে ঋক্‌বেদ ও এই Critique হইতে। একটা গ্রন্থের ভূমিকায় আর একটা গ্রন্থের উল্লেখ এমন অযাচিতভাবে করা সহজ শ্রদ্ধার কথা নয়।

তবে যে কেন তিনি ইহাকেই খাটো করিয়া দিবার প্রয়াস করিয়া "আশাতীত সঙ্কীর্ণ অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছেন", তাহা ভববিভূতিবাবু বলিতে পারেন। যাই হউক, এই "হিন্দুজাতির প্রাণস্বরূপ" ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তটি অপৌরুষেয় ঋকবেদেরই অন্তর্গত থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদাঙ্কানুসারী বঙ্গীয় অনুবাদক তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করায় ভববিভূতি মহাশয় "বড়ই কাতরকণ্ঠে দেশের আশা-ভরসাস্থল ছাত্রবৃন্দ ব্রাহ্মণতনয়গণ"কে ডাকাডাকি করিতেছেন, সেই সূক্তটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহাকেও ডাক দেওয়া উচিত নয়। ইতিপূর্ব্বেই এই ১০ম মণ্ডলেরই ৮৫ সূক্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে; তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রখ্যাত ৯০ সূক্তটি কি? ইহা পরমপুরুষের মুখ-হাত-পা দিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতির তৈরি হওয়ার কথা। কিন্তু ইহা জটাপাট, পদপাঠ, শাকল, বাস্কল দিয়া যতই যাচাই হইয়া গিয়া থাকুক না কেন, বিশ্বাস করিতে হইলে অন্ততঃ আরও শ-চারেক বৎসর পিছাইয়া যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু সে যখন সম্ভব নহে, তখন আধুনিককালে সংসারের চৌদ্দ আনা শিক্ষিত সভ্য লোক যাহা বিশ্বাস করেন—সেই অভিব্যক্তির পর্য্যায়েই মানুষের জন্ম হইয়াছে বলিয়া মানিতে হইবে। তার পর কোটি কোটি বৎসর নানাভাবে তাহার দিন কাটিয়া, শুধু কাল, না হয় পরশু সে সভ্যতার মুখ দেখিয়াছে। এ-পৃথিবীর উপর মানবজন্মের তুলনায় চাতুর্ব্বর্ণ্য ঋগ্বেদে থাকুক আর না-থাকুক, সে কালকের কথা। অতএব হিন্দু-জাতির প্রাণস্বরূপ এই সূক্তটিতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি যেভাবে দৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত না হইলেও খাঁটি সত্য জিনিস নয়—রূপক।

কিন্তু ভয়ানক মিথ্যা, তদপেক্ষা ভয়ানক সত্য-মিথ্যায় মিশাইয়া দেওয়া। কারণ, ইহাতে না পারা যায় সহজে মিথ্যাকে বর্জ্জন করা, না যায় নিষ্কলঙ্ক সত্যকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় গ্রহণ করা। অতএব, এই রূপকের মধ্য হইতে নীর ত্যজিয়া ক্ষীর শোষণ করা বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধির তারতম্য-অনুসারে একজন যদি ইহার প্রতি অক্ষরটিকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করে এবং আর একজন সমস্ত সূক্তটিকে মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, তখন অপৌরুষেয়ের দোহাই দিয়া তাহাকে ঠেকাইবে কি করিয়া? সে যদি কহিতে থাকে, ইহাতে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম,

বৈশ্যের ধর্ম্ম, শূদ্রের ধর্ম্ম—এই চারি প্রকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, জাতি বা মানুষ নয় অর্থাৎ সেই পরমপুরুষের মুখ হইতে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি এক শ্রেণীর বৃত্তি; তাহাকেই ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ বলিবে। হাত হইতে ক্ষত্রিয়—অর্থাৎ বল বা শক্তির ধর্ম্ম। এই প্রকার অর্থ যদি কেহ গ্রহণ করিতে চাহে, তাহাকে 'না' বলিয়া উড়াইয়া দিবে কি করিয়া? কিন্তু এইখানে একটা প্রশ্ন করিতে চাহি। এই যে এতক্ষণ ধরিয়া ঠোকাঠুকি কাটাকাটি করিয়া কথার শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, তাহা কাহার কি কাজে আসিল? মনের অগোচর ত পাপ নাই? কতকটা বিদ্যা প্রকাশ করা ভিন্ন কোন পক্ষের আর কোন কাজ হইল কি? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যদি বলিয়াই ছিলেন, চাতুর্ব্বর্ণ্য হিন্দুর বিরাট ভ্রম এবং অধঃপতনের অন্যতম কারণ এবং ইহা ঋক্‌বেদের সনয়েও ছিল না—তবে ভববিভূতিবাবু যদি প্রতিবাদই করিলেন, তবে শুধু গায়ের জোরে তাঁদের কথাগুলা উড়াইয়া দিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া কেন প্রমাণ করিয়া দিলেন না, এ-প্রথা বেদে আছে! কারণ, বেদ অপৌরুষেয়, তাঁহার ভুল হইতে পারে না—জাতিভেদ প্রথা সুশৃঙ্খলার সহিত সমাজ-পরিচালনের যে সত্য-সত্যই একমাত্র উপায়, তাহা এই সব বৈজ্ঞানিক, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নজির তুলিয়া দিয়া প্রমাণ করিয়া দিলাম। তবে ত তাল ঠুকিয়া বলা যাইতে পারিত, এই দেখ, আমাদের অপৌরুষেয় বেদে যাহা আছে, তাহা মিথ্যাও নয় এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া হিন্দু ভুলও করে নাই, অধঃপথেও যায় নাই। তা যদি না করিলেন, তবে তাঁহারা জাতিভেদকে ভ্রমই বলুন, আর যাই বলুন, সে-কথার উল্লেখ করিয়া শুধু শ্লোকের নজির তুলিয়া উহাদিগকে কানা বলিয়া, সঙ্কীর্ণচেতা বলিয়া, আর রাশি রাশি হা-হুতাশ উচ্ছ্বাসের প্রবাহ বহাইয়া দিয়াই কি কোন কাজ হইবে? বেদের মধ্যেও যখন রূপকের স্থান রহিয়াছে, তখন বুদ্ধি-বিচারেরও অবকাশ আছে। সুতরাং শুধু উক্তিকেই অকাট্য যুক্তি বলিয়া দাঁড় করানো যাইবে না। আমি এই কথাটাই আমার এই ভূমিকায় বলিতে চাহিয়াছি।

অতঃপর হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার বিবাহের কথা। ইনি প্রথমেই বলিতেছেন, "হিন্দুর এই পবিত্র বিবাহপদ্ধতি বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে,—ঋগ্বেদের সময়ে যেভাবে নিষ্পন্ন হইত, আজও—একালের বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষেও তাহা অণুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই।" অণুমাত্রও পরিবর্ত্তিত যে হয় নাই, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণে সুস্পষ্ট করিয়াছেন—

"তখনও বরকে কন্যার গৃহে গিয়া বিবাহ করিতে হইত,—এখনও তাহা হইয়া থাকে। আবার বিবাহের পর শোভাযাত্রা করিয়া বহুবিধ অলঙ্কারভূষিতা কন্যাকে লইয়া শ্বশুর-দত্ত নানাবিধ যৌতুক সহিত তখনও যেমন বর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন, এখনও সেইরূপ হইয়া থাকে। বিবাহযোগ্যকালে কন্যা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু ঐ বয়সের কোন পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই। কন্যা শ্বশুরালয়ে

আসিয়া কর্ত্রীর স্থান অধিকার করিতেন, এবং শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর ও ননদগণের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতেন অর্থাৎ সকলকে বশ করিতেন।”

অতঃপর এই সকল উক্তি সপ্রমাণ করিতে নানাবিধ শ্লোক ও তাহার মন্তব্য লিখিয়া দিয়া বোধ করি অসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, এই সকল আচার-ব্যবহার বৈদিক কালে প্রচলিত ছিলই। ভালই।

কিন্তু এই যে বলিয়াছেন—বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের বিবাহপদ্ধতি যেমনটি ছিল, আজও এই বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষেও ঠিক তেমনটি আছে, 'অণুমাত্র' পরিবর্ত্তিত হয় নাই—ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। কারণ, পরিবর্ত্তিত না হওয়ায় বলিতেই হইবে, আজকালকার প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতিটিও ঠিক তেমনি নির্দ্দোষ এবং ইহাই বোধ করি বলার তাৎপর্য্য! কিন্তু এই তাৎপর্য্যটির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। বলিতেছে—“কন্যা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কন্যার বয়সের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই।” অর্থাৎ বুঝা যাইতেছে, আজকাল যেমন মেয়ের বয়স বারো উত্তীর্ণ হইয়া তেরোয় পড়িলেই ভয়ে এবং ভাবনায় মেয়ের বাপ-মায়ের জীবন দুর্ভর হয়ে উঠে এবং চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ এবং পেটের ভাত চাল হইতে থাকে, তখনকার বৈদিক কালে এমনটি হইতে পারিত না। ইচ্ছামত বা সুবিধামত মেয়েকে ১২।১৪।১৮।২০ যে-কোন বয়সেই হউক, পাত্রস্থ করা যাইতে পারিত। আর এমন না হইলে কন্যা শ্বশুরবাড়ি গিয়াই যে শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-দেবরের উপর প্রভু হইয়া বসিয়া থাইত, সে নেহাত কচী খুকীটির কর্ম্ম নয় ত।

রাগ দ্বেষ অভিমান—গৃহিণীপনার ইচ্ছা প্রভৃতি যে সেকালে ছিল না—বউ বাড়ি ঢুকিবামাত্রই তাঁহার হাতে লোহার সিন্দুকের চাবিটি শাশুড়ী-ননদে তুলিয়া দিত, সেও ত মনে করা যায় না।

যাহা হউক, ভববিভূতিবাবুর নিজের কথা মত বয়সের কড়াকড়ি তখন ছিল না। কিন্তু এখন এই কড়াকড়িটা যে কি ব্যাপার, তাহা আর কোন ব্যক্তিকেই বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই বোধ করি।

দ্বিতীয়তঃ ইনি বলিয়াছেন যে, “এইসকল উপঢৌকন কেহ যেন বর্ত্তমানকালে প্রচলিত কদর্য্য পণপ্রথার প্রমাণরূপে গ্রহণ না করেন। এগুলি কন্যার পিতার স্বেচ্ছাকৃত, সামর্থ্যানুরূপ দান বুঝিতে হইবে।”

কিন্তু এখনকার উপঢৌকন যোগাইতে অনেক পিতাকে বাস্তুভিটাটি পর্য্যন্ত বেচিতে হয়। সে সময় কিন্তু অপৌরুষেয় ঋকমন্ত্র মেয়ের বাপেরও এক তিল কাজে আসে না, বরের বাপকেও বিন্দুমাত্র ভয় দেখাইতে, তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। তৃতীয়তঃ—রাশীকৃত শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া

প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, যে-মেয়ের ভাই ছিল না, সে মেয়ের সহিত তখনকার দিনে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এবং বলিতেছেন, অথচ, আজকাল এই বিবাহই সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক। কারণ, বিষয়-আশয় পাওয়া যায়। যদিচ, এতগুলি শাস্ত্রীয় শ্লোক ও তাহার অর্থাদি দেওয়া সত্বেও মোটাবুদ্ধিতে আসিল না, ভাই না হওয়ায় বোনের অপরাধ কি এবং কেনই বা সে ত্যাজ্যা হইয়াছিল, কিন্তু এখন যখন ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, তখন ইহাকেও একটা পরিবর্ত্তন বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। তবেই দেখা যাইতেছে, (১) তখন মেয়ের বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট ছিল না, এখন ইহাই হইয়াছে বাপ-মায়ের মৃত্যুবাণ।

(২) স্বেচ্ছাকৃত উপঢৌকন দাঁড়াইয়াছে বাস্তুভিটা বেচা এবং (৩) নিষিদ্ধ কন্যা হইয়াছেন সবচেয়ে-সুসিদ্ধ মেয়ে।

ভববিভূতিবাবু বলিবেন, তা হোক না, কিন্তু এখনও ত বরকে সেই মেয়ের বাড়িতে গিয়াই বিবাহ করিতে হয় এবং শোভাযাত্রা করিয়া ঘরে ফিরিতে হয়। এ ত আর বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষ একতিল পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই? তা পারে নাই সত্য, তবুও মনে পড়ে, সেই যে কে একজন খুব খুশী হইয়া বলিয়াছিল,— 'অন্নবস্ত্রের দুঃখ ছাড়া আর দুঃখ আমার সংসারে নেই!"

আবার ইহাই সব নয়। "বিবাহিতা পত্নী যে-গৃহের প্রধান অঙ্গ,—গৃহিণীর অভাবে যে গৃহ জীর্ণারণ্যের তুল্য," তাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয় "গৃহিণীং গৃহমুচ্যতে"— এই প্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য হইতে সম্প্রতি অবগত হইয়াছেন। আবার ঋগ্বেদ পাঠেও প্রবাদটির সুপুরাতনত্বই সূচিত হইয়াছে। যথা—[৩ ম, ৫৩ সূ, ৪ ঋক্]

"জায়েদস্তং মঘবন্তসেদু যোনিঃ"

অর্থাৎ, হে মঘবন্—জায়াই গৃহ, জায়াই যোনি। সুতরাং বহু প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুগণ রমণীগণের প্রতি আদর ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। আবার তাঁহাদের পত্নী কিরূপ মঙ্গলময়ী, তাহা—"কল্যাণীর্জায়া…গৃহে তে" [৩ ম, ৫৩ সূ, ৬ ঋক্] হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়। সুতরাং—

"কিন্তু, তথাপি, বৈদেশিকগণ কেন যে হিন্দুগণের উপর রমণীগণের প্রতি কঠোর ব্যবহারের জন্য দোষারোপ করেন, তাহা তাহারাই জানেন।"

এই সকল প্রবন্ধ ও মতামতের যে প্রতিবাদ করা আবশ্যক সে কথা অবশ্য কেহই বলিবেন না। আমিও একেবারেই করিতাম না, যদি না ইহা আমার প্রবন্ধের ভূমিকা-হিসাবেও কাজে লাগিত। তথাপি প্রতিবাদ করিতে আমি চাহি না—কিন্তু ইহারই মত "বড়ই কাতরকণ্ঠে" ডাকিতে চাহি—ভগবান! এই সমস্ত শ্লোক আওড়ানোর হাত হইতে এই হতভাগ্য দেশকে রেহাই দাও। ঢের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লইয়াছ, এইবার একটু নিষ্কৃতি দাও।—শ্রীমতী অনিলা দেবী।

নারীর লেখা

নাক ডাকিতেছিল বলিয়া জাগাইয়া দিলে পুরুষমানুষ অপ্রতিভ হইয়া পাশ ফিরিয়া শোয়। মুখে স্বীকার করে না,—হয়ত বা, মনে মনে রাগও করে। এবং মিনিট-দুই পরেই এ-পাশ ফিরিয়া যাহা করিতেছিল ও-পাশ ফিরিয়াও তাহাই করিতে থাকে। এটা পুরুষের স্বভাব। কিন্তু স্ত্রীলোক একেবারে মরিতে আসে। দিব্যি করিয়া বলে, কক্ষণ না; যে যাই বলুক ও দোষটি তাহার নাই—নাক তাহার ডাকিতেই পারে না। অতঃপর তর্ক নিষ্ফল। করিলে কলহ হয়—আর কিছু হয় না। ঘুমন্ত অবস্থায় একটুখানি শব্দ করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতেছে বলায় যে মারাত্মক অপবাদ দেওয়া হয় না, একথা স্ত্রীলোক অপরের বেলায় যত সহজেই বুঝুক নিজের বেলায় বোঝে না। এটি তাহাদের স্বভাব।

সুতরাং আমার বক্তব্য যদি তাহাদের নিকটে অবোধ্য রহিয়াই যায়, তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য হইব না। ইহার প্রায় জোড়া আর একটা ব্যাপার আছে—সেটা অনুকরণ করা। পূর্ব্বেরটা শরীরের ধর্ম্ম, পরেরটা মনের। অতএব, অনিচ্ছাতেও যেমন নাক ডাকে, ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তেমনি অনুকরণ করা হয়। 'ডাকানো' অর্থে যেমন ইচ্ছা করিয়া ডাকান নয়, 'অনুকরণ করা' মানে ইচ্ছা করিয়াই করা এমন অর্থ না হইতেও পারে। অথচ, নাক ডাকিতেছিল বলিলে খুশী হই না, কেন করিতেছিলাম দেখাইয়া দিলেও কৃতজ্ঞতায় বুক ভরিয়া উঠে না। এসব জানি, কিন্তু একটু সতর্ক হইয়া পাশ ফিরিয়া শোওয়া কি উচিত নয়? এখন কথা যদি উঠে, এ দুইটার কোনটার উপরে সত্যিই যদি হাত নাই, এবং ইচ্ছা করিয়াও করি না, এবং দেহ-মনের ইহারা অতি স্বাভাবিক ক্রিয়াই হয়, তবে লজ্জা পাওয়াই বা কেন, আর লজ্জা দেয়ই বা কে! অবশ্য, লজ্জা পাওয়া না-পাওয়া স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু লজ্জা দিবার অধিকার তাহার আছেই, যে ব্যক্তি তখনও জাগিয়া আছে এবং ডাকের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিশ্রামের অবসর পাইতেছে না। সুতরাং, স্বেচ্ছায় করিতেছি না বলিয়াই সংসারে সব জিনিসের যে জবাবদিহি হয় না, এ-কথা তাহাকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক, যে লোক ঘুমাইতেছে এবং যে লোক নকল করার মধ্যে একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, শ্বাস-প্রশ্বাসের চলিত প্রথাটা অতিক্রম করিয়া গেলেও লোক বিরক্ত হয়, এবং ভাল জিনিসের অনুকরণ কর্ত্তব্য এবং স্বাভাবিক হইলেও তাহার নির্দ্দিষ্ট সীমা ডিঙাইয়া গেলেও লোকে নিন্দা করে।

ভালর অনুকরণ করিও না, এমন কথা বলিবার অধিকার নিশ্চয়ই কাহারো নাই। কিন্তু, "আর না,—থামো!" এ-কথা বলিবার অধিকার সমাজের লোকের আছেই। একটা দৃষ্টান্ত দিই,—

মিসেস্ বিশ্বাসের পোষাকের কাট-ছাঁট অতি চমৎকার। তেমনি পোষাকে নিজেকে সজ্জিত করিতে দোষ নাই, কিন্তু তাঁর কোমরের ঘেরটা হয়ত সওয়া তিন হাত। গাউনে কাপড় লাগে সাড়ে দশ গজ। হুবহু নকল করিব বলিয়া তোমার কাঠপানা দেহে ঠিক ঐ সাড়ে দশগজি গাউন জড়াইয়া পথে বাহির হইলে লোকে হাসিবে বৈকি! ভাল জিনিসের অনুকরণ করিতে গিয়া তুমি ভাল কাজেরই সূত্রপাত করিয়াছিলে মানি, কিন্তু অনুকরণের নেশায় এমনি মাতিয়া গেলে যে, নিজের দেহটার পানেও একবার চাহিয়া দেখিলে না। ইহাতে তোমার যে শুধু নকল করিবার সদুদ্দেশ্যটাই নিষ্ফল হইয়া গেল তাহা নহে, তোমার নিজের সৌন্দর্য্যও গেল, তোমার কাপড়ের দাম ও মজুরি নষ্ট হইল। পথের লোকের 'বাহবাটা' ত ফাউ। রবিবাবুর লেখা খুব ভাল। তাঁকে নকল করার ইচ্ছাও স্বাভাবিক, এবং করিবার চেষ্টাও সাধু। কিন্তু একেবারে রবিবাবুই হইব এমন পণ করিতে গেলে চলিবে কেন? দেখিতে পাওয়া উচিত যে, তোমার গায়ে তাঁর সাড়ে দশগজি গাউন সার্কাসের ঐ কাহাদের মতই মানাইয়াছে। তাঁর লেখার দোষই বল, আর গুণই বল, পড়িলেই মনে হয় এ ত খুব সোজা। লিখিলে আমিও এমন পারি। তাঁর উপমাগুলা এতই স্বাভাবিক এবং সরল যে, দেখিবামাত্রই মনে হয়—বাঃ—এ ত আমিও জানি—উপমা দিবার প্রয়োজন হইলে ঠিক এইটি ত আমিও দিতাম। কিন্তু ভ্রান্ত অনুকরণ-প্রয়াসীরা ভাবিয়াও দেখে না যে, কোহিনুরের নকল হয় না—টেটের ডায়মণ্ড হয়। আসলটা পাইলে সাত পুরুষ রাজার হালে বসিয়া খাইতে পারে, নকলটার দামে একবেলার বাজার-খরচ চলে না।

রবিবাবু কতকগুলো শব্দ প্রায়ই ব্যবহার করেন। সেগুলো এবং তাহার উপমা ও লিখিবার প্রণালী আজকালকার সাহিত্যসেবী নর-নারীরা কিরূপে যে বিকৃত করিতেছেন, তাহা দেখিলে ক্লেশ বোধ হয়। তিনি যাঁহাদের গুরু, তাঁহাদের উচিত তাঁকে বুঝিবার চেষ্টা করা, তাঁকে শ্রদ্ধা করা। ভিতরে ভিতরে ইঁহারা, শ্রদ্ধা করেন কি না, এ-কথা অবশ্য বলিতে পারি না; কিন্তু বাহিরে ভ্যাঙচানির চোটে গুরুজীর হাড় পর্য্যন্ত যে কালি হইবার উপক্রম হইয়াছে, সে কথা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। সে বেচারা যাই বলেন, ব্যাঘ্র! তাঁর ভক্তেরা অমনি ছুটিয়া আসিয়া দুই হাত নাড়িয়া বুঝাইয়া দিয়া যায়—অর্থাৎ, শার্দ্দূল! দুই একটা নজির দিতেছি। অবশ্য পুরুষদের কথা বলিতে চাহি না। তাঁহাদের কথা তাঁহারাই বলিবেন—এবং মাঝে মাঝে কেহ বলেনও, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। ঐ ডান পাশ আর বাঁ পাশ। আমি শুধু দুই-একটি মহিলা সরস্বতীর কথা উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

আজকাল যাঁহারা বড় লিখিয়ে হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষজায়া, অনুরূপা ও নিরুপমা দেবীর নাম প্রায় সকলেই জানেন। ইহাদের অজস্র গদ্য পদ্য কোন একখানা মাসিক হাতে তুলিয়া লইলেই দেখিতে

পাওয়া যায়। আজ ইঁহাদের কথাই বলি। শ্রীমতী ঘোষজায়ার লেখা নাকি রবিবাবুর লেখা বলিয়া অনেকের ভ্রমও হয়। অবশ্য ভ্রমের হেতুও আছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রবিবাবুর সত্য অনুকরণ যত কঠিনই হউক, বিকৃত করা খুব সহজ। ও আর কিছু নয়—আমার নিম্নলিখিত এই তালিকাটি মুখস্থ করিলেই হইবে। যদি মুখস্থ না হয়, বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া টেবিলের সম্মুখে টাঙ্গাইয়া দিয়া নিজের রচনার মধ্যে মধ্যে এক একটা প্রবেশ করাইয়া দিলেই কাজ হইবে। হরির লুটের বাতাসা কোঁচড়েই পড়ুক, আর পায়ের নীচেই পড়ুক, নিষ্ফল হইবে না। মুখস্থ করুন—পরিণতি, বিশ্ব, মানব, দেহাম্বয়, ভূমিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, মুখর, চাই-ই, বনস্পতি, প্রয়োজন হইয়াছে, ফাঁকি, দৈন্য, পুষ্টি-সাধন, দেবতা, অমৃত, শ্রেয়, ভূমা, আশীর্ব্বাদ, অর্ঘ্য, আবহমানকাল, শ্রেষ্ঠ, বাণী, খাঁটি, ভারতবর্ষ, নিষ্ঠা, জাগ্রত, জন্ম, সত্ব, দিন আসিয়াছে, তপশ্চর্য্যা, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, জো-নাই, খাটো, পাৎলা, ডাক পড়িয়া গিয়াছে, মুক্তির আনন্দ ও ত্যাগের আনন্দ। ব্যস, এই কয়টিই যথেষ্ট। একটা রচনার মধ্যে সব ক'টা ব্যবহার করিতে পার উত্তম, না পার ভূমা, অর্ঘ্য, দেবতা, বৈরাগ্য ও ভারতবর্ষ এই পাঁচটি চাই-ই। অন্যথা রচনাই নয়। এখন কেহ যদি অবিশ্বাস করিয়া বলেন, তা কি হয়? শব্দগুলো যদৃচ্ছা গুঁজিয়া দিলে লোকে ধরিয়া ফেলিবে যে! ইহার উত্তরে আমার নজির দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। গত অগ্রহায়ণের ভারতীতে শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষজায়ার আট পাতা জোড়া এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। নাম "মনুষ্যত্বের সাধনা"। টাইটেল দেখিয়াই 'বাপ্‌রে!' করিয়া উঠিলে চলিবে না। ভক্তি করিয়া পড়া চাই। আমার তালিকার প্রায় সকল শব্দগুলোই ইহাতে আছে, সুতরাং ইহা খুব ভাল, এবং শিক্ষা হইবে। তবে, অভিধানের সাহায্যে সবটুকু পড়িয়া কেহ যদি শেষকালে বলেন, এই আট পাতার ত আট ছত্রেরও মানে হয় না, তাহা হইলে আমি চুপ করিয়া থাকিব বটে, কিন্তু কবুল করিব না, এবং মনে মনে রাগ করিয়া বলিব, তবু তোমার শিক্ষা হইল ত! যাহা হউক, আমি নজির দিব বলিয়াছি, কিন্তু সমালোচনা করিব বলি নাই। সমালোচনা করা পণ্ডশ্রম। আমি বলিব, তোমার রচনার মানে নাই; তুমি জবাব দিবে, 'আছে।' আমি বলিব, এই জায়গাটায় বাড়াবাড়ি কারিয়াছ; তুমি বলিবে, "একটুও না; এমন না করিলে লেখা ফুটিত না।" আমি বলিব, "এই স্থানটার আর একটু প্রকাশ করা উচিত ছিল"; তুমি বলিবে, "নিশ্চয় না; আর প্রকাশ করিতে গেলে আর্ট মাটি হইয়া যাইত।" বাস্তবিক, এ-সব তর্কের মীমাংসা হয় না। একেই লেখা বলে এবং এই বিবেচনার উপরেই লেখকের যথার্থ কৃতিত্ব নির্ভর করে। সমালোচনা করিয়া দোষ-গুণ দেখাইয়া নিন্দা বা সুখ্যাতি করা যায় বটে, কিন্তু আর কোন কাজ হয় না।

যাহা হউক, যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহাই বলি। উক্ত প্রবন্ধে শ্রীমতী ঘোষজায়া বলিতেছেন, "ভারতবর্ষ আজ অকস্মাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়া দেখিতেছে, যে জনপদের পথ ধরিয়া সে চলিতেছিল তাহা প্রকৃত নয়, মায়া সৃষ্টি মাত্র, অকস্মাৎ আজ তাহা দিগন্ত-বিলীন 'বাণীর' ভিতর কোথায় মিলিয়া গিয়াছে।" ভাষা বটে! জনপদের পথ দিগন্ত-বিলীন বাণীর মধ্যে মিশিয়া গেল! জিজ্ঞাসা করি, রবিবাবু কোথাও কি এমনি করিয়া 'বাণীর' শ্রাদ্ধ করিয়াছেন? কিছুদিন পূর্ব্বে লেখিকা 'বিকাশ' পত্রিকায় একটি দশ-বার লাইনের কবিতায় 'ব্যোম' এর সঙ্গে মিলাইবার জন্য 'শশি সূর্য্য সোম' লিখিয়াছিলেন। কবিতার কথা না হয় নাই ধরিলাম—কেন না, 'ব্যোম, এর 'ম' 'সোম' ছাড়া মিলিতে চায় না। 'শশী'টিকেও বাদ দিলে অক্ষর কম পড়ে। কিন্তু, জন পদেঁর পথের অমন কোন ধনুক-ভাঙ্গা পণ ছিল না যে, ঐ 'বাণী'টি না পাইলে আর মিলিত না! কবিকে অঙ্কুশ দেখাইতে নিষেধ আছে তাহা মানি কিন্তু তার্কিক যখন ঘর ছাড়িয়া লাঠি-হাতে মারিতে আসে, তখনও যে একটুখানি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে নাই এ-কথা মানি না। সেটা 'কাব্যি'! কিন্তু এটা যে দার্শনিক প্রবন্ধ! দার্শনিক প্রবন্ধ যখন একশ টাকার দাবী করে, তখন সে ঐ ক্ষুদ্র তিনটি অক্ষরের 'একশ' টাকাই চায়, তাহাকে "নব-নবতি রজত-মুদ্রা" দিতে গেলে সে হাত পাতিয়া গ্রহণ করে না। কিন্তু আসল কথা এই যে, 'বাণী' রবিবাবু লেখেন সুতরাং সেটা চাই-ই।

যদিও নাটক-নভেলে অত দোষ নাই, তথাপি অনুরূপা যখন 'পোষ্যপুত্রে' লিখিলেন "পথে শব্দ মুখর হইয়া উঠিল" তখন 'শব্দ' শব্দায়মান হইয়া উঠিল বলা নিশ্চয়ই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু 'মুখর' কথাটার ঠিক মানেটাও ত তাঁর জানা উচিত ছিল। জোর করিয়া 'নির্লজ্জ' অর্থ করার চেয়ে বরং বলা ভাল, "কি করিব ওটা যে আমার চাই-ই। ওটা মহতের ইত্যাদি।"

শ্রীমতী অনুরূপা আর একস্থানে লিখিতেছেন—"ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে শস্য দান করে, পতিত থাকিলে কণ্টক-গুল্মের আবাসভূমি হয়। সুতরাং ভারতবর্ষের নৈতিক ক্ষেত্রও আকর্ষণে যে কণ্টক গুল্মে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে, ইহা কোন স্বভাব-বিরুদ্ধ ব্যাপার নহে। বনস্পতি এ-কাননে পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু এখন তাহা বল্মীক ও লতাস্তূপে এমন করিয়া ঢাকিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে আর চিনিয়া বাহির করিবার বুঝি কোন উপায় নাই।" ছিল ক্ষেত্র এবং শস্য, আসিল কানন ও বনস্পতি। তা আসুক—ক্ষেত্র না হয় বন-জঙ্গল হইতেও পারে, কিন্তু কোন শস্যকেই ত বনস্পতি, হইয়া উঠিতে দেখিলাম না। এদিকে ত হয় না—ও-দিকে হয় কি-না বলিতে পারি না। ওদিকে বোধ করি হয় না; কিন্তু 'বনস্পতি'টি যে চাই-ই। কিন্তু আমি বলি, চাহিবার পূর্ব্বে ও-জিনিসটা যে মটর-কলায়ের গাছ নয়, এটা ত জানা উচিত ছিল।

এই মহতের আশ্রয় ধরিতে গিয়া অনুরূপা একস্থানে লিখিলেন, "ভূমার সঙ্গে ভূমির, ক্ষুদ্রের সঙ্গে মহতের এই যে যোগ!" অর্থাৎ, ছোট্ট ভূমিটি মহৎ ভূমির সঙ্গে যুক্ত হইতেছে। 'ভূমা' কথাটা যে ব্যবহার করা আবশ্যক, আমি তাহা অস্বীকার করি না, কিন্তু কোনটি ক্ষুদ্র, কোনটি মহৎ সে সংবাদটাও কি বই লেখার পূর্ব্বে অনুসন্ধান করা আবশ্যক ছিল না?

১৩১৭ সালের আষাঢ়ের ভারতীতে 'প্রাচীন ভারতের পূজায়' শ্রীমতী ঘোষজায়া লিখিয়াছেন—"আত্মসম্মানের সহিত আত্মাদরের একটা সাদৃশ্য আছে, এই সাদৃশ্য-সঙ্কট এড়াইবার জন্য ভারতবর্ষের ধর্ম্মনীতি আত্মসম্মানকে দূরে রাখিয়া আসিয়াছে। ফল যখন পাকে, তখন আপনা হইতেই বোঁটা ছাড়িয়া পড়ে, পাকাইবার জন্য তাহাকে বৃন্তহীন করিলে তাহা বিকৃতই হয়, পরিণত হয় না।" আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না, এই 'বোঁটাছাড়ার' উপমাটির যোগ কাহার সঙ্গে। মৌলিক না হইলেও স্বতন্ত্রভাবে উপমাটি খুব ভাল তাহা স্বীকার করি, কিন্তু এই আগাগোড়া পরিপূর্ণ সুখ্যাতির মধ্যে ভাল যে এখানে সে কাহার করিতেছে তাহা বুদ্ধির অগোচর। "বাবলার মত সর্ব্ববিসারি 'গুল্ম'টার ন্যায়" অহং জিনিসটাকে বারংবার নিন্দা করিয়া তাহাকে পরিবর্জ্জন করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষ যেদিন বিরাট ব্যাপার করিয়াছিল, এবং তাহার প্রত্যেক জাতি; প্রত্যেক বর্ণ তাহার বিরাট রাজছত্রতলে স্থান পাইতেছিল, সেই সময়ে এই জোর করিয়া বোঁটাছাড়া অপরিণত ফলটি যে কোন্ শ্রেণীর মধ্যে ঢুকিতে গিয়া অন্যায় করিয়াছিল তাহা বুঝিয়া লইবার কোন পথই লেখিকা রাখেন নাই। সেদিন এই প্রাচীন ভারতের সুখ্যাতি ধরিতেছিল না; হঠাৎ এই বৎসর-দুয়েকের মধ্যে সে কি অপরাধ করিয়াছে যে, ঘোষজায়া মহাশয়া 'মনুষ্যত্বের সাধনার' ছুতা তুলিয়া এমন করিয়া তাহাকে আজ ভৎর্সনা শুরু করিয়া দিয়াছেন? বলিতেছেন, "কিছুমাত্র না বুঝিয়া শুক ও তোতার মত কণ্ঠস্থ করা যে বিদ্যাধ্যয়ন নহে, তাহা বলা নিশ্চয়ই বাহুল্যোক্তি, অধুনা শিশু-শিক্ষাতেও এরূপ মূঢ় নীতি প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু, আমাদের এই শ্রদ্ধেয়, পূজ্যপাদ, জ্ঞানগরিষ্ঠ ভারতবর্ষ এখনও তাহার ত্রিশ কোটী নর-নারীকে সেই প্রাথমিক যুগের প্রথম পাঠ পড়াইতেছে, গম্ভীর-মুখে মাথা নাড়িয়া সে বলিতেছে, "জিজ্ঞাসা করিবার তোমাদের অধিকার নাই, আজ্ঞাবহের মত তোমরা কেবল আজ্ঞা পালন করিবে, ইহাই তোমাদের মুক্তির মূল্য!" জ্ঞানগরিষ্ঠ ভারতবর্ষের এই জ্ঞানের পরিচয় দিয়া পরে লিখিতেছেন "কিন্তু প্রাচীন ভারত এই আপেক্ষিকতাকে একেবারেই আমল দেয় নাই। নেশার 'ঝোঁকে অসাধ্য-সাধনের পরম উল্লাসকে সে এমন বড় করিয়া দেখিয়াছিল যে, জীবনের ছোটখাট কর্ত্তব্যগুলি একান্তভাবে সে অবজ্ঞা করিয়াছে।" প্রাচীন ভারতবর্ষ নেশা খাইয়া কি করিয়াছিল, এবং জীবনের ছোটখাট কর্ত্তব্যগুলি একান্তভাবে অবজ্ঞা করিয়াছিল কিংবা করে নাই, এ তর্ক তুলিব না।

বিদুষীরা যখন বলিতেছেন, তখন মানিয়াই লইলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ওই 'শ্রদ্ধেয়' 'পূজ্যপাদ' প্রভৃতি বিশেষণগুলার কিছু অর্থ আছে, না, ওগুলো শুধু বিদ্যার পরিচয়? নিজের পিতার কোন ভুলের প্রতিবাদ করার জন্য তাঁহার মুখের সামনে দাঁড়াইয়া যদি বলা যায়, "হে আমার শ্রদ্ধেয় পূজ্যপাদ জ্ঞানগরিষ্ঠ বাবা! তুমি তাড়ি খাইয়া নেশার ঝোঁকে মাতলামি করিতেছিলে কি জন্য?" কেমন শুনায়? কে নাকি বাহিরে মার খাইয়া আসিয়া স্ত্রীর কাছে আস্ফালন করিয়া বলিয়াছিল, "হাঁ, কান মলে দিয়েচে বটে, কিন্তু অপমান করেনি।" ঘোষজায়া মহাশয়াও পূজ্যপাদের অপমান করেন নাই, শুধু কান মলিয়াছেন। যাহা হউক, লেখার হাত বটে!

একস্থানে ইনি evolution theory ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিতেছেন, "প্রবৃত্তি-মার্গের শাসন পালন করিয়া তাহা খণ্ডনপূর্ব্বক যাহারা নিবৃত্তি-মার্গে আরোহণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ভারত লুপ্ত পদাঙ্ক পুনরুদ্ধার আর করিতে না পারিয়া অন্তভাগশায়ী অবশিষ্ট চিহ্নগুলিকে একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছেন ও তাহাকে কৃপণের ধনের মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। তাহার পিছনে যে বিস্তৃতমুখ গহ্বর অন্ধকার মুখ ব্যাদিত করিয়া আছে, তাহাকে সে শুধু অসম্ভব প্রয়াসের দ্বারা আড়াল করিয়া রাখিতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহার পায়ের নীচের মাটি তাহার ভাবে যে খসিয়া পড়িতেছে, তাহার প্রতি তাহার দৃকপাত নাই।" অর্থাৎ 'অন্ধকার গহ্বর' 'অসম্ভব প্রয়াস' 'পায়ের নীচে মাটি খসিয়া পড়া' কথাগুলো লাগাইতেই হইবে। কেন তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু গোল হইতেছে এই যে, অন্তভাগশায়ী চিহ্নগুলিতে আকড়িয়া ধরিয়া থাকিবার মাঝখানে এত বড় গহ্বরটাই বা আসে কি সুবাদে এবং পায়ের নীচের মাটিই বা খসিয়া পড়ে কি হেতু? গহ্বরটা যে শুধু সে চেহারাই দেখিতে পায় নাই, তাহা নহে, আমারও ত কই কোনদিকে চাহিয়া চোখে পড়িতেছে না। আর একস্থানে রাশি রাশি শাস্ত্রের দোষ দিয়া লিখিতেছেন, "জীবনের অবস্থা-ভেদে কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মের প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। পুরুষের যাহা ধর্ম্ম নারীর ধর্ম্ম তাহা হইতে পারে না। অপরন্তু—সন্ন্যাসী যদি গৃহীর ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তবে সন্ন্যাসী ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় এবং গৃহী যদি সন্ন্যাসীর পদানুসরণ করে, তবে গৃহীও ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হয়।......লোকসমাজের যখন একটা অনুভূতির স্পন্দনোদয় ঘটিতে থাকে, বিধানের চাপ দিয়া তাহাকে বিমর্দ্দিত করা যায় না, গর্জ্জিত স্রোত তরঙ্গিনীর মত তাহা পথশায়ী প্রতিবন্ধক বিধ্বস্ত করিয়া পথ উন্মুক্ত করিয়া লইয়া অবতরণ করে। সুতরাং গৃহীদের সন্ন্যাসানুপন্থী হইবার সম্বন্ধে প্রবল শাস্ত্র-প্রতিষেধ থাকা সত্ত্বেও সমাজে তাহার প্রভাব অনুমাত্রও হ্রাস হয় নাই।"

অমার বিনীত নিবেদন এই, 'সুতরাং'টির অর্থ কি? সমাজের বিলকুল গৃহীগুলা কি গৃহিণী ত্যাগ করিয়া বনে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে? না, লুকাইয়া গেরুয়া

কাপড় ছোবাইতেছিল, ধরা পড়িয়াছে? নইলে ভয়ের কথা নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের বাড়িতে কাহারও ত ওসব লক্ষণ দেখি না। অন্ততঃ বড়কর্ত্তার সম্বন্ধে আমি ত হলফ করিয়া বলিতে পারি। আজ এই 'সুতরাং' শব্দটায় বহুদিনের একটা কথা মনে পড়িতেছে! একবার গাড়ি করিয়া রাত্রে বাড়ি যাইতেছিলাম! পথে ডানদিকের মাঠে চাষারা পাট কাচিয়া শুকাইতে দিয়াছিল। পাছে ভয় পাই, এই আশঙ্কায় আমাদের পঞ্চা চাকর গাড়ির উপর হইতে সাহস দিয়া বলিল, "মা-ঠাকরুণ ডানদিকে চেয়ে দেখুন, সুতরাং কেমন পাট শুকোচ্চে!" সেদিন বউমানুষের অত হাসি নিশ্চয়ই ভাল দেখায় নাই, কিন্তু ভাল দেখাইবার উপায় ত আমার হাতে ছিল না।

থাক্—আর না। এখনো অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু কাজ নাই। তা ছাড়া, আমরা মেয়েমানুষ হাঁড়ির একটা ভাতই টিপিয়া দেখি। শ্রীমতী আমোদিনী শিক্ষিতা রমণী, আমরা সেকেলে অশিক্ষিতা মূর্খ মেয়ে-মানুষ। হয়ত, তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছি। কিন্তু ভুল হোক, নির্ভুল হোক, যাহা বুঝিয়াছি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। যদি আবশ্যক হয় নিজের লেখা তিনি অনায়াসে সমর্থন করিতে পারিবেন। তবে, একটা কথা বলিয়া রাখি। মেয়ে-মানুষের নাক ডাকে জানি, কিন্তু এত জোরে ডাকিতে শুনিলে অন্য স্ত্রীলোকেরও যেন লজ্জা করিতে থাকে। ভয় হয়, এই বুঝি বা পুরুষমানুষে চমকাইয়া উঠিয়া পড়ে। তাই উৎকণ্ঠায় যদি বা একটু নিষ্ঠুরের মতই ঘুম ভাঙাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি, সে চেষ্টার মধ্যে আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নাই। কিন্তু তাঁর ভাষা যে অতি সুন্দর, অতি মধুর, তাহা অকপটে স্বীকার করি। প্রতি ছত্র গভীর পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ। বহুমূল্য ঘড়ির সুগঠিত কল-কব্জার ন্যায় তাঁহার প্রত্যেক শব্দ-বিন্যাসটির আশ্চর্য্য কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ঘড়িটি দামী এবং চলিতেছেও বটে, কিন্তু কাঁটা দুটি না থাকায় কবি পোপের মত সময়টা ঠিক ঠাওর করিতে অক্ষম হইয়াছি।

এইবার শ্রীমতী অনুরূপা ও নিরুপমার রচনা সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলিব। যদিও শ্রীমতী অনুরূপার 'পোষ্যপুত্রে'র গোড়াও পড়ি নাই, শেষও পড়ি নাই, শুধু মধ্যের গুটিকয়েক অধ্যায় মাত্র পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি, এবং এত অল্প পুঁজি লইয়া বলিতে যাওয়াও বিপজ্জনক জানি, কিন্তু বুড়ো-মানুষের নাকি বেশি পুঁজির আবশ্যক হয় না, তাই বলিতেছি। ইঁহারও ভাষা যে অতি মধুর তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার মেয়ে বলিতেছিল, এত মধুর যে মুখ মারিয়া যায়, আর গিলিতে পারা যায় না। তা ভাষা যাহাই হোক, প্রায় উপমাগুলিই যে না জানিয়া লেখা তাহা পড়িলেই চোখে ঠেকে। আর একটা জিনিস তার চেয়েও বেশি ঠেকে—সেটা অসহ্য জ্যাঠামো। এ-কথাটা আমার বলিবার ইচ্ছা ছিল না। কেন না, এইখানেই তর্ক বাধে। গ্রন্থকারের তারিফ্‌কারীরা ধরিয়া বসেন, কোথায় জ্যাঠামো দেখাও। আমি যাহাই দেখাই না

কেন, তাঁহারা প্রতিবাদ করিয়া বলিবেন—কখ্‌খনো না। এটা হিউমার, ওটা উইট্‌, সেটা আর্ট ইত্যাদি। জ্যাঠামো অন্তরে অনুভব করা যায়, কিন্তু অনুভব করানো যায় না। হিউমার কোথায় পাকামিতে পরিণত হয়, উইট্‌ কোথায় অশ্লীল হইয়া উঠে, আর্ট কোথায় আতিশয্যে ও ছেবলামিতে রূপান্তরিত হয়, সেটা যে-বয়সে বোঝা যায়, ততটা বয়স এখনও লেখিকার হয় নাই। তবে, আশা করি, এ দোষ একদিন শুধরাইবে। কিন্তু, তাঁহার না জানিয়া যা-তা উপমা দিবার স্বপক্ষে সে-রকম কৈফিয়ত কিছুই নাই। তাই দৃষ্টান্তের মত দুই-একটা উল্লেখ করিব মাত্র।

একস্থানে বলিতেছেন, "বিজন-পথে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ পায়ের নীচে দংশনোদ্যত সর্প দেখিলে পথিক যেমন আড়ষ্ট কাঠ হইয়া দাঁড়ায়, ইত্যাদি।" তাই বটে! একটা ন্যাকড়া কিংবা দড়ির টুক্‌রো দেখিলে লাফাইয়া কে কার ঘাড়ে পড়িবে ঠিক থাকে না, আড়ষ্ট হইয়াই দাঁড়ায়! তাও আবার যে-সে সর্প নয়—একেবারে দংশনোদ্যত সর্প! ইনি যে লেখেন নাই, রান্নাঘরে হঠাৎ জ্বলন্ত আগুনের টুক্‌রো পায়ের নীচে মাড়াইয়া ধরিয়া রাঁধুনী যেমন অবাক হইয়া হাঁ করিয়া দাঁড়ায়,—ইহাই পরম ভাগ্য!

আর একস্থানে লিখিতেছেন, "দীপ্ত সূর্য্যালোকের উপর মেঘ আসিয়া পড়িলে তাহা যেমন এক-মুহূর্ত্তেই ম্লান হইয়া যায়, শিবানীর মুখ তেমনি মুহূর্ত্তেই অন্ধকার হইয়া আসিল।" এটা অলঙ্কার না উপমা? কিন্তু দীপ্ত সূর্য্যালোকের উপর মেঘ আসিয়া পড়িলে কি হয়? শাদা দেখায়। কিন্তু লেখিকা ঐ যে ম্লান বলিয়াছেন, কাজেই তাঁহার অন্ধকার মুখের সহিত সূর্য্যালোক পতিত মেঘের তুলনা করিবার অধিকার জন্মিয়াছে! এই কি? আর এক জায়গায় গভীর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের গায়ে বক প্রভৃতিকে উড়িতে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে যেন 'কৃষ্ণতারকা' উড়িয়া যাইতেছে। কাল মেঘের তলায় বক কি কৃষ্ণতারকার মত দেখায়? তা ছাড়া 'কৃষ্ণতারকা'ই বা কি? রাত্রে আকাশের পানে চাহিয়া কোনদিন ত কাল কুচ্‌কুচে নক্ষত্র চোখে পড়ে না। আর যদি চোখের তারাই হয়, সেও ত সাদা পদার্থের মাঝখানে থাকে। কালো মেঘের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্যই বা কোথায়? প্রকৃতি-দেবীর উপর উৎপাত আরও অনেক আছে—সেইগুলি একটুখানি হুঁস করিয়া করা উচিত ছিল। কেন না, নিজে যাহা জানি না, তাহা না জানানই বুদ্ধির কাজ।

যাহা হউক, বইখানি শুনিয়াছি ৫।৬শ পাতার; আমি মাত্র ২৫।৩০খানি পাতা পড়িয়াছি; সুতরাং আশা করিতেছি, যাহা পড়ি নাই তাহার মধ্যে ভাল ভাল জিনিসই রহিয়া গিয়াছে। মেয়েটাও বলিতেছিল, বইখানি জ্ঞানগর্ভ। বেদ, কোরান, বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারত, এথিক্স, মেটাফিজিক্স, রামপ্রসাদী, তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, মারণ, উচাটন, বশীকরণ—সমস্তই আছে। এ-ছাড়া সংস্কৃত, হিন্দী,

ইংরেজী—কালিদাস, সেক্সপিয়র, টেনিসন—যাহা কিছু শিক্ষা করা প্রয়োজন একাধারে সমস্তই। বলিতে পারি না, শেষের দিকে রাজভাষা এবং clerk's guide আছে কি না। আমার ছোট নাতিটিকে একখানি কিনিয়া দিব মনে করিতেছি।

যদি আমার রাধারাণীর কথা সত্য হয়, তবে আর গোটা-দুই প্রশ্ন করিয়াই ক্ষান্ত হইব। জিজ্ঞাসা করি, এত বাড়াবাড়ি ধর্ম্মচর্চ্চা কেন? হিন্দু-ধর্ম্মের অত সূক্ষ্ম ভেদগুলি না হয় নাই দেখান হইত—তাহাতে এমনই কি ক্ষতি ছিল! এ যে সন্ন্যাসী ফকিরের ভিড়ে পা বাড়াইবার জো নাই, কোথায় দাঁড়াই, কোন দিকে চলি, কোন মহাত্মার গায়ে বুঝি পা দিয়া ফেলি, এই ভয়েই যে সারা হইতে হয়। তার উপর ইংরেজির বুকনি ও ইংরেজি কবিতার লম্বা কোটেশন! এ-কথাও ভাবা উচিত ছিল, এটা বাংলা উপন্যাস এবং তাহার অধিকাংশ ভগিনীগুলিই ইংরেজি জানেন না। জানি বলিয়া কি তাহা জানাইতেই হইবে! শুনিয়াছি, রবিবাবুও ইংরেজি জানেন, বঙ্কিমবাবুও নাকি শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও নভেলের মধ্যে লোভ সংবরণ করিতে পারিয়াছিলেন। এ-ক্ষেত্রেও লোভ সামলান উচিত ছিল। অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোক হইয়াও সর্বতোমুখী পাণ্ডিত্যের বহরে লোকজনের তাক্ লাগাইয়া দিব, এই স্পিরিট্‌টাই নিন্দার্হ। অগ্রহায়ণের 'ভারতী'তে এক ভদ্রলোক এই বইখানি সমালোচনা করিয়া একস্থানে বলিয়াছেন, স্থানে অস্থানে অত্যধিক প্রকৃতি-বর্ণনা এবং তাহাতে রসভঙ্গ না কি এমনি একটা দোষ ঘটিয়াছে। আমি কিন্তু এ কথা বলি না। বরং বলি, দুই-তিন পাতা জোড়া প্রকৃতি বর্ণনা পড়িয়া যে ব্যক্তি একটা কিছু আইডিয়া করিতে চায় সেই অরসিক। এ জিনিসটা গয়ায় পিণ্ড দেবার মত। পুরোহিত ঠাকুরও জানে না, কি বলাইতেছি; যজমানও গ্রাহ্য করে না, কি বলিতেছি! অথচ, উভয়েই জানে কাজ হইতেছে—ভূত ছাড়িতেছে! এ-বিষয়ে শ্রদ্ধা থাকা চাই, বিশ্বাস করা চাই, প্রকৃতি-বর্ণনা বুঝিতেছি। ভেল্কি-খেলা দেখেন নাই? খেলোওয়াড় চোখের ভিতর হইতে হাঁসের ডিম বাহির করিবার আগে হাত-পা নাড়িয়া ভানুমতীর ব্যাখ্যা শুরু করিয়া দেয়—এ তেমনি। বোঝা উচিত, এবার আশ্চর্য্য কিছু একটা আসিতেছে। যে সমঝদার সেই জানে এইবার ডিম বাহির হইবে—বোকায় শুধু হাত-পা নাড়া দেখিতেই ব্যস্ত থাকে এবং ভানুমতী ব্যাখ্যার মানে বুঝিতে চায়। আমি ত ৩০ অধ্যায়ের গোড়াতেই বুঝিয়াছিলাম, এবার নতুন কিছু একটা আছে।

লেখিকা লোক-হিতার্থে দয়া করিয়া পেটকামড়ানির মন্ত্র পর্য্যন্ত শিখাইয়া দিয়াছেন।

"রাম লক্ষ্মণ সীতে যান কিষ্কিন্ধ্যার পথে;
সাথে নিলে হনুমান আর সুগ্রীব মিতে;
সুগ্রীব বলিল মিতে আমি মন্তর এক জানি
পেটের ব্যথায় অব্যথা হয়ে যায় প্রাণী।"

বাস্তবিক, লোকের কুসংস্কারে হিন্দু-ধর্ম্মের অনেক ভাল জিনিস লোপ পাইতেছে, এটা কোনমতেই হইতে দেওয়া উচিত নয়। শ্রীযুক্ত লালবিহারী দে, গোবিন্দ সামন্তকে সাপের মন্তর শিখাইয়া দিয়াছিলেন। আমিও পেট কামড়ানির একটা মন্তর জানি, যদি কাহারও উপকার হয়, তাই লিখিতেছি। অবশ্য আমার মন্তর অব্যর্থ কি না বলিতে পারি না। এ বাড়ির পুরুষগুলা গোঁয়ার গোছের, ওসব বিশ্বাস করিতে চাহে না—তাই যাচাই করিয়া লইবার সুবিধা ঘটে নাই। যে বাড়ির পুরুষেরা শিষ্ট শান্ত সেখানে পরখ হইতে পারিবে। মন্তর এই—

"পেট কামড়ানি, পেট কামড়ানি,
ভাল হবি ত হ';
নইলে কামড়ে কামড়ে কি গরু বাছুর
মেরে ফেলবি!"

রোগীর পেটে হাত বুলাইয়া তিনবার বলিতে হয়।

এবার শ্রীমতী নিরুপমার কথা কিছু বলিব। ইঁহাদের মধ্যে নিরুপমার রচনাকে অনেক দিক হইতে ভাল বলিতেই হয়। সহজ, সরল ও বিনীত। যাকে 'পাণ্ডিত্যের হুঙ্কার' বলে সেটা নাই, এবং স্টেজ আস্ফালনিও কম। কথাবার্ত্তাগুলি কথাবার্ত্তারই মত। লেখার ভুল যে নাই তাহা নহে। ভুল কাহারই বা না থাকে, এবং থাকিলেই তাহা মহা লজ্জার বিষয় হয় না, যদি না ভুল যাচিয়া ঘরে আনি। যদি না সোজা পথ ছাড়িয়া অজানা পথের মধ্যে গিয়া পথ হারাই। শরীরে ঘা হওয়া এক এবং চুলকাইয়া ঘা করা আর। একটায় মায়া হয়, অপরটায় রাগ করিতে ইচ্ছা করে—মুখে আসিয়া পড়িতে চায়—বেশ হইয়াছে, যেমন কর্ম্ম। যদি পারিবে না, তবে যাও কেন? নিরুপমা এই দোষটি করেন বলিয়া ইহার ভুলটা শুধু ভুল, কিন্তু ওঁদের ভুলগুলা ভুল ত বটেই এবং আরো কিছু। যাহারা সোজা পথে চলিয়া ভুল করে তাদের ভুল একদিন আপনি শুধরাইয়া যায়, কিন্তু যাহারা বাঁকা পথে চলিতে চায়, অথচ পথ চেনে না, তাদের ভবিষ্যৎ অধিকতর বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে থাকে। শ্রীমতী নিরুপমার 'অন্নপূর্ণার মন্দির' পড়িবার সময় দুই-একটা সোজা ভুল চোখে ঠেকিয়াছিল, কিন্তু এখন আর তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। তবে, একটা মনে আছে, দৃষ্টান্তের মত উল্লেখ করিতেছি। একস্থানে 'সন্তরণ মূঢ়ের ন্যায়' না বলিয়া 'সন্তরণহীন মূঢ়ের ন্যায়' বলিয়াছেন। এটা বুঝিবার ভুল। বঙ্কিমবাবু যেমন কৃষ্ণকান্তের উইলের গোড়াতেই 'ইহলোকান্তে' না বলিয়া একাধিক বার 'পরলোকান্তে' বলিয়াছেন—তেমনি। কিন্তু, এটা যদি রবিবাবুর অনুকরণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যায় করা হইয়াছে। তিনি 'সন্তরণ মূঢ় রমেশ সঙ্গীতের হাঁটুজলে' ইত্যাদি বলিয়াছেন, 'সন্তরণহীন' বলেই নাই। যাহা হউক, এটা ধর্ত্তব্যের

মধ্যেই নয়। কি ধর্ত্তব্যের মধ্যে সেইটা নিশ্চয়ই যেটা না জানা সত্ত্বেও লেখা হইয়াছে। যেখানে সতী আফিং এবং বেলেডোনা দুই খাইয়াছে। একটা বিষ আর একটা প্রতিষেধক। বেলেডোনা দিয়ে ডাক্তারেরা 'মরফিন্' ইনজেকট করেন। দুইটা বিষ একসঙ্গে সেবন করিলে দুর্ভাগা যে অনেক সময়ে শুধু মরে না, তা নয়, মরিলেও অত শীঘ্র অত আরামে মরে না; অনেক বিলম্বে অনেক কষ্টে মরে। সেটা নিশ্চয়ই লেখিকার অভিপ্রায় ছিল না। তাছাড়া, দুর্ঘটনার আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল। হয়ত মরিতই না, হয়ত পোড়াইবার সময় চোখ চাহিয়া ফেলিত। যাহা হউক, যখন নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে, তখন আর আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বেলেডোনা যোগাড় করিবার জন্য মালিশের ঔষধ, ডাক্তার, ডাক্তারখানা, বাত ইত্যাদি অনেক অবান্তর কথার অবতারণা করিতে হইয়াছে। সুতরাং, একটুখানি জানিয়া লিখিলে আর এই বাজে মেহন্নতগুলো করিতে হইত না।

আর না। এইবার সমাপ্ত করি। অপ্রিয় কথা অনেক লিখিলাম। আশা করি ইহাতে সুফল ফলিবে। আর যদি প্রচলিত নিয়মানুসারে লেখক-লেখিকারা এই বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবার চেষ্টা করেন যে, সমালোচকেরা নিজেরা লিখিতে পারে না বলিয়াই হিংসা করিয়া গ্লানি করে, তাহা হইলে আমি নিরুপায়। কিন্তু সমালোচক মাত্রেই যে লিখিতে পারে না, এবং পারে না বলিয়াই দোষ দেখাইয়া বেড়ায়, এ-কথাটার উপরেও তত আস্থা রাখা ঠিক নয়।

—শ্রীঅনিলা দেবী

গ্রন্থ-পরিচয়

গৃহদাহ

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩২৩ সালের মাঘ—চৈত্র, ১৩২৪ সালের বৈশাখ—আশ্বিন অগ্রহায়ণ ফাল্গুন, ১৩২৫ সালের পৌষ—চৈত্র এবং ১৩২৬ সালের আষাঢ়-অগ্রহায়ণ ও পৌষ—মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ ২০শে মার্চ, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ (ফাল্গুন, ১৩২৬)।

বিন্দুর ছেলে

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩২০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ ৩রা জুলাই, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ (শ্রাবণ, ১৩২১) 'রামের সুমতি' ও 'পথ-নির্দ্দেশ' নামক অপর দুইটি গল্পের সহিত একত্রে পুস্তকাকারে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। 'Modern Review' পত্রে ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী—জুন সংখ্যায় "Bindu's Son" নামে শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় কৃত ইহার ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বিন্দুর ছেলে'র নাট্যরূপ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে।

অনুপমার প্রেম

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩২০ সালের চৈত্র সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হয়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ 'কাশীনাথ' গল্প-পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত সাতটি গল্পের অন্যতম। 'কাশীনাথ গল্প-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ (ভাদ্র, ১৩২৪)। 'অনুপমার প্রেম' গল্পের নাট্যরূপ প্রকাশিত হয় ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫

অপ্রকাশিত রচনাবলী

সমাজ-ধর্ম্মের মূল্য

প্রথম প্রকাশ : ১৩২৩ সালের বৈশাখ—জৈষ্ঠ্য সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে 'শ্রীমতী অনিলা দেবী' এই ছদ্মনামে প্রকাশিত।

এই ছদ্মনামে শরৎচন্দ্র 'যমুনা' ও 'ভারতবর্ষে' কয়েকটি প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার এই নাম প্রথমে 'যমুনা'য় বাহির হইয়াছিল।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তিনি রেঙ্গুন হইতে 'যমুনা' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিয়াছিলেন :—"আমার তিনটে নাম। সমালোচনা-প্রবন্ধ প্রভৃতি —অনিলা দেবী। ছোট গল্প—শরৎচন্দ্র চট্টো। বড় গল্প—অনুপমা। সমস্তই এক নামে হলে লোকে মনে করবে, এই লোকটি ছাড়া আর বুঝি এদের কেউ নেই।"

পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রথম প্রকাশ : "শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী"র অন্তর্ভুক্ত হইয়া পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়—শ্রাবণ, ১৩৫৮।

নারীর লেখা

প্রথম প্রকাশ : ১৩১৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'যমুনা' মাসিক পত্রিকায় 'শ্রীঅনিলা দেবী' এই ছদ্মনামে প্রকাশিত।

পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রথম প্রকাশ : "শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী"তে ইহার প্রকাশ হয়।

সপ্তম সম্ভার

সমাপ্ত